প্রথম প্রকাশ
৩০ শ্রাবণ, ১৩৬৭

প্রকাশক
অধ্যাপক প্রভাত প্রসূন মোদক এম. এ., এল. এল. বি.
সহ-সভাপতি, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ইনিস্টিটিউট্ অফ্ রিসার্চ্ অ্যাণ্ড কাল্চার
৬২, ৭৪ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-২৫

প্রয়াত ভারতরত্ন সত্যজিৎ রায় মহোদয়ের উপদেশানুসারে
প্রচ্ছদপট এঁকেছেন রনেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী

মুদ্রণ
বি. বি. প্রিন্টার্স
দিলীপকুমার পান
২০এ, রাধানাথ বোস লেন, কলকাতা-৬

গ্রন্থনকারী
শ্রীগুরু বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৭২/৩, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান
চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং লিঃ
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭৩
মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

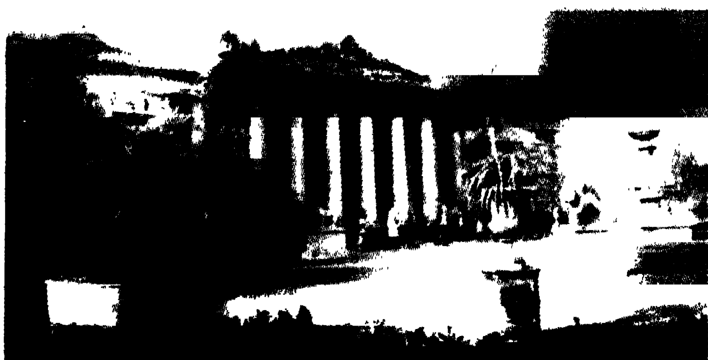
চিত্ররাজি পরিচয়

ক্রমিক সংখ্যা **নির্দেশ পৃষ্ঠা**



কলকাতায় শোভাবাজারে মহারাজা নবকৃষ্ণের দেওয়ানখানা

চিত্র সংখ্যা—১ পৃঃ—২৬-২৭



কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিকের মার্বেল প্যালেস্

চিত্র সংখ্যা—২ পৃঃ—৫৩-৫৫



কলকাতায় আলিপুরে ওয়ারেন্ হেস্টিংসের বাসভবন

চিত্র সংখ্যা—৩ পৃঃ—১৬



মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর

চিত্র সংখ্যা—৪ পৃঃ—৬০



মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর

চিত্র সংখ্যা—৫ পৃঃ—৫৮



কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটায় টেগোর প্যালেস্

সংখ্যা—৭ পৃঃ—৫৯



কলকাতায় ড্যালহৌসী স্কোয়ারে বেঙ্গল কাউন্সিল্ চেম্বার, সামনে অন্ধকূপহত্যা স্মারক

চিত্র সংখ্যা—৬ পৃঃ—১৪২



কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটায় টেগোর ক্যাসল্

চিত্র সংখ্যা—৮ পৃঃ—৫৯



মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহতব

সংখ্যা—৯ বর্ধমান পৃঃ—১২৯-৩০



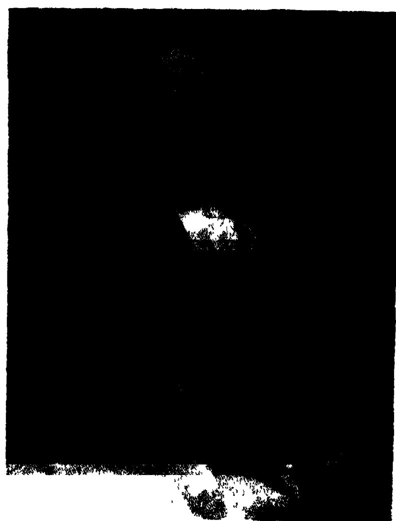
রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

সংখ্যা—১০ কলকাতা পৃঃ—৪৬-৪৭



নবাব আবদুল লতিফ খান

সংখ্যা—১১ কলকাতা পৃঃ—৬৩



নবাব সৈয়দ আমীর আলি খান

সংখ্যা—১২ কলকাতা পৃঃ—৬২



মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা

সংখ্যা—১৩ কলকাতা পৃঃ—৭০-৭১



রাজা কৃষ্ণদাস লাহা

সংখ্যা—১৪ কলকাতা পৃঃ—৭১-৭২



রাজা হৃষীকেশ লাহা

সংখ্যা—১৫ কলকাতা পৃঃ—৭২



রাজা দিগম্বর মিত্র

সংখ্যা—১৬ কলকাতা পৃঃ—৬৭, ৬৮



রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রাসাদের ড্রইংরুম

সংখ্যা—১৭ কলকাতা পৃঃ—৬৯



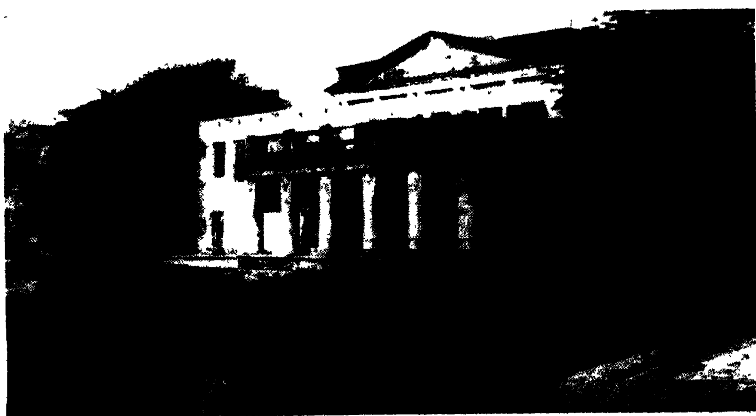
শ্রীরামপুরে গোস্বামীদের রাজবাড়ী

চিত্র সংখ্যা—১৮ পৃঃ—৯৮-৯৯



হাওড়ায় আন্দুলের রায়দের রাজপ্রাসাদ

চিত্র সংখ্যা—১৯ পৃঃ—৮২



হাওড়ায় শিবপুরে রায়চৌধুরীদের রাজবাড়ী

চিত্র সংখ্যা—২০ পৃঃ—৭৭-৭৯



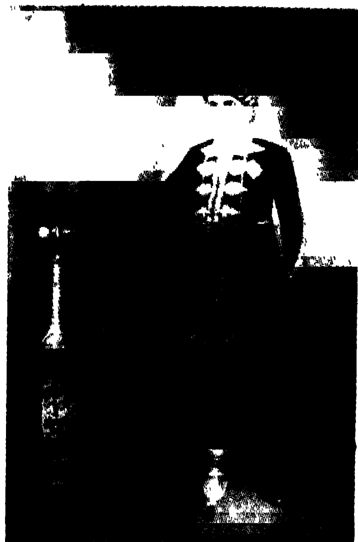
নবাব সৈয়দ হাসান্ আলি মির্জা

সংখ্যা—২১ মুর্শিদাবাদ পৃঃ—১৪৯



নবাব ওয়াসিফ্ আলি মির্জা

সংখ্যা—২২ মুর্শিদাবাদ পৃঃ—১৫১



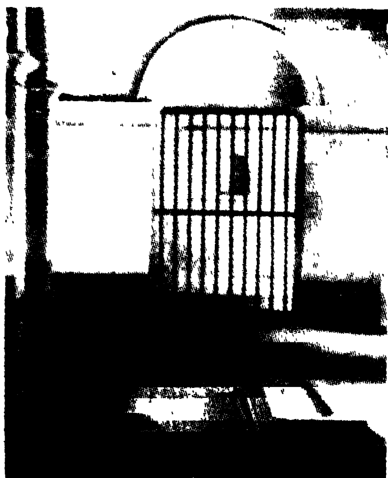
মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

সংখ্যা—২৩ কাশিমবাজার পৃঃ—১৮৭-৮৯



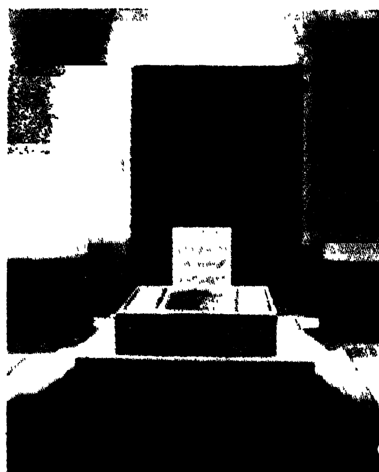
মহারাজা রণজিৎ সিংহ

সংখ্যা—২৪ নসীপুর পৃঃ—১৯৬-৯৭



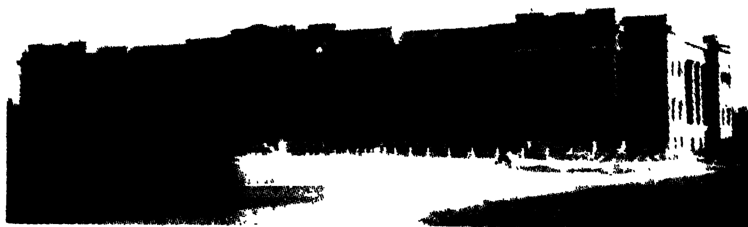
নবাব সিরাজের ও তাঁর বেগমের কবর

সংখ্যা—২৫ মুর্শিদাবাদ পৃঃ—১৬৪

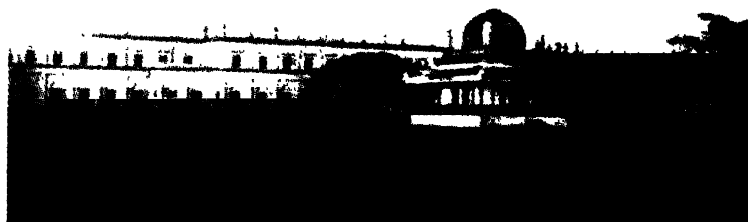


নবাব আলিবর্দীর কবর

সংখ্যা—২৬ মুর্শিদাবাদ পৃঃ—১৬৪



সংখ্যা—২৭ হাজার দুয়ারী প্রাসাদ, মুর্শিদাবাদ পৃঃ—১৬৩



সংখ্যা—২৮ ইমামবাড়া, মুর্শিদাবাদ পৃঃ—১৬৩



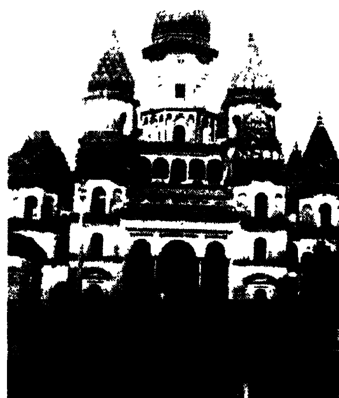
মহারাণী ভবনী প্রতিষ্ঠিত ভবনীশ্বর শিব মন্দির

সংখ্যা—২৯ বড়নগর, মুর্শিদাবাদ পৃঃ—১৭৭-২২৭



মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দির

সংখ্যা—৩০ কৃষ্ণনগর পৃঃ—২০৫



হংসেশ্বরী মন্দির

সংখ্যা—৩১ বাঁশবেড়িয়া পৃঃ—৮৭



সংখ্যা—৩২ বিষ্ণুপুরে মল্ল মন্দির-স্থাপত্য—রাসমঞ্চ পৃঃ—১২২



সংখ্যা—৩৩ বিষ্ণুপুরে মল্ল মন্দির-স্থাপত্য—শ্যামরায়ের মন্দির পৃঃ—১২২-২৩



কোচবিহার রাজবাড়ী পৃঃ—২১৩-১৪



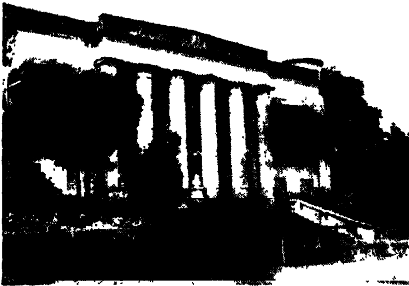
মহারাজা গিরিজানাথ রায়

সংখ্যা—৩৫ দিনাজপুর পৃঃ—২৮৯-৯০



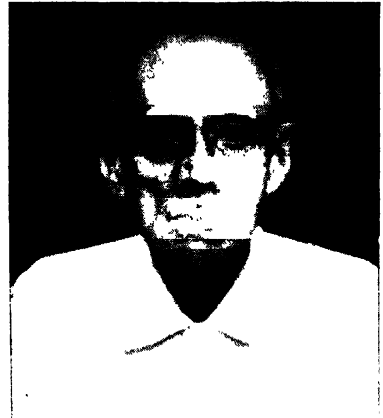
মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ

সংখ্যা—৩৬ কোচবিহার পৃঃ—২১৩



উত্তরপাড়ায় জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী

সংখ্যা—৩৭ পৃঃ—৯৫



রাজা কমলারঞ্জন রায়

সংখ্যা—৩৮ কাশিমবাজার পৃঃ—১৯৯



সংখ্যা—৩৯ রাজসাহীতে দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী পৃঃ—২৩১



মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য চৌধুরী

সংখ্যা—৪০ ময়মনসিংহ পৃঃ—২৪২



রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী

সংখ্যা—৪১ মুক্তাগাছা পৃঃ—২৪৫-৪৬



মহারাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী

সংখ্যা—৪২ সন্তোষ পৃঃ—২৪৯-২৫০



রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

সংখ্যা—৪৩ রামগোপালপুর পৃঃ—২৪৭-৪৮





সংখ্যা—৪৪, ৪৫ রাজসাহীতে বলিহারের রাজবাড়ী ও ঠাকুর বাড়ী পৃঃ—২৩৫



নবাব স্যার খাজা আবদুল গনি মিয়া
সংখ্যা—৪৬ ঢাকা পৃঃ—২৫৮-৫৯

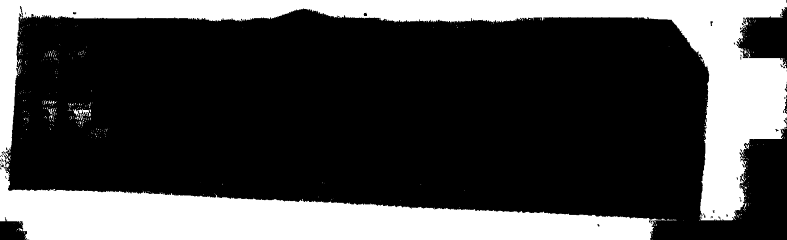


নবাব স্যার খাজা সলিম উল্লাহ
সংখ্যা—৪৭ ঢাকা পৃঃ—২৬০



নবাব স্যার খাজা আহসান্ উল্লাহ
সংখ্যা—৪৮ ঢাকা পৃঃ—২৬০-৬

ঢাকার নবাবদের প্যালেস্ আহসান্ মঞ্জিল
সংখ্যা—৪৯ পৃঃ—২৫৭-৫৯



পাঠ্যসূচী

প্রসঙ্গ		পৃষ্ঠা

প্রয়োজনীয় সংশুদ্ধি

পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপায় ভুল আছে	নির্ভুল হবে
৩৯	১৪	১৭৭০	১৭৯৩
৫৯	২	অ্যালেন্ ইডেন্	এাস্লে ইডেন্
৫৯	৩	১৮৯০	১৮৭৭
৫৯	১১	ত্রৈমারেল্ড	এমারেল্ড
৬১	৩০	ক্যাসলেই	প্রাসাদে
৭৮	পাদটীকা	১৮২৪	১৮২৮
৭৯	১৭	হয়ে গেছে	হয়নি
১০১	১২	১৬৪৬-৬৮	১৬৩৯-৬০
১১৪	২	বীরেন্দ্রনারায়ণ	ধীরেন্দ্রনারায়ণ
১৫২	১১	১৬৪০	১৬৫৮
১৭৭	১৮	১৭০৮	১৭২৮
১৭৮	৪	১৭০৭-২৯	১৭০৩-২৭
১৮০	২০	৩৫	৩০
১৮৯	৪	১৩১৮	১৩১৬
১৯৪	৮	দৌহিত্র	দৌহিত্র-জামাতা
১৯৬	২৮	কিস্তীটচাঁদ	কীর্তিচাঁদ
১৯৬	২৯	কিরীটচাঁদ	কীর্তিচাঁদ
২০৮	১২	দফতায়	দক্ষতায়
২১১	৬	রমেন্দ্রনাথ	রনেন্দ্রনাথ
২৪০	২৪	প্রভা	পূর্বা
২৪৫	৯	১৮৫৭	১৮৭৫
২৫০	২০	১৩৩৯	১৯৩৯
৩১৬	২ এবং ২০ একই গ্রন্থের নাম।		

সময়ের স্বল্পতা ও তারিখের প্রাচুর্যের ফলে সামান্য কয়েকটি ভুল সুধী পাঠকেরা সংশোধন করে নেবেন। এই আশাই করবো—প্রকাশক

ভূমিকা

'এক যে ছিল রাজা'—যুগ যুগ ধরে রাজারাজড়া, নবাব-বাদশাহের কাহিনী লোকে আগ্রহের সঙ্গে শুনে এসেছে। সব দেশের ইতিহাস জুড়ে আছে এঁদের কথার সঙ্গে। এঁদের ঐশ্বর্য-বিভব, বিলাস-ব্যসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য। এঁদের নিয়ে কত গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কাব্যও রচিত হয়েছে। তবু রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশাদের কাহিনী কখনও পুরান হয়নি।

ইংরেজ আমলে ভারতে প্রায় ছ'শর ওপর দেশীয় রাজ্য ছিল, কোনটা ছোট, কোনটা মাঝারি, কোনটা বা বেশ বড়। এঁদের অনেকেই স্বায়ত্ত-শাসনের সুবিধা পেত। স্বাধীনতার পর এঁদের এলাকা ভারতের সঙ্গে মিশে গেল এবং 'ব্যক্তিগত প্রাপ্য' তুলে দেওয়া হল। তাঁরা ধনী অথচ সাধারণ নাগরিক হয়ে রইলেন। এইসব করদ নৃপতিদের চমকপ্রদ কাহিনী নিয়ে ইংরেজীতে অনেক জনপ্রিয় গ্রন্থ লেখা হয়েছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ ধরণের গ্রন্থ বিরল। কিছু বিবরণ ছড়িয়ে আছে 'বংশ পরিচয়' 'জীবনী কোষ' বা 'ভারত কোষ' প্রভৃতি গ্রন্থে।

বহু পুস্তকের রচয়িতা বিমল চন্দ্র দত্ত মহাশয় 'খেতাবী রাজারাজড়া' গ্রন্থটি প্রণয়ণ করে বাংলা ভাষার এই অভাবটি বহুলাংশে পূরণ করলেন। গ্রন্থটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, এর নায়কেরা সাধারণত যুদ্ধ জয় করে রাজা হয়নি। তাঁরা দেশের শাসক-শক্তির কাছ থেকে তাঁদের সৎকর্মের স্বীকৃতি-স্বরূপ 'রাজা', 'মহারাজা' বা 'নবাব' উপাধি পেয়েছিলেন। এঁদের অনেকেরই উদ্ভব হয়েছিল মুঘল আমলে, যেমন বাংলার 'বারো ভুঁইয়া', মুর্শিদাবাদ ও ঢাকার নবাব বংশ, বীরভূমের মল্লবংশ প্রভৃতি। অন্যদের খ্যাতি প্রতিপত্তি ইংরেজ শাসন কালে। নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা, কর্মকুশলতা, দান-ধ্যান, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা আর জনসেবার কারণে এঁরা সরকারের কাছে এই মহাসম্মান লাভ করেছেন। যদিও এঁদের অনেকে ইংরেজ সাম্রাজের স্তম্ভ ছিলেন, তবু লোকসেবায় এঁরা পশ্চাৎপদ হননি। স্বাধীনতা সংগ্রামে দান আর অবদানের জন্যে সুবোধচন্দ্র মল্লিক জনসাধারণের কাছে রাজোপাধি লাভ করেন। প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামমোহন রায় ভারতে নবযুগের পুরোধা বলে স্বীকৃত। পণ্ডিতপ্রবর রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র আজও সম্মানার্হ। ঠাকুর-পরিবারের রাজোপাধি-ধারক কত সজ্জন বঙ্গসংস্কৃতির বিকাশের জন্যে সুখ্যাত। বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত রায়, মল্লিক ও লাহা পরিবার ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্প বিস্তারের জন্যে স্মরণীয়। নবাবোপাধি-

ধারীদের অবদানও ভূয়সী প্রশংসার যোগ্য! এই গ্রন্থটিতে এই সব বরণীয়দের কথা গ্রন্থকার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের কর্মক্ষেত্র ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ সংসদের 'হাউস অব লর্ডস' অবধি বিস্তৃত। অথচ এই সব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেরই জীবন সামান্য চাকুরি বা ব্যবসায় থেকে শুরু হয়েছিল, তাঁরা স্বীয় শ্রম ও প্রতিভাবলে উচ্চসম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

গ্রন্থটির অপর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে কাহিনী মূল নায়কদের জীবনীতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, তাঁদের উত্তরাধিকারীদের পরিচয় ও কৃতিত্বের কথাও জানান হয়েছে। স্পষ্টত এঁদের গরিমা এক পুরুষেই শেষ হয়নি, বরং পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে। এই সব তথ্য খুবই আশাব্যঞ্জক যে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও এঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থ পাঠ করলে বোঝা যায় যে, লেখক বহু পরিশ্রম করে এই সব তথ্য একত্র গ্রথিত করেছেন। তাঁর ভাষাও প্রাঞ্জল ও নিরুচ্ছাস। অল্প-পরিসরে অনেক সংবাদ উপস্থিত করার ক্ষমতা লেখকের আছে। গ্রন্থটি যেন একটি বিশেষ কোষ সংকলন।

গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট চিত্রগুলিও এক বিশেষ সম্পদ। তাদের মধ্যে অনেক নায়কের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়। অনেকের বিশাল প্রাসাদ ও মন্দিরাদি বাস্তুকর্ম আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই মূল্যবান্ তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থটি সুধী পাঠকবৃন্দের কৌতূহল চরিতার্থ করবে, এই আমার বিশ্বাস। লেখকের সাধু প্রয়াস অবশ্যই অভিনন্দনীয়।

ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র
এম. এ., এল. এল. বি., ডি. ফিল্., ডি. লিট্.,
ডি. এস্. সি., এফ. এ. এস্.
(প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা, সমাজকল্যাণ ও সংস্কৃতি মন্ত্রী)

লেখকের নিবেদন

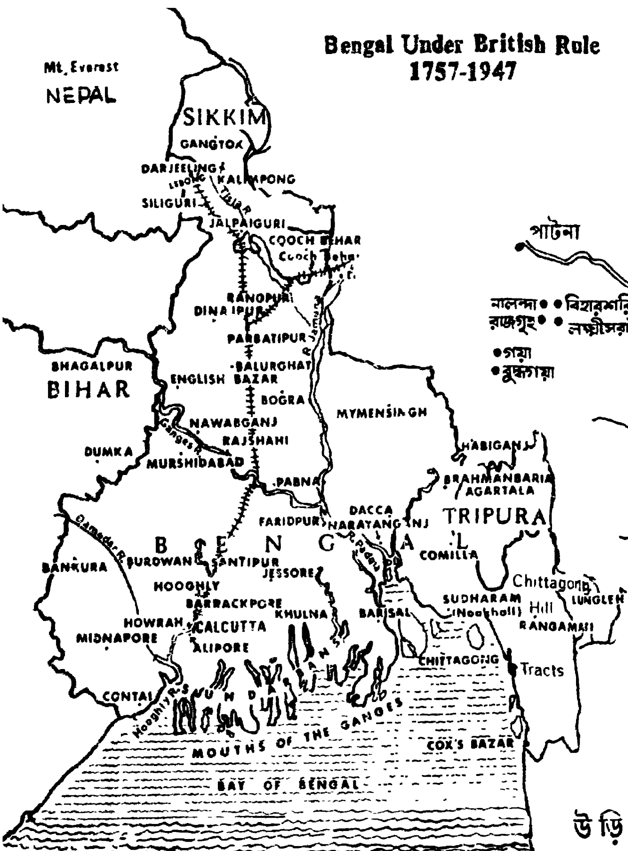
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'কথা ও কাহিনী'। 'কথা' অংশ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। আলোচ্য গ্রন্থ বাংলার খেতাবী রাজরাজড়াদের 'কথা' হলেও, সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক বিষয়বস্তুগুলি ইতিহাস-ভিত্তিক।

সতেরো-উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাস রাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস—ঘটনা বৈচিত্রে ভারতের ইতিহাসে সমধিক উজ্জ্বল। আমাদের দেশীয় রাজন্যবর্গের কার্যকলাপ ও চরিত্রের মূল্যায়নে বলা হয়েছে—সব সম্প্রদায়ের জনগনের স্বজাতিপ্রাণ, সহানুভূতি ও প্রীতি পাওয়া সত্বেও, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবে আমাদের সমাজ নায়কদের স্ববিরোধিতা ও নৈতিক চরিত্রহীনতার সহায়তায়, ইংরাজ বণিক কোম্পানী কিভাবে তাঁদের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সুপরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা দেশীয় হিন্দু-মুসলমান প্রভাবশালী জমিদারদের সম্মানসূচক রাজকীয় 'খেতাবে' ভূষিত করে ইংরাজ রাজশক্তির বুনিয়াদ সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন।

আলোচ্য গ্রন্থটিকে রাজরাজড়াদের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-কাহিনী বলার দাবী না করলেও, আমার সীমিত প্রচেষ্টায় প্রায় একশো নবাব ও রাজপরিবারের সাতশো রাজা, নবাব, এমনকি, তাঁদের বর্তমান বংশধরদের পরিচয় এবং পাঁচ হাজারেরও বেশী সুনির্দিষ্ট তারিখ দেওয়া হয়েছে—কেবল একটি উদ্দেশ্য যে, আমাদের উত্তরপুরুষরা তাঁদের মাতৃভূমির সম্পূর্ণ বিস্মৃত একটি গৌরবময় অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিজেরা গৌরববোধ করবেন। দেশপ্রেমের চিরন্তন প্রেরণার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি উৎসর্গ।

প্রথমেই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই আমাদের অধ্যক্ষ জ্ঞানতপস্বী ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহোদয়কে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক, সুসাহিত্যিক ও সমাজ-সেবী শ্রদ্ধেয় ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র মূল্যবান 'ভূমিকা' লিখে এবং সাহিত্যপ্রেমী প্রবুদ্ধ রাজা কমলারঞ্জন রায় বাহাদুর 'পরিচয় পত্র' দিয়ে, এই গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করায় আমি এঁদের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ। সাহিত্য-সেবী শ্রীদীলিপ রায়চৌধুরী, শ্রীমতী অর্চিতা রায়চৌধুরী ও শ্রীগৌরহরি সাহা ব্যতীত, পশ্চিমবঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও জাতীয় পাঠাগারের কর্মীবৃন্দ এবং আলোচ্য 'রাজপরিবারের' বংশধরদের উৎসাহ ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার জন্য, কেবল স্বীকৃতি দিয়ে এঁদের ঋণ পরিশোধ করা যাবে না।

বিমল চন্দ্র দত্ত



খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকে বঙ্গদেশ

কামরূপ
হাজো
গৌহাটি
ব্রহ্মপুত্র নদ
কোচ
পূর্ণিয়া
রংপুর
দিনাজপুর
পাটনা
একডালা
পাণ্ডুয়া
তেলিয়াগড়
লক্ষ্মণাবতী
নালন্দা
বিহারশরিফ
রাজগৃহ
লক্ষ্মীসরাই
রাজমহল
গয়া
বুদ্ধগয়া
রাজশাহী
শ্রীহট্ট
ময়মনসিংহ
ঢাকা
লাখনোর
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
কাশিমবাজার
নবদ্বীপ
বিক্রমপুর
সুবর্ণগ্রাম
নারিকিলা
কর্মান্ত
বর্ধমান
বিষ্ণুপুর
সপ্তগ্রাম
হুগলী
গড়মন্দারণ
যশোহর
ত্রিপুরা
বঙ্গাল
চন্দ্রদ্বীপ
তাম্রলিপ্ত
কলিকাতা
গোবিন্দপুর
চট্টগ্রাম
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর

মোগলশাহি নবাব নাজিম, খেতাবী রাজরাজড়া ও ইংরাজ কোম্পানী

খ্রীষ্টীয় ষোলো—সতেরো শতকে মোগল বাদশা আকবর—জাহাঙ্গীর—শাহ্‌জাহানের উদার ও শক্তিশালী শাসন-নীতির অবসানে, অদূরদর্শী ঔরঙ্গজেবের ভ্রান্ত-নীতি, বাংলার প্রভাবশালী শাসনকর্তা, রাজন্য ও জমিদারদের কাছে সমধিক ঘৃণাস্পদ হয়ে ওঠে। ১৬১২ খ্রীঃ বাংলার রাজধানী রাজমহল (আকবর নগর) থেকে স্থানান্তরিত হয় ঢাকায় এবং প্রায় একশো বছর পরে চলে আসে মুর্শিদাবাদে (১৭০৪ খ্রীঃ) আর শেষপর্যন্ত কলকাতায় স্থিতি হয় ১৭৭৩ খ্রীঃ। ঢাকায় সুবাদার ইসলাম্ খান (১৬০৮-১৩ খ্রীঃ) থেকে শুরু করে শাহজাদা আজিমুস্‌খানের শাসন-ব্যবস্থায় (১৬৯৭—১৭১২ খ্রীঃ) পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় মোগল অধিকারের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে সর্বাঙ্গীন শান্তি বিরাজ করেছিল।

রাজধানী মুর্শিদাবাদের সুবাদার নবাব নাজিম সদ্‌গুণশালী 'জেন্দাপীর' **মুর্শিদকুলী খান** (১৭০৩-২৭ খ্রীঃ)। তাঁর আমলে দিল্লীর জবরদস্ত প্রভুত্বের অবসান ঘটায়, (ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর—১৭০৭ খ্রীঃ) নবাব নিজের মনোমত (মুসলমান উমরাহ্ সমেত) ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ অভিজাত বংশীয় কর্মদক্ষ বহু হিন্দু সন্তানকে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাতে দ্বিধাবোধ করেননি। বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, নদীয়া, যশোহর, তাহিরপুর, সুসঙ্গ, কোচবিহার এবং আরও কয়েকটি জমিদারী ছাড়া, নাটোর, দিঘাপতিয়া, নসীপুর, কাশিমবাজার, মহিষাদল, মুক্তাগাছার জমিদাররা মুর্শিদকুলীর সময়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। তাঁর আমলে দেশে শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব ছিল সুস্থিত। যুগান্তর ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন করে ১৭২২ খ্রীঃ 'জমা কামেল তুমারী' চালু করেন। সারা বাংলায় তেরোটি চাকলা (বিভাগ) ও ১৬৬০টি পরগণা আর রাজস্ব নির্দিষ্ট হয় বাৎসরিক ১৪,২৮,৮১,৮৬ টাকা। এই টাকার পঁচানব্বই ভাগ দিতে হতো কিঞ্চিন্যূন পঁচিশ জন হিন্দু বড় জমিদারদের।

বাংলার সুবাদার নবাব শায়েস্তা খানের হুকুমে ইংরাজদের কাশিমবাজারের কুঠী ভেঙে দেওয়া হয়েছিল ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু নবাব মুর্শিদকুলীর সময়ে ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে নবাবের কোন সামরিক সংঘর্ষ না ঘটলেও, ১৭১৭ খ্রীঃ মিঃ সুরম্যানকে বাদশাহ্ ফররুখশিয়ারের দেওয়া অনুমতিপত্র (বার্ষিক তিন হাজার টাকার দেওয়ার বিনিময়ে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য ও কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮টি গ্রামের ইজারা নিয়ে বসবাস করা) গ্রাহ্য করেন নি। কারণ নবাবের বিচারে ইংরাজরা কলকাতার

একটি শক্ত ঘাঁটি তৈরীর উদ্দেশ্যেই এই ইজারায় আগ্রহী। পরে ইংরাজরা নবাবের অনুমতি আদায় করে নিয়ে নিজেদের স্বার্থে যতদূর সম্ভব নবাবের সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

নবাব নাজিম **আলিবর্দী খান** নবাব-গদীতে বসেন ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি একজন বীর যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ। যুক্তি-বিশ্বাসী, নিরপেক্ষতা নীতি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তিনি ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে সম্ভবপর সদ্‌ভাব রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরাজদের ব্যবসা বিনা বাধায় প্রসার লাভ করলেই শুল্কের টাকায়, তাঁর রাজকোষ পূর্ণ হবে। ইংরাজরাও সবসময় মনে রেখেছিলেন যে, নবাবের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি কখনই হতে পারে না। নবাব আলিবর্দী সিরাজ-উদ্‌দৌলাকে সতর্ক করে বলেছিলেন 'বিদেশী বণিকরা এক ঝাঁক মৌমাছি, তাঁদের মধু থেকে দেশ বেশ কিছু লাভ করতে পারে বটে, কিন্তু মৌচাকে ঢিল মারলে তাঁরা কামড়ে শেষ করে ছাড়বে।' আলিবর্দীর নিরপেক্ষতার আরো প্রমাণ—তাঁর আমলে বেশ কয়েকজন হিন্দু জমিদার ও বিশেষ বিশ্বাভাজন ব্যক্তিরা দায়িত্বশীল পদে বহাল থাকায়।

নবাব আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় দৌহিত্র স্বেচ্ছাচারী দুর্বিনীত যুবক **সিরাজ-উদ্‌-দৌলা** নবাব-গদীতে আসীন হন ১১ এপ্রিল, ১৭৫৬ খ্রী:। কয়েক দিনের ব্যবধানে ২ মে, ১৭৫৬ খ্রী: সিরাজ ইংরাজদের কাশিমবাজার কুঠী ধ্বংস করেন। তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, ইংরাজ বণিকরা মুর্শিদাবাদের নবাব-গদীর লড়াইয়ে, তাঁর শত্রুপক্ষকে (ঘসেটি বেগম, শওকৎ জঙ্গ ও মীরজাফর এবং কয়েকজন দেশীয় বড় জমিদার (রাজারা) ও রাজকর্মচারীদের) পরোক্ষে উৎসাহিত করেছেন। সঙ্গত কারণে ইংরাজদের সঙ্গে কোনদিন তাঁর সদ্‌ভাব ছিল না। তাঁদের উচিত-মত শিক্ষা দিতে ১৫ জুন, ১৭৫৫ খ্রী: কলকাতা অবরোধ করে (অন্ধকূপ হত্যা) সাময়িকভাবে ইংরাজদের উচ্ছেদ করেন। কিন্তু সিরাজের চূড়ান্ত আত্মতুষ্টি ও অদূরদর্শিতার ফলে এবং ষড়যন্ত্রের বলী হয়ে, মাত্র ১৩৫ দিনের মধ্যে ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৫ খ্রী:, কুটিল ইংরাজ বণিকদের ফাঁদে পা দিয়ে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। বিশ্বাসঘাতক ও ষড়যন্ত্রীদের আশ্বাসে নিশ্চিত হয়ে, সামান্য অজুহাতে রবার্ট ক্লাইভ ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রী: পলাশীর 'জাল' যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের পতন ঘটান।

এবার **ইংরাজ বণিক কোম্পানীর** ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। কলকাতায় পর্তুগীজ বণিকদের ব্যবসা শুরু হওয়ার প্রায় আটাশ বছর পরে, ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে, ইংরাজ বণিকদের ভারতে আবির্ভাব হয়, যখন ক্যাপ্টেন হকিন্স্‌ ইংলণ্ডের

সম্রাট প্রথম জেমস্-এর সুপারিশপত্র নিয়ে মোগল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দিল্লী-দরবারে হাজির হন। বিফল হলেও সাত বছর পরে, স্যার টমাস্ রো ভারতের কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য করার সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন। ১৬৩৯ খ্রীঃ ইংরাজ চিকিৎসক গাব্রিয়েল ব্রাউটন্ সম্রাট শাহজাহান ও পরে বাংলার সুবাদার শাহজাদা মহম্মদ সুজার (১৬৫০ খ্রীঃ) কাছ থেকে হুগলীতে কুঠী তৈরী ও বাণিজ্যে আরও সুযোগের অনুমতি পান।

১৬৮৭ খ্রীঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে ইংরাজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। জোব চার্ণক (দৌত্যে ও ক্ষমা প্রার্থনার পরে) ১৬৮৭ খ্রীঃ প্রথমে সুতানটি (বর্তমান শোভাবাজার, বড়বাজার ও পোস্তা এলাকার) ও পরে ২৪ আগস্ট, ১৬৯০ খ্রীঃ কলকাতার মাটিতে পা রাখেন ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, যা পরে ভাবী ইংরাজ ভারত সাম্রাজ্যের বীজ বপন করে। কোম্পানী ১০ নভেম্বর, ১৬৯৮ খ্রীঃ বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে বার্ষিক মাত্র ১৩০০ টাকায় সুতানাটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা—তিনটি গ্রামের জমিদারী-রাজস্ব আদায়ের শর্ত খরিদের পর, অন্যান্য জমিদারদের মত নিজেদের এলাকায় দুটি কাছারী ও পুলিস রাখার অনুমতি পায় সুবাদার আজিম-উস্-শানের। ১৭২৭ খ্রীঃ ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত এবং একটি আপিল আদালত স্থাপিত হয় কলকাতায়।

ইংরাজ রাজশক্তির প্রসার প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয় পলাশী যুদ্ধের পর। ইংরাজ কোম্পানী নিজেদের মনোমত - নবাব মীর্জাফর থেকে শুরু করে সব নবাবদের মুর্শিদাবাদের গদীতে বসিয়ে, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সুকল্পিত-ভাবে প্রভাব বিস্তার করেন। ১২ আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর তাঁরা প্রকৃতপক্ষে পূর্বভারতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী হন। রবার্ট ক্লাইভের 'দ্বৈত শাসন-ব্যবস্থায়' নবাব তথা জমিদারদের ওপর রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে, নিজেরা দায়িত্বহীন ক্ষমতা লাভ করেন। সেই সময় রাজস্ব আদায়ে সর্বময় কর্তা ছিলেন নিষ্ঠুর অত্যাচারী দেওয়ান মহম্মদ রেজা খান। তিনি ১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ ভয়াবহ মন্বন্তর কবলিত মুমূর্ষ বাংলার জমিদার ও প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচারে রাজস্ব আদায় করে কোম্পানীর কোষাগার পূর্ণ করেন।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্ণর হয়ে ইংরাজ কর্মচারী, নবাব ও জমিদারদের দুর্নীতি বন্ধ করার নামে (নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত) কোম্পানীকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে শাসনকার্য্যের বেশ কিছু সংস্কার করেন। মুর্শিদাবাদেই ফৌজদারী বিচারের ভার নবাবদের ওপর আর দেওয়ানী বিচারের ভার

কোম্পানীর ওপর ছিল। হেস্টিংস সাহেব দেওয়ানী কার্য্যালয় ও আদালত, এমনকি, বাণিজ্যকেন্দ্র, হুগলী থেকে সব প্রধান কার্য্যালয় কলকাতাতেই স্থানান্তরিত করেন ১৭৭৪ খ্রীঃ। বস্তুত ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'রেগুলেটিং অ্যাক্ট' অনুযায়ী গভর্ণর জেনারেল-এর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার মুখ্য প্রশাসনিক কার্যালয় কলকাতাতে আনা হয়।

লর্ড কর্ণওয়ালিস ১৭৯০ খ্রীঃ মুর্শিদাবাদ থেকে সদর নিজামত আদালতও (ফৌজদারী) কলকাতায় নিয়ে আসেন। 'দশসালা বন্দোবস্ত' (১৭৯১ খ্রীঃ) ও 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' (১৭৯৩ খ্রীঃ) সুবাদে বাংলার সব জমিদারদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ব্যবস্থা ও ইংরাজ বণিক-গোষ্ঠীর প্রভুত্ব বা রাজা-প্রজার সম্বন্ধ স্থায়ীরূপ নেয়।

প্রায় দেড়শো বছর বাংলায় ইংরাজ রাজত্বের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি—সর্বক্ষেত্রে বাঙালীর যে অন্তর্মুখিতা ও আত্ম-বিস্মৃতি দেখা দিয়েছিল, ইংরাজী ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান—পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে [১] এবং বেশ কয়েকজন প্রগতিশীল জমিদারদের (রাজা ও নবাব) অর্থসাহায্য ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে, বাংলায় 'নবজাগরণ' ও নবচেতনার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই একশো পঞ্চাশ বছর ধরে যে এক শ্রেণীর মানুষ দারুণ প্রতাপের সঙ্গে সমাজে বসবাস ও প্রভুত্ব করে যে ভূমিভিত্তিক ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিলেন, তা আজও সমাজে কাজ করে ফিরছে—আপাততঃ মানসিক দিক দিয়ে। এখনও 'বাবু-কালচার'—জুড়ি-গাড়ী, ঝাড়-বাতি—বৈঠকখানা, চুনট-করা ধুতি আর গিলে-করা পাঞ্জাবী বা জোবরা-পরা বাবুর সঙ্গে ঢাকার জামদানি-পরা বিবিদের আর উর্দি-পরা গোলামদের চালচলন নকল করা নিশ্চয় ছাড়তে পারা যায়নি, বিশেষ করে, সামাজিক ও ধর্মীয় জাঁক্-জমকে-ভরা অনুষ্ঠানে।

আজকের তিলোত্তমা কলকাতার সৃষ্টি করেছে 'ব্রহ্মরূপী' ইংরাজ বণিকগোষ্ঠী তিলে তিলে, পৃথিবীর যাবতীয় সৌন্দর্য আহরণ করে। একদিকে আত্মরক্ষার্থে দুর্গ আর সরকারী আভিজাত্যের স্মারক বিশাল স্থাপত্য—গভর্নমেন্ট হাউস, হাইকোর্ট, রাইটার্স বিল্ডিংস, জি. পি. ও., টাউন-হল, অক্টোরলনী মনুমেন্ট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, অপরদিকে এশিয়াটিক সোসাইটি, যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও যোগাযোগের যথাযথ ব্যবস্থা—প্রভৃতির সুফল তিনশো বছর ধরে কলকাতাবাসীরা ভোগ-দখল করছেন। এটাও উল্লেখ্য যে, গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ বিশেষ করে, খেটে খাওয়া লোকেদের আর্থিক উন্নতির দায়িত্ব ইংরাজ সরকার না নিলেও, সব জমিদাররা তাঁদের নৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন তাদের নিজস্ব এলাকায় জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে। কলকাতা শহরের আধুনিক রূপায়ণে তাঁদের অবদান নিশ্চয়ই স্মরণীয়।

১। In National & Constitutional Development in British India, Dr. R. C. Majumdar says, 'The most outstanding effect of the introduction of Western culture in India was the growth of modern political concepts, such as nationalism, nationality, patriotism, political rights etc. which one usually associated with the Western countries in modern age'.

পাথুরিয়াঘাটার রায় রাজপরিবার

কলকাতা

খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের মাঝামাঝিতেও হুগলী জেলায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও) একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে গণ্য হত। স্থানীয় প্রভাবশালী সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের ধনবান মহাজন **লক্ষ্মীকান্ত ধরের** সঙ্গে হুগলীর ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের কাজ-কারবারের লেন-দেন ছিল। লক্ষ্মীকান্ত ইংরাজ কুঠিয়ালদের সঙ্গে নিজের ব্যবসায় প্রসার ও সুবিধা ভোগের জন্য সুতানুটিতে (কলকাতা) আসেন। লক্ষ্মীকান্ত ধর স্থানীয় লোকেদের কাছে 'নকু ধর'[১] নামে পরিচিত ছিলেন। কলকাতায় সুখবাজার—পাথুরিয়াঘাটা ও পোস্তা প্রভৃতি এলাকা ছিল লক্ষ্মীকান্তের কর্মক্ষেত্র। এই অঞ্চলে লক্ষ্মীকান্তের দৌহিত্র মহারাজা **সুখময় রায়ের** প্রাসাদোপম বসতবাড়ী (রাজবাড়ী), ঠাকুর-বাড়ী ও সুখবাজার (পোস্তা বাজার) এখনও তাঁর স্মৃতি বহন করে। নকু ধরের দৌলতে পাথুরিয়াঘাটা রায় রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠা।

মুর্শিদাবাদের মহারাজা জগৎ শেঠ-বংশ যেমন নবাবদের ও পরে ইংরাজদের প্রয়োজনে অর্থের জোগান দিতেন, তেমনই লক্ষ্মীকান্ত ও তাঁর দৌহিত্র-বংশধরেরা ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তাঁদের ব্যবসার প্রসার ও যুদ্ধ-বিগ্রহে[২] অগ্রিম অর্থ সাহায্য দিয়ে ব্যবসাক্ষেত্রে নিজেদের সুখ-সুবিধা আদায় করতেন। এই প্রসঙ্গে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের উল্লেখ করা যায়। নবকৃষ্ণ তাঁর প্রথম কর্মজীবনে লক্ষ্মীকান্তের 'মুন্সী' হিসাবে কাজ করেছিলেন। লক্ষ্মীকান্তই নবকৃষ্ণকে লর্ড ক্লাইভের দপ্তরে সুপারিশ করে 'মুন্সী'র কাজ পাইয়ে দেন। টাকা-পয়সার আদান-প্রদানের স্বার্থে লর্ড ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্তের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। লক্ষ্মীকান্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন পরে ক্লাইভের দেওয়ান হয়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৭৬২ খ্রীঃ কোম্পানীর কাছ থেকে খেলাত পান। এমন কি, তাঁকে 'মহারাজা' উপাধি দেওয়ার জন্যও ইংরাজ কোম্পানী দিল্লীর দরবারে সুপারিশ করেছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর প্রাপ্য 'মহারাজা' উপাধি ক্লাইভের আনুকূল্যে দৌহিত্র সুখময় রায়কে পাইয়ে দেন ১৭৫৭ খ্রীঃ।

১। নকু ধরের নামে প্রচলিত ছড়া— "নন্দ বোসের ছড়ি, উমিচাঁদের দাড়ি।
নকু ধরের কড়ি, মথুর সেনের বাড়ি।"

২। পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রীঃ) বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ও পরে প্রথম মারাঠা যুদ্ধে (১৭৭৫ খ্রীঃ) [illegible] নীকে নয় লক্ষ টাকা সাহায্য করেছিলেন।

মহারাজা সুখময় রায় বাহাদুর

লক্ষ্মীকান্ত ধরের কোন পুত্র ছিল না। একমাত্র কন্যা পার্বতী দাসী। বিবাহ হয় নদীয়া জেলার মহানাদ গ্রামের রঘুনাথ রায় (পাল)-এর সঙ্গে। তাঁদের স্বনামধন্য পুত্র সুখময় রায়ের[৩] জন্ম হয় আনুঃ আঠার শতকের তৃতীয় দশকে। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব তাঁর সমসাময়িক। মহারাজা সুখময় রায়, মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের মত রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন না হলেও ব্যবসা-বুদ্ধিতে অধিকতর পরিণত। সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯ খ্রীঃ) তাঁকে 'মহারাজা' সনন্দ ও চার হাজারী মনসবদার পদ এবং ঝালদার পালকী উপহার দেন। ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব ও কর্মবীর মহারাজা সুখময়ের সুতানুটি (কলকাতা) গড়ে ওঠা ও সমৃদ্ধির মূলে যথেষ্ট অবদান ছিল।

দানবীর মহারাজা সুখময় ও তাঁর মাতা মহারাজমাতা পার্বতী দাসীর যুগ্মদানের তালিকায় পাওয়া যায় যে, প্রায় ২৮০ মাইল লম্বা—উলুবেড়িয়া থেকে পুরী ধাম পর্যন্ত রাস্তা কটক রোড দশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরী হয়েছিল। কাশীপুর গান ফাউণ্ড্রী থেকে দমদম পর্যন্ত রাস্তা চওড়া করার জন্য চল্লিশ হাজার টাকা, কটক রোডের ওপর কয়েকটি সেতু নির্মাণ, পথের ধারে যাত্রী-নিবাস কূপ ও জলাশয় খননের জন্য আরও কয়েক লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। বৃন্দাবন ও পুরী ধামে কয়েকটি যাত্রী-নিবাসও তাঁদের অর্থ সাহায্যে তৈরী হয়েছিল।

মহরাজা সুখময় রায়ের দানশীলতার খ্যাতির জন্য মহামান্য পারস্যের শাহ তাঁকে 'মহারাজা বাহাদুর' সনন্দ উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তদানীন্তন 'ব্যাংক অফ বেঙ্গল'-এর একমাত্র ভারতীয় ডিরেক্টর। সুখময় রায়ের কর্মময় জীবন শেষ হয় ১৯ জানুয়ারী, ১৮১১ খ্রীঃ। মহারাজা সুখময় রায়ের পাঁচ পুত্র—রামচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, বৈদ্যনাথ, শিবচন্দ্র ও নরসিংহচন্দ্র। সকলেই 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

মহারাজা রামচন্দ্র রায় বাহাদুর

মহারাজা সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রামচন্দ্র রায় তাঁর পিতার জীবদ্দশায় 'রাজা বাহাদুর' ও দু'হাজারী মনসবদার উপাধি ১৭৯৭ খ্রীঃ মোগল দরবারের একই সনন্দে পেয়েছিলেন। পরে ১৮১১ খ্রীঃ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর তাঁকে 'মহারাজা বাহাদুর', চার হাজার পদাতিক ও চার হাজার অশ্বারোহীর সৈন্যাধ্যক্ষ পদের অধিকারী করেন ও পিতার মত ঝালদার পাল্‌কী ব্যবহার করার অনুমতি দেন। তিনিও পিতার

৩। 'সুবর্ণ-বণিক কথা ও কীর্তি', ২য় খণ্ড।
'Maharaja Sukhmoy Roy Bahadur and His family'—B. Chatterjee, 1910.

ন্যায় উদার প্রকৃতির ও সমাজসেবী ব্যক্তি। ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড আমহার্ষ্ট-এর (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ) সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁর দেহাবসান ঘটে ২৪ মে, ১৮২৫ খ্রীঃ। মহারাজা রামচন্দ্রের একমাত্র সন্তান রাজনারায়ণ। তিনি 'রাজা' উপাধি পাননি, তবে লোকে তাঁকে 'রাজা' বলেই সম্বোধন করত। অকালে মৃত্যু হয় ২৩ এপ্রিল, ১৮৩১ খ্রীঃ। তাঁর দত্তক পুত্র রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ অকালে মারা যান নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীঃ। মহারাজা সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজা রামচন্দ্রের বংশধরেরা ৭৯, আপার চিৎপুর রোডে (২৮৬, রবীন্দ্র সরণী) রাজবাড়ীতে বসবাস করেন।

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র দীনেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় ১৮৪৭ খ্রীঃ। তিনি ছিলেন শিষ্টাচার, সৌজন্য ও ভদ্রতার প্রতিমূর্তি। পূর্ব-পুরুষদের রাজ-রাজড়ার বিলাস-বহুল চালচলনের জন্য অপব্যয় বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জনহিতকর কাজে ব্রতী হয়ে যথেষ্ট দানভার বহন করেছিলেন। তাঁরই আনুকুল্যে পিতামহের নামে 'রাজা রাজনারায়ণ ষ্ট্রীট' ও পিতার নামে 'রাজা ব্রজেন্দ্রনারায়ণ ষ্ট্রীট' রাস্তা দুটি তৈরী হয়। এই রাস্তা দুটি তৈরীর জন্য জমি অধিগ্রহণের মূল্য বাবদ প্রায় ৩২,০০০ টাকা দান করেছিলেন। ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৯৩ খ্রীঃ তাঁকে 'কুমার' সনন্দ দেন। ১৯১১ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর রাজ্যাভিষেকের বর্ষে তিনি 'সার্টিফিকেট অফ-অনার' পান। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯১৪-১৫ খ্রীঃ), কলকাতা করপোরেশনের নির্বাচিত কমিশনার (১৮৮২-১৯১৪ খ্রীঃ), ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনের মনোনীত সভ্য (১৯০৪-৫ খ্রীঃ), অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট (১৮৮৬-১৯১৫ খ্রীঃ), ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ (পেন্সহার্স্ট) কুমার দীনেন্দ্রনারায়ণকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন ১ জানুয়ারী, ১৯১৪ খ্রীঃ। তিনি এই রাজকীয় সম্মান বেশী দিন ভোগ করতে পারেননি। মারা যান ২৬ আগষ্ট, ১৯১৫ খ্রীঃ। তাঁর মৃত্যুর প্রায় দশ বছর বাদে কলকাতার নাগরিকরা তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে কলকাতার টাউন হলে ২১ মার্চ, ১৯২৫ খ্রীঃ তাঁর আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করেন। মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন স্যার ইভান কটন, সভাপতি, বঙ্গীয় আইন পরিষদ।

রাজা দীনেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীঃ। তিনি পিতার ন্যায় বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সমাজ সেবা-মূলক প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১১ মে, ১৯১৪ খ্রীঃ ইংরাজ সরকার তাঁকে

'কুমার' উপাধি দেন। কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণের পুত্র শৈলেন্দ্র, বীরেন্দ্র, ক্ষিতীন্দ্র, সুরেন্দ্র, জিতেন্দ্র ও আদিত্য। রাজেন্দ্রনারায়ণ পিতার ন্যায় কলকাতায় স্কুল ও অনাথ আশ্রমের জন্য যথাসাধ্য দান করে গেছেন।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়

মহারাজা সুখময় রায়ের দ্বিতীয় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় অল্প বয়সে মারা যান ডিসেম্বর, ১৮২৮ খ্রীঃ। তাঁর পিতৃ-সম্পত্তির সব অংশ দান করেছিলেন তাঁদের কুল দেবতা 'শ্যামসুন্দরের' সেবায়। শ্যামসুন্দরের বিগ্রহের দৈনিক পূজা ও বাৎসরিক পার্বণ অনাড়ম্বরের সঙ্গে এখনও অনুষ্ঠিত হয় পুরাতন রাজবাড়ী সংলগ্ন ঠাকুরবাড়ীতে, ১০ রতন সরকার ষ্ট্রীট।

রাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর

মহারাজা সুখময় রায়ের তৃতীয় পুত্র বৈদ্যনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন আনুঃ ১৭৯০ খ্রীঃ। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী দান-ধ্যান করেছেন। হিন্দু কলেজের জন্য ৫০,০০০ টাকা, বঙ্গীয় নারী শিক্ষা তহবিলে ২০,০০০ টাকা, কর্মনাশা সেতু প্রকল্পে ৮,০০০ টাকা, লণ্ডনের পশু বিজ্ঞান বিভাগে ৬,০০০ টাকা প্রভৃতি। কলকাতায় পশু-বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার উন্নতিকল্পে নিজে এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে অনেক কাজ করে গেছেন। পশু-পক্ষী সংগ্রহ ও রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য চিড়িয়াখানা তৈরী করেছিলেন ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে চিড়িয়া মোড়ে।

রাজ-ভক্তি ও সমাজ-সেবার জন্য লর্ড আমহার্ষ্ট (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ) তাঁকে 'রাজা বাহাদুর', একটি স্বর্ণ পদক ও তরবারি উপহার দেন। রাজা বৈদ্যনাথ পোস্তার 'রাজবাড়ী' ত্যাগ করে ১৩৯ ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে প্রাসাদতুল্য বাস ভবনে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর বংশধরেরা এখনও সেখানে বাস করছেন। তাঁর মৃত্যু হয় ডিসেম্বর, ১৮৬০ খ্রীঃ। দুই পুত্র রাজকৃষ্ণ ও কালীকৃষ্ণ উত্তরাধিকারী হন। রাজকৃষ্ণের দুই পুত্র জয়গোবিন্দ ও শ্যামদাস রায়। জয়গোবিন্দর পরম্পরাগত বংশধররা মোনহরচন্দ্র, আশুতোষ ও বিশ্বনাথ রায়। কুমার আশুতোষ ইনষ্টিটিউসন-এর প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ রায় জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রশেখর রায়। শ্যামদাসের বংশধর দুলালচন্দ্র রায়। বর্তমানে গগনচাঁদ রায় ও নিতাইচাঁদ রায় রাজা সুখময় রায়ের প্রত্যক্ষ বংশধর, এই শাখা বংশে কেউ দত্তক ছিলেন না।

রাজা শিবচন্দ্র রায় বাহাদুর

রাজা সুখময় রায়ের চতুর্থ পুত্র রাজা শিবচন্দ্রের জন্ম আনুঃ ১৭৯৩ খ্রীঃ। তাঁর দত্তক পুত্র কালীকুমার অপুত্রক অবস্থায় মারা যান ১৮৫৬ খ্রীঃ। মহারাজা শিবচন্দ্র মারা যান ১৮২৭ খ্রীঃ।

রাজা নরসিংহ রায় বাহাদুর

রাজা সুখময় রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র নরসিংহ রায় জন্মগ্রহণ করেন আনুঃ ১৭৯৮ খ্রীঃ। তিনি পোস্তার পুরানো রাজবাড়ী (২৫ নং দরমাহাটা স্ট্রীট) সমেত পিতার বিশাল সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ পান। তা ছাড়া তাঁর অপর দুই ভাই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও রাজা শিবচন্দ্রের দেবোত্তর সম্পত্তি দেখা-শোনার ভার তাঁর উপর ন্যস্ত হয়। অভিজাত রুচি-সম্পন্ন সৌখীন চরিত্রের মানুষ রাজা নরসিংহ রায় কলকাতার তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের ও বিদেশী নাগরিকদের কাছে বিশেষ সমাদৃত ব্যক্তি। রাজা নরসিংহ তাঁর বিখ্যাত মনোরম প্রমোদ-উদ্যান 'লীলা বাগান'-এ আনন্দ উৎসব ও ভোজ সভার আয়োজন করায় উদ্যানটি বিশেষ আকর্ষণীয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, কর্মনাশা নদীর উপর পুল তৈরী প্রভৃতি জনহিতকর কাজে যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে চার ঘোড়ায় টানা ফিটন গাড়ী ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন। সেকালে বিশেষ সম্মানিত ও ইংরাজদের নির্বাচিত ব্যক্তিরাই এই গাড়ী চড়ার অধিকার লাভ করতেন। রাজা নরসিংহের মৃত্যু হয় ১৮৫৯ খ্রীঃ তাঁর একমাত্র পুত্র উত্তরাধিকারী রাজকুমারকে রেখে। রাজকুমার রায় 'রাজা' উপাধি পাননি তবে লোকে তাঁকে 'রাজা' বলেই জানত। তাঁর দুই পুত্র রাধাপ্রসাদ ও দেবীপ্রসাদ। রাধাপ্রসাদের এক পুত্র বিষ্ণুপ্রসাদ। দেবীপ্রসাদের এক পুত্র হরিপ্রসাদ। কুমার রাধাপ্রসাদ একজন সাহিত্য-প্রেমী। দর্শন ও সামাজিক বিষয়-বস্তু সম্বন্ধীয় কয়েকটি গ্রন্থের লেখক। বিষ্ণুপ্রসাদের দুই পুত্র পশুপতিনাথ ও জিতেন্দ্রনাথ। হরিপ্রসাদের দৌহিত্র বিশ্বনাথ (দত্তক)।

শোভাবাজারের দেব রাজপরিবার

কলকাতা

উনিশ শতকে বাংলায় 'নবজাগরণ'-কে যদি 'রেনেসাঁস্‌' হিসাবে গণ্য করা হয়, তা হলে আঠার শতককে রাজনৈতিক নবজন্মের বা বিবর্তনের আদিপর্ব হিসাবে নিশ্চই চিহ্নিত করা যেতে পারে। আঠার শতক দেখেছে পরাক্রমশালী মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়, বাংলার স্বাধীন নবাবদের উত্থান-পতন এবং ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা। আর নবকলেবরে পুরানো নবাবী আমলাতন্ত্র তথা সামন্ততন্ত্র ও ইংরাজ বণিক শাসকগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট স্বার্থেন্বেষী ব্যবসায়ী পরিবারদের অভ্যুত্থান। তা ছাড়া ঐ যুগে কমপক্ষে পাঁচটি যুদ্ধ, বর্গীদের ক্রমান্বয়ে লুটপাট, ছিয়াত্তরের মর্মান্তিক মন্বন্তর আর জমিদার তথা ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-নীতি, বাংলার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে পঙ্গু করে রেখেছিল। ঐ সময়েই আবির্ভাব হয় কলকাতার শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রাণ-পুরুষ মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের (১৭৩২-১৭৯৭ খ্রীঃ)।

মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

পিতৃহারা ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার মধ্যে প্রতিপালিত হলেও, নবকৃষ্ণ বংশ-মর্যাদায় আসীন ছিলেন। তাঁর ২১ তম পূর্ব-পুরুষ শ্রীহরি দেব মুর্শিদাবাদের কাণসোণা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। প্রপিতামহ রুক্মিণীকান্ত ও পিতামহ রামেশ্বর ব্যবহর্তা (উপাধি) মুড়াগাছার নাবালক জমিদার কেশবরাম রায়চৌধুরীর জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। রামেশ্বরের পরে দ্বিতীয় পুত্র রামচরণ ঐ পদে বহাল হন। কিন্তু হিজলি, মহিষাদল ও তমলুকের লবণ বিভাগে কর্মরত থাকায় গোবিন্দপুরে বসতি করেন। পরে কটকে নবাবদের একজন দেওয়ান হন। রামচরণের অকাল মৃত্যুতে তাঁর পরিবারের (স্ত্রী, তিন পুত্র, পাঁচ কন্যা) সংসারে অভাব অনটন ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণের জন্ম হয় গোবিন্দপুরে ১৭৩২ খ্রীঃ। অগ্রজ দুই ভাই—রামসুন্দর ও মানিকচন্দ্রের অন্নে পালিত নবকৃষ্ণের রাজভাষা ফার্সীতে যথেষ্ট বুৎপত্তি থাকায় কলকাতার ধনকুবের ব্যবসায়ী 'নকুধর' ও পরে তাঁর পুত্র রাজা সুখময় রায়ের অধীনে সামান্য চাকরীতে বহাল হন। ইংরাজ বণিক কোম্পানীর যুবক কর্মচারী ওয়ারেন্‌ হেস্টিংসের ফার্সী ভাষার শিক্ষক ছিলেন (১৭৫০-১৭৫৬ খ্রীঃ)। নবকৃষ্ণ ড্রেক্‌ সাহেবের 'নবুমুন্সী' হলেন মাসিক ষাট টাকার বেতনে। ক্রমান্বয়ে কোম্পানীর 'মুন্সী' ও রবার্ট ক্লাইভের অনুচর হিসাবে, পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রীঃ) আগে ও পরে নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলার দরবারের গুরুত্বপূর্ণ

গুপ্ত-তথ্য সংগ্রহ ও কোম্পানীর যাবতীয় পত্র যোগাযোগের (ফার্সী-ইংরাজী) অনুবাদ নবকৃষ্ণ-ই করতেন। [১] এমনকি নবাব কর্তৃক কলকাতা থেকে বিতাড়িত ইংরাজ-গোষ্ঠী যখন ফলতায় গঙ্গাবক্ষে নৌবহরে অবস্থান-রত (জুলাই থেকে ডিসেম্বর, ১৭৫৬) সেই সময় নবকৃষ্ণ নিজের জীবন বিপন্ন করে তাঁদের রসদ যোগান দিয়েছেন।

ইংরাজদের, বিশেষ করে ক্লাইভের, বিশ্বাসভাজন ও আজ্ঞাবহ হয়ে পাটনার শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণ ও মেদিনীপুরের শাসনকর্তা রাজা রামসিংহের ব্যাপারে মধ্যস্থতা করা এবং ১৭৬৫ খ্রীঃ জুন মাসে সম্রাট শাহ্-আলমের দরবারে কোম্পানীর গুরুত্বপূর্ণ জীবনদায়ী পুরস্কার-স্বরূপ 'দেওয়ানী' লাভের জন্য (১২ আগষ্ট, ১৭৬৫) [২] সহায়তা করা ছাড়া, বারাণসীর রাজা বলবন্ত সিংহ ও বিহারের রাজা সেতাব রায় প্রমুখ রাজপুরুষদের সঙ্গে ক্লাইভের 'বন্দোবস্ত' ব্যাপারে নবকৃষ্ণ পরামর্শ দাতাদের অন্যতম ছিলেন। কূটনীতিবিদ্ নবকৃষ্ণ তাঁর রাজনৈতিক অবদানের স্বীকৃতিও পেয়েছিলেন। [৩] এ বিষয়ে কোম্পানীর উদ্দেশ্যে নবকৃষ্ণের নিজের লেখা ১৮ নভেম্বর, ১৭৭৭ খ্রীঃ-এর আবেদন পত্রের উল্লেখ করা হল :—

'From the year 1756-1776, an interval during which the welfare and interest of the honourable company were in most critical and dangerous situation, it is well known fact that all the most important and secret negotiation and transactions with Country Powers were conducted through the medium of your petitioner, the success of which he humbly hopes sufficiently marks his fidelity.' In the same petition, Nabakrishan mentions his few achievements : (i) 'His services during Siraj's capture of Calcutta, subsequent defeat of Siraj on which occasions, your petitioner acted as Persian secretary and translator and was employed in all the most confidential sections.'

১। Mr. Richard Barwell 'He is profoundly learned in Persian and most of the custom of the Mohomadan'. Mr. Johnstone (Company Governor) 'An able conveyancer and well-versed in drafting treaties.'

২। লর্ড রবার্ট ক্লাইভ দিল্লী সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দেবার শর্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকার আদায় করায় ইংরেজ কোম্পানী রাজস্ব সংগ্রহে অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেছিল।

৩। Memoirs of Maharaja Nabakrishna Bahadur, N. N. Ghose, 1901.

(ii) 'His services under Major Adam c/c of the Nabob Kasimally Cawn, which your petitioner had the sole management of all such negotiations and transactions with the Country Powers and chief people.'

(iii) His services under Lord Clive on his return in India in 1764, when your petitioner was the only native entrusted or employed in all the several Treaties which were made with the Mangol or King Shaw Alam, the late Vizir Suja-ud-Dowla, the Nabob of Bengal, Nujum-ud-Dowla etc., When the grant of Dewani was obtained for the honourable company.'

নবকৃষ্ণ তাঁর কর্মদক্ষতা, কূটনৈতিক সুপরামর্শ ও রাজভক্তির স্বীকৃতি হিসাবে লর্ড ক্লাইভের ব্যক্তিগত 'কনফিডেন্সিয়াল এ্যাডভাইসার' পদমর্যাদায় আসীন হন। ১৭৬৫ খ্রীঃ বাদশা দ্বিতীয় শাহ্‌আলম নবকৃষ্ণ-কে 'রাজা বাহাদুর', 'ছয় হাজারী মনসবদার,' 'তিন হাজারী সওয়ার' খেতাব ও আনুসঙ্গিক উপহার দেন।[১] পরের বছর (ভিন্নমতে ১৭৬৭ খ্রীঃ) 'মহারাজা' উপাধিও লাভ করেন। পরবর্তী গর্ভনর ভেরেলস্ট্ (১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ) কার্টিয়ার (১৭৬৯-৭২ খ্রীঃ) ও ওয়ারেন্ হেস্টিংস (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) প্রত্যেকেরই বিশ্বাসভাজন হয়ে রাজনৈতিক দেওয়ান হওয়ায় তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পায়। দেওয়ান রেজাখান ও রাজা সেতাব রায়-এর সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সমাজপতির আসনেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

মহারাজা নবকৃষ্ণের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট রাজপুরুষদের কোন না কোন ব্যাপারে একাধিকবার যোগাযোগ হয়েছে। তাঁদের সঙ্গে মহারাজার কিরূপ সম্পর্ক ছিল তা অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোচনা করা হল। প্রভাবশালী রাজপুরুষ মহারাজা নন্দকুমার (আনুঃ ১৭০৫-৭৫ খ্রীঃ) মহারাজা নবকৃষ্ণের বয়োঃজ্যেষ্ঠ। চিরদিন পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষার ভাব দেখা যায়। নন্দকুমার যখন নবাব দরবারে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ক্লাইভের অতি বিশ্বাসভাজন, তখন নবকৃষ্ণ ছিলেন ইংরাজ বণিকদের একজন মুন্সী। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মীরজাফরের দেওয়ান থাকাকালীন নন্দকুমার একবার দু'লক্ষ টাকা নজরানা বা উপঢৌকন দিয়েছিলেন গর্ভনর ভ্যান্সিটার্টকে মুন্সী নবকৃষ্ণের মারফৎ। পরে অবশ্য মহারাজা

১। উপাধি প্রদান দরবারে শহরের প্রায় সব ইংরেজ ও বাংলার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। দরবারের শেষে রাজা নবকৃষ্ণ সুসজ্জিত হাতীর হওদায় চড়ে শোভাবাজার রাজবাড়ীতে ফিরে যান।

নবকৃষ্ণ কোম্পানীর রাজনৈতিক 'বেনিয়ান' হন। ব্রাহ্মণ পুত্র প্রভাবশালী নন্দকুমার সঙ্গত কারণে কায়স্থ সন্তান নবকৃষ্ণের (প্রথম পর্যায়ে) হিন্দু সমাজপতির আসন দখলের অন্তরায় ছিলেন। কিন্তু ওয়ারেন্ হেস্টিংসের জমানায় মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রশ্নাতীত। তিনি হিন্দু সমাজপতির আসনেও সুপ্রতিষ্ঠিত। হেস্টিংসের পরম শত্রু মহারাজা নন্দকুমারকে লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল নবকৃষ্ণের পরামর্শে। [১] ফাঁসির আসামী নন্দকুমারকে বাঁচাবার জন্য কোন আবেদন পত্রে নবকৃষ্ণের স্বাক্ষর ছিল না, বরং সুপ্রীম কোর্টের 'সুবিচারের' প্রশংসাপত্রে স্বাক্ষর দিয়ে তিনি নন্দকুমারের প্রতি তাঁর বৈরূপ্য প্রকাশ করেছেন।

নদীয়াধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-৮২ খ্রীঃ) নবকৃষ্ণের থেকে প্রায় ২২ বছরের বড়। দু'জনেরই 'রাজসভা' ছিল এবং ঐ যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত প্রবর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন উভয় সভায় উপস্থিত হতেন। নবকৃষ্ণের বাসভবনে তাঁর জ্যেষ্ঠ কন্যার বিবাহে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র সহ বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ ত্রিলোক চাঁদ ও রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভ সেন রায় রাইয়াঁ প্রমুখ রাজ-রাজড়ারা উপস্থিত ছিলেন। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের আর একটি প্রমাণ হল, কৃষ্ণচন্দ্রের উপাধি ছিল 'মহারাজা-বাহাদুর' আর বর্ধমানের রাজাদের ছিল 'মহারাজাধিরাজ-বাহাদুর'। ক্ষুণ্ণ কৃষ্ণচন্দ্রের মনে অসন্তোষ দূর করতে ইংরাজ সরকারের বিশ্বাসভাজন নবকৃষ্ণই সচেষ্ট হয়ে তাঁকে 'মহারাজা-রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি পাইয়ে দেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আর্থিক অনটনে নবকৃষ্ণ কয়েকবার টাকা ধার দিয়েছেন। কায়স্থ-সন্তান নবকৃষ্ণ বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্রকে সবসময় যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন। তবে বিশেষ করে দুর্গোৎসব উপলক্ষে দুই রাজপুরুষের মধ্যে একটা সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে রেশারেশির ভাব লক্ষ্য করা যায়।

মহারাজ নবকৃষ্ণের সমসাময়িক গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে পোস্তার রাজা সুখময় রায়, রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ সেন রায় রাইয়াঁ, আন্দুলের রাজা রামচরণ রায়, ভূকৈলাশের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল, কান্দীর দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দী, পাথুরিয়াঘাটার দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রমুখ অন্যতম ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ইংরাজ আমলে (আঠার শতক) কলকাতায় বাঙালী কালচার সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করা হল। মহারাজা নবকৃষ্ণ শোভাবাজারের রাজবাড়ীকে বাঙ্গালী সমাজ ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল করতে ভোলেননি। সুতানুটিতে (উত্তর কলকাতা) 'তালকদার

কালচার' বা সামন্ত-যুগীয় আদব-কায়দার সঙ্গে নবদ্বীপ-ভাটপাড়ার প্রাচীন শাস্ত্রীয় ও কাব্যপ্রীতির মহামিলনেই জন্ম হয়েছিল 'বাবু কালচার' বা "এজু কালচার", যার প্রতিফলন দেখা যায় উনিশ শতকে।

মহারাজা নবকৃষ্ণের 'নবরত্ন সভা' (গুপ্ত সম্রাট বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে) তৎকালীন বঙ্গ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র রাজা কালীকৃষ্ণের সভা-পণ্ডিত রামচন্দ্র তর্কলংকারের 'মাধবমালতী' গ্রন্থে এ বিষয়ে যথাযথ উল্লেখ রয়েছে :—

'তাঁর ছিল নবরত্ন ইহার সেরূপ।
সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যারূপ ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ।
তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবন বিখ্যাত ।।
মহাকবি বানেশ্বর নদের শঙ্কর।
বলরাম, কামদেব আর গদাধর ।।
শিবরাম পানপুরের স্মার্ত কৃপারাম।
শান্তিপুরে বাস গোঁসাই ভট্টাচার্য নাম ।।
এই নবরত্ন লয়ে সর্বদা আমোদ।
আপনি আছেন লক্ষ্মী, কি কব সম্পদ ।।'

'নবরত্ন সভার' রত্নরা ছিলেন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৩.৯.১৬৯৪—১৯.১০.১৮০৭), বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, নদের শংকর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, কুমারভট্টের বামদেব বিদ্যাবাচস্পতি, শিবরাম তর্কপঞ্চানন, পানপুরের কৃপারাম তর্কবাগীশ, রাধারমন বিদ্যাবাচস্পতি ও অনন্তরাম বিদ্যাবাগীশ।

সনাতন ধর্মপন্থী, ভাষাবিদ্‌ ও বিদ্যোৎসাহী মহারাজা নবকৃষ্ণ বহু অমূল্য প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করেন। বাংলার পণ্ডিত-সমাজে সংস্কৃত অধ্যাপনার কাজে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। হিন্দু সমাজপতি হিসাবে বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা এবং উৎসাহ দানের যোগ্য ভূমিকা পালন করেছেন। কলকাতায় সেন্ট জন গীর্জার (জব চার্নকের স্মৃতি-সৌধ স্থল) জমি তাঁরই দান। দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণায় বেহালা থেকে কুলপী পর্যন্ত ৩২ মাইল রাস্তা তাঁর উদ্যোগে তৈরী হয়েছিল—'রাজার জাঙ্গাল'।

মহারাজা নবকৃষ্ণের কর্মকাণ্ডের মধ্যে রাস্তার দুধারে দুটি রাজবাড়ী। দক্ষিণ-মুখী আদি রাজবাড়ী বা 'পুরানো বাড়ী'। আঠার শতকের প্রথমার্ধে দেব-পরিবার গোবিন্দপুর গ্রাম

থেকে সুতানুটিতে[১] চলে আসতে বাধ্য হন। সুতানুটি গ্রামের অংশ—বর্তমান শোভাবাজার অঞ্চলটির সাবেকি নাম ছিল 'পাবনার বাগান' 'মাতা গোস্বামীর মহাল', মনহোর মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বা 'রাসপল্লী'। শোভাবাজার নামের উৎস নিয়ে মতান্তর আছে।[২] দুপাশে দুটি বাঘওয়ালা তোরণ দ্বারের পিছনে সুবিশাল আদি রাজবাড়ীর নহবতখানা প্রথমেই চোখে পড়ে। এর ছাদে মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রিয় অবসর ক্ষেত্র ছিল। সুবৃহৎ ঠাকুরদালানে অধিষ্ঠিত কুলদেবতা শ্রীরাধাগোবিন্দজী। এই ঠাকুর-দালানে ১৭৫৭ খ্রীঃ ঐতিহাসিক জাঁকজমকে ভরা আলোড়ন সৃষ্টিকারী দুর্গোৎসবের সূচনা করেন নবকৃষ্ণ। লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস থেকে শুরু করে কলকাতার ও কলকাতার বাহিরের রাজপুরুষ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নিমন্ত্রিত হতেন। রাস্তায় লোকে লোকারণ্য। দুর্গোৎসবের এলাহি কাণ্ড-কারখানা দেখে ইংরাজ-কুল বলত 'পলাশীর যুদ্ধ জয়ের স্মৃতি-উৎসব'। সমকালীন সংবাদপত্রে ফলাও করে নাচগানের ও মেমসাহেবদের আনাগোনা ও খানাপিনার কথা লেখা হত।

'পুরানো বাড়ীর' বিপরীত দিকে ১৭৮৯ খ্রীঃ 'নতুন বাড়ী' তৈরী করার পর মহারাজা নবকৃষ্ণ পুত্র রাজকৃষ্ণকে নিয়ে এখানেই বাস করতে থাকেন। পুরানো বাড়ীতে দত্তক পুত্র রাজা গোপীমোহন থাকতেন। এই সুবিশাল নতুন বাড়ীটিতেও 'পুরানো বাড়ীর' মত মন্দির, প্রাঙ্গন, ঠাকুরদালান, লাইব্রেরী প্রভৃতি সবই ছিল। রাজা নবকৃষ্ণের জীবদ্দশায় দুই বাড়ীতে দুটি দুর্গাপূজার সূচনা হয়েছিল তা এখনও বহাল আছে, যদিও 'নতুন বাড়ী'র পূজায় লোক সমাগম বেশী হয়।

লর্ড হেস্টিংসের আমলে কোম্পানীর প্রতিভূ হিসাবে মহারাজ নবকৃষ্ণের অসামান্য কর্মদক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজকার্যে তাঁর ব্যাপক কর্ম দায়িত্বভার গ্রহণের মধ্যে। রাজনৈতিক দেওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়েও তিনি একাই দায়বদ্ধ ছিলেন—মুন্সী দপ্তর, আরজবেগী দপ্তর, জাতিমালা কাছারী, মালখানা ও চব্বিশ-পরগণার মালআদালত, তহশীল দপ্তর ও খাজাঞ্চীখানার। এর মধ্যে কয়েকটি দপ্তর তাঁর বিরাট কাছারী বাড়ীতে রেখেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর সুবিস্তৃত জমিদারী, গঙ্গা মণ্ডল (ত্রিপুরা), হুগলী, ২৪-পরগণা, মুড়াগাছা, সুতানুটি ইত্যাদি প্রায় ১৫টি পরগণার, সুষ্ঠু পরিচালনার

১। ২৮ এপ্রিল, ১৭৭৮ খ্রীঃ এক সনদে ইংরাজ সরকার নবকৃষ্ণকে সুতানটি তালুকের স্বত্ব প্রদান করেন। বার্ষিক রাজস্ব দিতে হত ১২৩৭ টাকা ১২ আনা ১০ পাই।

২। (i) দুর্গা পূজায় বা অন্যান্য আনন্দ উৎসবে রাজবাড়ী অপরূপ আলোকে সুসজ্জিত হওয়ায় 'শোভা' বেড়ে যেত ও প্রচুর লোকসমাগমে 'বাজারে' পরিণত হত।

(ii) ভিন্ন মতে—স্থানীয় জমিদার শোভারাম বসাকের নামে।

(iii) 'দুর্গাপূজা—সেকাল থেকে একাল'—বিমল চন্দ্র দত্ত, ১১৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হয়েছে। ১৭৮০ খ্রীঃ বর্ধমান জমিদারীর তত্ত্বাবধান তাঁকেই করতে হ'য়েছিল।

মহারাজ নবকৃষ্ণের সাত সাতটি বিবাহিতা রাণী রাজ-অন্তঃপুর সব সময় সরগরম করে রাখতেন। কিন্তু মাতৃত্বের দাবী ছিল প্রথমার (এক কন্যা), আর চতুর্থার (রাণী সুখি দাসী) এক পুত্র **রাজা রাজকৃষ্ণ**। নবকৃষ্ণের দত্তক পুত্র **রাজা গোপীমোহন**। দুই পুত্রই তাঁর ভূ-সম্পত্তির[১] পৃথকী-কৃত অংশের মালিক হন। প্রায় চল্লিশ বছর যাবৎ বিরাট ব্যক্তিত্বের স্মরণীয় অবদান রেখে মারা যান ২২ নভেম্বর, ১৭৯৭ খ্রীঃ। মহারাজ নবকৃষ্ণ বাংলার প্রবাদ-পুরুষদের অন্যতম। আজও রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের দুপাশে শ্রেণীবদ্ধ পুরানো (ভগ্নদশাপ্রাপ্ত) বাড়ীগুলি তাঁর ও অধঃস্তন বংশধরদের স্মৃতি আর বর্তমান বংশধরদের আবাসস্থল। মহারাজা নবকৃষ্ণের স্মারক রাস্তা 'রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট' ও ভাগীরথী তীরে একটি ঘাট – 'নবকৃষ্ণ ঘাট'।

রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের জন্ম হয় ১৭৮২ খ্রীঃ। বিবাহ করেন রামানন্দ বসুর কন্যাকে ১৭৯১ খ্রীঃ। ১৭৮৯ থেকে 'নতুন বাড়ীতে' পিতার সঙ্গে প্রায় ১০ বছর বসবাস করায় পিতৃ-অনুসৃত কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রাখেন। হিন্দী, ফার্সী ও ইংরাজী ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল। তাঁর লেখা 'দেওয়ান রাজা', 'মস্‌নবি রাজা', পয়ারছন্দে 'কুলপ্রদীপ' প্রভৃতি পুস্তক তাঁর সাহিত্য-চর্চার নিদর্শন। গর্ভনর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি রাজকৃষ্ণকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন ১৭৯৮ খ্রীঃ। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড তাঁর দেওয়া জমিতে তৈরী হয়েছিল। সংগীতবিৎ রাজা মারা যান ১০ আগষ্ট, ১৮২৩ খ্রীঃ ৪১ বছর বয়সে।

রাজা রাজকৃষ্ণের আট পুত্র—শিবকৃষ্ণ, কালীকৃষ্ণ, দেবীকৃষ্ণ, অপূর্বকৃষ্ণ, মাধবকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ, নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও যাদবকৃষ্ণ। এঁদের সকলের সুষ্ঠুভাবে লিখিত জীবন

১। (i) পরম্পরাগত জনশ্রুতি ছাড়া কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের—ফার্সী গ্রন্থ 'শেহর মুতাক্ষরীণ'—ভিত্তিতে নিখিলনাথ রায় বলেছেন, পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত ও পলাতক সিরাজের 'হীরাঝিল' প্রাসাদের ধনাগারে প্রায় এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা, বত্রিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড, এবং চার বাক্স হীরা-জহরত গচ্ছিত ছিল। ২৪ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ ধনাগার লুণ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মীরজাফর (নতুন নবাব), ক্লাইভ, ওয়ালস্‌, ওয়াটস্‌, লুসিংটন সাহেবরা, দেওয়ান রামচরণ (আন্দুলের রাজা) ও মুন্সী নবকৃষ্ণ। হাণ্টার সাহেবও এই তথ্য তাঁর 'Statistical Account of Murshidabad' p-188 গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

(ii) ইতিহাস-বেত্তারা মনে করেন রবার্ট ক্লাইভ ও সহকারী লুটেরারা সিরাজের ধনাগার থেকে কমপক্ষে আট কোটি টাকা মূল্যের ধনরাশি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে ছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ দুর্গাপূজায় ও তাঁর মায়ের শ্রাদ্ধে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন।

কাহিনী পাওয়া না গেলেও বিক্ষিপ্ত উল্লেখ ও উত্তব-পুরুষের প্রদত্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে বেশ কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উল্লিখিত হল—

জ্যেষ্ঠপুত্র মহারাজা **শিবকৃষ্ণের** জন্ম হয় ১৮০৪ খ্রীঃ এবং মৃত্যু হয় ১০ অক্টোবর, ১৮৬৬ খ্রীঃ। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র রাজা কালীকৃষ্ণ (জন্ম-১৮০৮ খ্রীঃ) ছিলেন সাহিত্যানুরাগী। সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকায় 'রাসেলা পে'র ফেবলস, 'বিদ্বোন্মাদ তরঙ্গিনী', 'মহানাটক' প্রভৃতি বাংলায় ও ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তাঁর সাহিত্য-সেবা ও পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি স্বরূপ জার্মান, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, অষ্ট্রিয়া, নেপাল, প্রভৃতি দেশের সম্রাটদের দেওয়া সম্মান সূচক পদক ও মানপত্র পেয়েছিলেন। ইংরাজ সরকারের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কালীকৃষ্ণকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব দেন ১৮৩৩ খ্রীঃ। তাঁর পিতৃব্যপুত্র মহারাজা রাধাকান্ত দেবের মৃত্যুর পর রাজপরিবারের খ্যাতি ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, কলকাতার জাস্টিস্ অফ্ পীস, মেয়ো হাসপাতালের গর্ভনর, বেথুন ইস্কুলের ম্যানেজার। রবীন্দ্রকাননে (বিডন স্কোয়ার পার্ক) তাঁর একটি মর্মর মূর্তি আছে। রাজা কালীকৃষ্ণের চার পুত্র—রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ, কুমার উদয়কৃষ্ণ, কুমার অতুলকৃষ্ণ ও কুমার অমরেন্দ্রকৃষ্ণ। তাঁর মৃত্যু হয় ১১ এপ্রিল, ১৮৭৪ খ্রীঃ বারাণসীতে ৬৬ বছর বয়সে। এই প্রসঙ্গে কুমার অমরেন্দ্রের প্রপৌত্র অলককৃষ্ণ দেবের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁর দেব রাজপরিবারের ইতিহাস চর্চার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্য। তা ছাড়া সুধীন্দ্রকৃষ্ণ ও অমলকৃষ্ণের নামও যুক্ত করতে হয়।

রাজা দেবীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র রাজা দেবীকৃষ্ণের জন্ম হয় ১৮১২ খ্রীঃ। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মৃত্যু হয় ১৫ এপ্রিল, ১৮৭২ খ্রীঃ।

রাজা অপূর্বকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র অপূর্বকৃষ্ণের জন্ম হয় ১৮১৫ খ্রীঃ। ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কয়েকটি শ্যামা বিষয়ক কবিতা ও ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা [illegible] 'কবি' উপাধি লাভ করেন। স্পেনের রাজার কাছ

থেকে তিনি পেয়েছিলেন সম্মান সূচক 'নাইট' খেতাব। তাঁর দুই পুত্র কুমারকৃষ্ণ ও উপেন্দ্রকৃষ্ণ। মারা যান ১৪ মে, ১৮৬৭ খ্রীঃ।

রাজা মাধবকৃষ্ণ দেব

রাজা মাধবকৃষ্ণ মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণের পঞ্চম পুত্র। রাজা মাধবকৃষ্ণের জন্ম হয় ১৮১৬ খ্রীঃ। তিনি নিঃসন্তান ও স্বল্পায়ু ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মারা যান ৫ জুন, ১৮৩৯ খ্রীঃ।

মহারাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণের ষষ্ঠ পুত্র মহারাজা কমলকৃষ্ণের জন্ম হয় সেপ্টেম্বর, ১৮২০ খ্রীঃ। হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ও ভাইসরয় কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন। 'গুণাকর' ও 'ভাস্কর' পত্রিকা দু'টির তিনি ছিলেন প্রধান লেখক ও প্রকাশক। ত্রিপুরায় রাস্তা নির্মাণ, খড়দায় পৌর দাতব্য চিকিৎসালয়, মেয়ো হাসপাতালের বাড়ীর জন্য ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারী স্কুলের জন্য টাকা দান করেন। স্বনামধন্য ডব্লু. সি. ব্যানার্জীকে তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠিয়ে ছিলেন। কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ব্যানার্জী মহোদয় তাঁর প্রথম পুত্রের নাম রাখেন কমলশেলী ব্যানার্জী। ১৮৬৪ ও ১৮৭৪ খ্রীঃ বাংলার দুর্ভিক্ষে তিনি ত্রাণ-কার্যে বিশেষ উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহে তিনি ইংরাজ সরকারকে সাহায্য করেছিলেন। ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ তিনি 'রাজা' উপাধি পান। বড়লাট লর্ড লিটন কমলকৃষ্ণকে স্যার ও 'মহারাজা' খেতাব দেন ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খ্রীঃ। ১৯ মার্চ, ১৮৩৮ খ্রীঃ 'ল্যাণ্ড হোল্ডার এসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ও পরে সভাপতি হয়েছিলেন। মহারাজা কমলকৃষ্ণ 'চৈত্র' বা 'হিন্দুমেলা'র উদ্যোক্তা। উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় দেশাত্মবোধে সর্বসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করা। এই বিষয়ে তিনি রাজা রমানাথ ঠাকুর, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা দুর্গাচরণ লাহা, রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক ও রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সম্ভাব্য সহযোগিতা পেয়েছিলেন। মহারাজা কমলকৃষ্ণের দুই পুত্র—কুমার নীলকৃষ্ণ ও রাজা বিনয়কৃষ্ণ। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১৯ নভেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীঃ।

মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণের সপ্তম পুত্র মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের জন্ম হয় ১০ অক্টোবর, ১৮২২ খ্রীঃ। গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়াশোনা শুরু করেন

ও হিন্দু কলেজ থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন ১৮৩৯ খ্রীঃ। শিক্ষাবিদ ডেভিড হেয়ারের সান্নিধ্যে এসে তিনি শিক্ষামূলক কাজে ব্রতী হন। তিনি ছিলেন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন'-এর সহ সভাপতি, কলকাতার কমিশনার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর (বর্তমানে ন্যাশানাল লাইব্রেরী) সভাপতি, ও 'বঙ্গীয় কায়স্থ সভার' প্রথম সভাপতি। 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন ১৮৭৫ খ্রীঃ, কে. সি. আই. ই. ১৮৮৮ খ্রীঃ, 'মহারাজা বাহাদুর' ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ। সংগীত-প্রেমী মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ 'ভারতীয় সংগীত সমাজের' প্রতিষ্ঠাতা। জনসাধারণের সেবামূলক কাজের দ্বারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে যোগ দেন, অবশ্য তাঁকে বেশী দিন চাকরী করতে হয়নি। গভর্নর জেনারেলের আইন সভার মনোনীত সদস্য হন ১৮৭৫ খ্রীঃ। 'ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিল', বিচার ব্যবস্থার সংস্কার 'ইলবার্ট বিল' (১৮৮৩ খ্রীঃ) এবং 'ব্যাঙ্ক বিষয়ক বিল' প্রভৃতি প্রশাসনিক পরিবর্তনের জন্য আইনের খসড়া নিয়ে তিনি জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। এ ছাড়া 'ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস' ক্যাডর (চাকরী)-এ ভারতীয়দের যোগদানের সমতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে আন্দোলনকে সমর্থন করে কলকাতার টাউন হলে ২৪ মার্চ, ১৮৭৭ খ্রীঃ তাঁর বলিষ্ঠ মত ব্যক্ত করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ২০ মার্চ, ১৯০৩ খ্রীঃ। মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের সাত পুত্র— ব্রজেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ, দ্বীপেন্দ্রকৃষ্ণ, ধনেন্দ্রকৃষ্ণ, মানবেন্দ্রকৃষ্ণ ও যতীন্দ্রকৃষ্ণ।

রাজা যাদবকৃষ্ণ দেব

রাজা রাজকৃষ্ণের অষ্টম পুত্র রাজা যাদবকৃষ্ণের জন্ম হয় ১৮২৩ খ্রীঃ। ২২ মার্চ, ১৮৫২ খ্রীঃ মাত্র ২৯ বছর বয়সে অকালমৃত্যু হয়। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর একটি মাত্র কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণরমনী।

রাজা গোপীমোহন দেব বাহাদুর

মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের দত্তক পুত্র রাজা গোপীমোহনের জন্ম ১৭৬৩ খ্রীঃ। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন ১৮৩৩ খ্রীঃ। তিনি ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত। হিন্দু পদ্ধতিতে পৃথিবীর একটি মানচিত্র তাঁর নির্দেশ ও আনুকূল্যে তৈরী করা হয়েছিল। তিনি বিখ্যাত 'ধর্মসভার' প্রতিষ্ঠাতা ও হিন্দুকলেজের ফাউণ্ডার ডাইরেক্টর। কালীঘাটের দক্ষিণাকালীর জন্য মূল্যবান জড়োয়া-গহনা তৈরী করিয়ে দিয়েছিলেন। মারা যান ১৭ মার্চ, ১৮৩৭ খ্রীঃ ৭৪ বছর বয়সে।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর

মহারাজ নবকৃষ্ণের পৌত্র এবং রাজা গোপীমোহনের পুত্র, দেব রাজপরিবার তিলক রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের জন্ম হয় ১০ মার্চ, ১৭৮৪ খ্রীঃ।[১] রাজা নবকৃষ্ণ তাঁর নাতিকে ১৩ বছর বয়স পর্যন্ত 'মানুষ' করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পিতামহের আদর্শই তাঁর কর্মজীবনকে প্রভাবিত করেছিল। রাজবাড়ীতে গৃহ শিক্ষক কৃষ্ণমোহন বসুর কাছে বিদ্যাভ্যাস শুরু হয়—বাংলা, আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত ভাষা। ইংরাজী শিক্ষার জন্য মিষ্টার কামিংসের 'ক্যালকাটা এ্যাকাডেমিতে' পড়েছেন। সংস্কৃত জনসাধারণের সহজলভ্য ও গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য প্রায় আঠারো বছর (১৮০১-১৮১৯ খ্রীঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে সংস্কৃত ভাষার অভিধান 'শব্দকল্পদ্রুম', প্রথম খণ্ড প্রকাশ করেন—আগষ্ট, ১৮১৯ খ্রীঃ। তা ছাড়া সরকারী সংস্কৃত কলেজ থাকা সত্ত্বেও ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৭ খ্রীঃ তিনি শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার দিন থেকে (১৪ মে, ১৮১৫ খ্রীঃ, স্যার হাইড ইষ্ট-এর গৃহে) জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'শব্দকল্পদ্রুমের' অষ্টম বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৮ খ্রীঃ, মোট খরচ ষোল লক্ষ টাকা। সনাতন ধর্মপন্থী রাধাকান্ত উদার-পন্থী 'ইয়ং বেঙ্গল' নেতা ডিরোজিওর বিরুদ্ধাচারণ ও সতীদাহ প্রথা রহিত আইনের প্রতিবাদ করেছেন। বহু-বিবাহ বন্ধ করার বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা বিবাহ-এর পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে তিনি রাজা রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ তৎকালীন সমাজ-সংস্কারকদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু সনাতন-পন্থী সামাজিক বা ধর্মীয় নীতি পরিবর্তনের ব্যাপারে কোন রকম আপোষ করেননি। ২ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৪ খ্রীঃ তাঁর জনসেবামূলক কাজের জন্য বড়লাট লর্ড আমহার্ষ্ট তাঁকে 'পাঁচ পার্চায়' এক খেলাৎ ও শিরপেচ এবং পরে ৪ অক্টোবর, ১৮৩৭ খ্রীঃ গভর্নর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড রাধাকান্ত দেবকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব প্রদান করেন। ৩০ এপ্রিল, ১৮৬৬ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কাছ থেকে প্রথম বাঙালী কে. সি. এস্. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁর অন্যান্য কর্মযজ্ঞের মধ্যে রয়েছে—'School Book Society'-র আজীবন কর্নধার, চিৎপুরে হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠা, হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় ও দেব রাজবাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। তিনি ছিলেন 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনে'র একজন প্রতিষ্ঠাতা ও 'জমিদার সভার' (গঠন ১৯ মার্চ, ১৮৩৮) উদ্যোক্তা ও সভাপতি। রাজা

১। রাজা রাধাকান্ত দেব দ্বিশততম জন্ম বার্ষিকী স্মরণিকা—১৯৮৫। ভিন্নমতে জন্ম ১৭৮৩ খ্রীঃ।

রাধাকান্ত সতীপ্রথা ও বহু বিবাহ রোধ করার বিপক্ষে হলেও নারী-শিক্ষার উন্নতির জন্য তৎপর ছিলেন। গোঁড়া হিন্দু[১] (বৈষ্ণব) হওয়া সত্ত্বেও অন্যধর্ম থেকে 'হিন্দু ধর্মে' অন্তর্ভুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয়তাবাদ ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের নেতা ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১ খ্রীঃ) অতি উদার মতবাদের বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত করেন ২৫ এপ্রিল, ১৮৩১ খ্রীঃ।

তিরাশী বছর বয়সে রাজা রাধাকান্ত দেবের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১৯ এপ্রিল, ১৮৬৭ খ্রীঃ বৃন্দাবন ধামে। রাজা রাধাকান্তের তিনপুত্র—রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ, রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ ও রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণ। রাজা মহেন্দ্র নারায়ণ ও রাজা দেবেন্দ্র নারায়ণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মহেন্দ্র নারায়ণের দুই কন্যা—ব্রজ কুমারী ও কমল কুমারী এবং দেবেন্দ্র নারায়ণের দুই পুত্র—ব্রজেন্দ্র ও সুরেন্দ্র।

রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ দেব বাহাদুর

রাজা রাধাকান্ত দেবের দ্বিতীয় পুত্র রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণের জন্ম হয় জুন, ১৮১৫ খ্রীঃ। তিনি ছিলেন পিতার সুযোগ্য পুত্র। 'সনাতন ধর্ম রক্ষিণী' ও 'কায়স্থ কুল সংঘ রক্ষিণী' সভার প্রতিষ্ঠাতা। 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন ৩০ এপ্রিল, ১৮৬৯ খ্রীঃ। তিনি ছিলেন 'ভাইসরয় কাউন্সিলের' সভ্য ও সাহিত্য-সেবী'। তৎকালীন অনেকগুলি গ্রন্থের প্রকাশনার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। পিতা রাজা রাধাকান্ত দেবের 'জীবনচরিত' তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি মারা যান ১৮৮১ খ্রীঃ ৬৬ বছর বয়সে একমাত্র পুত্র গিরীন্দ্র নারায়ণ দেবকে রেখে। গিরীন্দ্র নারায়ণের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী হেমন্ত কুমারী।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর

মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র কমলকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র রাজা বিনয়কৃষ্ণের জন্ম হয় ১৮৬৬ খ্রীঃ। সনাতন-ধর্মনিষ্ঠ হয়েও তিনি ছিলেন উদারপন্থী জাতীয়তাবাদী ও বহু ভাষাবিদ। তাঁর বিবাহ হয় প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারীর কন্যা জ্যোতির্ময়ী দেবীর সঙ্গে ১৮৮১ খ্রীঃ। দরিদ্র ছাত্র ও অভাবী মানুষদের সাহায্যার্থে তিনি 'বেনাভোলেণ্ট সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন ১৮৮১ খ্রীঃ। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন ১৮৮৬ খ্রীঃ। ঋষি অরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১১ খ্রীঃ) সক্রিয় অংশগ্রহণ

১। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও দেবদ্বিজে তাঁর প্রশ্নাতীত ভক্তি ছিল।

করেন এবং ১৯০৮-০৯ খ্রীঃ বঙ্গীয় প্রদেশ কংগ্রেস-এর সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি (১৮৯২ খ্রীঃ), গভর্নর, মেয়ো হাসপাতাল ও সহ-সভাপতি, 'ক্যালকাটা হিস্টোরিকাল সোসাইটি'।

রাজা বিনয়কৃষ্ণ তাঁর নিজ বাসভবনে (২/২ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট) সাহিত্যচর্চার আসর —"বেঙ্গল এ্যাকাডেমি অফ্ লিটারেচার" প্রতিষ্ঠা করেন ২৩ জুলাই, ১৮৯৩। এই প্রতিষ্ঠানই পরে (১৭ বৈশাখ, ১৩০১ সন) ২৭ এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রীঃ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' নামে পরিচিত হয়। বহুদিন পরিষদের কাজকর্ম এখান থেকেই পরিচালিত হয়েছিল। বিনয়কৃষ্ণের লেখনী প্রসূত কয়েকটি গ্রন্থের মধ্যে, 'The Early History & Growth of Calcutta' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ খ্রীঃ কলকাতায় আমেরিকা (চিকাগো) প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কলকাতার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে। বিলাতে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া' ও কলকাতায় 'বাঙ্গালী' ও 'অমৃতবাজার' প্রভৃতি পত্রিকাকে আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম ছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁর সমাজসেবা ও সাহিত্যে অবদানের জন্য তাঁকে প্রথমে 'রাজা' (১৮৯৫ খ্রীঃ), 'কাইজার-ই-হিন্দ' (১৯০২ খ্রীঃ) ও 'রাজা বাহাদুর' (১৯১০ খ্রীঃ) উপাধি দেন। রাজা বিনয়কৃষ্ণের আট পুত্র—প্রফুল্ল, প্রমোদ, প্রদ্যুম্ন, প্রকাশ, প্রভাত, প্রভাস, প্রত্যুষ ও প্রমথ। তাঁর মৃত্যু হয় ১ ডিসেম্বর, ১৯১২ খ্রীঃ।

রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের মধ্যম পুত্র রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম হয় ১৫ ডিসেম্বর, ১৮৫০ খ্রীঃ। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ১৮৬৭ খ্রী.। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়েন ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর—এম. এ. বি. এল. ডিগ্রী পান। কর্মজীবন শুরু করেন হাওড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর পদে ১৮৭৬ খ্রীঃ। বহরমপুর, ফরিদপুর, পাবনা ইত্যাদি অঞ্চলের ম্যাজিষ্ট্রেট ও কলেক্টর হয়েছিলেন। ইন্স্‌পেক্টর জেনারেল অফ রেজিষ্ট্রেশন পদেও কিছুদিন কাজ করেছিলেন। ঢাকা, বর্ধমান, হুগলী প্রভৃতি আদালতে সিভিল ও সেশন জজ পদে আসীন ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করেন। ইংরাজ সরকার তাঁর গুণগত দক্ষতা ও সমাজসেবার স্বীকৃতি হিসাবে 'রাজা' উপাধি দেন ২৯ জুন, ১৯০৬ খ্রীঃ। রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবই দেব-বংশের শেষ খেতাবী রাজা। তিনি সভাপতি 'বঙ্গীয়

কায়স্থ সভা' ও সহ-সভাপতি, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'। জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম। রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণের তিন পুত্র—দ্বিজেন্দ্র, শচীন্দ্র ও রবীন্দ্র। তাঁর দেহাবসান ঘটে ২৬ মার্চ, ১৯৩২ খ্রীঃ। ১

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও রাজা কালীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম হয় আনুঃ ১৮২৬ খ্রীঃ। তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় সরকারী কর্মচারী হিসাবে, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে মার্চ, ১৮৫১ খ্রীঃ। 'বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' ও 'ভাইসরয় কাউন্সিলের' সভ্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। 'রাজা' উপাধি পান ৪ জুন, ১৮৭৪ খ্রীঃ। তাঁর তিন পুত্র—বরেন্দ্র, রামেন্দ্র ও সত্যেন্দ্র।

রাজা সীতানাথ বোস বাহাদুর

শোভাবাজারের দেব রাজপরিবারের দৌহিত্র সন্তান রাজা সীতানাথ বোস বাহাদুরের জন্ম হয় আনুঃ ১৭৮০ খ্রীঃ। তিনি ছিলেন মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের পিতৃব্য পুত্র ব্রজমোহন দেবের দৌহিত্র। সীতানাথের পিতার নাম মনমোহন বোস। কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। সীতানাথকে মহারাজা নবকৃষ্ণই লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছিলেন। সীতানাথ কর্মজীবন শুরু করেন সরকারী মুন্সেফ হিসাবে। পরে সরকারী তোষাখানার তত্ত্বাবধায়কেরও কাজ করেছিলেন। তাঁর বিচক্ষণতায় সন্তুষ্ট হয়ে সরকার তাঁকে মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজিম-এর সহকারী দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন। সেই সময় 'নবাব-স্টেট' বিশৃঙ্খলা ও আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়েছিল। রাজা সীতানাথ অল্প সময়ের মধ্যেই স্টেটের সুযোগ্য কর্মচারীদের কাজকর্মের সাহায্যে ও নিজের অভিজ্ঞতার বলে স্টেটকে ঋণমুক্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার পুরস্কার স্বরূপ ইংরাজ সরকার তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব দেন। মারা যান একমাত্র কন্যা রেখে।

১। রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণের পৌত্র ধ্রুবেন্দ্রকৃষ্ণের প্রদত্ত তথ্য অবলম্বনে।

রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব

মহারাজা নবকৃষ্ণের বড় ভাইয়ের (রামসুন্দর) প্রপৌত্র ও শ্রীনারায়ণ দেব-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন তোষাখানার সরকারী তত্ত্বাবধায়ক [১] হিসাবে। পরে তাঁর দক্ষতা ও কর্মসচেতনতার সুবাদে ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে সহকারী সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন ৮ অক্টোবর, ১৮৫৯ খ্রীঃ। তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার প্রসন্ন নারায়ণকে ১৮৪৭ খ্রীঃ 'রায় বাহাদুর' ও পরে ৩ জানুয়ারী, ১৮৪৮ খ্রীঃ 'রাজা' খেতাব দেন।[২] মারা যান ১৮৭০ খ্রীঃ, তিন পুত্র—কুমার বিজয়কৃষ্ণ, যোগেন্দ্রকৃষ্ণ ও জ্যোতীন্দ্রকৃষ্ণকে রেখে।[৩] ইংরাজ রাজকর্মচারী (গভর্নর জেনারেল) লর্ড এলেনবরো ও লর্ড হার্ডিঞ্জ[৪] এবং স্যার হেনরী ইলিয়ট প্রমুখ, রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গেছেন।

১। এই পদেই পূর্বে তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা রাজা সীতানাথ বোস আসীন ছিলেন।

২। রাজা প্রসন্ন নারায়ণ মুর্শিদাবাদের 'দেওয়ান নিজামত' পদে নিযুক্ত হন ১৮৫৩ খ্রীঃ নবাব মনসুর আলি খানের অধীনে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পূর্বে রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ও ঐ পদে কর্মরত ছিলেন।

৩। রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেবের বংশধর রবীন্দ্রকৃষ্ণ দেব ও রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব এবং অন্যান্যরা ৬৭ এ, বি. রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীটে বসবাস করেন।

৪। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রশংসাপত্র, ৩ জানুয়ারী, ১৮৪৮ খ্রীঃ 'I have great pleasure in recording my sense of the excellent services of Raja Bahadur Prasanna Narayan Deb, the superintendent of Toshakhana. This officer accompanied me in 1845 to the North West Frontier as the head of his department, and I have on several occassions, stated in public Durbar and elsewhere my approbation of his......services. As mark of my personal estimation......to present him with a gold medal with a suitable inscription which I shall send to him from England.'' এই প্রশংসা-পত্রের সুপারিশে রাজা প্রসন্ন নারায়ণ দেব 'রাজা' উপাধি পান ও পরে ভারত সরকারের বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ে নিযুক্ত হন।

বাগবাজারের সোম রাজপরিবার

কলকাতা

মহারাজা জানকীরাম সোম বাহাদুর

অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে হুগলী জেলায় চুঁচুড়ার সোম বংশই কলকাতায় বাগবাজারের নবাবী আমলের মহারাজা রাজবল্লভের [১] পিতৃবংশ। তাঁর প্রপিতামহ চুঁচুড়ার **কৃষ্ণবল্লভ সোম** (১৬৬৮-১৭৩৬)। [২] কৃষ্ণবল্লভ সোম ও তাঁর অপর সহোদর ভাই গঙ্গানারায়ণ [৩] যথাক্রমে চুঁচুড়া ও বাগবাজারের সোমবংশের আদিপুরুষ। সতেরো শতকের মাঝামাঝি আদি নিবাস চুঁচুড়া ছেড়ে বাগবাজারে বসতি করেন কৃষ্ণবল্লভ সোম। তিনি ছিলেন উড়িষ্যার সুবাদার-নবাব সুজাউদ্দিনের কানুনগো (১৭২৭ খ্রীঃ)। তার পুত্র **জানকীরাম সোমের** জন্ম হয় ১৬৮৮ খ্রীঃ। কৈশোর অবস্থাতে পিতার সান্নিধ্যে নবাবী সেরেস্তার কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন জানকীরাম। প্রথমেই তাঁর শিক্ষানবিসী শুরু হয় বিশেষ অভিজ্ঞ তহশীলদার মহম্মদ্ আলীর (পরে নবাব-নাজিম আলিবর্দী খান) কাছে। ১৭২৯ খ্রীঃ সুজাউদ্দিন বাংলায় সুবাদার-নবাব আর আলিবর্দী খান বিহারের নায়েব-সুবাদার। আলিবর্দী জানকীরামকে নিয়ে আসেন বিহারে দেওয়ানের পদে। দশ বছর পর আলিবর্দী বাংলায় সুবাদার-নবাব হলে জানকীরাম ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নে মুর্শিদাবাদের দেওয়ানের গদি লাভ করেন। নবাব-আলিবর্দীর খাস মন্ত্রী-মণ্ডলের সদস্য হন ১৭৪০ খ্রীঃ।

মারাঠা বর্গীদের বারে বারে (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) লুটপাটের শিকার হতে থাকে

১। বাংলার নবাব আলিবর্দী খানের আমল থেকে মীরকাশিম পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ দরবারে রাজা রাজবল্লভ নামে দুই রাজপুরুষের অবস্থান ছিল। তাঁদের জীবন চরিতের পরস্পর বিরোধী তথ্য পরিবেশিত হওয়ায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ট ও আধুনিক মতবাদের উপর ভিত্তি করে দুই রাজপুরুষের দুটি পৃথক রাজনৈতিক জীবন-চরিত আলোচিত হয়েছে। তবে এঁদের মধ্যে যে একজন সেন বা বৈদ্যজাতি এবং অপরজন সোম বা কায়স্থ বংশীয়—এ বিষয়ে কোন মতান্তর নেই।

২। ভিন্ন মতে এঁরা রাজশাহী নিবাসী কায়স্থ বংশীয় রায়—'উদ্ভট সাগর'—পূর্ণচন্দ্র দে, 'সোমবাবুদের বংশাবলী'—কেদারনাথ সোম, 'হুগলি জেলার ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড—সুধীরকুমার মিত্র।

৩। সোম পরিবারের পূর্বপুরুষ বলভদ্র সোম ছিলেন গৌড়াধিপতির প্রধান মন্ত্রী—'ভিজিরল মোমালাক্'। বলভদ্রের উত্তর-পুরুষ কৃষ্ণবল্লভ ও গঙ্গানারায়ণ (ভিন্নমতে, লক্ষ্মীনারায়ণ)।

বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা। শেষ পর্যন্ত চৌথ দিতে স্বীকৃত হওয়ায় বর্গীদের দৌরাত্ম্য কিছুটা কমে। জানকীরামের পরামর্শ ও কৌশল নবাবকে খুশী করে। পদমর্যাদায় উন্নীত হলেন—'দেওয়ান-ই-তান্'। নবাবের খেতাবী 'রাজা' হয়ে বিহারে গেলেন নায়েব-সুবাদার পদে। দক্ষতার সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের কাজ পরিচালনা করেন। দিল্লীর সম্রাট মহম্মদ শাহ্ (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ) সন্তুষ্ট হ'য়ে জানকীরামকে 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাব ও 'ছয়-হাজারী মনসব্দার' পদের অধিকারী করেন। ১৭৫৩ খ্রীঃ ৬৫ বছর বয়সে মৃত্যু হয়।

মহারাজা মহীন্দ্র বাহাদুর দুর্লভরাম সোম

মহারাজা জানকীরামের পুত্র মহারাজা দুর্লভরামের (রায়দুর্লভ নামেও সুপরিচিত) জন্ম হয় ১৭১০ খ্রীঃ। পিতার সান্নিধ্যে রাজকার্যের খুঁটিনাটি বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করেন অল্প বয়সে। নবাব আলিবর্দী দুর্লভরামকে পাঠালেন উড়িষ্যার সুবাদার আব্বাস সোভনের অধীনে সরকারী সেরেস্তার কাজে। ১৭৪৯ খ্রীঃ সুবাদার সোভনের মৃত্যুর পর দুর্লভরামকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে বসালেন খাস্ সুবাদারের পদে। পাটনার সুবাদার হিসাবেও তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। দুর্লভরাম মারাঠী বর্গীদের [১] অতর্কিত আক্রমনে বন্দী হন—তিন লক্ষ টাকা পণে মুক্তি পান। ১৭৫৬ খ্রীঃ বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা। নবাবের আদেশে দুর্লভরাম কলকাতায় এসে ফোর্ট উইলিয়ামকে ইংরাজ কোম্পানীর মজবুত দুর্গ বানাবার কাজে বাধা দেন। ২০ জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ খণ্ড যুদ্ধে গভর্নর ড্রেক ও কর্ণেল ওয়াটসন্ পরাজয় স্বীকার করেন। ফোর্ট উইলিয়ম নবাবের অধিকারে আসে। কিন্তু ২ জানুয়ারী, ১৭৫৭ খ্রীঃ ইংরাজরা দুর্গ পুনর্দখল করেন। ইংরাজদের এই সাফল্যের মধ্যে রাজা দুর্লভরাম, মানিকচাঁদ, উমিচাঁদ ও মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের যুগ্ম চক্রান্তের অবদান ছিল। ২৩ মার্চ, ১৭৫৭ খ্রীঃ নবাবের আদেশ সত্ত্বেও ফৌজদার রাজা নন্দকুমার, রাজা দুর্লভরাম ও মানিকচাঁদ (সেখানে উপস্থিত থেকেও) ইংরাজদের বিরুদ্ধে চন্দননগরে ফরাসী বণিকদের কোন রকম সাহায্য করেননি।

পলাশীর যুদ্ধ ঘনিয়ে এলো ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ। বিশ্বাসঘাতকদের চক্রজালে নবাব সিরাজ পরাজিত। ইংরাজ কোম্পানী বিশ্বাসঘাতকদের যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণে তৎপর। কর্নেল ক্লাইভ কর্তৃক রাজা দুর্লভরামকে রংপুর জেলায় পৌরাবন্দ পরগণা, বাৎসরিক ছয় লক্ষ টাকা আয়ের জায়গীর দান এবং দিল্লী দরবার থেকে খেতাব 'মহারাজা মহীন্দ্র বাহাদুর' আনিয়ে দেওয়া হল। [২] আর বসানো হ'ল 'দেওয়ান-ই-আলা' মন্ত্রী পদে।

১। ভাস্কর পণ্ডিতের জীবন চরিতে সোম বংশের উল্লেখ আছে।

২। এই খেতাব দেওয়ান মহারাজা মুনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর মারফৎ আনান হয়েছিল।

মীরজাফর হলেন বাংলার নবাব ২৯ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ। এক বছরের মধ্যেই নবাব মীরজাফর রাজা দুর্লভরামকে নিছক সন্দেহের বশে পদচ্যুত করেন। রাজা দুর্লভরামকে হত্যা করতে পুত্র মীরণকে আদেশ দেন। মহারাজা নন্দকুমার তখন হুগলীর দেওয়ান। তাঁর কাছে এই দুঃসংবাদ আসা মাত্রই তিনি সপ্রহরায় দুর্লভরামকে হুগলীতে নিয়ে এসে প্রাণরক্ষা করেন। কিন্তু এর ফলে নন্দকুমারকে হেস্টিংসের কোপে পড়ে চরম শাস্তি পেতে হয়েছিল। ইংরাজ কোম্পানীর সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের (১২ আগস্ট ১৭৬৫ খ্রীঃ) ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা ছিল দুর্লভরামের। ইংরাজ কোম্পানী ১৭৬৮ খ্রীঃ তাঁদের একজন বিশ্বস্ত আমলা ও পরমহিতৈষী বন্ধু মহারাজা দুর্লভরামকে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা পেনসনের ব্যবস্থা করে দেন। এই প্রসঙ্গে কোম্পানীর একটি অঙ্গীকার পত্রের উল্লেখ করা হল—'আমরা বাইবেল চুম্বন পূর্বক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে অঙ্গীকার করিতেছি যে, যতদিন রাজা দুর্লভরামের পরিবারের মধ্যে একজন জীবিত থাকিবে, ততদিন আমরা তাহাদের বংশ পরম্পরায় সম্মান ও ভারপোষণের সম্যক যত্ন লইব'—ভ্যান্সিটার্ট (সেক্রেটারী), কারনাক্ এবং হেস্টিংস্—১৭৭৫ খ্রীঃ।[১] মহারাজা দুর্লভরামের মৃত্যু হয় ১৭৭০ খ্রীঃ।

রাজা রাজবল্লভ সোম

কলকাতায় গঙ্গার ধারে বাগবাজারে পৈতৃক প্রসাদে মহারাজা দুর্লভরামের পুত্র রাজবল্লভের জন্ম হয় আনুঃ ১৭৩১ খ্রীঃ। পিতার জীবদ্দশায় রাজবল্লভ নবাবী রাজকার্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা (সুবাদারের বকসি) নিয়েছিলেন। পিতার 'হুজুর নবিশ' অর্থাৎ মুখ্য সম্পাদক হিসাবে সরকারী কাগজ-পত্রে দস্তখত করার অধিকারী ছিলেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সময় মুর্শিদাবাদে 'খালসার' দেওয়ান ছিলেন। পরে লর্ড ক্লাইভের বিশেষ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি রূপে চিহ্নিত হন। রাজা রাজবল্লভ বুদ্ধিমান ও স্বাধীন-চেতা রাজপুরুষ। নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে তার পুরানো বৈরিতার জন্যে ১১ অক্টোবর, ১৭৬৫ খ্রীঃ নবাব সেনাপতি রেনহার্ডের সৈন্যদের হাতে রাজা রাজবল্লভ এবং বহু ইংরাজ ও বাঙালী নাগরিক মারা যান। তখন তিনি কলকাতাতেই থাকতেন। তাঁর বয়স মাত্র ৩৪ বছর। বৃদ্ধ পিতা মহারাজা দুর্লভরাম জীবিত।[২]

উত্তর কলকাতায় বাগবাজারের 'রাজবল্লভ পাড়া', 'রাজবল্লভ ঘাট' ও রাজা 'রাজবল্লভ ষ্ট্রীট' তাঁর নামের স্মরণীক। রাজা রাজবল্লভের বাসভবনের কোন চিহ্নই দেখা

১। সেকালের কলকাতা—আর. কে. মিত্র। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—নিখিলনাথ রায়।

২। ভিন্ন মতে রাজা রাজবল্লভের মৃত্যু হয় ১৭৯৮ খ্রীঃ।

যাবে না। স্থানীয় বয়োঃবৃদ্ধদের অনুমান যে, ১৪ রামকান্ত বোস স্ট্রীটে বর্তমান 'নব বৃন্দাবন মন্দিরটির' (তৈরী ১৯৪১ খ্রীঃ) সংলগ্ন এলাকাতেই সোম পরিবারের বাসভবনের অবস্থান ছিল।

রাজা রাজবল্লভের একমাত্র পুত্র **রাজা মুকুন্দবল্লভ** ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর স্ত্রী রাণী জয়মণি **গৌরবল্লভকে** পোষ্য নেন। কিন্তু ইংরাজ সরকার ঐ পোষ্যকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। সোম বংশের প্রত্যক্ষ বংশধর না হলেও রাজা গৌরবল্লভের পোষ্যপুত্র রাজা রুক্মিণীবল্লভের (কোন পুত্র ছিল কিনা জানা যায় না) কন্যার পুত্র কাশীপ্রসাদ মিত্রের [১] পুত্র রায় বাহাদুর রামপ্রসাদ মিত্র, গোপাললাল মিত্র, অঘোরকুমার মিত্র, ও তাঁদের উত্তরপুরুষরা রাজা রাজবল্লভের স্মৃতি বহন করছেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই বংশে রামচরণ সোম চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ বণিকদের দেওয়ান ছিলেন আঠারো শতকের প্রথমভাগে। তাঁর পুত্র শ্যামরাম সোম ওলন্দাজ কাউন্সিলের একজন সদস্য ছিলেন। তাঁর নামে এখনও চুঁচুড়ায় গঙ্গার ধারে একটি ঘাট আছে। তিনি ১৭৮৪ খ্রীঃ মারা যান। তাঁর পুত্র ঘনশ্যাম সোমও ওলন্দাজ কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের উত্তরপুরুষ রায় বাহাদুর বেণীমাধব সোম ঢাকা আদালতের বিচারপতি ছিলেন। তার মৃত্যু হয় ১৭ অক্টোবর, ১৮৭৮ খ্রীঃ।

একটি পুরানো প্রামাণ্য প্রকাশনায়—"Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars", Part II by Lok Nath Ghosh—1881. চুঁচুড়ার সোম বংশের অন্যতম প্রধান শাখা যে, কলকাতায় বাগবাজারে বসতি করেছিলেন, সে বিষয়ে কোন উল্লেখ করা হয়নি। কেবল চুঁচুড়ার সোম বংশের গঙ্গানারায়ণ সোমের উত্তরপুরুষদের যে বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে, তা উল্লেখ করা হল—"The ancesstors (Balabhadra) of the Som family of Chinsurah settled in the province of Bengal 669 years ago (Reign of Gour Dynasty). One of the decendants of Balabhadra Som left two sons, Ganga Narayan and Krisna Ballava……Ganga Narayan's son Ram Charan was the Dewan to the Dutch Trading Company (1753 A.D.) His son Syam Charan was a member of the supreme council of of the Dutch Government, who received the title 'Babu' from Siraj-ud-Dowla (1756 A.D.) He left one son Ghanasyam Babu, who was also Dutch Government's Agent & Dewan. His son Gokul Bihari was Chief Native Officer, Orissa. Beni Madhab Som—Judge of Small Causes of Dacca died on 17th October, 1878 A.D. leaving two sons Radhikalal and Priyalal'.

১। মিঃ কটন্ বলেছেন যে, কাশী মিত্র (গঙ্গার ধারে কাশী মিত্র ঘাট) রাজা রাজবল্লভের ভাগিনেয়।

ভূকৈলাসের ঘোষাল রাজপরিবার

খিদিরপুর, কলকাতা

খ্রীষ্টীয় ১৯৯০ কলকাতা মহানগরীর দক্ষিণাঞ্চলে খিদিরপুরের ভূকৈলাস রাজবাড়ীর তিনশো বছর পূর্তি হল। অতএব ভূকৈলাস রাজবাড়ীর ইতিহাস কলকাতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৬৯০ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারী জব চার্নক যখন হুগলীর কুঠিতে, তখন নবাবের সৈন্যরা কুঠি আক্রমণ করে। নিরুপায় চার্নক তাঁর পুরানো সুতানুটি-গোবিন্দপুরের ব্যবসা কেন্দ্রে ফিরে আসেন। ইংরাজ বণিকদের শক্তিশালী হতে হবে। তৈরী হল বাড়ী-ঘর, রাস্তাঘাট ও সৈনিক-ছাউনি। মজবুত করে বানানো হল দুর্গ। ইংলণ্ডের রাজা উইলিয়ামের নামে দুর্গের নামকরণ হল ফোর্ট উইলিয়াম (১৭৭৩ খ্রীঃ), আজও দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গত কারণেই ঐ এলাকার আদি-বাসিন্দাদের বাড়ী জমি-জায়গা ছেড়ে যেতে হল। যেমন দেব-পরিবার চলে গেলেন শোভাবাজারে, ঠাকুর-পরিবার দরমাহাটায় আর ঘোষাল-পরিবার খিদিরপুরে।

মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল

'ভূকৈলাস' নামটি ঘোষাল-পরিবারের মহারাজ জয়নারায়ণের দেওয়া। তাঁর একান্ত ইচ্ছায় কলিযুগে মর্ত্যে কলকাতায় আর এক 'কৈলাস' সৃষ্টি হল। দেবালয়ের গর্ভ-গৃহে কৈলাসের দেব-দেবীদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনটি শিবলিঙ্গ—রক্ত-কমলেশ্বর, কৃষ্ণ-চন্দ্রেশ্বর ও রাজ-রাজেশ্বর ছাড়া পঞ্চানন, মহাদেব, গঙ্গা, গণেশ, কার্তিক, সূর্য, রাম-সীতা, হনুমান, কালভৈরব প্রভৃতি বিগ্রহের আজও নিত্য পূজা হয় দেবোত্তর এস্টেটের আয় থেকে। শিবরাত্রি ও চড়কে এখনও মেলা বসে। রাজবাড়ীর দুর্গাপূজা বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'সুরধুনী' কাব্যে লিখেছেন :—

'ভুবনে কৈলাস-শোভা ভূকৈলাস ধাম
সত্যের আলয় শুদ্ধ সত্য সব নাম,
... ...
বিরাজে ঠাকুর-ঘরে হেম দশভূজা
পটবাসাবৃত বিপ্র করিতেছে পূজা।'

ঘোষাল-বংশের কুলদেবী **পতিতপাবনীর** অষ্টধাতুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭৮২ খ্রীঃ। ঘোটকাকৃতি সিংহে আরূঢ়া মহিষাসুরমর্দিনী দশভূজা দুর্গা। নিত্য পূজা

ছাড়া দুর্গাপূজার দুটি দিন দেবী নবম্যাদিকল্পে বিশেষভাবে পূজিতা হন। এই প্রতিমার বিশেষত্ব যে, তিনি কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বলরাম ও কৃষ্ণরূপেও পূজিতা হন এবং তা হয়ে থাকে, সেই সেই দেব-দেবীর পূজা তিথিতে। মহারাজা জয়নারায়ণের প্রেরণায় রাজা নৃসিংহ দেবরায়ের হংসেশ্বরী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঁশবেড়িয়ায় ১৭৯৯ খ্রীঃ।

হাওড়া জেলার বাকসাড়া গ্রামের আদি-নিবাসী ঘোষাল-বংশের আদি-পুরুষ সুধানিধির ২৫ অধস্তন পুরুষ কন্দর্পনারায়ণ ঘোষাল খিদিরপুর অঞ্চলে [১] বসতি করেন ১৭৬৪ খ্রীঃ। তাঁর তিন পুত্র—কৃষ্ণচন্দ্র [২], **গোকুলচন্দ্র** ও রামরাম চন্দ্র। গোকুলচন্দ্র বাংলার গভর্নর ভেরেলষ্ট সাহেবের (১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ) দেওয়ান ছিলেন। নিজের ব্যবসার মাধ্যমে বিশাল ঐশ্বর্য্যের মালিক হন, এমন কি, স্বাধীন (করদ) ত্রিপুরার রাজা দুর্গামাণিক্য দেববর্ম্মণ বাহাদুরকে তিনি সাহায্য করেছিলেন ১৮০৯ খ্রীঃ। তার বিনিময়ে পান কয়েকটি নিষ্কর গ্রামের মালিকানা। 'উইলিয়ম হিকির স্মৃতিকথায়' (১৭৪৯-১৮০৯) জানা যায় যে, ঘোষালদের খিদিরপুরের জমি অধিকার করেন কর্ণেল ওয়াটসন্ [৩] ডক তৈরীর জন্য। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে (স্যার এলিজা ইম্পে) মামলা জেতেন গোকুল ঘোষাল, পরে অবশ্য মিটমাট হয়ে যায়। ডকের কাজ চলতে থাকে। গোকুলচন্দ্রের দুটি বিবাহ —প্রথমা স্ত্রী পতি-সহমরণের জন্য সতী হন—আজও ভগ্নাবস্থায় 'সতীঘাট' দেখা যাবে খিদিরপুরে ভাগীরথী তীরে। দেওয়ান গোকুলচন্দ্র মারা যান ১৭৭৯ খ্রীঃ।

মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর

গোকুলচন্দ্র [৪] তাঁর বড় ভাই কৃষ্ণচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয়নারায়ণ ঘোষালকে তাঁর বিশাল সম্পত্তির মালিক করে দেন। জয়নারায়ণের জন্ম হয় (১১৫৯ সন, ৩রা আশ্বিন) সেপ্টেম্বর, ১৭৫২ খ্রীঃ। তিনি অল্প বয়সে তাঁর মেধা, অধ্যবসায়, ও গৃহ-শিক্ষকের সাহায্যে বাংলা, হিন্দী, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী, ফরাসী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিন বছর (১৭৭০-৭৩ খ্রীঃ) বাংলার নবাব মীরজাফরের চতুর্থ সন্তান নবাব মোবারক-উদ্দৌলার সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। পরে কলকাতায় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জন্ সেক্সপিয়ারের সহকারী পদে কর্মরত হন।

১। আদি বসত-বাড়ীটি খিদিরপুরের ডক সম্প্রসারিত হওয়ায় ১৮৮৩-৮৪ খ্রীঃ ভেঙে ফেলা হয় এবং কিছুকালের মধ্যেই বর্তমান রাজবাড়ীর (৪৯ ১, সার্কুলার গার্ডেনরীচ রোড) পত্তন হয়।

২। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাধক কবি রামপ্রসাদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। পতিতপাবনী মন্দির স্থাপনের (১৭৮২ খ্রীঃ) পর বৃদ্ধ বয়সেও রামপ্রসাদ এখানে আসতেন, গান গাইতেন।

৩। খিদিরপুরে ওয়াটগঞ্জ এলাকা তাঁর স্মৃতিবাহক।

৪। গোকুলচন্দ্রের পাঁচ পুত্রদের কোন পুত্র-সন্তান ছিল না।

কার্যদক্ষতা, নিষ্ঠা ও রাজভক্তির প্রতিদানে গভর্নর ওয়ারেন্ হেষ্টিংস-এর সুপারিশে মোগল সম্রাট শাহ্‌আলম্ (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ) জয়নারায়ণকে 'মহারাজা বাহাদুর' ও 'সাড়ে তিন হাজারী মন্‌সবদার' প্রভৃতি উপাধি দেন ১৭৮১ খ্রীঃ। ভূকৈলাসের গড়বন্দী রাজপ্রাসাদ ও দুটি সরোবর—শিবগঙ্গা ও সত্যগঙ্গা তাঁর প্রতিষ্ঠিত। মহারাজা জয়নারায়ণ তাঁর বিপুল ধনরাশি সদব্যবহার করেছিলেন ধর্মপ্রচার আর সমাজকল্যাণে।

বারাণসীতে ভূকৈলাস্ দেবস্থান, 'গুরুধাম' ও বাংলাদেশের বরিশালে ঝালকাটিতে দ্বিতীয় 'গুরুধাম' তাঁর প্রতিষ্ঠিত। বারাণসীতে বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, দর্শন ও সংস্কৃত-সাহিত্য প্রসারের জন্য 'টোল' ও বিদেশী ভাষা—ইংরাজী, আরবী ও ফার্সী শিক্ষার জন্য 'খ্রীষ্টান মিশনারী চার্চ সোসাইটি'কে যথেষ্ট অর্থ ও ভূসম্পত্তি দান করেন ২১ অক্টোবর, ১৮১৮ খ্রীঃ। অনেকের মতে তিনি রাজা রামমোহনের আদর্শে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। রাজা জয়নারায়ণের সাহিত্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর লেখনী-প্রসূত 'শঙ্করী সঙ্গীত', 'ব্রাহ্মণার্চ্চনা-চন্দ্রিকা','জয়নারায়ণ কল্পদ্রুম', 'করুণানিধান-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থগুলিতে। 'কাশীখণ্ডের' বাংলায় ছন্দানুবাদ, স্বরচিত 'কাশীপরিক্রমা', তাঁর বিশিষ্ট অবদানগুলির অন্যতম। কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ২৫ কার্ত্তিক, ১২২৮ সন (১৮২১ খ্রীঃ), ৬৯ বছর বয়সে।

রাজা কালীশংকর ঘোষাল বাহাদুর

মহারাজ জয়নারায়ণের একমাত্র পুত্র রাজা কালীশংকর সিন্ধু যুদ্ধে (১৮৩৮-৩৯ খ্রীঃ) ইংরাজ সরকারকে আর্থিক সাহায্য ও সরকারী সেবামূলক কাজে বহু অর্থ দান করেছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও নিষ্ঠাবান ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। সমাজসেবায় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁর অনুদানের পরিমাণ ছিল যথেষ্ট। ধর্মীয় গ্রন্থ-প্রকাশনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান—'ব্যবহার মুকুর' 'যোগাবশিষ্ট রামায়ণ' 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত' পুরানের মূল ও বিশুদ্ধ বাংলা অনুবাদ—চিরস্মরণীয়। রাজা কালীশংকরের বদান্যতা ও রাজভক্তির স্বীকৃতি হিসাবে ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড এলেনবরোর সুপারিশে সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন ১৮৪৩ খ্রীঃ। রাজা রামমোহনের সঙ্গে রাজা কালীশংকরের হৃদ্যতা ছিল। রাজা কালীশংকরের সাত পুত্র—কাশীকান্ত, সত্যপ্রসাদ, সত্যকিংকর, সত্যচরণ, সত্যশরণ, সত্যপ্রসন্ন ও সত্যভক্ত। রাজা কালীশংকরের চতুর্থ পুত্র **রাজা সত্যচরণ** বিদ্যোৎসাহী মানুষ। শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে তিনি দান করেন কাশীর জয়নারায়ণ কলেজ ও কলকাতার মেডিকেল কলেজের সম্প্রসারণের কাজে। 'বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের' সভ্য ছিলেন। মারা যান ১৮৫৬ খ্রীঃ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন সত্যচরণের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

মহারাজ কালীশংকরের পঞ্চম পুত্র **রাজা সত্যশরণ বাহাদুর** সি-এস-আই উপাধি পেয়েছিলেন। তিনিও 'বঙ্গীয় লেজিসলেটিভ কাউন্সিল','ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভ্য ছিলেন। সত্যশরণের তিন পুত্র—সত্যানন্দ, সত্যকৃষ্ণ ও সত্যাসত্য।

ঘোষাল পরিবারের সর্বশেষ 'রাজা বাহাদুর' হলেন **সত্যানন্দ ঘোষাল**। ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৯ খ্রীঃ ছোটলাট স্যার উইলিয়াম গ্রে তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন। রাজা সত্যানন্দ ঘোষালের ভাই সত্যকৃষ্ণ ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। কলকাতা কর্পোরেশনের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবীতে তিনি অবিচল ছিলেন। তিনি অল্প বয়সেই মারা যান।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঘোষাল পরিবারের কাছ থেকে অনেক আর্থিক সাহায্য পেয়েছিলেন। জমিদারী বিলুপ্তি হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁদের জমিদারী ত্রিপুরা, ভুলুয়া, ঢাকা, খুলনা, ২৪ পরগণা প্রভৃতি এলাকায় ছিল। দেয় রাজস্ব হল ১,৫০,০০০ টাকা। কুমার সত্যকৃষ্ণের পাঁচ পুত্র—সত্যভূষণ, সত্যেশ্বর, সত্যাঙ্গ, সত্যজিৎ ও সত্যকান্তি।

কুমার সত্যাসত্যের পাঁচ পুত্র —সত্যশংকর, সত্যবাদী, সত্যভানু, সত্যধ্যান ও সত্যহর্ষ। সত্যশংকরের পাঁচ পুত্র—সত্যকাম, সত্যগিরি, সত্যদ্বিজ, সত্যপ্রিয় ও সত্যরাম। রাজা সত্যশরণের অপর চার ভাইয়ের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। বর্তমান বংশধরেরা রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের ত্রয়োদশ অধস্তন-পুরুষ।

পতিতপাবনী দেবীর উদ্দেশ্যে সাধক কবি রামপ্রসাদের দুটি গান যা আজও এখানে গাওয়া হয়ে থাকে :—

১

"কাল হারালেম কালের বশে।
কি হবে মা অবশেষে॥
তখন কারে ডাকবো তারা,
শমন এসে ধরলে কেশে॥
পুরাণে শুনেছি আমি
পতিতপাবনী তুমি
এবার তোমার ভার তারা যেন বিপক্ষেতে নাহি হাসে॥
প্রসাদ গতি মতিহীন
কুমতি কুরীতি ক্ষীণ
কেবল মাত্র আছি কালা অভয় চরণ পাবার আশে॥"

২

"পতিতপাবনী পরা, পরামৃত ফলদায়িনী, 'স্বয়ভু শিরিসি সদা সুখদায়িনী॥
সুদীন চরণ ছায়া, বিতর শঙ্কর জায়া, কৃপাং কুরু স্বগুণে মা নিস্তারকারিণী॥
কৃত পাপ হীন পুণ্য বিষয়ী ভজনা শূন্য তারারূপে তারয় মাং নিখিল জননী॥
ত্রাণ হেতু ভবার্ণব চরণ তরণী তব প্রসাদে প্রসন্না ভব, ভবের গৃহিনী।"

মিত্র রাজপরিবার

শুঁড়া, কলকাতা

রাজা পিতাম্বর মিত্র বাহাদুর

কনৌজের কুলীন কায়স্থ বংশজাত কালিদাস মিত্র গৌড়েশ্বর রাজা আদিশূরের রাজত্বকালে (অনুঃ ১০৭২ খ্রীঃ) রাজধানী গৌড়ে আসেন। তাঁর চতুর্দশ উত্তর-পুরুষ সত্যভম মিত্র বড়িষা অঞ্চলে (দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা) বসতি করেন। মিত্র পরিবারের আর একটি শাখা হুগলী জেলায় কোন্নগরে চলে যায়। এই কোন্নগরের মিত্র বংশেরই সন্তান ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্র।[১] পরে বড়িষার মিত্র পরিবার গোবিন্দপুরে (প্রথমে মেছুয়াবাজারে ও পরে শুঁড়া অঞ্চলে) স্থায়ী বাসিন্দা হন। সত্যভম মিত্রের পৌত্র **রামরাম মিত্র** আলিবর্দী খানের (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) দেওয়ান ছিলেন। রামরামের পুত্র **অযোধ্যারাম** প্রথমে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্দৌলার উকিল হিসাবে দিল্লী দরবারে উপস্থিত ছিলেন আঠারো দশকের মধ্যভাগে এবং পরে খাস্ মোগল রাজকর্মচারীর পদে আসীন হন। পিতার ন্যায় সরকারী চাকুরী-রত হয়ে 'রায়' উপাধি পান। অযোধ্যারামের পৌত্র ও কৃপারামের পুত্র, মিত্র বংশ তিলক পিতাম্বর মিত্রের জন্ম হয় ৩ জুন, ১৭৪৪ খ্রীঃ। বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ পিতাম্বর রাজকার্যে বিশেষ গৌরবময় ভূমিকা পালন করেন। বারাণসীর রাজা চৈতসিংহের বিদ্রোহের সময় (১৭৭৯ খ্রীঃ) ওয়ারেন হেস্টিংস-এর নির্দেশে জেনারেল পামার রামনগর দুর্গ অবরোধ করেন। সেখানে রাজা পিতাম্বর মিত্র উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ) তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব ও 'তিন হাজারী মনসবদার' পদ প্রদান করেন। এ ছাড়া তাঁকে কুর্‌রা জেলার (দোয়াব) জায়গীর দান করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই জায়গীর ১৭৮২ খ্রীঃ প্রথম মারাঠা যুদ্ধের ফলে পিতাম্বর মিত্রের হস্তচ্যুত হয়। ১৭৮৭ খ্রীঃ রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণের সময় ঐ জায়গীরের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে নয় লক্ষ টাকা পান।[২] কর্ম-জীবনান্তে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনি তাঁর রাজ-বেশ ছেড়ে

১। 'রাজা দিগম্বর মিত্র' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। এই নয় লক্ষ টাকায় তিনি যথেষ্ট ধনবান হয়ে বিশাল ভূ-সম্পত্তির মালিক হন।

দিয়ে পার্থিব সংসার ত্যাগ করে একজন সাধারণ বৈষ্ণব ভক্ত হিসাবে ঠাকুর [১] সেবায় জীবনের শেষ দিনগুলি কাটিয়ে দেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৭ আগস্ট, ১৮০৯ খ্রীঃ।

রাজা পিতাম্বর মিত্রের একমাত্র পুত্র **বৃন্দাবনচন্দ্রের** জন্ম হয় ১৭৬৯ খ্রীঃ। উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রচুর ধনসম্পত্তি পাওয়া সত্ত্বেও বৃন্দাবন মিত্রের অমিতব্যয়ীতার জন্য শীঘ্রই তাঁকে সরকারী চাকরীতে যোগ দিতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ইংরাজ সরকার তাঁকে কটকের কলেক্টর—দেওয়ান পদে বসান, কিন্তু তিনি ছয় মাসের মধ্যে চাকরীতে ইস্তফা দেন। তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও সাহিত্য-প্রেমী মানুষ। বহু সংস্কৃত কাব্য ও ফার্সী সাহিত্য (গজল) বাংলায় অনুবাদ করান। আঠারোটি বাংলা তর্জমা তাঁর আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র রাজা রামমোহনের সমসাময়িক। দেশের সমাজ সংস্কারের কাজে পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সহযোগ ছিল। তাঁর মৃত্যু হয় ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৩২ খ্রীঃ।

বৃন্দাবন মিত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র **জন্মেজয় মিত্রের** (৩.৯.১৭৯৬—২৫.৪.১৮৬৯ খ্রীঃ) ছয় পুত্র—গোপাললাল, ব্রজেন্দ্রলাল, রাজেন্দ্রলাল (রাজা), উপেন্দ্রলাল, দেবেন্দ্রলাল ও ভবেন্দ্রলাল।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র

জন্মেজয় মিত্রের তৃতীয় পুত্র রাজেন্দ্রলালের জন্ম হয় ১৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮২২ খ্রীঃ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিদ্যাভ্যাস শুরু হয় পাথুরিয়াঘাটায় 'কৃষ্ণচন্দ্র বোস স্কুলে'। পরে 'গোবিন্দচন্দ্র বসাক হিন্দু অবৈতনিক স্কুলেও' কিছুদিন পড়াশোনা করেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু উৎসাহের অভাবে চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে নিজের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস চর্চা ও গবেষণায় একান্তভাবে মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র গ্রন্থাগারিক ও সহকারী সম্পাদকের পদে যোগ দেন। [২] এখানেই তাঁর কর্মজীবনের ও

১। শুঁড়াতে (বেলেঘাটায়, ১৪৩ নং রাজেন্দ্রলাল রোড) রাজা পিতাম্বর মিত্রের বাসভবন ও ঠাকুরবাড়ী। বংশের কুলদেবতা (পিতাম্বর প্রতিষ্ঠিত) বলদেব জীউ ও গোপাল জীউ ও রেবতীরানী—দারু মূর্তি। ঠাকুরবাড়ীর সংলগ্ন এলাকায় রাসযাত্রা উপলক্ষে প্রায় ২০০ বছরের পুজা এবং বিরাট মেলা (সাতদিন) এখনও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

২। 'সোসাইটির' মাধ্যমে প্রায় পঞ্চাশটি বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক পুস্তক-পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর জীবনের পঁয়তাল্লিশ বছর 'সোসাইটির' সেবায় নিয়োজিত ছিল। এ ছাড়া ১৮৫০ খ্রীঃ 'সমাজ' ও 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১ খ্রীঃ) মাসিক পত্রিকা দুটির তিনিই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা।

প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এই মহান প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিদেশী মনীষীদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করেন। তিনি বহু প্রবন্ধ, গবেষণা পত্র, অনুবাদ এবং পনেরোটিরও বেশী গ্রন্থের রচয়িতা। রাজেন্দ্রলাল 'এশিয়াটিক সোসাইটির' প্রথম ভারতীয় সভাপতি (১৮৫৫ খ্রীঃ), মিউজিয়ামের প্রথম ক্যাটালগ সংকলক, ভারতে ফোটোগ্রাফির কুলগুরু। বাংলা অক্ষরে প্রথম মানচিত্র রচয়িতা। ১৮৫৬ খ্রীঃ থেকে প্রায় ৩৫ বছর মানিকতলায় কলকাতার অভিজাত সম্প্রদায়ের বিখ্যাত 'ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন'-এর অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। সেই সময় বেশ কিছুকাল যাবৎ এই অঞ্চলে ঘুগীপাড়ায় রাজেন্দ্র মিত্র ষ্ট্রীটের বাড়ীতে থেকেছেন। তিনি ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক। বহু বিদেশী মনীষী ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, তাঁর পাণ্ডিত্যের সম্মান ও স্বীকৃতি দিয়েছেন। তৎকালীন সুপ্রতিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী 'ল্যাণ্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েশনের' মাধ্যমে জনসাধারণকে বিধি-সম্মত উপায়ে নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও ন্যায্য অধিকার দাবী করার ও স্বাধীন মত প্রকাশের পথ তিনিই দেখিয়ে ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রাজেন্দ্রলালকে সম্মান সূচক এল. এল. ডি. ডিগ্রী দেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ইংরাজ সরকার তাঁর অসামান্য জ্ঞান-প্রীতি-চর্চা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ 'রায় বাহাদুর', ১৮৭৮ খ্রীঃ 'সি. আই. ই.' ও ১৮৮৮ খ্রীঃ 'রাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর দেহাবসান ঘটে ২৬ জুলাই, ১৮৯১ খ্রীঃ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করে তাঁর 'জীবন স্মৃতিতে' লিখেছেন—'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন, তিনি একাই একটি সভা। এই উপলক্ষ্যে তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি ধন্য হইয়াছিলাম।……তখনকার দিনে কৃষ্ণদাস পাল ছিলেন কৌশলী, আর রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান।……বাংলাদেশের এই একজন অসামান্য মনস্বী পুরুষ মৃত্যুর পর দেশের লোকের নিকট হইতে কোনো সম্মান লাভ করেন নাই।[১]

রাজা রাজেন্দ্রলালের দু'টি বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী সৌদামিনীর অকাল মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়া স্ত্রী ভুবনমোহিনীর গর্ভে দুই পুত্র—রমেন্দ্রলাল ও মহেন্দ্রলাল (অপুত্রক)। রমেন্দ্রলালের তিন পুত্র—অজিতেন্দ্রলাল (স্বল্পায়ু), রোহিনীন্দ্রলাল ও মেদিনীন্দ্রলাল। রোহিনীন্দ্রলালের ছয় পুত্র—রথীন্দ্র, দিলীপ, গৃহপতি, মাধব, কেশব ও শশাঙ্ক। মেদিনীন্দ্রলালের চার পুত্র—রণজোড়লাল, স্বরূপ দাস, কৃষ্ণদাস ও গোবিন্দদাস। বর্তমানে রাজা রাজেন্দ্রলালের পৌত্ররা প্রত্যেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১। একশ বছর পরে গত ২৬শে জুলাই, ১৯৯১ খ্রীঃ, 'এশিয়াটিক সোসাইটিতে' রাজা রাজেন্দ্রলালের 'শততম মৃত্যুবার্ষিকী'তে তাঁর অসামান্য কীর্তি ও মনীষার স্মৃতিচারণ করা হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায়

খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে বাংলাকে কুসংস্কারের বেড়াজাল থেকে যে মনোমুক্তি ও সমাজ-চেতনার (নবজাগৃতির) আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, রাজা রামমোহন ছিলেন তার প্রাণ-পুরুষ। এক্ষেত্রে রামমোহন ইউরোপীয় 'রেনেসাঁস্' যুগের ইতালির মহাপুরুষ পেত্রার্ক, বোক্‌কাচো প্রমুখ 'হিউম্যানিস্ট' বা মানব-ধর্মীদের সমতুল্য। এই মানব-ধর্মী বাঙালী মনীষী রামমোহন হিন্দুধর্মকে কুসংস্কার মুক্ত করে হিন্দু-মুসলমান ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতে এক জীবনাদর্শের সূচনা করেন। তাই তিনি একজন যুগ-প্রবর্ত্তক।

সম্ভবতঃ ২২ মে, ১৭৭২ খ্রীঃ [১] হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের কাছে রাধানগর গ্রামে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বন্দোপাধ্যায় পরিবারে রামমোহনের জন্ম হয়। পিতৃ-পুরুষের আদি নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায় শাকসা গ্রামে। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার নবাব-নাজিমের সেরেস্তায় চাকরী করে যথেষ্ট বিষয়-সম্পত্তি ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। রামমোহনের অতিবৃদ্ধ প্র-পিতামহ পরশুরামই প্রথম নিজামতের অধীনে কাজ শুরু করেন। রামমোহনের প্র-পিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র নবাবী পদবী 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের তিন পুত্রের মধ্যে ব্রজবিনোদ (রামমোহনের পিতামহ) নবাব আলিবর্দী খানের সরকারে চাকরী করেন। ব্রজবিনোদের সাত পুত্র। পঞ্চম পুত্র **রামকান্তের** (রামমোহনের পিতা) তিন বিবাহ—জ্যেষ্ঠা পত্নী সুভদ্রা ছিলেন নিঃসন্তান, কনিষ্ঠা পত্নীর একমাত্র পুত্র রামলোচন, দ্বিতীয়া স্ত্রী তারিণীদেবীর এক কন্যা এবং দুই পুত্র—জগমোহন এবং রামমোহন। তারিণীদেবীর পিতা শ্যাম ভট্টাচার্য্য শ্রীরামপুরের চাতরা পল্লীর বাসিন্দা। রামমোহনের পিতা রামকান্ত নবাব সিরাজ-উদ্-দ্দৌল্লা সরকারের কর্মচারী ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর চলে আসেন রাধানগরে।

রামমোহনের শিক্ষা শুরু হয় তাঁর গ্রামে। ফার্সী, বাংলা ও সাংস্কৃত শিক্ষা কলকাতায় প্রাথমিক পর্যায়ে আরম্ভ হয়। আরবী ভাষা ও মুসলিম শাস্ত্র অধ্যায়ন করেন পাটনায় আর সংস্কৃত বারাণসীতে। গৃহ-বিবাদের ফলে রামমোহন ষোল বছর বয়সে (১৭৮৯ খ্রীঃ) পিতার আশ্রয় ত্যাগ করে প্রায় তিন-চার বছর পরিব্রাজক হিসাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান। তিনি নাকি সেই সময় তিব্বতেও পাড়ি দিয়েছিলেন। যাই হোক পিতার আহ্বানে ঘরে ফিরে আসেন। পিতা রামকান্তের মৃত্যু হয় ১৮০৩ খ্রীঃ।

১। ভিন্ন মতে ১০ মে, ১৭৭৩ বা ১৭৭৪।

বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও ইস্‌লাম ধর্মের কোরাণ, হাদিস্ প্রভৃতি গ্রন্থ পড়ার পর তাঁর হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতায় শ্রদ্ধা চলে যায়। একেশ্বর-বাদে বিশ্বাসী হন। বেদান্ত, উপনিষদ, ব্রহ্ম সূত্র, গীতা, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় গ্রন্থে যথেষ্ট বুৎপত্তি ছিল। তিনি গ্রীক, হিব্রু, সিরিয় ধর্মগ্রন্থের সারমর্ম উপলব্ধি করতে ত্রুটি করেননি।

রামকান্ত রাধানগরের কাছে লাঙ্গুলপাড়ায় ১৭৯২ খ্রীঃ তাঁর নব বাসভবন তৈরী করেন। ১৭৯৬ খ্রীঃ পৈতৃক দানপত্রে রামমোহনের অপর দুই ভাই গ্রামের সব সম্পত্তি আর রামমোহন কলকাতায় জোড়াসাঁকোর একটি বসত-বাড়ীর অধিকারী হন ১৮১৪ খ্রীঃ। কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে শুরু করেন তেজারতি ও কোম্পানী-কাগজের লেন-দেন। ১৮০৩-১৫ খ্রীঃ প্রায় বারো বছর তিনি চাকরীজীবী ছিলেন। শুরু হয় বারাণসীতে ও রামনগরে সেরেস্তার কাজে। রংপুর, যশোর, ভাগলপুর প্রভৃতি জায়গায় দেওয়ানেরও কাজ করেছিলেন। তিনি জন্ ডিগ্‌বী সাহেবের মুন্সীর পদেও নিযুক্ত ছিলেন ১৮০৩ খ্রীঃ। তাঁর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় ভূসম্পত্তি বৃদ্ধি পায়। বর্ধমান জেলায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর ছাড়া আরও তিনটি তালুক তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ীর নিজ-অংশ দান করেন ভাগ্নে গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে। ১৮১৭ খ্রীঃ রঘুনাথপুরে তাঁর নতুন বাড়ীতে সপরিবারে বাস করতে থাকেন। তা ছাড়া কলকাতার মানিকতলায় মেওেস্ সাহেবের পাঁচশ বিঘে বাগান-সহ একটি বাংলো বাড়ীও কিনেছিলেন। যদিও পরে এই বাড়ীটির (১১৩ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড) মালিক হয়েছিলেন এক আর্মেনিয়ান সাহেব। কিন্তু ইংরাজ সরকার বাড়ীটি অধিগ্রহণ করে পুলিশ অফিস করেন। অনেকেই মনে করেন যে, এই বাড়ীতে ইংরাজ মহিলা শ্রীমতী ফ্যানি পার্কস্ (১৮২২-২৮ খ্রীঃ) নেমতন্ন খেতে এসে একটি বিবরণ লিখেছিলেন—"বাড়ীটি ইউরোপীয় রুচীসম্মত মূল্যবান আসবাবপত্রে সাজানো হলেও গৃহস্বামী বাঙালীবাবু।"

রামমোহন পিতার নির্দেশে মাত্র নয় বছর বয়সের মধ্যে তিনটি বিবাহ করেন ১৭৮২ খ্রীঃ। প্রথমা স্ত্রী স্বল্পায়ু ও তৃতীয়া স্ত্রী উমাদেবী ছিলেন অপুত্রক। দ্বিতীয়া স্ত্রীর দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ। নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে লেখা 'হিন্দু নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার' গ্রন্থে হিন্দু বহু-বিবাহ প্রথার তীব্র নিন্দা করেছেন। কলকাতায় স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে তিনি কেবল অর্থ উপার্জনের চিন্তা করেননি—অদম্য উৎসাহ ও আন্তরিক সৎ উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়ে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসতে থাকেন। ফোর্ট উইলিয়াম্ কলেজে কাজী, মৌলবী, সংস্কৃত পণ্ডিত ও পাশ্চাত্য দেশের মনীষীদের সঙ্গে জ্ঞান আহরণের সুযোগ তিনি সদ্ব্যবহার করেছিলেন।

তাঁর বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় হিতৈষীদের মধ্যে জন্ ডিগ্‌বী, ডেভিড্ হেয়ার, স্যার হাইড ইস্ট (প্রধান বিচারপতি), বিশপ হেবার, মিঃ এডাম, আলেকজাণ্ডার ডাফ্, মণ্টেগুমেরী, মার্টিন প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতীয়দের মধ্যে মুষ্টিমেয় শুভানুধ্যায়ীরা ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ রায়, ব্রজমোহন মজুমদার, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ্, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, মহারাজা রমানাথ ঠাকুর প্রমুখ।

চাকরীরত অবস্থায় রামমোহন সাহিত্য রচনা এবং তীব্র বিরোধিতা সত্বেও[১] একাধিক সমাজ-সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম বই আরবী-ফার্সী ভাষায় 'তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুত্তহাহিদিন' প্রকাশিত হয় ১৮০৩-১৮০৪ খ্রীঃ। প্রকাশনাটিতে আলেচনার বিষয়-বস্তু হল—সব শাস্ত্রে পুরোহিত-তন্ত্র, অন্ধ-বিশ্বাস, কুসংস্কার-মুক্ত-ঈশ্বরে-বিশ্বাস এবং ন্যায় ও মানবপ্রীতির উপর প্রতিষ্ঠীত সর্বজনীন ধর্মস্থাপনের পরিকল্পনা। এরপর প্রকাশিত হয়—তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীতে 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫ খ্রীঃ), 'বেদান্ত-সার'ও পরের পর পাচটি উপনিষদের ব্যাখ্যা (১৮১৫-১৯ খ্রীঃ)। এই সঙ্গে ভগবদ্গীতার বাংলা অনুবাদও তিনি লিখেছিলেন। অবাঙালী পাঠকদের জন্য হিন্দীতে 'বেদান্ত-সার' আর ইংরাজীতে অন্যান্য বইগুলির অনুবাদও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এই ধর্মীয় বইগুলির ব্যাখ্যায়ে সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য শংকরের দর্শনের বিশেষ মিল দেখা যায়। খৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ পঠনে তাঁর মনে হয়েছিল যে, যীশুখৃষ্টের অমূল্য উপদেশগুলি জনসাধারণের মুক্তির নির্দেশ-নামা। উপদেশগুলির ভূমিকাসহ সংকলন **'The Pecepts of Jesus'** প্রকাশ করায় তাঁকে কঠোরপন্থী মৌলবী, পণ্ডিত, এমনকি পাদ্রীদেরও তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রতিবাদের জবাবে ১৮২০, ১৮২১, ১৮২৩ খ্রীঃ তিনটি আবেদন পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তাঁর চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সী কলেজ) ও ১৮২৪ খ্রীঃ সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সমাজ-সেবক হিসাবে তাঁর অবদান **সতীদাহ প্রথা** বন্ধের জন্য নিরলস চেষ্টা। পুস্তিকা ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে, সভা-সমিতির ভাষণে, এমনকি, শ্মশানে-শ্মশানে ঘুরে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচার অভিযান অব্যাহত ছিল। লর্ড বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেছিলেন ৪ ডিসেম্বর, ১৮২৯ খ্রীঃ। নারী স্বাধীনতা ও সম্পত্তির অধিকার, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় থেকে জুরী নির্বাচন, হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ

১। 'সবাই মেলের কুল বেটার বাড়ী খানাকুল,
বেটা সর্ব্বনাশের মূল ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে কুল
ও শালা জেতের দফা করলে রফা মজালে মোদের তিনকুল'।

প্রভৃতি সংস্কারমূলক কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ১৮১৫ খ্রীঃ স্থাপিত 'আত্মীয়-সভা'ই পরে (১৮২৮ খ্রীঃ) 'ব্রাহ্ম-সমাজের' সূচনা করে। তাঁর সক্রিয় উদ্যোগে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট' (সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হয় ১৫ মে, ১৮১৫ খ্রীঃ। আরও দুটি সাপ্তাহিক 'সংবাদ-কৌমুদি' (১৮২১ খ্রীঃ) ও ফার্সী 'মিরাৎ-উল্-আখ্বার' (১৮২২ খ্রীঃ) ও 'বেঙ্গল হেরাল্ড' পত্রিকাগুলির তিনিই ছিলেন মালিক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবীতে তীব্র আন্দোলনের ফলে ১৮৩৫ খ্রীঃ ভারতের সংবাদ পত্রিকাগুলির স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার বহাল থাকে।[১] যদিও তিনি ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা নেননি, কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে ও সমাজ-জীবনে আমূল পরিবর্তনে প্রত্যেকটি পদক্ষেপে, তাঁর আন্তরিক দেশপ্রেম সহজেই অনুমেয়। রামমোহন ১৫ নভেম্বর, ১৮৩০ খ্রীঃ যাত্রা করে ৮ এপ্রিল, ১৮৩১ খ্রীঃ ইংলণ্ডে পৌঁছোন। ১৮ এপ্রিল, ১৮৩১ খ্রীঃ ইংরাজ সরকারের বৃত্তি-ভোগী মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আকবর শাহ্ রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দেন। ইংলণ্ডে তিন বছর অবস্থানের সময় তিনি সম্রাট আকবর শাহের বৃত্তি বৃদ্ধির জন্য দরবার করেছিলেন। 'বৃটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটিতে' ভারতের তদানীন্তন রাজস্ব ও বিচার-বিভাগীয় শাসন-সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তাঁর বক্তব্য রাখেন। ১৮৩২ খ্রীঃ ফরাসী সম্রাট লুই ফিলিপ কর্তৃক সম্মানিত হন। এইসব কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন করেছেন। 'ইউনিটেরিয়ানগণ' তাঁকে এত শ্রদ্ধার সঙ্গে অভ্যর্থনা করেছিলেন যে—তাঁরা তাঁকে সক্রেটিস, প্লেটো, মিলটন্ বা নিউটনের মত মাননীয় ব্যক্তিদের সমআসনে বসিয়েছেন। ইংলণ্ডে ব্রিষ্টল শহরে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩ খ্রীঃ এই মহামানবের দেহাবসান হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রামমোহনের সমাধি মন্দির রয়েছে আর্নোস-ভেল্ শহরে। ভারতে, বিশেষ করে কলকাতায় তাঁর স্মৃতি রক্ষায় চিরস্থায়ী কর্ম-পরিকল্পনার অনেক কাজ বাকী আছে—কেবল রাস্তার নাম 'রামমোহন সরণী' ও একটি পুস্তকাগার 'রামমোহন লাইব্রেরী' বা 'রামমোহন রায় ফাউণ্ডেশন' এবং মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাঁর অমূল্য অবদানের ঋণভারের বোঝা হ্রাস করা যাবে না।

রাজা রামমোহনের দুই পুত্র—রাধাপ্রসাদ ও রামপ্রসাদ। রাধাপ্রসাদের একটি কন্যা। রামপ্রসাদ সদর দেওয়ানী আদালতের উকিল, পরে কলকাতা হাইকোর্টে প্রথম বাঙালী জজ হন। ৮৫, আমহার্ষ্ট স্ট্রীটের বাড়ীটি তৈরী করেন। অপরিণত বয়সে মারা যান। তাঁর দুই পুত্র হরিমোহন ও প্যারীমোহন (অপুত্রক)। রাধাপ্রসাদের দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর পুত্র মোহিনীমোহন। হরিমোহনের দত্তক পুত্র ধরণীমোহন।

১। 'শ্রীশিবপ্রসাদ শর্মা' ছদ্মনামে, রামমোহন দুটি পুস্তিকা 'ব্রাহ্মন সেবাধি' ও 'পাদরী শিষ্য সংবাদ' ১৪ আগস্ট, ১৮২১ খ্রীঃ প্রকাশ করেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মল্লিক বাহাদুর

চোরবাগান

কলকাতার চোরবাগানের মল্লিক বংশের আদি পুরুষ মথু শীল ও তাঁর বংশধরদের বসতি ছিল হুগলী জেলায় বাণিজ্য প্রধান স্থান—সপ্তগ্রাম, হুগলী [১] ও চুঁচুড়ায়। খ্রীষ্টীয় আঠার শতকের প্রথম ভাগে মল্লিক বংশের শাখা প্রশাখা কলকাতাতেও বিস্তার লাভ করেছিল। সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় ভুক্ত 'শীল' পদবি ছিল মল্লিক বংশের আদি পুরুষদের। [২]

রাজা রাজেন্দ্রলালের ঊর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ যাদব শীলই মুসলমান সুলতানদের দেয় 'মল্লিক' [৩] উপাধি পান। যাদব শীলের পৌত্র **জয়রাম মল্লিক** মারাঠা বর্গীদের তাড়নায় চুঁচুড়া থেকে গোবিন্দপুর অঞ্চলে চলে আসেন আনুঃ ১৭৪২-৪৩ খ্রীঃ। পরে ইংরাজ কোম্পানী গোবিন্দপুরে ফোর্ট উইলিয়াম্ সংলগ্ন জমি দখল করায় যাদব মল্লিকের প্রপৌত্র **গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক** ও তাঁর ভাইয়েরা পাথুরিয়াঘাটার বাড়ীতে বাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি ঐ অঞ্চলের বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি। ব্যাঙ্কের সঙ্গে আদান-প্রদানে কর্মরত বড় মহাজন। তিনি প্রতিবাসীদের জন্য কবিরাজী দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ছিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তরের সময় (১৭৭০ খ্রীঃ) তিনি অন্নসত্র খুলে দেন। মারা যান ৭ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৮ খ্রীঃ।

গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিকের একমাত্র পুত্র **নীলমণি মল্লিকের** জন্ম হয় ১০ সেপ্টেম্বর, ১৭৭৫ খ্রীঃ। তাঁর দরিদ্র-সেবা, বদান্যতা ও স্বধর্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। চোরবাগানে জগন্নাথদেবের ঠাকুরবাড়ী, দাঁতনে জগন্নাথদেবের নাট-মন্দির ও গঙ্গা তীরে নীলমণি মল্লিক ঘাট তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। মারা যান ২ সেপ্টেম্বর, ১৮২১ খ্রীঃ ৪৬ বছর বয়সে। [৪]

১। পর্তুগীজ বণিক পেড্রোট্যাভারেস্ হুগলী নগরে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপন করেন ১৫৭৯ খ্রীঃ সম্রাট আকবরের এক ফার্মানে।

২। আনন্দভট্ট লিখিত 'বল্লাল চরিত'—

স্বর্ণবাণিজ্য কারিত্বাদত্র স্থিতিবিশাং ময়া।
সুবর্ণবনিগিত্যাখ্যা দত্বা সম্মানবদ্ধয়ে॥

অতএব অনেকে মনে করেন যে, মহারাজা আদিশূর (১০৭২ খ্রীঃ) সুবর্ণ গ্রামের একজন বৈশ্য সনক আঢ্যকে 'সুবর্ণবণিক' আখ্যা দেন। প্রদত্ত তাম্রফলকে উপরোক্ত লিপি খোদিত আছে।

৩। 'মল্লিক'—পারস্য ভাষায় ভূস্বামী বা মহাবংশজাত।

৪। নীলমণি মল্লিক স্ট্রীট তাঁর স্মরণিক।

নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র (রাজা) রাজেন্দ্র মল্লিকের জন্ম হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন, ২৪ জুন, ১৮১৯ খ্রীঃ। নাবালক পুত্রের বয়স তখন তিন বছর—পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮২৩ খ্রীঃ নীলমণি মল্লিকের ভাই বৈষ্ণবদাস মল্লিক তাঁর বিধবা ভ্রাতৃজায়ার (হিরন্ময়ীদাসী) বিরুদ্ধে সম্পত্তি বাটোয়ারার মামলা করেন। অগত্যা নাবালক পুত্র রাজেন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর মা (হিরন্ময়ী) চলে গেলেন চোরবাগানের ঠাকুরবাড়ীতে। 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্'-এ সম্পত্তি ন্যস্ত থাকায় যাবতীয় দান-ধ্যানে ও নিজেদের সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব পালন করা কষ্ট-সাধ্য হয়েছিল। নাবালক রাজেন্দ্রের অভিভাবক ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার স্যার জেমস্ ওয়্যার হগ্।[১] পরে তিনি লর্ড হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চেয়্যারম্যান হয়েছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু স্কুলে ভর্তি করেন। জেমস্ সাহেবের উদ্যোগেই চোরবাগানে 'মার্বেল প্যালেস'-এ দেখার মত চিড়িয়াখানা কলকাতায় প্রথম তৈরী হয়েছিল। তখন আলীপুরের চিড়িয়াখানার জন্ম হয়নি। পরে জেমস্ সাহেব ও রাজেন্দ্র মল্লিকের চেষ্টায় আলীপুর চিড়িয়াখানার প্রারম্ভিক কাজ শুরু হয় ('Mullick House')।

কলকাতার প্রধান দ্রষ্টব্য প্রাসাদগুলির মধ্যে ভরিক্-করিন্থিয়ান্ আদলে তৈরী 'মার্বেল প্যালেস' পর্যটকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণ। রাজেন্দ্র যখন নাবালক তখন (১৮৩৫ খ্রীঃ) থেকেই শুরু হয়েছিল মার্বেল প্যালেসের নক্সা ও প্রয়োজনীয় নির্মাণ প্রস্তুতির কাজ। প্রাসাদ তৈরী হতে প্রায় পাঁচ বছর সময় লেগেছিল। এই শ্বেতপাথরের প্রাসাদটির সৌন্দর্য ও পরিবেশ সম্বন্ধে ডঃ আই. এইচ. নোলান বলেছেন,[২] 'বাবু রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ীতে আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। অন্যান্য লোকের চেয়ে এর প্রকাণ্ড বিষয় ও বিপুল বৈভব বিশেষ উল্লেখযোগ্য……মল্লিকবাবু বিলাতী ভদ্রলোকের মত থাকেন এবং বিদেশ থেকে আনা অনেক শোভন-দ্রব্য দিয়ে ঘরগুলি সাজানো আছে……তাঁহার উদ্যান নানা পশুপক্ষীতে পূর্ণ। অষ্ট্রিচ হইতে এমু পর্যন্ত, চীন দেশের মাণ্ডেরিণ হংস হইতে বার্ড অফ প্যারাডাইস,……কয় সপ্তাহ পূর্বে তিনি বড় সুন্দর নাচ দিয়াছিলেন, বিস্তূর্ণ প্রাসাদের কেন্দ্রস্থল চন্দ্রাতাপ মণ্ডিত হইয়াছিল, মধ্যস্থলে বহুমূল্য ফোয়ারার চতুপার্শ্বে লণ্ঠন ও বর্তিকা আলোক বিকীর্ণ করিয়া নাট্য সভার শোভাবর্ধন করিয়াছিল। এই নাচ ভারতের বৈশিষ্ট্য।'

রাজেন্দ্রলালের মহানুভবতা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবার বিশেষ উল্লেখ রয়েছে

১। জেমস্ সাহেবের পুত্র স্টুয়ার্ট হগ্-এর নামে 'Hog Market' (নিউ মার্কেট)।
২। 'Illustrated History of the British Empire and the East'.

২৩ জানুয়ারী, ১৮৬৭ খ্রীঃ 'কলকাতা গেজেট'—'১৮৬৫-৬৬ খ্রীঃ উড়িষ্যা ও বাংলায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়, রাজেন্দ্র চিৎপুরে বিরাট অন্নসত্র খুলে দিয়ে প্রতিদিন পাঁচ হাজারেরও বেশী বুভুক্ষু মানুষের খাবার ব্যবস্থা করে দেন। তিনি ছিলেন ধার্মিক, গরীবদের বন্ধু ও অজাতশত্রু'। বহু সরকারী রিপোর্টে ও 'ডেসপ্যাচ্'-এ তাঁর দানের খতিয়ান[১] পাওয়া যায়। ১৮৬৬ খ্রীঃ 'দুর্ভিক্ষ প্রশমন সমিতিকে' ত্রিভঙ্গীর বাগান বাড়ীর একটি অংশ দান করেছিলেন বাপ-মা হারা শিশুদের আশ্রয়ের জন্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত সর্বতোভাবে তাঁর সাহায্য পেয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের তিনি সমর্থক ছিলেন।

১ জানুয়ারী, ১৮৬৭ খ্রীঃ রাজেন্দ্রলালই প্রথম 'রায় বাহাদুর' উপাধি পান। বড়লাট লর্ড লিটন তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন ১ জানুয়ারী, ১৮৭৮ খ্রীঃ। রাজেন্দ্রলাল 'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'জুলজিক্যাল সোসাইটি' ভারতীয় চিত্রশালা প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৪ এপ্রিল, ১৮৮৭ খ্রীঃ আটষট্টি বছর বয়সে মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে 'এশিয়াটিক সোসাইটির' শোক সভায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন—"A more accomplished and finished gentleman you could not find in Calcutta."

মার্বেল প্যালেসের বিরাট হল-ঘরের মধ্যে রাখা দুষ্প্রাপ্য বৈদেশিক চিত্র-সম্ভার এবং ধাতু ও পাথরের তৈরী মনোরম ব্যতিক্রমী মূর্তি বিদেশীদের চোখেও অসামান্য, লর্ড হার্ডিঞ্জের (১৮৪৫ খ্রীঃ) মতে 'বিস্ময়কর'। বিস্তীর্ণ এলাকার উপর বিরাট প্রাসাদ-সংলগ্ন মনোরঞ্জক বাগান। সাজানো আছে বহু পাথরের মূর্তি—মাইকেল এঞ্জেলো, ভেনাস্, গাভী ও আরো অনেকের। 'পরমপুরুষ যীশু, মিশরের বলিয়েন, 'ক্রুশ হইতে অবতরণ' 'শেষ আহার' প্রভৃতি অসংখ্য তৈলচিত্রের সম্ভার এই প্রাসাদেই দেখা যাবে। বর্তমানে এই বিশাল বিরাট প্রাসাদটিকে দেখতে অসংখ্য পর্যটকদের আসা-যাওয়া রয়েছে। প্রতিদিন অন্নসত্রের[২] খেয়ে বেঁচে থাকা বহু মানুষের জয়ধ্বনি আজও শোনা যায়।

রাজা রাজেন্দ্রের ছয় পুত্র—দেবেন্দ্র, মহেন্দ্র, গিরীন্দ্র, সুরেন্দ্র, যোগীন্দ্র ও মনীন্দ্র। তাঁর জীবদ্দশায় চার পুত্র মারা যান। জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রর জন্ম হয় ১৫ আগস্ট,

১। The Munificence of Raja Rajendra Mullick.

২। ১৩২১ সনে (১৯১৪ খ্রীঃ) বারো মাসে অন্নসত্রে মোট লোক খেয়েছিল ৩,৫৩,০৭৪ জন। মল্লিক রাজবাড়ীর ধর্মসমন্বয়ের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অবদান—নিজেদের ঠাকুরবাড়ীর মাত্র একশ গজ দূরে তাঁদেরই তৈরী মসজিদের ব্যয় ভার বহন করেন স্থানীয় মুসলমানদের জন্য।

১৮৩৫ খ্রীঃ। কলা বিদ্যায় বিশেষ অনুরাগ। নিজে ছবি এঁকেছেন 'কুইন ভিক্টোরিয়া' 'এক যুথ-অশ্ব' এখনও 'মার্বেল প্যালেসে' দেখা যাবে। তিনি কলকাতার প্রায় সব সাংস্কৃতিক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ইংরাজ সরকার ১৮ জুলাই, ১৮৬১ খ্রীঃ দেবেন্দ্রকে 'কুমার' ব্যক্তিগতভাবে উপাধি দেন। তিনি মারা যান ১৮৯৪ খ্রীঃ। রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার মনীন্দ্র মল্লিকের জন্ম হয় ১৮৪৮ খ্রীঃ। মারা যান ৭ জুন, ১৯০৪।

কুমার দেবেন্দ্রের পুত্র নগেন্দ্র মল্লিকের জন্ম হয় ১ ডিসেম্বর, ১৮৫৩। মারা যান ২৭ জানুয়ারী, ১৯১৯ খ্রীঃ। পূর্বপুরুষদের তৈরী প্রাসাদ ও প্রাসাদের আসবাবপত্র সুসজ্জিত করে রেখেছিলেন।[১] ২৬ মার্চ, ১৯১০ খ্রীঃ লর্ড মিণ্টো 'মার্বেল প্যালেস' পরিদর্শন করে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন।

নগেন্দ্র মল্লিকের দত্তক পুত্র জিতেন্দ্র ৪ জুলাই ১৮৯৪ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। মারা যান ১৯৬২ খ্রীঃ। রাজা রাজেন্দ্রের তৃতীয় পুত্র গিরীন্দ্র মল্লিকের পুত্র ব্রজেন্দ্র এবং তাঁর পুত্র দীনেন্দ্র। রাজা রাজেন্দ্রলালের চতুর্থ পুত্র সুরেন্দ্রের পুত্র জ্ঞানেন্দ্র ও তস্যপুত্র গোপেন্দ্র। জিতেন্দ্রের প্রপৌত্র অতীন্দ্র, দীনেন্দ্রের প্রপৌত্র ব্রতীন্দ্র ও গোপেন্দ্রের প্রপৌত্র সৌরেন্দ্র বর্তমানে মল্লিক বংশের উত্তরাধিকারী।[২]

১। যেহেতু 'মার্বেল প্যালেসের' অপূর্ব সংগ্রহশালা সর্বসাধারণের দেখার জন্য উন্মুক্ত, তাই দর্শনীয় সামগ্রীর (তৈলচিত্র, ধাতু ও মর্মর মূর্তি) অতি সংক্ষিপ্ত (মোট সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী) একটি তালিকা দেওয়া হল :

আর্ট গ্যালারিতে মর্মর ও ধাতু মূর্তি—Venus at Bath, A pair of Cupids, Painter, Minerva, Sophocles, Demosthenes, Athena. Bust of Apallo, Busts of Napoleon, Venus de Medici, Duke of Wellington, Dancing Faun, Michael Angelo.

তৈলচিত্র সংগ্রহ—Battle of Amazons—Rubens (Belgium) ; Cleopatra—Massci (French) ; St. Cecilia—Raphel (Italy) ; Hercules & the serpents—Sir Joshua Reynold (England).

২। বর্তমান Board of trustees-এর অন্যতম ডাইরেক্টর দীপেন্দ্র ও হীরেন্দ্র 'মার্বেল প্যালেসের' ঐতিহ্য বজায় রাখার প্রেরণায় 'প্যালেসের' ইতিহাস রচনায় সাহায্য করেছেন।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর রাজপরিবার

হিন্দুদের লোকপ্রিয় ও পরম-আরাধ্যা দুই দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতীর এক-কাঠামোয় আবির্ভাব দেখা যায় সপরিবারে মহিষমর্দিনী দুর্গা প্রতিমায়। কিন্তু দেবীদ্বয়ের শুভ-সম্মিলিত অধিষ্ঠান যদি কোন রাজপরিবারে হয়ে থাকে, তবে তা কলকাতার ঠাকুর পরিবারে। বিদ্যা ও বিত্তের এক অপূর্ব সমন্বয়।

অধিকাংশ গবেষকদের মতে প্রায় ১০৭২ খ্রীঃ বঙ্গাধিপতি আদিশূরের আমন্ত্রণে কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে বাংলায় আনা হয়েছিল, ভট্টনারায়ণ ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ঠাকুর বংশের প্রথম পুরুষ এই ভট্টনারায়ণ। তাঁর সংস্কৃত নাট্য রচনা 'বেণীসংহার' আজও সমাদৃত। ভট্টনারায়ণের যথাক্রমে পঞ্চবিংশতি ও ষষ্ঠবিংশতি অধস্তন, শুকদেব ঠাকুর ও পঞ্চানন ঠাকুর তাঁদের আদি নিবাস যশোহরের চেঙ্গাটিয়ার অন্তর্গত করপাড়া গ্রাম থেকে চলে আসেন গোবিন্দপুরে। সরকারী চাকুরীতে কর্মরত থাকায় 'ঠাকুর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। অনেকে মনে করেন যে, গোবিন্দপুরে ইংরাজ বণিকদের দুর্গ (ফোর্ট উইলিয়াম্) এলাকার বিস্তৃতির জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের (ঠাকুর পরিবারসহ) বাস্তুভিটা ছেড়ে যেতে হয়েছিল আনুঃ ১৭৫৮ খ্রীঃ।

পঞ্চাননের পুত্র 'সেটেলমেণ্ট্ অফিসার' **জয়রাম** পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, কয়লাঘাটা ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ। জয়রামের চার পুত্র—আনন্দীরাম, নীলমণি, দর্পনারায়ণ ও গোবিন্দরাম। নীলমণির পুত্র **রামলোচন** (মৃত্যু ১৮০৭ খ্রীঃ) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের প্রাণপুরুষ। ভ্রাতুস্পুত্র দ্বারকানাথ তাঁর দত্তক পুত্র। জয়রাম ১৭৬২ খ্রীঃ মারা যাবার পূর্বেই মহারাজা রমানাথ ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটায় তাঁর বাসগৃহ ও গঙ্গায় স্নানের ঘাট তৈরী করেন।

মহারাজা রমানাথ ঠাকুর

রামলোচনের ভাই রামমণির দুই পুত্র **দ্বারকানাথ** (রামলোচনের দত্তকপুত্র) ও **রমানাথ** (মহারাজা)। নীলমণির বংশধরেরা রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস ও কাব্যের অনুশীলন করে সারা বিশ্বে খ্যাতিমান হয়েছেন। রমানাথের (মহারাজা) জন্ম হয় ১৮০০ খ্রীঃ। সেরবোর্ন সাহেবের গ্রামার স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে হিন্দু কলেজে পাঠরত ছিলেন। ইংরাজী, বাংলা, আরবী ও ফার্সী ভাষায় তার দখল ছিল। ব্যবসায়ী জীবনে প্রথমে শিক্ষানবীস ছিলেন নামী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান 'আলেকজাণ্ডার কোম্পানীতে'। পরে 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের' দেওয়ান হন।

'হরকরা', 'ইংলিশ-ম্যান' ও আরও কয়েকটি পত্রিকায় তাঁর বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। রাজনীতি-শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫১ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য। ভারতীয় আইন সভার সভ্য মনোনীত হয়েছিলেন ১৮৭৫ খ্রীঃ। ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিটন্ রমানাথকে 'সি. এস. আই' সনদ দেন ১৮৭৫ খ্রীঃ। মহারাজা উপাধিতে ভূষিত হন ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ। মারা যান ৭৭ বয়সে ১০ জুন, ১৮৭৭ খ্রীঃ। রাজকীয় মর্যাদা ও সম্মান তিনি বেশীদিন ভোগ করতে না পারলেও তৎকালীন বঙ্গ-সমাজে তিনি সবশ্রেণীর মানুষের কাছে বিশেষ পরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তি। মহারাজা রমানাথের এক পুত্র ও দুই কন্যা। পুত্র নৃপেন্দ্রনাথ অকালে মারা যান তিন পুত্র ও এক কন্যা রেখে।

রামলোচনের দত্তক পুত্র (প্রিন্স[১] দ্বারকানাথের জন্ম হয় ১৭৯৪ খ্রীঃ। বিশাল জমিদারীর উত্তরাধিকারী হলেন ১৭৯৯ খ্রীঃ। সেরবোর্ন সাহেবের গ্রামার স্কুলে শিক্ষারম্ভ। ইংরাজী ও পারস্য ভাষা ছাড়া আইনে তাঁর যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। বিত্তবান জমিদার দ্বারকানাথ একজন দক্ষ ব্যবসায়ী হিসাবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক', 'কার ঠাকুর কোম্পানী', শিলাইদহে নীলের কারখানা তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। সমাজ-কল্যাণের কাজে, সতীদাহ প্রথা নিবারণ আন্দোলনে, রাজা রামমোহনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন। হিন্দু কলেজ ও মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা-কল্পে তাঁর অবদান ছিল। ১৮৪২ খ্রীঃ ইংলণ্ডে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, ভাটিকানে মহামান্য পোপ ও ফ্রান্সের রাজা লুই ফিলিপের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ লণ্ডনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন-এর সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতের আভ্যন্তরীন কয়েকটি ব্যাপারে তাঁকে শলা-পরামর্শ দিয়েছিলেন। ১ আগষ্ট, ১৮৪৬ খ্রীঃ লণ্ডনে মারা যান মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে।

দ্বারকানাথের তিন পুত্র—দেবেন্দ্রনাথ (মহর্ষি), গিরীন্দ্রনাথ ও নৃপেন্দ্রনাথ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) সাত পুত্র—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরীন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ ও সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ভারতের গৌরব কবি সম্রাট, ডাক্তার (স্যার) **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**, কে. টি.[২] ডি. লিট। জন্ম হয় ৭ মে, ১৮৬১ খ্রীঃ। জীবনের অবসান ঘটে ৭ আগষ্ট, ১৯৪১ খ্রীঃ। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ২৯ অক্টোবর, ১৮৮৮ খ্রীঃ। মারা যান ৩ জুন, ১৯৬১ খ্রীঃ, দেরাদুনে। তিনি ছিলেন অপুত্রক। কবিগুরুর তিন কন্যা মাধুরীদেবী, রেণুকাদেবী, মীরাদেবী; তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু হয়।

১। 'প্রিন্স' কোন খেতাব নয়, তবে তাঁর প্রতিপত্তি ও বিশেষ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ইংরাজ রাজকর্মচারীরা তাঁকে 'প্রিন্স' আখ্যা দিয়েছিলেন।

২। ১৯১৯ খ্রীঃ পাঞ্জাবে বৃটিশ রাজশক্তি কর্তৃক জালিয়ানওয়ালাবাগের কুখ্যাত গণহত্যার প্রতিবাদে কে. টি. (স্যার) খেতাব বর্জন করেন।

পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর রাজপরিবার

কলকাতা

জয়রাম ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুরের (১৭৩১-৯৩ খ্রীঃ) জমিদারী ছিল রংপুর ও নাটোরের কয়েকটি পরগণায়। চন্দননগরে ফরাসী বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর দুই বিবাহ। প্রথমা পত্নীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে **গোপীমোহন** (১৭৬১—১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮১৮ খ্রীঃ) অন্যতম। গোপীমোহনের ছয় পুত্র। পঞ্চম পুত্র **হরকুমার ঠাকুর** (১৭৯৮-১৮৬৪ খ্রীঃ) ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু জমিদার। দয়া, দাক্ষিণ্য ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী। মূলাজোড়ে বিখ্যাত কালীবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম। তাঁর দুই কৃতী সন্তান—যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন।

মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

যতীন্দ্রমোহনের জন্ম হয় ১৬ মে, ১৮৩১ খ্রীঃ। গৃহশিক্ষকের কাছে পড়াশোনা করে ভর্তি হন হিন্দু স্কুলে। প্রায় নয় বছর ঐ স্কুলে পড়েছিলেন। ক্যাপ্টেন ডি. এল্. রিচার্ডস্-এর কাছে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষালাভ করেন। ১৮৪০ খ্রীঃ কৃষ্ণমোহন মল্লিকের কন্যাকে (ত্রৈলোক্যকালী) বিবাহ করেন। সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় সুপণ্ডিত যতীন্দ্রমোহন 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের রচয়িতা। তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় বাংলার নাটক ও রঙ্গালয় যথেষ্ট উন্নতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমা সম্ভব' কাব্য রচনা ও প্রকাশনা সম্ভব হয়েছিল তাঁর আর্থিক সাহায্যে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু সংস্থার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বিরাট জমিদারীর[১] মালিক হওয়ায় জনকল্যাণের কাজে মুক্ত হস্তে দান করেছিলেন। গরীব ছাত্রদের অর্থ সাহায্য, বিশেষ করে ১৮৬৬ খ্রীঃ উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরে দুর্ভিক্ষে ত্রাণকার্যে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম, মেয়ো হসপিটাল, 'এশিয়াটিক সোসাইটি' ও বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য ছিলেন (১৮৭০ খ্রীঃ)। রাজ-প্রতিনিধি বড়লাট আর্ল অফ্ মেয়ো, যতীন্দ্রমোহনকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন

১। বাংলার ইতিহাসের পাতায় উনিশ শতকে যে সব বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থানের উল্লেখ আছে, তার মধ্যে ৩০ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ কলকাতায় টালার মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধিতার ঘটনা অন্যতম। হিন্দু জমিদার মহারাজা যতীন্দ্রমোহনই ছিলেন আক্রমণের লক্ষ্য। সেনাদের গুলিতে এগার জনের মৃত্যু হয় ও আহতের সংখ্যা ছিল কিছু বেশী।

১৭ মার্চ, ১৮৭১ খ্রীঃ। 'সি. আই. ই.' ও 'কে. টি.' সম্মানসূচক পদবী দু'টি তাঁকে দেওয়া হয়েছিল ১৮৮২ খ্রীঃ। পরে ছোটলাট স্যার অ্যাশলেন ইডেন রাজা যতীন্দ্রমোহনকে 'মহারাজা বাহাদুর' সনন্দ প্রদান করেন ১ জানুয়ারী, ১৮৯০ খ্রীঃ। বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় বংশগত 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে। অপুত্রক যতীন্দ্রমোহন ভ্রাতুষ্পুত্র **প্রদ্যোৎকুমারকে** (সৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র) দত্তক নেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আমলে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন পাথুরিয়াঘাটায় টেগোর ক্যাসল স্ট্রীটের বাড়ীতে [১] (টেগোর ক্যাসল) দুর্গা পূজা আরম্ভ করেন ১৮৮৪ খ্রীঃ। পূজাটি মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর ও তাঁর পুত্র মহারাজা প্রবীরেন্দ্রকুমারের সময়েও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন পূজাটি আর হয় না। তাঁর অনন্যসাধারণ কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১০ জানুয়ারী, ১৯০৮ খ্রীঃ। কলকাতার কাছে ব্যারাকপুর রোডের ওপর মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের মনোরম উদ্যান বাটিতে, 'ত্রৈমারেল্ড বাওয়ার'—'মরকত কুঞ্জ', বিশেষ মাননীয় অতিথিদের যাতায়াত ছিল। জানুয়ারী, ১৮৭৬ খ্রীঃ হিন্দু কলেজের পুর্নমিলন উৎসব উপলক্ষে এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও সাহিত্য-সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। উত্তর কলকাতায় যতীন্দ্রমোহন এ্যাভিনিউ তাঁর স্মরণিক।

রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের ভাই সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (রাজা) জন্ম হয় সেপ্টেম্বর, ১৮৪০ খ্রীঃ। নয় বছর বয়সে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি হন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্কুল ছাড়তে হয়। ইংরাজ গৃহ-শিক্ষকের কাছে জার্মান ভাষা ও ইংরাজী বাদ্যযন্ত্র (পিয়ানো) শিখেছিলেন। পণ্ডিত লছমিপ্রসাদ ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন।

রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের সাহিত্যানুরাগের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের বাংলা অনুবাদ। সঙ্গীত-কলায় তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও উৎসাহের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিশ্বের প্রায় সব দেশ থেকে সঙ্গীত-সাহিত্যের নানাবিধ গ্রন্থ ও বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র সংগ্রহ করে, এক অভিনবগ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা তৈরী করেছিলেন। গবেষণার মাধ্যমে বহু সঙ্গীত পুস্তিকা (মণিমালা) প্রকাশ

১। ১৮৮২ খ্রীঃ কে. সি. এস. আই. উপাধি পাওয়ার পর যতীন্দ্রমোহন তাঁর পৈতৃক বাসভবনের অংশ (ভিন্নমতে খুল্লতাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বৈঠকখানা বা কাছারি বাড়ী) ভেঙে 'টেগোর ক্যাসল' তৈরী করেন অতিথি বিদেশী রাজপুরুষ ও এদেশীয় রাজরাজড়াদের জন্য।

করেছেন। বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গীত পুস্তকের বাংলা অনুবাদ এবং ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস ইংরাজীতে অনুবাদ করে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্য রক্ষা ও প্রসারের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁর কর্মযজ্ঞ এবং প্রতিভার স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বিশ্বের বহু দেশের রাষ্ট্র-প্রধানদের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র ও মানপত্র ইত্যাদির মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, জার্মানী, ইটালি, পারস্য, ভ্যাটিকান্, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশের নাম উল্লেখযোগ্য। বেলজিয়াম ও স্যাক্সোনির রাজদরবার সৌরীন্দ্রমোহনকে সম্মান-সূচক 'নাইট' উপাধি দিয়েছিলেন। ১৮৭১ খ্রীঃ ভারতের প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও বাদ্যযন্ত্রবিদদের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় চিৎপুরে একটি উচ্চমানের সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অফ্ মিউজিক' ডিগ্রী প্রদান করেন। আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েরও তিনি 'ডক্টর অফ মিউজিক' হয়েছিলেন। পারস্যের শাহ-এর কাছ থেকে তিনি 'নবাব' উপাধি পেয়েছিলেন। ইংরাজ সরকার সঙ্গীতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ সি. আই. ই. উপাধি দেন ১ জানুয়ারী, ১৮৮০ খ্রীঃ। 'রাজা' উপাধি পান ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খ্রীঃ। তিনি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। 'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম', 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির সক্রিয় সভ্য। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ৫ জুন, ১৯১৪ খ্রীঃ।

তাঁর তিনটি স্ত্রী—সুখদাসুন্দরী, সত্যকুমারী ও চণ্ডীরাণী। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে কুমার প্রমোদকুমার ও শিবকুমার সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। তৃতীয় পুত্র কুমার শ্যামকুমার পারস্যের ভাইস কনসাল পদে নিযুক্ত হওয়ায় 'নবাব' উপাধি পেয়েছিলেন। সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের দ্বিতীয় পুত্র **প্রদ্যোৎকুমার** তাঁর জ্যেষ্ঠতাত মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের দত্তক পুত্র। রাজা সৌরীন্দ্রমোহনের পৌত্র —যবনীমোহন, কৌশীকীমোহন, ক্ষেমেন্দ্রমোহন, প্রবীরেন্দ্রমোহন ও শক্তিন্দ্রমোহন। সৌরীন্দ্রমোহনের প্রপৌত্র জয়ন্তকুমার, সুরজিৎকুমার ও শ্রীজিৎকুমার। উল্লেখ্য যে, সৌরীন্দ্রমোহনের পৌত্র প্রবীরেন্দ্রমোহন, মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের দত্তক পুত্র।

মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর বাহাদুর

মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দত্তক পুত্র প্রদ্যোৎকুমারের জন্ম হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খ্রীঃ। গৃহশিক্ষক ব্যারিষ্টার ডব্লিউ. এফ. পিকক্ সাহেবের (প্রধান বিচারপতি পিককের পৌত্র) তত্ত্বাবধানে পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করেন। হিন্দু কলেজেও

অধ্যয়ন করেছিলেন। বিবাহ হয় পূর্ণবালা দেবীর সঙ্গে। তাঁর রাজভক্তি ও বংশ-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখায় ইংরাজ সরকার তাঁকে বংশগত 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি দেন।

লণ্ডনে জানুয়ারী, ১৯০২ খ্রীঃ সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক-দরবারে তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। 'কে. টি.' উপাধি পান ১৯০৮ খ্রীঃ। তিনি কলকাতায় জাদুঘর, আলিপুর চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, 'সাহিত্যকলা আকাদেমী', 'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের অন্যতম। জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর মাননীয় নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম।

বিলাসবহুল জীবন যাপনের মধ্যেও তিনি ছিলেন চিত্রকলার বোদ্ধা ও দরদী মানুষ। তিনি ছিলেন একজন স্বীকৃত জহুরী। হীরা মণি-রত্নাদির (জওহরাত) বিখ্যাত ইংরাজ-ব্যবসায়ী হ্যামিলটন্ কোম্পানীর উপদেষ্টা। তৎকালীন ভারতীয় রাজারা (নেটিভ্ এস্টেট) ও ধনী ব্যবসায়ীরা মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারের কাছে আসতেন—এইসব বহু মূল্যবান প্রস্তর-সমূহের উৎকর্ষ-নির্ণয়ে তাঁর বিচার ও উপদেশের জন্য। কলকাতার উত্তরে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডে প্রায় বিশ একর জমির ওপর ফলে-ফুলে সাজানো বাগান বাড়ী, 'এমারেল্ড বাওয়ার' তৎকালীন আকর্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলির অন্যতম। এই মনোরম কুঞ্জের মাঝখানে সুসজ্জিত বাগান বাড়ীটির হলঘরে সংরক্ষিত ছিল বিভিন্ন দেশের চিত্রকরদের বিরল তৈলচিত্র সংগ্রহ ও কিছু প্রাচীন ঐতিহ্যময় আসবাবপত্র। বর্তমানে এই এলাকায় গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার।

মহারাজা প্রদ্যোৎকুমারের মৃত্যু হয় ২৭ অগাস্ট, ১৯৪২ খ্রীঃ ৬৯ বছর বয়সে।

মহারাজা প্রবীরেন্দ্রকুমার ঠাকুর বাহাদুর

মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুরের দত্তক পুত্র প্রবীরেন্দ্রকুমারের জন্ম হয় ৪ এপ্রিল, ১৯০৯ খ্রীঃ। গৃহশিক্ষকের কাছে বিদ্যাভ্যাস শুরু হয়। হিন্দু স্কুলে পড়াশোনা করেন। সাহিত্য, শারীরবিদ্যা, ইতিহাস ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি 'জাস্টিস অফ্ পীস' হয়েছিলেন। তিনি আমেরিকা, ইউরোপ মহাদেশ; জাপান ইত্যাদি একাধিকবার ভ্রমণ করেছেন। বিবাহ হয় সুরীতি দেবীর সঙ্গে ২৯ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রীঃ। মৃত্যু হয় ৩০ এপ্রিল, ১৯৭৩ খ্রীঃ ৬৪ বছর বয়সে। মহারাজা প্রবীরেন্দ্রকুমার ঠাকুর বংশেরই সন্তান শ্রীজিৎকুমারকে দত্তক নেন ১৯৬৫ খ্রীঃ। শ্রীজিৎকুমার এইচ. এম. ভি. কোম্পানীতে কর্মরত। বর্তমানে মহারানী সুরীতি দেবী, তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ ও নাতনীকে নিয়ে 'টেগোর ক্যাসলেই' বসবাস করছেন।

নবাব সৈয়দ আমীর আলি খান বাহাদুর

মেহদীবাগান, কলকাতা

পারস্যবাসী কাজী সৈয়দ নোহা বংশজাত সপ্তম অধস্তন-পুরুষ মহম্মদ রফী দিল্লী থেকে বিহারে পাটনা জেলায় বাড়গ্রামে বসতি করেন। তিনি বাংলার নবাব আলিবর্দী খানের আমলে (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) পাটনায় নায়েব-নাজিম দপ্তরে কাজ করতেন। তাঁর দক্ষতায় খুশি হয়ে নবাব দিল্লীর দরবার থেকে মহম্মদ রফীকে 'শাইকুল মশাইখ' উপাধি পাইয়ে দেন। তাঁর পুত্র ওয়ারিস্ আলি।

ওয়ারিস্ আলির পুত্র ভাবী নবাব আমীর আলির জন্ম হয় পাটনায় ১ মার্চ, ১৮১০ খ্রীঃ। প্রায় উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত পাটনায় আরবী, ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষার শিক্ষানবিস ছিলেন। ইংরাজী ভাষা তিনি নাকি মোটেই জানতেন না। সবসময় তাঁকে উর্দ্দুতেই বাক্যালাপ করতে হত।[১] ১৮৩২ খ্রীঃ পাটনার দেওয়ানী আদালতের সরকারী উকিল হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। ঠিক দু'বছর পরে (১৮৩৪ খ্রীঃ) অযোধ্যার নবাব নাজিরউদ্দিন হায়দারের দরবারে ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধির সহকারী-কর্মী হিসাবে যোগ দেন। প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ তাঁর বিশেষ ভূমিকা সম্মান ও সততার সঙ্গেই পালন করেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ কলকাতায় প্রেসিডেন্সী স্পেশাল কমিশনার কোর্ট-এ সহকারী অধ্যক্ষ এবং ১৮৫৪ খ্রীঃ সরকারী উকিলের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁকে পুরানো সদর দেওয়ানী আদালতেও ওকালতি করতে হয়েছিল।

উকিল হিসাবে আমীর আলি খানের খ্যাতি না থাকলেও, বংশগত ইংরাজ রাজ-ভক্তির অভাব ছিল না। ১৮৫৭ খ্রীঃ পাটনায় সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তিনি তাঁর নিজের চেষ্টায় ও প্রভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের পূর্ণ সমর্থন সরকারের অনুকূলে আদায় করেন। তাঁকে পাটনার কমিশনার মিঃ স্যামুয়েল-এর সহকারী ডেপুটি-ম্যাজিসট্রেট পদে বসান হয়েছিল। তাঁর মধ্যস্থতায় মুর্শিদাবাদের তদানীন্তন শেষ নায়েব-নাজিমের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের দেনাপাওনা সংক্রান্ত বিবাদ সুষ্ঠুভাবে নিষ্পত্তি হয়। কর্মদক্ষতা ও রাজ-ভক্তির স্বীকৃতিতে তাঁকে রাজ-প্রতিনিধি লর্ডনর্থব্রুক ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৫ খ্রীঃ 'নবাব' উপাধি দেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ লর্ড লিটন তাঁকে বিশেষ পদক এবং সি. আই. ই. খেতাব প্রদান করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য কল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ তুর্কীর সুলতান নবাব আমীর আলিকে বিশেষ সম্মানসূচক **'Companion of Turkish order of the Osmanich'** উপাধিতে ভূষিত করেন। নবাব আমীর আলির মৃত্যু হয় ১৬ নভেম্বর, ১৮৭৯ খ্রীঃ।

১। Twelve Men of Bengal in the 19th centy. F. R. Bradley Bert, I.C.S. 1910.

নবাব আবদুল লতিফ খান বাহাদুর

খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে বাংলা তথা ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের নবজাগরণের চেতনার আন্দোলনকারীদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ অন্যতম। যদিও কর্মজীবনের প্রথম ৩৫ বছর তাঁকে সরকারের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদেই থাকতে হয়েছিল, তা সত্ত্বেও জীবনের শেষ দশ বছর তিনি অসামান্য কৃতিত্বের সঙ্গে মাস এডুকেশন (গণশিক্ষা)—সংকীর্ণতা, মনোমুক্তির যে, একমাত্র পথ তা প্রমাণ করেছিলেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ও নাগরিক দায়িত্ববোধের যে ব্যাপক নির্লিপ্ততা দেখা দিয়েছিল, তা দূর করতে তিনি সফল হয়েছিলেন।

মক্কা নিবাসী শাহ্ আজিমুদ্দিন মোগল সম্রাটের ছত্রছায়ার দিল্লীতে বসতি করেন। তাঁর পুত্র রসুল দিল্লী থেকে চলে আসেন পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার রাজপুর গ্রামের বিচারকের (কাজী) পদে নিযুক্ত হয়ে। তাঁর চতুর্থ অধস্তন-পুরুষ কাজী ফকির মহম্মদ চলে আসেন কলকাতায় সদর দেওয়ানি আদালতে আইনজীবীর পেশায়। কিন্তু ফকির মহম্মদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইতিহাস-চর্চা ও জ্ঞান লাভের সুযোগ সন্ধানের। সেই সৎ কামনা পূর্ণ হয়েছিল ১৮৩৬ খ্রী: তাঁর লেখনী-প্রসূত ফার্সী ইতিহাস 'জামী-উল্-তাওয়ারিক' প্রকাশনায়।

ফকির মহম্মদের তিন পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র নবাব আবদুল লতিফের জন্ম হয় ১৮২৮ খ্রী: ফরিদপুরে। শিক্ষালাভ করেন কলকাতার মাদ্রাসায়। সেই সময় ফার্সী ও আরবী ভাষায় আইন-আদালত ও সরকারী অফিসে কাজ চালান হত,—কিন্তু হিন্দু ছাত্ররা ইংরাজী ভাষা শেখার সুবাদে বিশেষ সুবিধা ভোগের সুযোগ পেতেন। অতএব আবদুল লতিফ তাঁর সম্প্রদায়ের ছাত্রদেরও ইংরাজী শিক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করেন। মাদ্রাসাগুলিতে সরকারের সাহায্যে ইংরাজী পঠনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা হয়।

আবদুল লতিফ মাদ্রাসায় পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবন শুরু করেন—দমদমে সরকারী পেনশন-ভোগী সিন্ধুর আমির সাহেবের একান্ত সচিব হিসাবে। এক বছর পরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও পরে কলকাতায় শিক্ষকতা করেন। মাত্র ২১ বছর বয়সে ১৮৪৯ খ্রী: ২৪-পরগণায় আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন মাসিক ২০০ টাকা বেতনে। পরে কয়েকটি জায়গায় বদলি হন। অসামরিক ও সামরিক চাকরীর পরীক্ষা-পর্ষদের মনোনীত সভ্য। বাংলার অর্থ-পরিষদ ও আলিপুর পুলিশ কোর্টের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। সরকারী পদে থাকার সময় তিনি যখন যে ভাবে পেরেছেন তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতির জন্য সরকারী সাহায্য ও অনুদান আদায়

করে নিয়েছিলেন। বহু সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধের মাধ্যমে রক্ষণশীল মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতার মনোভাব দূর করতে পেরেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত (১৮৬০ খ্রীঃ) 'মুসলিম সাহিত্য সমিতিতে' বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগ দেন। কর্মরত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন (১৮৬০ খ্রীঃ) নীলকর চাষীদের সপক্ষে বক্তব্য রাখেন। ১৮৬২ খ্রীঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হন।

মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা সুবিধার জন্য প্রেসিডেন্সী কলেজের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন লর্ড নর্থ ব্রুক ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৩ খ্রীঃ। সেইদিন মৌলবী আবদুল লতিফ তাঁর ভাষনে হিন্দু ও খৃষ্টানদের মতো মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার দাবী রেখেছিলেন। তাছাড়া 'মহসিন ফাণ্ড' থেকে ছাত্রবৃত্তির আরও উদার প্রসারণ তাঁরই অবদান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেল' মনোনীত হন ১৮৬৭ খ্রীঃ।

১৮৮৪ খ্রীঃ ভুপাল নবাবের অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী পদে কাজ করে সরকারের ও ভুপাল-বাসীদের বিশেষ প্রশংসা কুড়িয়ে ছিলেন। তাঁর সরকারী কর্মময়-জীবনের সমাপ্তি ঘটে ১৮৮৭ খ্রীঃ। মাসিক ৬০০ টাকা পেনসন। একই সালে সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে (১৮৮৭ খ্রীঃ) 'নবাব বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। পূর্বেই তাকে 'খান বাহাদুর' সনন্দ দেওয়া হয়েছিল। সি-আই-ই সনন্দ পান ১৮৯০ খ্রীঃ। মৃত্যু হয় ১০ জুলাই, ১৮৯৩ খ্রীঃ। তাঁর প্রশংসায় বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল্ লিখেছেন **'The most progressive and enlightened amongst the Muhammadans of Bengal, a self-made man, was the life and centre of the Indian society in calcutta and was the friend equally to European, Muhammadan and Hindu'.**[১]

১। অপর পক্ষে সফিউদ্দিন আহম্মদ-এর 'Bengal Muslims'-এ লেখা হয়েছে—'Nabab Abdul Latif did not ostensibly belong to Mongol 'Ashraf', but was to all intent and purposes a part of it. He took measures to 'impart useful information only to higher and educated classes of the community'.

হিন্দু মুসলমান ঐক্যের জন্য তিনি সব সময়ে সচেষ্ট ছিলেন। ২ জুন, ১৮৮০ খ্রীঃ 'ইণ্ডিয়ান মিরর' লিখেছিল—'দেশের উন্নতি -বিধায়ক প্রতিটি আন্দোলনেই তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল।'

সফিউদ্দিন আহম্মদের 'Bengal Muslim' (1981)-এ লেখার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—Nawab Syed Amir Ali—a Mongol Ashraf, regarded himself as the custodian of Mongol culture and guarded it as their most precious possession' Mr. Leonard Gordon considers him as "an outsider at the top, with no roots in 'The soil'."

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা

কলকাতার পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীর গোপীমোহন ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সূর্য কুমার ঠাকুরের দুই কন্যা—ত্রিপুরা সুন্দরী ও শ্যামা সুন্দরী। দু'জনেরই বিবাহ হয় পরমানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। শ্যামা সুন্দরীর গর্ভে দক্ষিণারঞ্জনের জন্ম হয় ২ অক্টোবর, ১৮১৪ খ্রীঃ ঠাকুর বাড়ীতে। দক্ষিণারঞ্জনের পিতা পরমানন্দ মুখোপাধ্যায় (কলকাতায় জগন্মোহন নামে পরিচিত) ছিলেন সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষাবিদ্। হাতের লেখা ছিল অসাধারণ সুন্দর। তাঁর বংশধররা এখনও এই পাণ্ডুলিপিগুলি সযত্নে রক্ষা করে বংশের গৌরব অক্ষুন্ন রেখেছেন। দক্ষিণারঞ্জনের পিতামহ ভৈরবচন্দ্র ইংরাজ কোম্পানীর হিজলি ও কাঁথির নুনগোলায় (কুঠি) সদর-আমিনের কাজ করতেন। ফার্সী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট অধিকার থাকায় তিনি 'মৌলবী মুখুজ্যে' নামেও পরিচিত ছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জনের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ডেভিড হেয়ার সাহেবের স্কুলে।[১] পরে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক প্রখ্যাত সমাজ-সংস্কারক ও জাতীয়তাবাদী তুর্কী নেতা হেনরী লুই ভিভিয়ান্ ডিরোজিওর[২] কাছে অধ্যয়ন করার দুর্লভ সুযোগ তিনি ভাগ্যবলে পেয়েছিলেন। মহামতি ডেভিড হেয়ার ও ডঃ উইলসন্ তাঁর অপূর্ব মেধা, বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করেছেন। ডিরোজিওর প্রতিষ্ঠিত 'এ্যাকাডেমিক্ অ্যাসোসিয়েশনের' (১৮২৮ খ্রীঃ) ছাত্র-সভ্যরা পরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রগতিশীল দেশাত্মবোধক কাজে লিপ্ত হয়েছিলেন।

মাতৃ সম্পত্তির অধিকারী হয়ে দক্ষিণারঞ্জন প্রায় লক্ষাধিক টাকার মালিক হন। সংবাদ পত্রের মাধ্যমে দেশের কাজ করার তাগিদে তিনি নিজের খরচায় 'জ্ঞানান্বেষণ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটি প্রকাশ করে (১৮৩১ খ্রীঃ), ছাত্রদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। পরে ইংরাজী ভাষায় 'পত্রিকার' অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মে গোঁড়ামী ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দা করে প্রবন্ধ লিখেছেন। এমনকি, পিতার বিরাগভাজন হয়ে বাড়ী ছেড়ে কিছুদিন অন্যত্র বাস করতে দ্বিধাবোধ করেননি। শিক্ষাগুরু হেয়ার সাহেব (৬০০০০ টাকা) ও রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি সাধ্যমত অর্থ সাহায্য করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।

১। ৬ নভেম্বর, ১৮৫০ খ্রীঃ বেথুন সাহেবের বিদ্যালয়ে দক্ষিণারঞ্জনের আর্থিক সাহায্য ছিল।

২। 'ইয়ং বেঙ্গল' আন্দোলনের নেতৃত্বে ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য প্রণালীতে শিক্ষায় দেশে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছিলেন ডিরোজিও। কলকাতাবাসী ইউরেশিয়ান ডিরোজিওর জন্ম হয় ১৮০৮ খ্রীঃ। মাত্র তেইশ বছর বয়সে মারা যান ১৮৩১ খ্রীঃ।

ডিরোজিও-দীক্ষিত দক্ষিণারঞ্জন 'জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভার' অধিবেশনে (৮ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩ খ্রী:), তাঁর প্রথম বক্তৃতায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বক্তব্য রাখেন। পারিবারিক জীবনে তাঁকে কিছুটা অশান্তি ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁর দুটি বিবাহ—প্রথম বিবাহ হয় হরচন্দ্র ঠাকুরের কন্যা জ্ঞানদা সুন্দরীর সঙ্গে, তাঁদের একটি কন্যা মুক্তকেশী। মুক্তকেশীর বিবাহ হয় রঘুনন্দন ঠাকুরের সঙ্গে। তাঁদের পুত্র রমেন্দ্রমোহন, তাঁর একমাত্র কন্যা লীনাদেবীর বিবাহ হয় আর্যকুমারের সঙ্গে। দক্ষিণারঞ্জনের দ্বিতীয় বিবাহ হয় বর্ধমানের মহারাজা তেজচন্দ্র বাহাদুরের বিধবা স্ত্রী মহারানী বসন্তকুমারীর সঙ্গে। সমাজের বিরোধীতা উপেক্ষা করে তিনি ৫৬, সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে থাকতেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর একমাত্র পুত্র মনোহররঞ্জনের বিবাহ হয় রামকুমারী দেবীর সঙ্গে। এঁদের দুই কন্যা ও একমাত্র পুত্র ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের একটি কন্যার বিবাহ হয় কলকাতায় চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

কর্মজীবনে দক্ষিণারঞ্জন উকীল হিসাবে খ্যাতিলাভ না করায় কলকাতায় সরকারী পদে প্রথম ভারতীয় কলেক্টর হিসাবে যোগ দেন। পরে ১৮৫১ খ্রী: তিনি মুর্শিদাবাদের নবাব-নজিম ফরেদুন জার 'দেওয়ান-নিজামত' পদ গ্রহণ করেন। নবাব দক্ষিণারঞ্জনকে 'রাজা' ও 'মাদার উল্-মাহাম্' (প্রধান মন্ত্রী) উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৫৪ খ্রী: দেওয়ানী পদ ছেড়ে উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় তাঁর দেশসেবার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, 'জাতীয় সংহতি' ভারতের উন্নতির একমাত্র পথ। এই আদর্শ রূপায়িত করার কাজে তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল ছিলেন। অনুন্নত রাজপুত জাতের 'শিশুকন্যা হত্যা' প্রথা তাঁরই আন্তরিক চেষ্টায় রোধ হয় ১৮৬১ খ্রী:।

কলকাতার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর অনুরূপ অযোধ্যায় একটি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৪৩ খ্রী:। অযোধ্যার নবাবের 'কৈশর বাগ' প্রাসাদকে সোসাইটির কাজের জন্য লর্ড ক্যানিং দান করেন। অযোধ্যায় 'তালুকদার সভার' কর্মকর্তা দক্ষিণারঞ্জন তিনটি সংবাদপত্র—'লক্ষ্ণৌ টাইমস্', 'সমাচার হিন্দুস্থানী' ও 'ভারত পত্রিকা'-র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। ১৮৫৭ খ্রী: সিপাহী বিদ্রোহের সময় অযোধ্যায় ইংরাজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। লর্ড ক্যানিং এর সঙ্গে তাঁর বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ১৮৬২ খ্রী: ক্যানিং-এর মৃত্যুতে অযোধ্যায় এক বিশাল শোক সভার তিনি আয়োজন করেন। আমিনাবাদের নবাব প্রসাদে ক্যানিং কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১ মে, ১৮৬৪ খ্রী:। অভিজাত সন্তানদের শিক্ষার জন্য 'ওয়ার্ডস্ ইন্‌স্টিটিউশন' তাঁরই আগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় ও ইংরাজদের মধ্যে প্রীতি ও সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখার অক্লান্ত প্রয়াসের জন্য ১৮৭১ খ্রী: লর্ড মেয়ো দক্ষিণারঞ্জনকে 'রাজা' উপাধি দেন। শেষ জীবনে মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৪ বছর বয়সে মারা যান লক্ষ্ণৌ শহরে ১৫ জুলাই, ১৮৭৮ খ্রী:।

রাজা দিগম্বর মিত্র

ঝামাপুকুর, কলকাতা

হুগলী জেলার কোন্নগর 'মন্দিরবাটী' মিত্র (কায়স্থ) পরিবারের **রামচন্দ্র মিত্র** (দিগম্বর মিত্রের পিতামহ) কলকাতার টয়লার কোম্পানীর খাজাঞ্চী ছিলেন। রামচন্দ্রের পুত্র **শিবচন্দ্র মিত্রের** উপার্জনের চেয়ে ব্যয় তার ছিল বেশী। বাড়ীতে দোল, দুর্গোৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ভরণপোষণের ব্যয় ভারে তাঁকে পৈতৃক-সম্পত্তি বিক্রি করতে হয়েছিল। শিবচন্দ্র কলকাতায় রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রীট একটি বাড়ী কিনে সপরিবারে বাস করতে থাকেন। শেষ জীবনে অর্থাভাবে সংসারের দুর্বিসহ জীবনযাপন থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য বারাণসীতে চলে যান ও দেব সেবায় ব্রতী হন। শিবচন্দ্রের জন্ম হয় অনুঃ আঠারো শতকের আট দশকে। দেহত্যাগ করেন আনুঃ ১৮৪৪ খ্রীঃ।

শিবচন্দ্রের পুত্র দিগম্বর মিত্রের জন্ম হয় কোন্নগরে ১৮১৭ খ্রীঃ। প্রাথমিক শিক্ষা কোন্নগরেই শুরু হয়। পরে ইংরাজী শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে কলকাতায় ডেভিড হেয়ার স্কুলে অধ্যয়ন করেন ১৮২৭-৩০ খ্রীঃ। মনীষী রামতনু লাহিড়ী তাঁর সহপাঠী ছিলেন। স্কুলের পাঠান্তে তাঁরা উভয়েই হিন্দু কলেজে (১৮৩০-৩৪ খ্রীঃ) বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ-সংস্কারক ডিরোজিও সাহেবের (১৮০৯-৩১ খ্রীঃ) কাছে পড়াশোনা করেন। মাত্র পনের বছর বয়সে ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। মাত্র তিন-চার বছরের মধ্যে প্রথম স্ত্রী-বিয়োগ হওয়ায় কলকাতায় মদন মিত্র লেনে বলরাম সরকারের কন্যার সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন।

জীবিকা অর্জনের জন্য দিগম্বর মুর্শিদাবাদে 'নিজামত স্কুলে' শিক্ষকতা শুরু করেন ১৮৩৪ খ্রীঃ। প্রায় এক বছর পরে রাজসাহীর কলেক্টর অফিসে একশ টাকার মাসিক বেতনে 'হেড্ ক্লার্কের' পদে যোগ দেন। মনঃপূত না হওয়ায় সরকারের খাস-মহলে তহসিলদারের কাজে রত হন। পরে বহরমপুরে 'ইনফ্যান্টী' লাইনে কেরানীর কাজ করেছিলেন ১৮৩৮ খ্রীঃ। কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায়ের সাবালকত্ব পাওয়ার সময় তাঁর জমিদারীর সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য দিগম্বর ম্যানেজার হিসাবে নিযুক্ত হন ১৮৩৮ খ্রীঃ। রাজা কৃষ্ণনাথ তাঁর কর্মদক্ষতা ও সততার পুরস্কার-স্বরূপ দিগম্বরকে এক লক্ষ টাকা দেন। কাশিমবাজারে থাকাকালীন তিনি নীলের আবাদ, তুলার চাষ ও সিল্ক ব্যবসায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। ম্যানেজারের পদে ইস্তফা দিয়ে (১৮৪৪ খ্রীঃ) শুরু করেন নিজস্ব ব্যবসা। মালদহে নীল ও সিল্ক ব্যবসায়

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দাক্ষিণ্যে যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৪৭ খ্রীঃ কলকাতায় 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' ফেল হওয়ায় দিগম্বর অত্যন্ত কঠিন সমস্যায় পড়েন। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর মতিলাল শীলের সাহায্যে পুনরায় সিল্ক ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থের অধিকারী হন।

দিগম্বর ১৮৫১ খ্রীঃ তাঁর কর্ম-জীবন কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটের বসত-বাড়ী বিক্রি করে দিয়ে কলকাতার পূর্বপ্রান্তে উল্টোড্যাঙ্গাতে একটি বাগান-বাড়ী তৈরী করে বাস করতে থাকেন। উড়িষ্যা ও চব্বিশ-পরগণা জেলায় বিভিন্ন স্থানে দিগম্বর ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। উল্টোড্যাঙ্গার বাগান-বাড়ী বিক্রি করে ১৮৫৩ খ্রীঃ কলকাতার ঝামাপুকুর লেনে একটি বিরাট অট্টালিকা তৈরী করে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। গৃহ-দেবতারূপে শ্রীধরনাথজীর প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ভোলেননি। এই বাড়ীতে **শ্রীরামকৃষ্ণের** অগ্রজ শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায় শ্রীধরনাথের পূজারী ছিলেন। অগ্রজের অনুপস্থিতিতে গদাধর (শ্রীরামকৃষ্ণের ডাক নাম) এই বিগ্রহের পূজা করতেন ১৮৫২-৫৬ খ্রীঃ। শ্রীরামকৃষ্ণ-স্পর্শ-ধন্য এই বাড়ীটিতে রাস-উৎসব, দোলোউৎসব ও জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে পূজা, কীর্ত্তন, রাত্রিব্যাপি যাত্রা-থিয়েটার ও বিপ্লবী পুলিন দাসের ব্যায়াম সমিতির লাঠি, ছোরা খেলা প্রভৃতি বছরের পর বছর অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ্যানি বেসান্ত মাঝে মাঝে এখানে থাকতেন, 'থিওসফি্ক্যাল্ সোসাইটির' নিয়মিত অধিবেশন হত। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রী'ম' রাজা দিগম্বর মিত্রের প্রপৌত্র হিরণ্যকুমারের গৃহশিক্ষক ছিলেন। রাজা দিগম্বর মিত্রের পৌত্র নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত-রসিক ছিলেন। তাঁর সময়ে বিখ্যাত ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ এখানে বাস করতেন ও সেই যুগের খ্যাতিমান শিল্পীদের গানের আসর নিয়মিতভাবে এখানে বসত। বাড়ীটি 'শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ', ঝামাপুকুর-এর ব্যবস্থাপনায় শ্রীরামকৃষ্ণের পূজাপাঠের ব্যবস্থা ছাড়া সমাজ-সেবার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। গৃহ দেবতা শ্রীধরনাথজীর নিত্য পূজাও হয়ে থাকে।

দিগম্বর মিত্র তাঁর বহুমুখী কর্মজীবনে বহু সাংস্কৃতিক ও সমাজ-সেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ তিনি মিউনিসিপ্যাল কমিশন ও ১৮৬৪ খ্রীঃ ফিবার কমিশনের (ম্যালেরিয়া) সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য ১৮৬৪। ৩১ অক্টোবর, ১৮৫১ খ্রীঃ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' [১] প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যুগ্মভাবে। পরে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হন ১৮৭৩ খ্রীঃ। তিনি কলকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন ১৮৭৪-৭৫ খ্রীঃ। তিনিই প্রথম বাঙালী

১। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন'-এর সভাপতি—রাজা রাধাকান্ত দেব, সহ সভাপতি—রাজা কালীকৃষ্ণ দেব। অন্যান্য সদস্যের মধ্যে ছিলেন রাজা সত্যশরণ ঘোষাল, মহারাজা রমানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দেব, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে তাঁর রাজনৈতিক চেতনাবোধ জাগ্রত হয়।

(ভারতীয়) শেরিফ। ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস্-এর উপস্থিতিতে কলকাতায় রেসকোর্স ময়দানে দরবার-মণ্ডপে দিগম্বর মিত্র 'সি. এস. আই.' উপাধিতে ভূষিত হন। পরের বছর ১৪ আগষ্ট, ১৮৭৭ খ্রীঃ বাংলার ছোটো লাট স্যার এস্‌লে ইডেন দিগম্বর মিত্রের কার্য্যাবলীর প্রশংসা করে তাঁকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন।

ভারতীয় বিচারপতিদের অধিকার ও ইংরাজ বংশোদ্ভূত প্রজাগণের বিচারালয়ে অধিকার প্রভৃতি আইন প্রবর্ত্তনের বিরুদ্ধে ও মুদ্রাযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। সতীদাহ, শিশু হত্যা, গঙ্গাযাত্রা প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধে রাজা রামমোহন রায়ের সহায়তা করেছিলেন। নিজ গৃহে একশ ছাত্রের আহার, বাসস্থান ও স্কুল কলেজে শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সংবাদ পত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

রাজা দিগম্বর মিত্র তাঁর কর্মময় জীবনে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিলেন একমাত্র পুত্র গিরিশচন্দ্রের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুতে, মার্চ, ১৮৭০ খ্রীঃ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও কলকাতা হাইকোর্টের উকিল গিরিশচন্দ্র দুর্ঘটনার দিনে নিয়মিত প্রাতঃ অশ্বারোহনে বেড়াবার সময় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান, দুটি নাবালক পুত্র-মন্মথনাথ ও নরেন্দ্রনাথকে রেখে। পুত্রশোক ও অতিরিক্ত পরিশ্রম করার ফলে রাজা দিগম্বরের শরীর ভেঙে পড়ে এবং তেষট্টি বছর বয়সে ২০ এপ্রিল, ১৮৭৯ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়। দিগম্বর মিত্র উত্তরাধিকারী সূত্রে জমিদার হননি, স্বীয় পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও কর্মদক্ষতায় স্বউপার্জিত ধন-দৌলত ও বিশাল জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। রাজবাড়ীর দালানে রেলিংগুলির নক্সায় একটি সিংহ মূর্তির চারিদিকে ঘিরে লেখা আছে একটি ফরাসী বাক্য 'courage et esperance' অর্থাৎ বিপদে সাহস হারাইয়ো না—এটাই ছিল রাজা দিগম্বর মিত্রের জীবন-বাণী।

রাজা দিগম্বর মিত্রের নাবালক দুই পৌত্র **মন্মথনাথ** ও **নরেন্দ্রনাথ** ও এক পৌত্রী। জমিদারীর দেখাশোনার ভার পড়ে মহেন্দ্রনাথ বসুর উপর (এক্সিকিউটার)। সাবালক হয়ে মন্মথনাথ ও নরেন্দ্রনাথ নিজেদের মধ্যে আপোষে সম্পত্তি ভাগ করে নেন। মন্মথনাথ কলকাতায় ৩৪, শ্যামপুকুর রোডে একটি বাড়ী কিনে ১৯০২ খ্রীঃ সেখানে বাস করতে থাকেন। নরেন্দ্রনাথের পুত্র হিরণ্যকুমার ও পৌত্র প্রফুল্লকুমারকে নিয়ে রাজবাড়ীতে বসবাস করেন। রাজবাড়ীতে একমাত্র বংশধর প্রফুল্লকুমারের মৃত্যু হয় মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে। পিতা হিরণ্যকুমার ছিলেন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও কর্পোরেশনের কাউন্সিলর। ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য।

দিগম্বরের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রায় বাহাদুর মন্মথনাথের সাত পুত্র ও চার কন্যা। বংশধরদের মধ্যে দিলীপকুমার, তপনকুমার, জয়ন্তকুমার ও ডঃ মিহিরকুমার ও অন্যান্য কয়েকজন শ্যামপুকুর এলাকায় বসবাস করেন। বংশের দৌহিত্র নির্মলকুমার ঘোষ রাজবাড়ীর ও অন্যান্য সম্পত্তির দেখাশোনা করে থাকেন।

ঠনঠনিয়ার লাহা রাজপরিবার
কলকাতা

বাংলায় হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় তোলাফটক ও আশপাশের অঞ্চলের সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় সোনা ও মহাজনী ব্যবসার পথিকৃৎ। খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম ভাগে বর্ধমান জেলার বারমুল গ্রামের (শান্তিনিকেতনের কাছে) আদি নিবাসী সুবর্ণবণিক মধুমঙ্গল লাহার পুত্র **রাজীবলোচন লাহা** কলকাতায় আসেন। তার আগে তিনি পাটনায় নন্দরাম বৈষ্ণনাথের কুঠিতে কর্মরত ছিলেন পঁচিশ টাকার মাস-মাইনে। কলকাতায় ব্যবসা করতে থাকলেও চুঁচুড়ার বাসভবনে মারা যান ১৮৩০ খ্রীঃ। তাঁর তিন পুত্র—প্রাণকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ ও বটকৃষ্ণ। জ্যেষ্ঠ পুত্র **প্রাণকৃষ্ণ** তাঁর প্রথম জীবনে একাধিক সওদাগরি অফিসে শিক্ষানবিস বা কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি নাকি তেত্রিশ হাজার টাকা লটারিতে পেয়ে নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন। দানবীর মতিলাল শীলের সাহায্যেই তিনি ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ১৮৩৯ খ্রীঃ প্রাণকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠিত মেসার্স 'প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানীর' দৌলতে লাহা বংশের লক্ষ্মী-লাভ হয়। যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তির মালিক ও প্রতিষ্ঠিত বাঙালী ব্যবসায়ী প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৮৫৩ খ্রীঃ তেষট্টি বছর বয়সে।

প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র—দুর্গাচরণ, শ্যামাচরণ ও জয়গোবিন্দ। নবকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র ভগবতীচরণ ও বটকৃষ্ণের তিন পুত্র—অভয়চরণ, দেবীচরণ ও রামচরণ।

মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা

প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাচরণের (মহারাজা) চুঁচুড়ায় জন্ম হয় ২৩ নভেম্বর, ১৮২২ খ্রীঃ। লেখাপড়া শুরু হয় গোবিন্দ বসাক স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে। তাঁর সহপাঠী ছিলেন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রসময় দত্তের পুত্র গোবিন্দ দত্ত ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর। পিতার ইচ্ছায় পড়া ছেড়ে ব্যবসায়ে যোগ দেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে এবং প্রায় ১৪ বছর পিতার সান্নিধ্যে ব্যবসায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সমকালীন বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি।

কলকাতায় প্রথম ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান—'কলকাতা সিটি কর্পোরেশন'[১] প্রতিষ্ঠিত হয় অক্টোবর, ১৮৬৩ খ্রীঃ রাজা দুর্গাচরণের উদ্যোগে। 'দার্জিলিং-হিমালয়ান রেলওয়ের' ডিরেক্টর এবং আরও কয়েকটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অংশীদার ছিলেন

১। এটি পরে 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া' নামে পরিচিত হয়।

মহারাজা দুর্গাচরণ। কেবল ভারতীয়দের মধ্যে নয়, ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বহু গণ্যমান্য রাজকর্মচারী ও বণিক সম্প্রদায়ের বিত্তবানদের কাছে তিনি বিশেষ সম্মানীত ও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। কলকাতা ও চুঁচুড়ায় বহু জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর বদান্যতার বহু দৃষ্টান্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটে ১৮৭৩ খ্রীঃ মেদিনীপুরে নারায়ণগড়ের রাজা পৃথিবীবল্লভ পালকে তিন লাখ কুড়ি হাজার টাকা ধার দেওয়ার ব্যাপারে। পৃথিবীবল্লভ টাকা শোধ করতে না পারায় রাজা দুর্গাচরণ জমিদারী অধিগ্রহণ করেন। কিন্তু পৃথিবীবল্লভের সকরুণ আবেদনে তাঁর রাজবাড়ীতে তাঁকে বসবাস করার অনুমতি দেন ও ১২৫ টাকা হিসাবে আজীবন মাসোহারার ব্যবস্থা করেন। পরে পৃথিবীবল্লভের দত্তক পুত্রও ঐ ভাতা ভোগ করেছিলেন। ছোট ছোট বাঙালী ব্যবসায়ীরা তাঁর আর্থিক সাহায্য থেকে বঞ্চিত হননি। মহারাজা দুর্গাচরণ সরকারী প্রতিষ্ঠান 'কলকাতা পোর্ট ট্রাষ্ট'-এর প্রথম ভারতীয় কমিশনার, 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' সভাপতি। তাছাড়া তিনি ছিলেন অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, শেরিফ্, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৭৪ খ্রীঃ) ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৮৮২ খ্রীঃ) এবং মেয়ো হাসপাতালের অন্যতম পরিচালক। ১৮৮৪ খ্রীঃ তিনি 'সি-আই-ই' উপাধি লাভ করেন। ছোট লাট স্যার স্টুয়ার্ট বেইলি দুর্গাচরণকে 'রাজা' উপাধি দেন ১৮৮৭ খ্রীঃ ও পরে 'মহারাজা' খেতাবে ভূষিত করেন ২৭ জানুয়ারী, ১৮৯১ খ্রীঃ। সরকার তাঁকে আদালতে হাজির দেওয়া থেকে রেহাই দেন। মহারাজা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ২০ মার্চ, ১৯০৪ খ্রীঃ ৮২ বছর বয়সে।

রাজা কৃষ্ণদাস লাহা

মহারাজা দুর্গাচরণের দুই পুত্র—কৃষ্ণদাস লাহা (রাজা) ও হৃষীকেশ লাহা (রাজা)। কৃষ্ণদাসের জন্ম হয় ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৯ খ্রীঃ চুঁচুড়ায়। প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ (প্রথমে হিন্দু স্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ) করার পর পৈতৃক ব্যবসা 'প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানীতে' শিক্ষানবিস ছিলেন। সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। দেশ-কল্যাণের কাজে তিনি ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হৃষীকেশ লাহা যৌথভাবে প্রচুর অর্থদান করেছেন। চুঁচুড়া শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য ৮০,০০০ টাকা (১৯১১ খ্রীঃ), রিপন কলেজে ১৫,০০০ টাকা, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭২,০০০ টাকা প্রভৃতি তাঁদের দানের কয়েকটি নমুনা।

রাজা কৃষ্ণদাস ছিলেন অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার শেরিফ্ (১৯০৬ খ্রীঃ) ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের ট্রাষ্টী। ইংরাজ সরকারের রাজপ্রতিনিধি ছোট লাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার কৃষ্ণদাসকে ২৪ জুন, ১৯১০ খ্রীঃ 'রাজা' উপাধি দেন।

কলকাতার রাজপ্রাসাদে ৪ জানুয়ারী, ১৯১২ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও মহারানী মেরী যে বিরাট মজলিস বসিয়েছিলেন তাতে মহারাজ কৃষ্ণদাস নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট বিলের প্রতিবাদে—৩১ মার্চ, ১৯১৪ খ্রীঃ কলকাতার টাউন হলে বিশিষ্ট নাগরিকদের সভায় তিনি পৌরহিত্য করেন। স্বায়ত্ব শাসনের পক্ষে তাঁর জোরালো সাওয়াল পরে খুবই কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে তাঁর পৈতৃক বাসভবনে [১] নভেম্বর, ১৯২৪ খ্রীঃ ৭৫ বছর বয়সে।

রাজা হৃষীকেশ লাহা

মহারাজ দুর্গাচরণের কনিষ্ঠ পুত্র হৃষীকেশ লাহার জন্ম হয় চুঁচুড়ায় ৪ মে, ১৮৫২ খ্রীঃ। হৃষীকেশ হিন্দু স্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্র হিসাবে (১৮৬৯ খ্রীঃ) খুব বেশী দিন পড়াশোনা করতে পারেননি। পিতার ইচ্ছায় মাত্র উনিশ বছর বয়সে 'মেসার্স কেলী এণ্ড কোম্পানীতে' শিক্ষানবিস ও পরে কয়েক বছর ঐ অফিসেই কর্মরত ছিলেন। আমদানী ও রপ্তানী ব্যবসায় অভিজ্ঞতা লাভ করাই ছিল উদ্দেশ্য। পৈতৃক ব্যবসার দায়িত্ব পালন করা ছাড়া, জমিদারী ও সম্পত্তি পরিচালনার কাজ তাঁকেই করতে হত। ১৮৮০ খ্রীঃ তিনি 'কৃষ্ণদাস ল এণ্ড কোম্পানী' নামে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান শুরু করেন। তিনি ছিলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৯০৯ খ্রীঃ), কলকাতার শেরিফ (১৯১৫) ও প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট, 'ন্যাশন্যাল চেম্বার অফ কমার্স'-এর সভাপতি, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' সম্পাদক, রামমোহন লাইব্রেরীর ট্রাষ্টী, কলকাতা করপোরেশনের সহ-সভাপতি (১৯০৬ খ্রীঃ), 'পোর্ট ট্রাষ্ট', 'ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট', ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির কর্ণধারদের অন্যতম। তাঁর জনকল্যাণমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসাবে ইংরাজ সরকার তাঁকে ১৯১৩ খ্রীঃ 'রাজা' ও 'সি-আই-ই' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে তাঁর প্রাসাদোপম বাসভবনে (২৯, রামমোহন সরণী) ১৬ মে, ১৯৩৫ খ্রীঃ ৮৩ বছর বয়সে। রাজা কৃষ্ণদাসের দুই পুত্র—কুমার গোকুলচন্দ্র ও কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র। গোকুলচন্দ্রের পুত্র মুরারীচরণ ও তাঁর তিন পুত্র—গুণাঙ্কর, দেবাঙ্কর ও মিনাঙ্কর। এঁরা পাস্তুয়ের ল্যাবরেটারীর মালিক।

রাজা হৃষীকেশ লাহার দুই পুত্র—কুমার নরেন্দ্র ও কুমার সুরেন্দ্র। কুমার নরেন্দ্রের দুই পুত্র—শচীন্দ্র ও রবীন্দ্র। রবীন্দ্রের পুত্র অরুণ। কুমার সুরেন্দ্রের দুই পুত্র—তুলসীচরণ ও রাধাচরণ। তুলসীচরণের ছয় পুত্র—অজিত, শরৎ, রঞ্জিত, সনৎ, বিশ্বনাথ, শঙ্কর—বাস করেন ৩৮৪/১, কেয়াতলা লেন, বালীগঞ্জ। রাধাচরণের পুত্র মিহিরকুমার থাকেন ৪২/৬ শেক্সপীয়ার সরণী।

১। মহারাজা দুর্গাচরণ ২, বিধান সরণীর প্রাসাদোপম তারকনাথ পালিতের বাড়ীটি কেনেন ১৮৮৬ খ্রীঃ। এখানে তিনি অনেক বছর বাস করেছিলেন। তাঁর পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস ১৯০৬ খ্রীঃ বাড়ীটির পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। রাজাদের আলোকচিত্র—'চিত্ররাজি' দ্রষ্টব্য।

কলুটোলার রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক

কলকাতা

গত একশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতার যে সব ধনী 'বাবু' জনসাধারণের সেবার কাজে প্রচুর অর্থ সাহায্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন, রাজা দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক তাঁদের অন্যতম। কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ বিত্তবান নিমাইচরণ মল্লিকের প্রপৌত্র ও দানবীর মতিলাল শীলের দৌহিত্র ও অদ্বৈতচরণের কনিষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৫২ খ্রীঃ মতিলাল শীলের বাসভবনে। হিন্দু স্কুলে পাঠাভ্যাস বেশি দিন হয়নি। ১৮৭১ খ্রীঃ উনিশ বছর বয়সে চিৎপুরের হরনাথ মল্লিকের পৌত্রীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বৈশ্য সন্তানের স্বাভাবিক বৃত্তি-ব্যবসায় তাঁর প্রবল অনুরাগ। মেধাবী দেবেন্দ্রনাথ ১৮৭২ খ্রীঃ বিখ্যাত চা ব্যবসায়ী জে. টমাস কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত হন। অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া বিশেষ লাভবান হননি। জমি ও বাড়ী তৈরী ও বেচা-কেনা করে প্রচুর টাকা রোজগার করেন।

'সুবর্ণবণিক দাতব্য সভার' সম্পাদক ও পরে সহ-সভাপতি থাকাকালীন জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের বহু অভাবী ছাত্র ও দায়গ্রস্ত মানুষদের সাহায্য করা ছাড়া, দেবেন্দ্রনাথ স্কুল, কলেজ ও সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থদানে বিরত ছিলেন না। তাঁর বিরাট দানের তালিকায় রয়েছে—রোগার্তের সেবায় বেলগাছিয়া কারমাইকেল মেডিক্যল কলেজের (অধুনা আর. জি. কর মেডিকল কলেজ) ১,২০০০০ টাকা ব্যয়ে আউটডোর বাড়ীটি, দ্বারোদ্ঘাটন করেন বাংলার গভর্নর লর্ড রোনাল্ডসে ৭ এপ্রিল, ১৯২০ খ্রীঃ। বার্ষিক ব্যয়ের জন্য মাসিক ৩০০০ টাকার চিরস্থায়ী দানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। কলকাতা মেডিক্যল কলেজের 'চক্ষু বিভাগ' তার অনুদানেই তৈরী হয়।

কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা ও নিবারণের জন্য সংযুক্ত সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে (কুষ্ঠাশ্রম) এককালীন দান ছাড়া, প্রায় দশ লক্ষ টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির একটি 'ট্রাস্ট ফাণ্ড' তৈরী করেন।

দেবেন্দ্রনাথের বিরাট দানের স্বীকৃতি হিসাবে ইংরাজ সরকার তাঁকে ১৯২০ খ্রীঃ 'রায়বাহাদুর' এবং ১ জানুয়ারী, ১৯২৬ খ্রীঃ 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। বর্তমান কলুটোলায় দেবেন্দ্র মল্লিক স্ট্রীট-এ তাঁর বিরাট বাসভবনে ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯২৬ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। রাজা দেবেন্দ্রনাথের পাচ পুত্র—কুমার কার্তিকচরণ, গণেশচন্দ্র, মহেশচন্দ্র, গৌরচরণ ও হরিচরণ এবং সাত কন্যা। তাঁর প্রপৌত্রের মধ্যে বলাইচাঁদ, নৃসিংহ, শঙ্কর, রমেশ, সুরেশ, দীনেশ, পরেশ, মোহন, মাইকেল, সমর, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, নবকুমার, রামকুমার, সুবোধ, সমীর, অসীম, রবীন, মণীশেষ, হরেন্দ্র ও হীরেন্দ্র তাঁদের আদি বসত বাড়ীতে ও আশপাশের অঞ্চলে বসবাস করে থাকেন।

লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহ

কলকাতা

বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, স্থায়ীত্ব ও একতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি সময়োপযোগী সনদে আকর্ষনীয় বিশেষ সম্মান, খেতাব, পদমর্যাদা, উপহার প্রভৃতি—ব্যক্তি বিশেষকে তাঁর রাজভক্তি, আনুগত্য বা গুণগত প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কৃত করা হত। ইংলণ্ডে বিশেষ সম্মানসূচক 'লর্ড' উপাধি যা পুরুষানুক্রমে শুধু জ্যেষ্ঠ পুত্রই ধারণ করার অধিকারী। ভারতবর্ষে কেবলমাত্র একটি পরিবারকে এই উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল এবং সেই উপাধি এখনও তাঁরা ব্যবহার করেন।

অযোধ্যার আদি বাসিন্দা **লালচাঁদ সিংহ** (রায়পুরের সিংহ বংশের প্রতিষ্ঠাতা) মেদিনীপুরে চন্দ্রকোণায় বসতি করেন খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝি। লালচাঁদ সিংহের পুত্র **শ্যামকিশোর** (১৭৮৭-১৮২৮ খ্রীঃ) বীরভূম জেলায় রায়পুরে চলে আসেন চন্দ্রকোণা ছেড়ে। তিনি বীরভূমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিনিধি জন্ চীপ্ সাহেবের অধীনে কোম্পানীর তাঁত শিল্পে জাহাজের পালের কাপড় তৈরীর কাজ তদারক করতেন। শ্যামকিশোর সরকারী কাজে রত থাকায় বিত্তশালী হয়ে স্থানীয় ভূসম্পত্তির মালিক হন। শ্যামকিশোরের পৌত্র **সিতিকণ্ঠের** সময় জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি পায়। তাঁর পুত্র লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের সময় জমিদারীর বাৎসরিক দেও রাজস্ব ছিল ১,৪২০০০ টাকা। জমিদারীর বিলুপ্তি ঘটলেও রায়পুরে ভগ্নপ্রায় বিরাট সিংহবাড়ী এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সত্যেন্দ্র প্রসন্নের পিতৃব্য প্রতাপ নারায়ণ সিংহ ১৮৮৮ খ্রীঃ, বিশ বিঘা জমির মৌরসী-পাট্টা দান করেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁর 'শান্তিনিকেতন' প্রকল্পের জন্য। রায়পুরের জমিদার সিংহ বংশের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল।

জমিদার শ্যামকিশোরের পৌত্র সিতিকণ্ঠ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মুন্সী ছিলেন। পরে সদর আমিন পদে উন্নীত হন। তাঁর চার পুত্র—দেবেন্দ্র প্রসন্ন (চিকিৎসক), রাম প্রসন্ন (সরকারী উকিল), সত্যেন্দ্র প্রসন্ন (লর্ড), নৃপেন্দ্র প্রসন্ন (আই এম. এস.)।

জমিদার সিতিকণ্ঠের তৃতীয় পুত্র **লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্নের** জন্ম হয় ২৪ মার্চ, ১৮৬৩ খ্রীঃ। বিদ্যাভ্যাস শুরু হয় বীরভূমের সরকারী বিদ্যালয়ে। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পাশ করেন ১৮৭৭ খ্রীঃ। কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে এফ. এ. পাশ করেন ১৮৭৯ খ্রীঃ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পর্যায়ে পড়াশোনা সম্পূর্ণ না করে

বিলাত চলে যান ১৮৮১ খ্রীঃ। সেখানে কৃতিত্বের সঙ্গে বৃত্তি নিয়ে 'লিনকোন' আইন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও ১৮৮৬ খ্রীঃ ব্যারিষ্টার হয়ে দেশে ফেরেন। তাঁর বিবাহ হয় মাহাটার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র মিত্রের কন্যা গোবিন্দ মোহিনী দেবীর সঙ্গে। ঐ বছরেই তিনি কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হন ও সিটি কলেজের আইন বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন। শীঘ্রই আইনজীবী হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ায় ১৯০৪ খ্রীঃ ইংরাজ সরকার তাঁকে 'স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল'-এর পদে নিযুক্ত করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ অস্থায়ী 'অ্যাডভোকেট জেনারেল' ও ১৯০৮ খ্রীঃ ঐ পদে স্থায়ী হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় ঐ পদে আসীন হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১১ খ্রীঃ) তিনি ছিলেন মধ্যপন্থীদের অন্যতম। সঙ্গত কারণে সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করেন। ১৯০৯ খ্রীঃ 'গভর্ণর জেনারেল এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিল'-এর ('ল মেম্বর') প্রথম ভারতীয় সভ্য, পরে প্রেস বিল বিষয়ে মতানৈক্য ঘটায় ইস্তফা দেন। নিজের আইন ব্যবসা (ব্যারিষ্টারী) শুরু করেন। বেশ কয়েক বছর পরে ১৯১৬ খ্রীঃ পুনরায় 'অ্যাডভোকেট জেনারেল' পদে নিযুক্ত হন। ১ জানুয়ারী, ১৯১৫ খ্রীঃ 'কে. টি.' উপাধি পান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রীঃ) তিনি তৎকালীন বিশ্বযুদ্ধ সংক্রান্ত 'শান্তি অধিবেশনে' ভারতের প্রতিনিধি হয়ে ফ্রান্সে যান ১৯১৯ খ্রীঃ। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে ১৮৯৬ খ্রীঃ থেকে ১৯১৯ খ্রীঃ পর্যন্ত, প্রায় ২৩ বৎসর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডিসেম্বর, ১৯১৫ খ্রীঃ বোম্বাইয়ের কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং 'স্বায়ত্ব শাসন'-এর দাবীতে জোরালো বক্তব্য রাখেন। ১৯১৭ খ্রীঃ 'বেঙ্গল এক্সজিকিউটিভ কাউন্সিলের' সভ্য নির্বাচিত হন। ১৯১৯ খ্রীঃ মহামান্য ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ তাঁকে ইংলণ্ডের 'ব্যারণ' খেতাব-ধারী পদমর্যাদায় ভূষিত করেন। স্বাভাবিকভাবে 'হাউস অফ্ লর্ডস্' (প্রিভি কাউন্সিল)-এর সভ্য হন। তিনি 'ব্যারণ সিনহা অফ্ রায়পুর' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি নিজ উদ্যোগে 'গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট' (১৯১৯ খ্রীঃ) 'হাউস অফ লর্ডস' থেকে পাশ করিয়ে নেন। সেই সময় 'আণ্ডার সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া' পদে নিযুক্ত ছিলন ১৯১৯-২০ খ্রীঃ। সত্যেন্দ্র প্রসন্ন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমবয়সী ছিলেন। কবির ইউরোপ ভ্রমণকালে সত্যেন্দ্র প্রসন্ন তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম।

ভারতে ফিরে আসেন ১৯২০ খ্রীঃ এবং বিহার ও উড়িষ্যার গভর্নর নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণে তিনি মাত্র দু'বছর ঐ পদে আসীন ছিলেন। তদানীন্তন 'বাঙ্গালী' পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীতে যোগ দেন ১৯২৩-২৬ খ্রীঃ। 'সাইমন কমিশনের' বিরুদ্ধবাদীদের প্রতিবাদে তিনি সোচ্চার হন। তাঁর দেহাবসান ঘটে ৪ মার্চ, ১৯২৮ খ্রীঃ বহরমপুরে। তাঁর চার পুত্র ও তিন কন্যা।

লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্নের জ্যেষ্ঠ পুত্র **অরুণ কুমারের** (লর্ড) জন্ম হয় কলকাতায় ২৯ এপ্রিল, ১৮৮৭ খ্রীঃ। তিনিও পিতার ন্যায় বিলাতে ব্যারিষ্টারী পাশ করে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। বিবাহ হয় রায় বাহাদুর লহিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা নিরুপমা দেবীর সঙ্গে। তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় বিলাতে কাটান। পিতার মৃত্যুর পর প্রায় দশ বছর (১৯২৮-৩৮ খ্রীঃ) তিনি 'লর্ড' খেতাব থেকে বঞ্চিত ছিলেন। বহু মামলা-মকদ্দমা ও আবেদন-নিবেদনের পর 'হাউস-অফ-লর্ডস' এর 'লিগাল কমিটি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী (১১ মে, ১৯৩৮ খ্রীঃ) ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'হাউস-অফ-লর্ডস' এর সদস্য হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হন। তাঁর দেহাবসান ঘটে ১১ মে, ১৯৬৭ খ্রীঃ।

লর্ড সত্যেন্দ্র প্রসন্নের দ্বিতীয় পুত্র শিশির কুমার একজন আইন-জীবী, তৃতীয় পুত্র সুনীল কুমার আই. সি. এস. এবং কনিষ্ঠ পুত্র তরুণ কুমার কমপ্‌ট্রোলার অফ্‌ মিলিটারী এ্যাকাউন্টস্‌-এর পদে আসীন ছিলেন।

লর্ড অরুণ কুমারের দুই পুত্র **লর্ড সুধীন্দ্র প্রসন্ন** ও অনিন্দ্যে কুমার ও তিন কন্যা—বীণা, গীতা ও শীলা। জ্যেষ্ঠ পুত্র লর্ড সুধীন্দ্র প্রসন্নের জন্ম ২৯ অক্টোবর, ১৯২০ খ্রীঃ। একাধিক বৃহৎ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ম্যাকনীল কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর ছাত্র-জীবন বিলেতে শুরু হয়, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণে পড়াশোনা সম্পূর্ণ না করে দেশে ফিরে আসেন। সুধীন্দ্র প্রসন্ন কলকাতার 'স্টেটসম্যান্‌' পত্রিকার অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। তাঁর দেহাবসান ঘটে ৬ জানুয়ারী, ১৯৮৯ খ্রীঃ।

লর্ড সুধীন্দ্র প্রসন্নের একমাত্র পুত্র **লর্ড সুশান্ত প্রসন্নের** জন্ম হয় ১৬ মে, ১৯৫২ খ্রীঃ। পড়াশোনা করেন দার্জিলিং-এ নর্থ পয়েন্ট স্কুলে ও কলকাতায় সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে। বর্তমানে তিনি চা-ব্যবসায়ের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করেন ও নিজেদের এস্টেটের তদারকী করেন। কলকাতায় ৭ লর্ড সিনহা রোডে পৈত্রিক বাস ভবনে বাস করেন। তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যার অকালে মৃত্যু হয়।

রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী

শিবপুর, হাওড়া

খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হাওড়ার (বর্তমান শিল্প শহর) অন্তর্গত শিবপুর ছিল একটি সমৃদ্ধ গ্রাম। শিবপুরের আদি ভূখণ্ডে বেতড়ের (অধুনা ব্যাতাইতলা) সুপ্রাচীন চণ্ডীপীঠ **বেত্রচণ্ডিকা মন্দিরের**[১] উল্লেখ পাওয়া যায় খ্রীষ্টীয় ষোল শতকের ধর্মগ্রন্থে। এই মন্দিরের আদি প্রতিষ্ঠাতাদের সঠিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও, পরবর্তীকালে শিবপুরের রায়চৌধুরীরা যে, মন্দিরের সংস্কার ও নিত্য-পূজার দায়িত্ব পালন করে আসছেন তা অবশ্যই স্বীকার্য।

শিবপুরের রায়চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামব্রহ্মের (মুখোপাধ্যায়) জীবন-বৃত্তান্তে (অনুঃ ১৬৫৪-১৭০৭ খ্রীঃ) পূর্বপুরুষদের সব নাম পাওয়া না গেলেও, তাঁদের আদি বাসভূমি ছিল উত্তর ২৪-পরগণার ব্যারাকপুর মহকুমার চানক মণিরামপুর। এঁদের সাবেকী বাড়ীটি পলতার জলাধার তৈরীর সময় অবলুপ্ত হয়। কিন্তু গঙ্গাতীরে এই বংশের প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষীর প্রাচীন মন্দিরটি এখনও বর্তমান। ভিন্নমতে, এই বংশের একাংশ গোবিন্দপুর (ফোর্ট উইলিয়ামের আদি কেন্দ্রস্থল) গ্রামে বসবাস করতেন। যাইহোক নথি-পত্রে দেখা যায় যে, আনুঃ ১৬৮৩ খ্রীঃ ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা রামব্রহ্ম রায়চৌধুরী পৈতৃক জমিদারীর তেরোটি গ্রাম (শিবপুর, রামকৃষ্ণপুর, ব্যাতাইতলা, ডাসি, সলপ, নিবড়া, মাঝের হাটি, বাঁকড়া, গোদা, বেতড়, চাময়াইল, নিতাকুর, দেবীপাড়া প্রভৃতি) নিজস্ব ভাগে পেয়ে শিবপুরে বসতি শুরু করেন। 'হাওড়া জেলার ইতিহাস' লেখক অচল ভট্টাচার্য্যের মতে, মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) ফরমানে রায়চৌধুরীরা এই অঞ্চলের জমিদারীর মালিক হন ও 'রাজা' উপাধি পান। শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রীর মতে, হাওড়ার এই বিস্তৃণ অঞ্চলের স্বত্ব পান রামব্রহ্মের পুত্র সুকদেব নবাব আলিবর্দীর (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) আনুকূল্যে।

১। 'নগর হাওড়ার' লেখক অলোক মুখোপাধ্যায় মনে করেন রাজা সুকদেব চানক মনিরামপুরে 'বিশালাক্ষী' দেবীর অনুরূপে 'বেত্রচণ্ডিকা' বা 'ব্যাতাইচণ্ডী' ও শিবপুরের ধর্মতলায় 'ধর্মরাজে'র বিগ্রহ স্থাপন করেন।

মন্দির প্রসঙ্গে একটি জনশ্রুতি আছে যে, রানী রাসমণির (১৭৯৩-১৮৬১ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বরের 'মা ভবতারিণী'র মন্দিরটি তিনি প্রথমে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে হাওড়ায় নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রায় চৌধুরীরা তাঁদের 'বেত্রচণ্ডিকা'র মন্দিরের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কায়, রানী রাসমণিকে হাওড়ায় মন্দির তৈরী করতে দেননি।

অনেকেই মনে করেন যে, 'বেত্রচণ্ডিকা' মন্দির রায়চৌধুরী বংশের পূর্বপুরুদেরই প্রতিষ্ঠা ; তা হলে এঁরা তো অনেক পূর্বেই শিবপুরে এসেছিলেন।

শিবপুরে ভাগীরথীর তীরে প্রায় পঁচাত্তর বিঘার চৌহদ্দিতে বর্তমান ভগ্নদশাপ্রাপ্ত রাজপ্রাসাদটি তৈরী হয়েছিল আনুঃ ১৬৮৪ খ্রীঃ। ধর্মপ্রাণ রাজা রামব্রহ্ম তাঁর ভদ্রাসনে প্রথমেই একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করতে ভোলেননি। সম্রাট প্রদত্ত ফরমানে (এখন অস্তিত্ব না থাকলেও), জমিদারীর দলিল-দস্তাবেজে অবশ্য কিছু অবস্থাগত প্রমাণ দেখা যায়। সাত্বিক রাজা রামব্রহ্ম গৃহী-সংসারী হয়েও 'ব্রহ্মচারী' আখ্যায়ী ছিলেন তাঁর সাধু-সুলভ জীবন যাত্রা ও ধর্ম প্রবণতার জন্য। তিনি ১৭০৯ খ্রীঃ মারা যান।

রাজা রামব্রহ্মের পুত্র **সুকদেব** (আনুঃ ১৬০৮-১৭৫৯ খ্রীঃ) জমিদারীর মালিক হন আনুঃ ১৭০৭ খ্রীঃ। মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ার (১৭১৩-১৯ খ্রীঃ) ইংরাজ বণিকদের বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অনুমতি দেন ১৭১৭ খ্রীঃ। কিন্তু বাংলার স্বাধীনচেতা সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলী খান প্রথমে এই ফরমান্ অগ্রাহ্য করেন, পরে অবশ্য মেনে নেন। ইংরাজ কোম্পানী ভাগীরথীর উভয় তীরে প্রায় আটত্রিশটি গ্রামে বাণিজ্য করার ইজারা পান। কিন্তু পশ্চিম তীরের গ্রামগুলি[১] বেশ কিছুকাল (১৭১৭-১৭৬০ খ্রীঃ) ইংরাজদের নিয়ন্ত্রণে আসেনি, নবাবের পরোক্ষ সহায়তায় রায়চৌধুরীদের বিরোধিতার জন্য। সঙ্গত কারণে ইংরাজ কোম্পানী, জমিদার রায়চৌধুরীদের খুব একটা সুনজরে দেখতেন না। ফলে তৎকালীন ইংরাজ সরকারের অনুগ্রহ-পুষ্ট জমিদার বা খেতাবী রাজাদের অনুষ্ঠিত জাঁকজমকের দুর্গাপূজায় মহামান্য অতিথি ইংরাজ প্রভুদের কখনো তাঁরা আমন্ত্রণ করেননি। এই প্রসঙ্গে শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের অভূত-পূর্ব আড়ম্বরে দুর্গাপূজায় ইংরাজ সরকারের রাজপুরুষদের (লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস প্রমুখ) উপস্থিতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে রায়চৌধুরীদের সঙ্গে ইংরাজ সরকারের বিরোধের আরও একটি দৃষ্টান্ত হল, গঙ্গাবক্ষের চড়া-পড়া জমির মালিকানার স্বত্ব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা। অবশ্য জমিদাররা সুবিচার পাননি। ১৭৬৫ খ্রীঃ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের

১। সালিখা, হাওড়া, কাসুন্দিয়া, রামকৃষ্ণপুর, বেতড়, শিবপুর প্রভৃতি।

২। রায়চৌধুরীদের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল বেতড়ের সংলগ্ন শালিমার অঞ্চল, যা এখন বিশাল 'শালিমার রেলওয়ে ইয়ার্ড' নামে পরিচিত। তাছাড়া বোটানিক্যাল্ গার্ডেন (কোম্পানীর বাগান), বি. ই. কলেজ প্রকৃতপক্ষে তাঁদেরই জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই এলাকায় কাশিমবাজারের মহারানী স্বর্ণময়ীকে (১৮২৪-৯৭ খ্রীঃ) ৩৩৫ বিঘা জমি বাৎসরিক ৮৩০ টাকা ১৪ আনা ৬ পাই খাজনায় ইজারা দেওয়া হয়েছিল।

ফরমানে পাওয়া বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভে, ইংরাজ বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল। নবাবী আমলে রায়চৌধুরীদের প্রতিপত্তি বজায় থাকলেও, ইংরাজ শাসনকালে তাঁরা নিজেরাই রাজানুগ্রহ নিতে আগ্রহী ছিলেন না, বরং অবজ্ঞা ও বিরোধের মধ্যে জমিদারী পরিচালনা করেছেন। তাই তাঁদের উত্তর-পুরুষদের গুরুত্ব কমে যায়। অপরপক্ষে, রায়চৌধুরীদের জমিদারীর সংলগ্ন আন্দুলের খেতাবী রায় রাজবংশের বিশাল জমিদারীর পত্তন হয়েছিল ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের অবসানের পর—খাস লর্ড ক্লাইভের পৃষ্ঠপোষকতায়। আন্দুলের কায়স্থ পরিবারভুক্ত রায় রাজারা বিস্তৃণ জমিদারী ও ঐশ্বর্য্যের মালিক ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত।[১]

পূর্বেই বলা হয়েছে রাজবাড়ী[২] ও দুর্গাপূজার কথা। কিন্তু এঁদের পূজা প্রাচীনত্ব ও নিখুঁত শাস্ত্রীয় নিয়মানুবর্তিতার জন্য বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রাজবাড়ী সংলগ্ন নহবৎ-খানা সমেত এক বিশাল দুর্গাদালান তৈরী করেছিলেন রাজা রামব্রহ্ম আনুঃ ১৬৮৬ খ্রীঃ। বিদেশী রাজপুরুষদের কাছে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের কোন প্রয়োজন না থাকায়, পূজায় জাঁকজমকের আসর বসত না। স্থানীয় জনশ্রুতিতে শোনা যায় যে, ইংরাজ-বিদ্বেষী অভিব্যক্তিতেই এঁদের পূজায় নাকি সাদা চামড়ার প্রতিক একটি সাদা ছাগ বলির প্রবর্তন করেন রাজা রামব্রহ্মের পুত্র সুকদেব। এখন অবশ্য বলিদান প্রথা বন্ধ হয়ে গেছে, তবে দশমীর দিন প্রাতে "বেত্রচণ্ডিকা" মন্দিরে একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বর্তমানের দুর্গাদালানটি প্রথম পর্যায়ে ছিল বাঁশের তৈরী 'আটচালা'। স্থানীয় লোকেদের কাছে এখনও এই পাকা পূজা প্রাঙ্গনটি 'সাঁজের আটচালা' নামেই পরিচিত। এখন প্রয়োজনীয় সংস্কারের পর এই প্রাঙ্গনটিতে 'শিবপুর শিক্ষালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৫৯ খ্রীঃ। অবশ্য দুর্গাপূজা, কালীপূজার সময় প্রাঙ্গনটির ব্যবহারে কোন অসুবিধা হয় না। রায়চৌধুরী পরিবারের একাধিক পুরুষ দেশ ও দশের কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রামচন্দ্র রায়চৌধুরী, হরিপদ রায়চৌধুরী, বিপ্লবী তারকনাথ রায়চৌধুরী অন্যতম। বর্তমানে এই পরিবারের ডঃ চন্দন রায়চৌধুরী হাওড়া শহর অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী।

১। আন্দুল রাজপরিবার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। চিত্ররাজি দ্রষ্টব্য।

আন্দুলের রায় রাজপরিবার

হাওড়া

আঠারো শতকের মধ্যভাগে হুগলী জেলায় আন্দুল ১ ছিল একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। 'কর' পদবীর কায়স্থ পরিবারের মানুষ **রামচরণ** বা **রামচাঁদ কর** (রায়)-এর ফার্সী ও আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হুগলীর দপ্তরে উকিল পদে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন মাসিক ২০ টাকা বেতনে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন ও পরিশ্রমী রামচরণ নিজ কর্মদক্ষতায় রাজধানী মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর দেওয়ানের সহকারী পদে মাসিক ৬০ টাকা বেতনে আসীন হন। মুন্সী নবকৃষ্ণের (শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব) ন্যায় রামচরণ রবার্ট ক্লাইভ ও পরে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আন্দুল অঞ্চলে জোড়হাট গ্রামটি পেয়ে জমিদারী শুরু করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পর পরাজিত ও পলাতক সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রাসাদে গচ্ছিত প্রায় আট কোটি টাকার মুদ্রা, হীরা-জহরত লুণ্ঠিত হয় ২৪ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন মুন্সী নবকৃষ্ণ ও দেওয়ান রামচরণ এবং আরো অনেকে। ২ ১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরাজ বণিকদের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর দেশের রাজনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। ইংরাজ কোম্পানীর রাজনৈতিক প্রভুত্বের স্থায়ী রূপ নেয়। কোম্পানীর প্রতি ভাগ্যলক্ষ্মীর প্রসন্নতার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর বিশ্বস্ত 'জো-হুজুর' কর্মচারীদের পদোন্নতি ও আনুষাঙ্গিক 'উপরি' আমদানীর পথ প্রশস্ত হয়। রামচরণ ক্লাইভের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হওয়ায় তাঁর প্রভাব, প্রতিপত্তি ও ধনসম্পত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ৩ মে, ১৭৬৫ খ্রীঃ লর্ড ক্লাইভ ভারতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রামচরণের 'রাজা' উপাধি প্রাপ্তি ঘটে। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহআলমের (১৭৫৯-১৮০৬) কাছে আর্জি দিয়ে রামচরণ তাঁর প্রাপ্য 'রাজা' উপাধি নিজ পুত্র রামলোচন রায়কে পাইয়ে দেন ২ জানুয়ারী, ১৭৬৬ খ্রীঃ।

রাজা রামলোচন রায়

রাজা রামলোচন 'পাঁচ হাজারী' মনসবদার সনন্দও পেয়েছিলেন। কথিত আছে, রামলোচনকে হাতী, ঘোড়া ও কয়েকটি কামান দেওয়া হয়েছিল। অনেকে মনে করেন

১। বর্তমানে হাওড়া জেলার অন্তর্গত শহরতলী আন্দুল রেলপথে মাত্র ১৩ কিলোমিটার হাওড়া স্টেশন থেকে। ২। মহারাজা নবকৃষ্ণদেব পরিচ্ছেদ, ২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

যে, রামচরণ সিরাজের প্রাসাদ থেকে লুণ্ঠিত টাকা নৌকা পথে আন্দুলে নিয়ে এসেছিলেন, কেননা যখন তিনি মারা যান তখন তাঁর কাছে ১৬ লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারী ও ২০ লক্ষ টাকার জহরত বর্তমান ছিল।

রাজা রামলোচন রায় পিতার জীবিত অবস্থায় জমিদারীর কার্যভার গ্রহণ করেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিদ্যোৎসাহী রাজা রামলোচন আন্দুল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় টোল, চতুষ্পাঠী এবং আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। ১৭৬১ খ্রীঃ কোম্পানীর গভর্নর ভান্সিটার্ট রামলোচনকে তাঁর দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করেন। শেষ জীবনে রামলোচন কলকাতায় পাথুরিয়াঘাটার বাসভবনে থাকতেন। রাজা রামলোচনের নাম ইতিহাসের পাতায় এক বিশেষ অধ্যায়ে গ্রথিত। মহারাজা নন্দকুমারের জালিয়াতীর বিচারের সময়ে তিনি ছিলেন সরকার তরফের প্রধান সাক্ষীদের অন্যতম। ১০ আগষ্ট, ১৭৭৬ খ্রীঃ তাঁর জবানবন্দী ও পরে হিসাবপত্র দাখিলের মারফৎ রামলোচন ঐ মামলায় হেস্টিংসকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রভাবের দৃষ্টান্ত হিসেবে, তিনি তার জমিদারীর কাজে 'আন্দুলাব্দ' নামে একটি অব্দের প্রচলন শুরু করেন। এই অব্দের সূচনা হয়েছিল বাংলা ১১৭৪ সন বা ১৭৬৭ খ্রীঃ। এই 'অব্দটি' কতদিন চালু ছিল, তা এঁদের বংশধরেরাও জানেন না। আন্দুলের বাইরে কালীঘাটের মন্দিরের সামনে নাটমন্দির তিনি তৈরী করেছিলেন। আন্দুলে প্রথম রাজবাটী রাজা রামলোচনের তৈরী ১৭৬৬ খ্রীঃ। বর্তমান রাজবাড়ীর পূর্বদিকে তার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তাঁর তৈরী দুর্গাদালানে দুর্গাপূজা প্রথম শুরু হয়েছিল ১৭৭০ খ্রীঃ। ১৭৭৭ খ্রীঃ রাজা রামলোচনের মৃত্যু হয়।

রাজা কাশীনাথ রায়

রামলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কাশীনাথ রায় (১৭৬৭-১৮০৭ খ্রীঃ) আন্দুল জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র দশ বছর। স্বভাবতই মাতা রানী সখিসুন্দরী ও তাঁর পিতৃব্যপুত্র রাজচন্দ্র রায় কাশীনাথের অভিভাবক হন। পরে কাশীনাথ সুষ্ঠুভাবে জমিদারী পরিচালনা করা ছাড়াও শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতিসাধনে ব্রতী ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রায় আট লাখ টাকা ব্যয়ে অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির ও সংলগ্ন চৌদ্দটি শিবমন্দির। ১৮০৭ খ্রীঃ রাজা কাশীনাথ মারা যান একমাত্র শিশু পুত্রকে রেখে।

রাজা রাজনারায়ণ রায়

চার বছরের নাবালক পুত্র রাজনারায়ণ উত্তরাধিকারী হন। স্বভাবতই 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস' জমিদারী পরিচালনার ভার নেয়। রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন।

বিশিষ্ট শিক্ষক ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১ খ্রীঃ) অবদান 'ইয়াং-বেঙ্গল' আন্দোলনের অন্যতম সদস্য ছিলেন রাজনারায়ণ। সাংস্কৃত ভাষায় তাঁর বুৎপত্তি ছিল। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করতেন। তাঁর আমলে আন্দুল সংস্কৃত সাহিত্য-চর্চার এক বিশেষ কেন্দ্র হয়েছিল। কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের সংস্কৃত পণ্ডিতদের উপস্থিতিতে সর্বভারতীয় মহাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। লোকে আন্দুলকে 'দক্ষিণ বাংলার নবদ্বীপ' বলত। পণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ 'আন্দুলরাজ প্রশস্তি' লেখার কাজের ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করতে পারেননি। রাজপরিবারের ইতিহাস লেখার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। রাজা রাজনারায়ণ বাংলায় কায়স্থ সমাজের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কায়স্থরা যে ক্ষত্রিয় বংশজাত ও উপবীত ধারণের অধিকারী, তা প্রতিপন্ন করার জন্যই 'কায়স্থ সৌরভ কৌস্তুভ' গ্রন্থ তাঁর আনুকূল্যে রচিত হয়েছিল। সঙ্গীতকলায় তাঁর বিশেষ অনুরাগ থাকায় দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়ার, বেনারস প্রভৃতি ঘরানার গায়ক-গায়িকাদের নিমন্ত্রণ করে আন্দুল রাজবাটীতে গানের মজলিস্ বহুবার বসিয়েছেন। ভারতের বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬ খ্রীঃ রাজনারায়ণকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন ও একটি রত্নখচিত তরবারী এবং রাজবেশ দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর সময়ের আন্দুল রাজবাটীর বিরাট দরবার হলে দেশী-বিদেশী ভাস্করশিল্পের প্রদর্শনগুলি, কারুশিল্পকলায় রাজা রাজনারায়ণের বিশেষ অনুরাগের পরিচয়।

আন্দুলের বিরাট **রাজপ্রাসাদটি** (চিত্ররাজি দ্রষ্টব্য) ১৮৩০-৩৪ খ্রীঃ রাজা রাজনারায়ণের আমলে তৈরী, যদিও তাঁর পুত্র বিজয়কেশব রাজপ্রাসাদের বাকি কিছু অংশ সম্পূর্ণ করেন। দক্ষিন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে আন্দুল রাজবাটীর বিলক্ষণ অবদান রয়েছে। এ সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে রাজাদের কৃত্তিকলাপ বর্ণনায়। প্রায় ষাট ফুটেরও বেশী সুউচ্চ তিনতলা বিশিষ্ট বিশাল প্রাসাদটির সামনের দিকে মাঝখানে রয়েছে দণ্ডায়মান দশটি ডোরিক্ স্থাপত্যের অনুকরণে তৈরী প্রায় পঞ্চাশ ফুট উঁচু স্তম্ভ যা, সারা বাংলায় কেবল এই প্রাসাদটিতে দেখা যাবে। সেকালের বড় জমিদারদের বৈভবের মাপকাটি ছিল জাঁকজমকের চূড়ান্ত প্রতীক নাচঘর। অনন্যসাধারণ এই নাচঘরের ভিতরে চারিদিকে উঁচু স্তম্ভগুলির (১৬টি) মাঝখানে ঝোলানো থাকত বিরাশিটি ঝাড়লন্ঠন। দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল মূল্যবান দেশী-বিদেশী তৈলচিত্র। বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী ও নাচগানের সেরা বাইজীদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও বাজনা শুনতে এখানে এসেছেন বহু বিদেশী রাজপুরুষ ও দেশীয় রাজ-রাজড়ারা।

রাজা বিজয়কেশব রায়

রাজা রাজনারায়ণের পুত্র বিজয়কেশব রায়ের জন্ম হয় ১৮৩৬ খ্রীঃ। ১৮৪৯ খ্রীঃ রাজা রাজনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক (১৩ বছর) পুত্র বিজয়কেশব

উত্তরাধিকারী হন। বিজয়কেশবের দুই পত্নী। কিন্তু তাঁদের কোন পুত্র সন্তান ছিল না। বিজয়কেশব জমিদারীর কাজে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেননি। তিনি তন্ত্র সাধনার মধ্য দিয়ে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। মারা যান ১৮৭৯ খ্রীঃ।

রাজা বিজয়কেশবের দুই বিধবা রানী—দুর্গাসুন্দরী ও নবদুর্গা দুটি দত্তক নেন।[১] আদালতের রায়ে দত্তক-গ্রহণ অবৈধ্য সাব্যস্ত হয়। রাজা কাশীনাথের কন্যা ত্রিপুরাসুন্দরীর বিবাহ হয় কৃষ্ণনগর নিবাসী কালীপদ মিত্রের সঙ্গে। আদালতের আর একটি আদেশে রাজা কাশীনাথের দৌহিত্র (ত্রিপুরাসুন্দরীর পুত্র) ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র (জন্ম—১৮২২ খ্রীঃ) জমিদারীর মালিকানা পান।

এইভাবে আন্দুলে 'রায়' রাজপরিবারের অবসান ঘটে ও 'মিত্র' রাজপরিবারের আবির্ভাব হয়। **ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্রের** পারদর্শীতায় জমিদারীর উন্নতি হয়। তিনি আন্দুল ও অন্যান্য স্থানে বেশ কয়েকটি দেবালয়, রাস্তা-ঘাট, সেতু, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি জনহিতকর কাজে সাধ্যমত দান করেছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁর কল্যাণমূলক কাজের জন্য যথোপযুক্ত স্বীকৃতি দেন। রাজপ্রতিনিধি ছোট লাট এ. ম্যাকেঞ্জী ২০ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্রকে 'সার্টিফিকেট্ অফ্ অনার' প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। স্থানীয় লোকেরা তাঁর জনপ্রিয়তার স্বীকৃতি স্বরূপ 'রাজা' আখ্যা দিয়েছিল। রাজা ক্ষেত্রকৃষ্ণ মিত্র মারা যান ৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ খ্রীঃ ৮৫ বছর বয়সে। তাঁর তিন পুত্র—উপেন্দ্র, দেবেন্দ্র (অকালমৃত্যু) ও নগেন্দ্র। ক্ষেত্রকৃষ্ণের উইল বা শেষ ইচ্ছাপত্রে তাঁর জমিদারীর দশ আনা অংশ জ্যেষ্ঠ পুত্র উপেন্দ্রনাথ এবং ছয় আনা কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে যান। মামলায় কনিষ্ঠ পুত্র নগেন্দ্রনাথ আট আনা অংশেরই ভাগীদার বলে নির্দিষ্ট হয়।

বড় তরফের (জ্যেষ্ঠ পুত্র) উপেন্দ্রনাথের পাঁচ পুত্র—প্রমথ, মন্মথ, সুরথ, ভরত ও জগৎ। ছোট তরফের (কনিষ্ঠ পুত্র) নগেন্দ্রের একমাত্র পুত্র শৈলেন্দ্র। রাজবাটীর পূর্বাংশে বড় তরফ ও পশ্চিমাংশে ছোট তরফের আবাসস্থল।[২] বড় তরফের প্রমথনাথের বংশধর—প্রফুল্লকুমার, প্রদ্যোতকুমার ও প্রভাতকুমার; প্রফুল্লকুমারের পুত্রদ্বয় প্রদীপকুমার ও প্রণবকুমার; প্রদ্যোতকুমারের পুত্র প্রদীপ্ত; আর ছোট তরফের অলোককুমারের পুত্র অমিতাভ ও পৌত্র অরুণাভ—সকলেই আন্দুল মিত্র রাজপরিবারের ঐতিহ্য বজায় রাখতে যথেষ্ট যত্নবান।

১। এই প্রসঙ্গে রাজপরিবারের কৌতুহলপূর্ণ শ্রুতিতে জানা যায় যে, বিধবা রানীরা নাকি নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ) ও ছোট ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত-কে দত্তক নিতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু দত্ত বংশের ঘোরতর আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। ঘটনাটি ঘটে আনু. ১৮৭০ খ্রীঃ।

২। ছোট তরফের এক বংশধর থাকেন কলকাতায় কালীঘাট অঞ্চলে আন্দুল রাজ রোডে।

বাঁশবেড়িয়ার রায় রাজপরিবার

হুগলী

কবিরাম রচিত 'দিগ্বিজয় প্রকাশ' গ্রন্থে ও হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের পুরানো ইতিবৃত্তে বর্ধিষ্ণু গ্রাম 'বংশবাটীর' উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, প্রচুর বাঁশবন থাকায় চলতি নাম হয়েছে বাঁশবেড়িয়া।[১] এই জনপদের গুণকীর্তন করেছেন কবি দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-৭৩ খ্রীঃ)—

"পরিপাটি বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই দেখি সকলই সুন্দর।"

বংশবাটী রাজবংশের আদি পুরুষ দেবদত্ত গৌড়েশ্বর আদিশূরের আহ্বানে মুর্শিদাবাদ জেলার দত্তবাটীতে বাস করতে থাকেন। পরে এই বংশের একটি শাখা বর্ধমান জেলায় পাটুলি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। এই বংশের **উদয় রায়ের** পুত্র **জয়ানন্দ রায়** সম্রাট জাহাঙ্গীর-এর (১৬০৫-২৭ খ্রীঃ) কাছ থেকে 'মজুমদার' [২] উপাধি ও কোটবক্তিয়ারপুর পরগণা (হুগলী) জায়গীর হিসাবে পান। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সপ্তগ্রামের 'মজুমদার' ভবানন্দ রায় ছিলেন নদীয়ার রাজবংশের আদি পুরুষ। জয়ানন্দ বাংলার নজিম কাশিমখানের (১৬১৪-১৭ খ্রীঃ) কানুনগো ছিলেন। মারা যান সতেরো শতকের শেষ ভাগে।

তৎকালীন ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর ও এজেন্ট মিঃ **উইলিয়ম হেজেস** তাঁর রোজ-নামচায় লিখেছেন—অক্টোবর, ১৬৮২ খ্রীঃ পাটুলির জমিদার উদয় রায় ও 'রেউই' গ্রামের বিষয়—**'Early in the morning we passed a village called Sreenagar and 5 o'clock this afternoon (October, 1682), we got as far as Rewee, a small village belonging to Woodoy Roy, a Zaminder that owns all the country on that side of the water almost as far as over against Hughly.……He pays more than twenty lacks of rupees per annum to ye king……and lack of rupees to ye Mogoul and his favourits to divert his intention of hunting and hawking in his country for fear of his**

১। কলকাতা থেকে শহরতলী বাঁশবেড়িয়া রেলপথে ৪৫ কিঃ মিঃ।

২। ইংরাজ সরকার প্রকাশিত 'Fifth Report'-এ জানা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলায় যে পাঁচজন জমিদারকে 'মজুমদার' উপাধি দেন, তাঁদের মধ্যে পাটুলি ও নদীয়ার রাজবংশ অন্যতম।

tenants being ruined and plundered by the emperor's lawless and unruly followers"—Hedges Dairy, Vol I.

জয়ানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাটুলি গ্রামের জমিদার **রাঘব রায়** (১৬১৮-৭৬ খ্রীঃ) সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে 'চৌধুরী' এবং 'মজুমদার' উপাধি পান ১৬৫৬ খ্রীঃ। তিনি সাতগাঁও-এর অন্তর্গত একুশটি (মালদহ, মেদিনীপুর, সাহাপুর, জাহানাবাদ, রায়পুর, ঘোষালপুর ইত্যাদি) ভূসম্পত্তির মালিক হন। তাঁর জমিদারী পরিচালনার সুবিধার জন্য পাটুলি থেকে বংশবাটীতে চলে আসেন ১৬৫৬ খ্রীঃ। তিনি তাঁর দুই পুত্র রামেশ্বর ও বাসুদেবের মধ্যে জমিদারী দশ আনা ও ছয় আনা অংশে ভাগ করে দেন।

রাজা রামেশ্বর রায়

দশ-আনি অংশীদার রামেশ্বরই বংশবাটীর রাজপরিবারের প্রাণ-পুরুষ। আর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেবের বংশধরেরা হুগলী জেলার সেওড়াফুলী রায় রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। দিনাজপুরের রায় রাজপরিবার এই বংশের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ।

রাজা রামেশ্বর রায় নবাবী উপাধি 'মহাশয়', তাঁর পদবীর সঙ্গে যুক্ত করার অনুমতি পান। তিনি বাঁশবেড়িয়াকে সর্বতোভাবে একটি সুন্দরী নগরীরূপে গড়ে তুলে ছিলেন। নাগরিক জীবনের প্রয়োজনীয় সুখ-সুবিধার কথা মনে রেখে, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বৈদ্য, কায়স্থ ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মানুষদের স্থায়ীভাবে বসবাসের সুব্যবস্থা করেছিলেন। রাজশক্তি বৃদ্ধির জন্য মুসলমান পাঠান সেনাদের ছাউনী তৈরী করে দেন। শিক্ষিত-সমাজ গড়ার তাগিদায় তিনি প্রায় চৌদ্দটি চতুষ্পাঠী[১] প্রতিষ্ঠা করে বারাণসীর পণ্ডিতদের পরিচালনাধীন করে দেন।[২] প্রখ্যাত রামশরণ তর্কবাগীশ তাঁর সভাপণ্ডিত ছিলেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব

১। "During the time of Rameshswar Roy & Raghudeb Roy, Bansberia rapidly developed into a seat of Sanskrit learning. Rambhadra Sidhvanta, Atmaram Nayalankar, Ramsankar Tarakabagis, Ramkrishna Nayapanchanan, Ramnath Bachaspati were the leading Naya scholars. Sanskrit learning rapidly declined during the 19th Century and ended during the middle of 20th Century."

Hunters statistical Account of Bengal Vol I.

২। Golden Book of India by Sir Roper Leth-bridge.

The family history of Bansberia Raj by S. C. Dey.

লালমোহন বিদ্যানিধির "সম্বন্ধ নির্ণয়ে" উল্লেখ আছে যে,—বাঁশবেড়িয়ার রাজপরিবারের পূর্বপুরুষদের রাজা মানসিংহ (১৫৮৯-৯৫ খ্রীঃ) জায়গীর দান করেছিলেন।

রামেশ্বরের কাজে বিশেষ খুশী হয়ে ১৬৮১ খ্রীঃ 'পঞ্চপর্চা' খেলাত সহ 'রাজা মহাশয়' রাজোপাধি তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের ব্যবহার করার অনুমতি দেন। ৪০১ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও কলকাতা সহ বারটি পরগণার জমিদারীও দান করেন। ইংরাজ সাহেব মিঃ এ. জি. বাওয়ার লিখেছেন—**'We know of no family in India enjoying the title of 'Raja Mahasaya' except the Bansberia Raj।"**

পরম বৈষ্ণব রাজা রামেশ্বর ১৬৭৯ খ্রীঃ বাঁশবেড়িয়াতে অনন্ত বাসুদেব (বিষ্ণু) মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিখ্যাত মন্দির গাত্রে টেরাকোটা (পোড়ামাটি) ফলকে দেব-দেবীর মূর্তি ও অন্যান্য কারুকার্যের বিচিত্র নমুনা, বাংলার মন্দির-শিল্পের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শক। এই মন্দির-গাত্রে প্রস্তর ফলকে লিখন—"মহীব্যোমাঙ্গশীতাংগণিত শকবৎসরে শ্রীরামেশ্বর দত্তেন নর্মমে বিষ্ণুমন্দিরং ১৬০১ ॥" আনুঃ ১৭২৮ খ্রীঃ রামেশ্বরের মৃত্যুর পূর্বে তাঁর তিন পুত্র ও দুই ভ্রাতুষ্পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র **রঘুদেব** বংশবাটীতে (অর্শ তালুক) বাস করেন এবং অপর দুই পুত্র যথাক্রমে শিবপুর (হাওড়া) ও রাজহাট (উত্তর ২৪ পরগণা) এবং ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যে মনোহর রায় সেওড়াফুলীতে (বড় তালুক) বসতি করেন। রাজা রঘুদেব বর্গীর আক্রমণ (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে বংশবাটীর রাজবাড়ীর চারিদিকে গড় (খাল) কেটে প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। হৃদয়বান রাজা রঘুদেব প্রজাদের মঙ্গলার্থে যথেষ্ট দান-ধ্যান করে গেছেন। স্বয়ং নবাব মুর্শিদকুলী খান তাঁকে ও তাঁর বংশধরদের 'শুদ্রকুলমণি' খেতাব দেন।

রাজা নৃসিংহদেব রায়

রাজা রঘুদেবের একমাত্র পুত্র **গোবিন্দদেব** (স্বল্পায়ু) ও তাঁর পুত্র রাজা নৃসিংহদেব রায় তাঁর পিতৃ-বিয়োগের তিন মাস পর জন্মগ্রহণ করেন ১৭৪০ খ্রীঃ। বাল্যকাল থেকেই তিনি অসহায় অবস্থার মধ্যে মানুষ হতে থাকেন। স্বার্থান্বেষী প্রতিবেশী ও বর্ধমান জমিদারদের পেশকার মাণিকচন্দ্র, 'বংশবাটীর জমিদার গোবিন্দদেব অপুত্রক', এই রটনার পরিপ্রেক্ষিতে নবাব আলিবর্দী খানের সম্মতিতে বংশবাটীর জমিদারীর বেশ কিছু অংশ হস্তগত করেন। বাকী অংশ গ্রাস করেন নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজা নৃসিংহদেব ১৭৮৭ খ্রীঃ (সন ১১৯৪) লর্ড কর্ণওয়ালিসের কাছে আবেদন[১] করায় তাঁর হৃত জমিদারী ও আরো তিনটি পরগণার

১। এই প্রসঙ্গে রাজা নৃসিংহদেবের 'স্মৃতিকথা' লেখায় আছে—'সন ১১৪৭ মাহ আশ্বিনে আমার পিতৃদেব গোবিন্দদেবের কাল হয়, সেকালে আমি গর্ভস্থ ছিলাম, বর্ধমানের জমিদারের পেশকার মাণিকচন্দ্র নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট আমার পিতার অপুত্রক কাল হইয়াছে খেলাপ জাহির করিয়া আমার পুস্ত-পুস্তানের জর খরিদা সনন্দী জমিদারী আপন মালিকের জমিদারীর সামিল করিয়া সন ১১৪৮ মাহ বৈশাখ খামখা দখল করে ও হলদা পরগণা কিসমতের মালগুজারী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় আপন পুত্র শম্ভুচন্দ্র রায়ের তালুকের সামিল করিয়া দখল করেন'—১১৯৪ সন (১৭৮৭ খ্রীঃ)।

মালিক হন। ধর্মপ্রাণ রাজা বারাণসীতে প্রায় সাত বছর (১৭৯২-৯৯ খ্রীঃ) বাস করেন ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়নে রত হন। সেই সময়ে ভূকৈলাস-এর রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশী-বাসী ছিলেন। রাজা নৃসিংহদেব রায় সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট বুৎপত্তি লাভ করেন। 'উদ্দিসা-তন্ত্র' বাংলায় অনুবাদ করেন।

রাজা নৃসিংহদেব ১৭৮৮ খ্রীঃ বংশবাটীতে **স্বয়ম্ভুবা মন্দির** প্রতিষ্ঠা করেন। হংসেশ্বরী মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমে ধ্বংসপ্রাপ্ত এই মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তরের অবস্থান এখনও দেখা যায়।

রাজা নৃসিংহদেবের অক্ষয় কীর্তি বাঁশবেড়িয়ায় **হংসেশ্বরী মন্দির**।[১] ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, বজ্রাক্ষ ও চিত্রিনী—মানুষের দেহের মধ্যে পাঁচটি নাড়ী আছে। সেই আদর্শে পাঁচতলা ও তেরটি মিনার বিশিষ্ট নব্বই ফুট সুউচ্চ 'এক রত্ন' বিশিষ্ট, কুণ্ডলিনী শক্তিরূপিনী দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির নির্মাণ শুরু করেন ১৭৯৯ খ্রীঃ। মন্দিরটি অসম্পূর্ণ থাকাকালীন রাজা নৃসিংহদেবের মৃত্যু হয় ১৮০২ খ্রীঃ। সম্পূর্ণ করেন তাঁর ধর্মপ্রাণা স্ত্রী রাণী শঙ্করী দেবী পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৮১৪ খ্রীঃ। হংসেশ্বরী দেবীর মূর্তিটি পরম পরা শক্তির বিকাশ স্বরূপ, নিমকাঠের তৈরী, নীল রং। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হংসেশ্বরী দেবীমূর্তির বর্ণনা এক বিদেশীর লেখায়—"She represents a form of Kali with her unbridled. The God Mahadeb is lying on "Trikona Jantra" and the Goddess is placed on the petalled lotus that has sprung from the navel of the aforesaid deity.' রাজা নৃসিংহদেবের হিতৈষী মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের (ভূকৈলাস) উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এই মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যশিল্পে হংসেশ্বরীর মন্দিরে পোড়ামাটির কারুশিল্পের বেশ কিছু শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখা যায়। 'সমাচার দর্পণ'-এ প্রকাশিত সংবাদে জানা যায় যে, মন্দিরের দেবীর সব গহণা চুরি হয়ে যায় ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮২০ খ্রীঃ।

রাজা নৃসিংহদেবের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র রাজা **কৈলাসদেব রায়** উত্তরাধিকারী হন। তিনি আরাম-প্রিয় ও বিলাসভোগী। রানী শঙ্করীর বিরুদ্ধে মামলায় তিনি হেরে যান। রানী নিজে জমিদারী দেখাশোনা করেন। তিনি মারা যান ১৮৫২ খ্রীঃ। রানীর জীবদ্দশায় কৈলাসদেব রায় মারা যান ও তাঁর একমাত্র পুত্র রাজা **দেবেন্দ্রদেব রায়** উত্তরাধিকারী হন। স্বল্পায়ু দেবেন্দ্রদেব রায়ের তিন পুত্র পূর্ণেন্দ্র, সুরেন্দ্র, ভূপেন্দ্র, যথাক্রমে বড়, মেজ ও ছোট তরফ নামে অভিহিত। রাজা পূর্ণেন্দ্রদেব ছিলেন বিচক্ষণ ও কর্মঠ মানুষ। স্কুল, চিকিৎসালয় ও রাস্তা তৈরীর কাজে অর্থ সাহায্য করেন।

১। চিত্ররাজি দ্রষ্টব্য।

বড় তরফ রাজা পূর্ণেন্দ্রের চার পুত্র মণীন্দ্র, (অপুত্রক) ক্ষিতীন্দ্র, মুনীন্দ্র ও রমেন্দ্র। কুমার মণীন্দ্র গ্রন্থাগারের গুরুত্ব সম্বন্ধে পড়াশুনা করেন এবং ১৯৩৫ খ্রীঃ স্পেন-এ অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থপঞ্জী কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ক্ষিতিন্দ্রদেব রায় বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মেজ তরফের সুরেন্দ্রের এক পুত্র বীরেন্দ্র ও ছোট তরফ ভূপেন্দ্রের এক পুত্র কুমারেন্দ্র। বড় তরফের ক্ষিতীন্দ্রের পুত্র গোপালেন্দ্র। মণীন্দ্রের পাঁচ পুত্র—বলেন্দ্র, বিনয়েন্দ্র, বিজয়েন্দ্র, বিবেকেন্দ্র ও বুদ্ধেন্দ্র। মেজ তরফের বীরেন্দ্রের তিন পুত্র বারীন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র ও সোমেন্দ্র। ছোট তরফ কুমারেন্দ্রের পুত্র শোভেন্দ্র, ধ্রুবেন্দ্র, কনকেন্দ্র, অলকেন্দ্র ও তপনেন্দ্র। কলকাতার ভবানীপুরে দেবরায় বংশের বাসভবনের সংলগ্ন রাস্তাটির নাম রানী শঙ্করী লেন। এই বাসভবনে বংশের শরিকদের কয়েকটি পরিবার বাস করেন। তাছাড়া কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলেও এদের বংশধরেরা রয়েছেন। বংশবাটীর রাজপ্রাসাদে জরাজীর্ণ কয়েকটি অংশে এখনও আলো জ্বলছে, নিত্য পূজাও হচ্ছে। পৈত্রিক বাসভূমি আঁকড়ে পড়ে আছেন ছোট তরফের একাধিক পরিবার তবে পূজা-পার্বণে বিশেষ করে দুর্গা পূজায় অধিকাংশ বংশধরেরা বংশবাটীতে আসেন।

রাজা নৃসিংহদেবের প্রতিষ্ঠিত 'স্বয়ংভবা' মন্দিরটির পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখন মন্দিরের অস্তিত্ব না থাকলেও, শ্বেত পাথরের মহিষ-মর্দিনী দুর্গামূর্তিটি দেখা যাবে। রাজা নৃসিংহদেবের প্রপিতামহ রাজা রামেশ্বরদেবের সময় মহাসমারোহে শারদীয়া দুর্গাপূজা আরম্ভ হলেও, এক অনন্যসাধারণ অনুষ্ঠান শুরু হয় 'স্বয়ংভবা' মন্দির প্রতিষ্ঠার পর থেকে যা, আজ পর্যন্ত বহাল আছে। প্রতিপদাদিকল্পে পূজায় প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত নয়টি কুমারী পূজা করা হয়। দুর্গা প্রতিমার মণ্ডপে যে সব পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়, তার পুনরাবৃত্তি করা হয় 'স্বয়ংভবা' মূর্তির সামনেও। এই প্রসঙ্গে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা উল্লেখ করতেই হয়। নবমীর দিন সন্ধ্যারতির পর পৃথক কাঠামোয় মহাদেব তাঁর বাহন বৃষ এবং অভিন্ন সঙ্গী ভৃঙ্গীর মৃত্তিকা মূর্তিটিকে 'বর,-যাত্রী' অনুকরণে শোভাযাত্রা করে কন্যারূপিনী মা দুর্গার মৃন্ময়ী প্রতিমার পাশে রাখা হয়। 'হরপার্বতীর বিবাহ-বন্ধন' অনুষ্ঠান পৌরাণিক রীতি ও লোকাচার অনুসারে সম্পন্ন করা হয়। এখন জাঁকজমক না থাকলেও সাত্বিক পূজাটি নিষ্ঠার সঙ্গে রায় পরিবার পালন করে থাকেন।

শেওড়াফুলীর রায় রাজপরিবার

হুগলী

হুগলী জেলায় শেওড়াফুলী (সাড়াপুলী) কলকাতার প্রাচীন শহরতলীগুলির অন্যতম। হাওড়া ষ্টেশন থেকে মাত্র ২৩ কি.মি. দূরত্বে। সেওড়াফুলীর কায়স্থ রায় রাজপরিবার বর্ধমানের গঙ্গাতীরে **পাটুলি গ্রামের** বিখ্যাত জমিদার **উদয় রায়ের** (আনুঃ ১৬১০-৮২ খ্রীঃ) পুত্র জয়নন্দ রায়ের বংশজাত। জয়ানন্দের জ্যেষ্ঠপুত্র রাঘব রায় (১৬১৮-৭৬ খ্রীঃ) সম্রাট শাহজাহানের প্রদত্ত 'চৌধুরী' ও 'মজুমদার' উপাধির অধিকারী। সাতগাঁও-এর অন্তর্গত পাটুলির বিস্তীর্ণ এলাকার জমিদার। পাটুলি পরিত্যাগ করে বংশবাটিতে[1] জমিদারী পরিচালনার কাজে সুবিধার জন্য বসবাস শুরু করেন ১৬৭৬ খ্রীঃ। তার দুই পুত্র—রামেশ্বর ও বাসুদেবের মধ্যে জমিদারী দশ আনা ও ছয় আনা অংশে ভাগ করে দেন। রামেশ্বর পান জমিদারীর দশআনা অংশ ও বাঁশবেড়িয়ার রাজবাটি। কনিষ্ঠভ্রাতা বাসুদেবের বংশধররা ছয় আনা অংশের অধিকারী হয়ে হুগলী জেলার সেওড়াফুলী ও বালী[2] অঞ্চলে চলে যান। পূর্বেই সেওড়াফুলীতে পাটুলি জমিদারদের কাছারী বাড়ী ছিল।

রাজা মনোহরচন্দ্র রায়

বাসুদেব রায়ের উত্তর পুরুষ রাজা মনোহরচন্দ্র রায়। ধর্ম-প্রাণ রাজা মনোহরচন্দ্র বাংলায় ও বাংলার বাইরে পঁচিশটিরও বেশী দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ও দেব সেবার জন্য ভূ-সম্পত্তি দান করেন। সেওড়াফুলী রাজবাড়ীতে (পূর্বতন কাছারী বাড়ী) সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরে যে অষ্ট-ধাতুর 'দুর্গা' মূর্তি- এখনও দেখা যায়, তা রাজা মনোহরচন্দ্র রায়ের প্রতিষ্ঠিত আষাঢ়ের শুক্লানবমী ১১৪১ সনে (১৭৩৪ খ্রীঃ)। অবশ্য বর্তমান মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয়েছে। তিনি ১৭৫২ খ্রীঃ শ্রীপুরে (শ্রীরামপুর) শ্রীরামচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। আকনায় 'রাম সীতা' মন্দির ও মাহেশে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির নির্মাণে, তাঁর দানের উল্লেখ আছে। তাঁর ধর্মপরায়ণতার স্বীকৃতি হিসাবে নবাবদের কাছ থেকে 'শূদ্র কুলমণি' উপাধি পান। রাজা মনোহরচন্দ্র ৮ই অক্টোবর, ১৭৫৫ খ্রীঃ তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত শ্রীপুর সহ পাঁচটি গ্রামের চিরস্থায়ী

১। এই প্রসঙ্গে বংশবাটির রায় রাজপরিবার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। ভগ্নপ্রায় বসতবাটী 'দু'আনি রাজবাড়ী' নামে স্থানীয় লোকেদের কাছে পরিচিত।

পাট্টা বার্ষিক ১৬০১ টাকা খাজনায় দিনেমার বণিকদের ইজারা দিয়েছিলেন। দিনেমার বণিকরা শ্রীপুরের নাম পরিবর্তন করে 'ফ্রেডরিক' নগর রাখেন। পরে ১১ অক্টোবর, ১৮৪৫ খ্রীঃ ১২,২৫০০০ টাকায় শ্রীরামপুর, বালেশ্বর, টানকোয়েলার ইংরাজদের বিক্রী করে দেন।

রাজা হরিশচন্দ্র রায়

রাজা মনোহর রায়ের পুত্র **রাজা রাজচন্দ্র রায়**[১] এবং তাঁর পুত্র রাজা **আনন্দচন্দ্র রায়** পর্যায়ক্রমে কিছু সময় পাটুলির রাজবাড়ী ও শেওড়াফুলীর কাছারী বাড়ীতে থাকতেন।

রাজা আনন্দচন্দ্র রায়ের পুত্র **রাজা হরিশচন্দ্র রায়** এই কাছারী বাড়ী (বর্তমান রাজবাড়ী) ও সংলগ্ন এলাকা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে রাজপরিবারে বাসোপযোগী করেন এবং নিজে সপরিবারে বসবাস করতে থাকেন। রাজা হরিশচন্দ্রের তিনটি বিবাহ। সেওড়াফুলীতে একত্রে থাকাকালীন তিন রানী প্রায়ই কলহে লিপ্ত হতেন। কোন একদিন, রাজা হরিশচন্দ্র ধৈর্যচ্যুত হয়ে প্রথমা রাণী সর্ব্বমঙ্গলা দেবীকে তরবারির আঘাতে হত্যা করেন। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য অনুতপ্ত রাজা সেওড়াফুলীতে গঙ্গাতীরে কষ্টিপাথরে তৈরী **নিস্তারিণী কালী** মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন, জ্যৈষ্ঠ শুক্লা পঞ্চমী ১২৩৪ সন (১৮২৭ খ্রীঃ)। মন্দির-গাত্রে একটি প্রস্তর ফলকে লিখন শ্লোকের উদ্ধৃতি দেওয়া হল—

'স্বীয়ে রাজ্যে ভূজঙ্গ·····কালী যদ্ ভিলাসী······চন্দ্রে গঙ্গাসমীপে বিগত ভল ভয় শ্রী হরিশচন্দ্র দত্তঃ। সম্যর্তির্যস্য রামেশ্বর ইতি নৃপশ্রেষ্ঠী যত্নেন সাধং॥'

তাঁর দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া স্ত্রী যথাক্রমে হরসুন্দরী দেবী ও রাধারাণী (ভিন্ন মতে, রাজধন দেবী) নিঃসন্তান হওয়ায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র (বয়োজ্যেষ্ঠ) ও পূর্ণচন্দ্রকে দত্তক নেন। এই দুই দত্তক পুত্রদের যথাক্রমে 'বড় তরফ' ও 'ছোট তরফ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। রাজা হরিশচন্দ্রের জন্ম আনুঃ ১৭৯২ খ্রীঃ এবং তাঁর দেহাবসান ঘটে আনুঃ ১৮৩২ খ্রীঃ।

বড় তরফের রাজা যোগেন্দ্রচন্দ্র একজন সুগায়ক ছিলেন। যোগেন্দ্রচন্দ্রের দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র ব্রজেন্দ্রচন্দ্র স্বল্পায়ু, কনিষ্ঠ পুত্র গিরীন্দ্রচন্দ্র[২] ছিলেন একজন নির্ভিক

১। রাজা রাজচন্দ্র রায়ের সময়কালে সম্রাট দ্বিতীয় শাহজানের ১৭১৯ খ্রীঃ শিলমোহরে (পুরানো বন্দোবস্তের নিশানায়) ওয়ারেন্ হেস্টিংসের স্বাক্ষর সম্বলিত ১০ ডিসেম্বর, ১৭৭৮ খ্রীঃ তারিখের এক 'বন্দোবস্ত নামায়', সেওড়াফুলী জমিদারীর খাজনা ও সীমানার কথা জানতে পারা যায়।

২। গিরীন্দ্রচন্দ্রের সময়ে সেওড়াফুলীর জমিদারীর কিছু অংশ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কিনে নেন।

ন্যায়-নিষ্ঠ ও শক্তিশালী রাজপুরুষ। গিরীন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র কন্যা নিরুপমা দেবী। বিবাহ হয় ভাগলপুরের গিরীশচন্দ্র ঘোষ বর্ম্মণের সঙ্গে। নিরুপমা দেবী শেওড়াফুলীর বাড়ীতেই আজীবন অতিবাহিত করেন। মারা যান ১৯১০ খ্রীঃ।

রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্রের উত্তরাধিকারী দৌহিত্র **নির্মলচন্দ্র ঘোষের** জন্ম হয় ১৮৮৫ খ্রীঃ। প্রকৃতপক্ষে মাতামহী ললিতাসুন্দরী নির্মলচন্দ্রকে লালন-পালন করেন। নিরুপমা দেবীর আরও তিনটি কন্যা ছিল। গিরীন্দ্রচন্দ্র মারা যান ১৮৯৬ খ্রীঃ। নির্মলচন্দ্রের বিবাহ হয় বীরভূম জেলার সাঁইথিয়ার হরিষবা গ্রামের জমিদার বাড়ীর কন্যার সঙ্গে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন-এর স্নাতক। মৃত্যু হয় ১৯৫৮ খ্রীঃ। তাঁর পাঁচপুত্র—অনিল, সুনীল, সলিল, নিখিল ও সুশীল—সকলেই বাস করেন রাজ বাড়ীর[১] বড় তরফের অংশে। এই পরিবারের সলিলচন্দ্র রাজবাড়ীতে একটি সঙ্গীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন।

রায় রাজপরিবারে **'ছোট তরফ'**-এর **রাজা পূর্ণচন্দ্র** (দত্তক) একজন বিদ্যানুরাগী, বিলাস-প্রিয় ও সৌখীন মানুষ। তিনি জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই কলকাতায় অতিবাহিত করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৩ খ্রীঃ। তাঁর একমাত্র পুত্র নরেন্দ্রচন্দ্র। নরেন্দ্রচন্দ্রও পিতার ন্যায় কলকাতায় থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর তিন পুত্র। তৃতীয় পুত্র মুর্শিদাবাদের পাঁচথুপী জমিদারী বংশের দত্তক পুত্র। প্রথম পুত্র সরসীচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পুত্র সুধীরচন্দ্র। সরসীচন্দ্রের দুই পুত্র পরন্তপ ও দীপম (স্বল্পায়ু)। পরন্তপ রায় কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী। সেওড়াফুলীতে পৈত্রিক বাসভবনে (নয়া মঞ্জীল) বসবাস করেন। সরসীচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুধীরচন্দ্রের চার পুত্র—প্রমথেশ, প্রণয়েশ, প্রভাবেশ ও শুদ্ধধন। বৈদ্যবাটীতে রাণী স্বর্ণময়ীর (নাতি) দান-সূত্রে পাওয়া 'রাজবাগ'-এ বাস করেন।

১। বর্তমানে বিশাল রাজবাড়ীর বেশ কিছু অংশ ভগ্নপ্রায় হলেও, নির্মলচন্দ্র ও সরসীচন্দ্রের উদ্যোগে সংলগ্ন দেবালয় ও মন্দিরের সংস্কার হওয়ায় এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে এখনও কালীপূজা ও শারদীয়া দুর্গা পূজা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

রাজা রামচন্দ্র সেন

বলাগড়, হুগলী

হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত 'সোমড়া' একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম, 'সোমড়-বাজার' রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে এক মাইল দূরত্বে। হাওড়া—বারহারওয়া রেলপথের একটি ষ্টেশন। আনুমানিক সতেরো শতকের শেষ দশকে নদীয়ার 'রেউই' গ্রামের (বর্তমান কৃষ্ণনগর) কাছে নেদেরপাড়ায় রাজা রামচন্দ্র সেনের পূর্বপুরুষ **রামরাম সেনের** বসতি ছিল। নদীয়ায় তৎকালীন রাজা ছিলেন জীবানন্দ মজুমদার। রামরাম সেনের দুইপুত্র —শিবরাম ও অযোধ্যারাম। শিবরামের পুত্র **কৃষ্ণরাম সেন**। বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন সেন পরিবারের সঙ্গে কৃষ্ণনগরের রায় রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশেষ করে, কৃষ্ণরাম সেন, তাঁর সঙ্গে রাজপরিবারের অন্তরঙ্গতার সুযোগে অন্দর-মহলে রানীদের কাছেও প্রয়োজনে উপস্থিত হতেন। কৃষ্ণরাম নদীয়ার যোদ্ধা রাজা রঘুরামের বিশেষ প্রীতিভাজন ও পরামর্শদাতা ছিলেন।

রাজা রঘুরাম বিশেষ কোন কারণে তাঁর পুত্র **কৃষ্ণচন্দ্রকে** বঞ্চিত করেন, তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই রামগোপালকে জমিদারীর উত্তরাধিকারী করে যান। কৃষ্ণচন্দ্রের মাতা, পুত্রের অসহায় অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কৃষ্ণরামের সাহায্য প্রার্থী হন। কৃষ্ণরামের সহায়তায় ও অনৈতিক কৌশলে[1] নবাবের দরবারে ন্যায় বিচার প্রার্থী কৃষ্ণচন্দ্রকে হাজির করেন। নবাবের বিচারে কৃষ্ণচন্দ্রই জমিদারীর অধিকারী হলেন। কৃষ্ণরামের প্রতিপত্তি নদীয়ার রাজপরিবারে আরও বেড়ে গেল। বয়োজ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত কৃষ্ণরাম কৃতজ্ঞ কৃষ্ণচন্দ্রেরও পরামর্শদাতা হয়েছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণরামের ব্যতিহার কৃষ্ণচন্দ্র সহ্য করেননি, নগণ্য অভিযোগে কৃষ্ণরামকে একমাস কারাবাসের আদেশ দেন।

কৃষ্ণরামের কনিষ্ঠ পুত্র **রামচন্দ্র সেন**। তিনি সুদর্শন, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান পুরুষ। নবাব দরবারের মুন্সী ও আমলাদের বিশ্বস্ত ও সুদক্ষ কর্মী। রামচন্দ্র তাঁর পিতার অপমানের (কারাবাস) প্রতিশোধ নিতে ভোলেননি। নবাব ও দিল্লীর বাদশাহের অনুমতি ও সাহায্যে, রামচন্দ্র সসৈন্যে কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী অবরোধ করে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাবাসে পাঠান। শীঘ্রই অবশ্য, পিতার আদেশে কৃষ্ণচন্দ্রকে মুক্তি দেন। আর একবার নদীয়া জমিদারীর রাজস্ব না দেওয়ার অভিযোগে ও নবাব আলিবর্দীর আদেশে, রামচন্দ্র বিশেষ কৌশলে কৃষ্ণচন্দ্রকে বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে হাজির করেন। সেই সময়ে নবাব দরবারে

[1] এই প্রসঙ্গে 'নদীয়ার রাজপরিবার' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

রামচন্দ্রের প্রভাব ছিল তুঙ্গে। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান হন। 'রাজা' ও 'রায় রায়ান' উপাধিতে ভূষিত হন।

যে কোন কারণেই হোক, রাজা রামচন্দ্র সেন মুর্শিদাবাদ-দরবারে অপ্রিয় হওয়ায়, তাঁকে রাজধানী মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করতে হয়। সঙ্গত কারণে, তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরুদ্ধাচরণের (১৭৪২ খ্রীঃ) জন্য কৃষ্ণনগরবাসীদের কাছেও অপ্রার্থীত ব্যক্তি হন। হুগলী জেলায় গুপ্তিপাড়ায় 'বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ'র দেবসেবার সেবাইত মধুসূদানন্দ ভাগীরথী তীরে সোমড়া গ্রামে বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর মঠের কয়েক বিঘা জমি রাজা রামচন্দ্রকে ও তাঁর ভাই দেওয়ান রামশঙ্কর সেনকে বসবাসের জন্য দান করেন। রামচন্দ্র এখানে বিরাট অট্টালিকা[১] ও প্রয়োজনীয় বিভিন্ন আবাসস্থল তৈরী করে বসবাস শুরু করেন ১৭৪২-৪৩ খ্রীঃ। বেশ কিছুকাল পরে তিনি সম্পূর্ণ সোমড়া গ্রামটি দখল করার জন্য সচেষ্ট হন। মঠের ক্ষিপ্ত সন্ন্যাসীরা ৫ আগষ্ট, ১৭৭৫ খ্রীঃ রামচন্দ্রের বাসভবনের ক্ষতি করেন। প্রতিরোধে রামচন্দ্রের মহিয়সী স্ত্রী চাঁদরানী স্বয়ং অংশ নেন। রাজা রামচন্দ্র মধুসূদানন্দের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণ বাবদ তিন লক্ষ টাকার দাবীতে কলকাতায় চিৎপুরে নবাবের আদালতে নালিশ করেন। সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ না পেলেও পূর্বের মান-সম্মান ফিরে পান।

১৭৭৯ খ্রীঃ মুর্শিদাবাদে কাল্সার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অবৈধ আদান-প্রদানের অভিযোগে গদীচ্যুত হন। রাজা রামচন্দ্র সেন, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিসের (সুপ্রীম কাউন্সিল-এর সভ্য) আনুকূল্যে ঐ পদে বহাল হন। পরশ্রীকাতর ও হিংসাপরায়ণ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে এসে, রামচন্দ্র সেনকে হেনস্তা করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যু হয় আনুমানিক ১৭৯৪ খ্রীঃ। তাঁর প্রত্যক্ষ বংশধর ও দৌহিত্র সন্তানরা এই অঞ্চলে এখনও বসবাস করেন।

রাজা রামচন্দ্র সেন জগদ্ধাত্রী 'নবরত্ন' মন্দির ১৭৫৫ খ্রীঃ, মহাবিদ্যা 'পঞ্চরত্ন' মন্দির ১৭৬৫ খ্রীঃ সোমড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেন। আজও মন্দির দু'টি অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণনগরের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজার প্রভাব সঙ্গত কারণে রাজা রামচন্দ্র সেনকে প্রবুদ্ধ করেছিল সোমড়ায় দুর্গাপূজার[২] সূচনায়। প্রায় ২৪০ বছরের এই পূজায় দুর্গা প্রতিমার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তিনি দশভূজা, কিন্তু আটটি মাত্র হাত সামনে দেখা যায়। আর বাকী দুটি হাত পেছনে অদৃশ্য থাকে। পূজাটির ঐতিহ্য এখনও বজায় রেখেছেন তাঁর বংশধর ও গ্রামবাসীরা।

১। ভগ্নদশাপ্রাপ্ত রাজপ্রাসাদে একটি প্রস্তর ফলকে লেখা আছে—'Here lived Rai Rayan Raja Ram Chandra, Dewan Bengal, Bihar, Orissa.' দেওয়ান রামশঙ্কর সেনের পৃথক বাসভবনের ভগ্নাবশিষ্টও রয়েছে। সোমড়ায় উনিশ শতকে তৈরী আনন্দ ভৈরবী মন্দির এখানকার দ্রষ্টব্যগুলির অন্যতম।

২। দুর্গাপূজা—সেকাল থেকে একাল—বিমলচন্দ্র দত্ত পৃঃ ১৫৭ দ্রষ্টব্য।

উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় রাজপরিবার

হুগলী

ভাগিরথীর পশ্চিম তীরে উত্তরপাড়া, হুগলী জেলায় খুব প্রাচীন গ্রাম না হলেও, বর্তমানে কলকাতার শহরতলীর একটি বিশিষ্ট অঞ্চল। বালি-উত্তরপাড়া ছিল অভিন্ন, কিন্তু ১৮৪৫ খ্রীঃ বালি খাল খননের ফলে গ্রাম দুটির পৃথকী-করণ হয়। খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের শেষভাগে, ২৪ পরগণার বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের রত্নেশ্বর রায় উত্তরপাড়ায় ব্রাহ্মণ-বসতির সূত্রপাত করেন। সংলগ্ন গ্রাম গবলগাছার রামনিধি চট্টোপাধ্যায় রায় বংশের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তাঁর জামাতা খামারগাছীর **নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়** উত্তরপাড়ার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশের সূচনা করেন। নন্দগোপালের ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তি থাকায় ঢাকায় নবাবী সেরেস্তায় নিযুক্ত ছিলেন। নন্দগোপালের ষোলটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন। তাঁর অন্যতমা স্ত্রী শিবানীর গর্ভে **জগমোহনের** জন্ম হয় আনুঃ ১৮০০ খ্রীঃ। জগমোহন কলকাতায় 'কমিসারিয়েট অফিসে' কেরানীর কাজ করতেন। পরে ১৮২৪-২৫ খ্রীঃ রাজস্থানে ভরতপুর অবরোধের সময় ইংরাজ গোরাদের বেনিয়ান ছিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় যথেষ্ট ধনের অধিকারী হন। তাঁর তিন পত্নীর গর্ভে পাঁচ পুত্র—জয়কৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, নবকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, নবীনকৃষ্ণ। জগমোহনের কর্মসূত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণের সুবাদে, তাঁর পুত্রদেরও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছিল। ১

জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের জেষ্ঠ্য পুত্র **জয়কৃষ্ণের** জন্ম হয় ২৪ আগষ্ট, ১৮০৮ খ্রীঃ। তিনি গৃহ-শিক্ষকের কাছে লেখা পড়া-শুরু করেন। কোন কলেজে পড়েননি বা ইউনিভার্সিটির কোন ডিগ্রী তাঁর ছিল না। জ্ঞান-পিপাসু হওয়ায় সাহিত্য (ইংরাজী ও বাংলা) এবং বিজ্ঞানে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেন। তিনি পিতার ন্যায় ইংরাজ সেনাবিভাগে 'পে মাস্টার'-এর কাজ করতেন ও পরে হুগলীর মহাফেজখানার অধিকারী হন। ১৮৩০ খ্রীঃ অবসর গ্রহণের পরে কয়েকটি জমিদারী কেনেন। সেনাবিভাগে কর্মরত অবস্থায় একাধিক ইংরাজ রাজকর্মচারীর (হেনরী হাভলক্) সংস্পর্শে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। সেনাবিভাগের সহকর্মীদের টাকা-পয়সা ধার দিয়ে তেজারতি করবার করেছিলেন। পুরানো বিরাট রাজবাড়ী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর আমলে।

১। A Bengal Zamindar—Nilmoni Mukherjee. 1975.

জয়কৃষ্ণের বিবাহ হয় পার্বতী দেবীর সঙ্গে। পরিবারের তিনিই প্রথম বহু-বিবাহ প্রথা বর্জন করেন। তাঁর তিন পুত্র—হরমোহন, **প্যারীমোহন** ও রাজমোহন। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৩৮ খ্রীঃ 'জমিদারী সভার' সভ্য হন ও জনসমক্ষে সেবামূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। উত্তরপাড়ায় [১] লাইব্রেরী, বিদ্যালয় (১৮৪৬ খ্রীঃ), মিউনিসিপ্যালিটি (১৮৫৩ খ্রীঃ), বালিখাল ব্রীজ (১৮৪৬ খ্রীঃ), পুরানো বেনারস রোডের আমূল সংস্কার, অহল্যাবাঈ রোড তৈরী (১৮৪০ খ্রীঃ) প্রভৃতি বহু জনহিতকর কাজে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি ২৯ জুলাই, ১৮৫৩ খ্রীঃ ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে সংবাদপত্রের মত স্বাধীনতা, বিধবা বিবাহের প্রচলন এবং আরও কয়েকটি বিষয়ে জনগণের বক্তব্য তুলে ধরেন, তাঁর সারগর্ভ ভাষণের মাধ্যমে। তিনি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' (২৯ অক্টোবর, ১৮৫১ খ্রীঃ) সক্রিয় সদস্য ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে (১৮৫৭ খ্রীঃ) সরকারকে সবরকম সাহায্য করেন। এই কর্মময় জীবনের স্বীকৃতি তিনি রাজদরবার থেকে পাননি, কারণ ১৮৬২ খ্রীঃ একটি জালিয়াতির মকদ্দমায়[২] জয়কৃষ্ণ জড়িয়ে পড়েন ও পাঁচ বছর জেল হয়। তবে ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ তাঁকে 'সার্টিফিকেট অব অনার' দেওয়া হয়েছিল। আশী বছর বয়সে অন্ধ অবস্থায় ১৯ জুলাই, ১৮৮৮ খ্রীঃ তাঁর জীবনের অবসান ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে পুরানো গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম **'জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী'** প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫ এপ্রিল, ১৮৫৯ খ্রীঃ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এখানে কিছুদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন (জুন, ১৮৭৩ খ্রীঃ)। ঋষি অরবিন্দও এই লাইব্রেরীতে এসেছিলেন ১৯০৮ ও ১৯০৯ খ্রীঃ।

রাজা প্যারীমোহন

জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র প্যারীমোহনের (রাজা) জন্ম হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৪০ খ্রীঃ। উত্তরপাড়া স্কুলে বিদ্যারম্ভ হয়। হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সী কলেজ) থেকে স্নাতক হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। এম. এ., বি. এল. (১৮৬৪-৬৫ খ্রীঃ) পাশ করার পর কয়েক বছর কলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য (১৮৮৪-৮৬ খ্রীঃ) ও বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য (১৮৭৯-১৯০৬ খ্রীঃ)। একাধিকবার 'জমিদার সভার' সভাপতি ছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ মহারানী

১। রাজবাড়ীতে পৈত্রিক আমলের দুর্গাপূজা দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে এখনও অনুষ্ঠিত হচ্ছে অন্যত্র। কারণ, রাজবাড়ীর অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেছে, সেখানে হাসপাতাল হয়েছে। জয়কৃষ্ণ স্ট্রীট ও রাজা প্যারীমোহন স্ট্রীট নামে উত্তরপাড়ার দু'টি প্রধান রাস্তা তাঁদের স্মরণিক।

২। বৈষয়িক কাগজপত্র জাল করার ব্যাপারে তাঁর বৈমাত্র ভ্রাতা বিজয়কৃষ্ণের বৈরিতায়, জয়কৃষ্ণের জেল হয়েছিল, কিন্তু মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার অনেক আগেই তিনি মুক্তি পান।

ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে এক বিশেষ দরবারে বড়লাট লর্ড লিটন প্যারীমোহনকে 'রাজা' ও 'সি. এস. আই.' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজা প্যারীমোহন অনেক সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর দান উত্তরপাড়া ও বাংলার বহু স্থানে ছড়িয়ে আছে। ১৯০৫ খ্রীঃ স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। একাধিকবার 'ব্রিটিশ-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। 'বেঙ্গল টেনান্সী বিল'-এর সম্বন্ধে তিনি যে বক্তব্য রেখেছিলেন, তাতে তাঁর 'রাজস্ব' বিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি 'মধ্যপন্থী' রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। জানুয়ারী ১৯১২ খ্রীঃ, কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রাজা প্যারীমোহন নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম। রাজা প্যারীমোহনের তিন পুত্র রাজেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ ও জিতেন্দ্রনাথ। তাঁর জীবনের অবসান ঘটে ১৬ জানুয়ারী, ১৯২২ খ্রীঃ।[১]

রাজা প্যারীমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার **রাজেন্দ্রনাথ** (১৮৭৫-১৯১১ খ্রীঃ) একজন সুপরিচিত তান্ত্রিক সাধক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে তৎপর ও ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কারক। তিনি পরোক্ষভাবে বাংলার বিপ্লবীদের সাহায্য করেছেন। তাঁর চার পুত্র, তারকনাথ, লোকনাথ, অমরনাথ ও চন্দ্রনাথ।

রাজা প্যারামোহনের দ্বিতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রের পাঁচ পুত্র—পঞ্চানন, যোগেশ, গনেশ, প্রভাস ও তপতী। কনিষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্রের চার পুত্র—সুরেশ, পরেশ, প্রবাল ও মনোমোহন। রাজা প্যারীমোহনের পৌত্র তারকনাথ প্রাক-স্বাধীনতাকালে বাংলার মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। লোকনাথের একমাত্র পুত্র শক্তিনাথ, কলিকাতা হাইকোর্টের যশস্বী আইনজীবী। অমরনাথের দুই পুত্র রমেন্দ্র ও সোমেন্দ্র। চন্দ্রনাথের এক পুত্র সতীনাথ।

রাজা জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায়

উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা নন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র রাজকৃষ্ণের (জয়কৃষ্ণের ভ্রাতা) জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিহর। সুপ্রতিষ্ঠিত জমিদার হরিহরের পুত্র জ্যোৎকুমারের জন্ম হয় ১৮৪৮ খ্রীঃ উত্তরপাড়ায় তাঁর পৈত্রিক সুদৃশ্য রাজবাড়ীতে। গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া করেছেন। স্কুল-কলেজের প্রচলিত শিক্ষা না পেলেও, নিজস্ব মেধা, বুদ্ধি ও চর্চার সাহায্যে সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় নৈহাটীর কাঁটালপাড়া (ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বাস্তুভিটা) গ্রামের শ্যামাচরণ

১। রাজা প্যারীমোহন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট পড়াশোনা করে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। রাজবাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়ে তিনি স্বহস্তে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন।

চট্টোপাধ্যায়ের কন্যার সঙ্গে। বিত্তশালী জমিদার জ্যোৎকুমার শিক্ষা ও ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় অকাতরে ব্যয় করেছিলেন। ধর্মশাস্ত্র, সঙ্গীত, কাব্য ও সাহিত্য-চর্চার জন্য বহু পণ্ডিত, গায়ক, কবি ও গ্রন্থকারদের বৃত্তির [১] ব্যবস্থা করেছিলেন। সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারে তাঁর প্রবল উৎসাহ ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১১ খ্রীঃ) তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল। জ্যোৎকুমারের উপস্থিতিতে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে ১৯০৮ ও ১৯০৯ খ্রীঃ শ্রীঅরবিন্দ জাতীয়বাদ সম্বন্ধে দুটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। [২] মহাসমারোহে রাজা জ্যোৎকুমার পৈত্রিক বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজা করতেন।

রাজা জ্যোৎকুমারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও দানে ১,৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে উত্তরপাড়া শহরে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। তা ছাড়া, হুগলী, শ্রীরামপুর, হাওড়া এবং কলকাতার লেডি ডাফরিন ও কারমাইকেল—হাসপাতালগুলিতে তাঁর যথেষ্ট দান আছে। কলকাতার রিপন কলেজ ভবনের নির্মাণে তাঁর অর্থ সাহায্য রয়েছে। হাওড়া শহরে সরকারী জমিতে প্রতিষ্ঠিত প্রথম পাবলিক লাইব্রেরী (ডিউক লাইব্রেরী) ভবনের নির্মাণ ও পুস্তক সংগ্রহার্থে তিনি ২২,০০০ টাকা দান করেছিলেন। স্বীয় জমিদারীর মধ্যে প্রায় চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাজাপুর ক্যানেল খনন করান প্রজাদের কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য। জ্যোৎকুমারের সদ্‌গুণ ও সমাজ-সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ ইংরাজ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' (১৯১১ খ্রীঃ) ও 'রাজা' (১৯১৫ খ্রীঃ) উপাধিতে সম্মানিত করেন। অগাধ ঐশ্বর্যের মধ্যে থেকেও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ, দানবীর রাজা জ্যোৎকুমারের দেহাবসান ঘটে ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ খ্রীঃ (২৮ মাঘ, ১৩২৭ সন)।

রাজা জ্যোৎকুমারের একমাত্র পুত্র কুমার সনৎকুমার (১৮৮৮—১৯৫৪ খ্রীঃ)। পিতার ন্যায় তিনিও বহু দানভার বহন করেছেন। ১২ মে, ১৯০৩ খ্রীঃ বীরভূম জেলার হেতমপুরের রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তীর একমাত্র কন্যার সহিত বিবাহ হয়। তাঁদের একমাত্র পুত্র প্রসাদকুমার। প্রসাদকুমারের এক কন্যা গীতারাণী। সনৎকুমারের দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একমাত্র পুত্র—সুদর্শনকুমারের জন্ম ২০ এপ্রিল, ১৯৪৯ খ্রীঃ। বর্তমানে ১৪৪, শরৎ বোস রোড, ভবানীপুরে বসবাস করেন। তাঁর দুই পুত্র—সুশ্রীক ও সৌভিক।

১। তাঁর অর্থানুকুল্যে হাওড়ার স্বনামখ্যাত দুর্গাদাস লাহিড়ীর "পৃথিবীর ইতিহাস" প্রকাশিত হয়।

২। ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ খ্রীঃ কলকাতায় চিকাগো প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় জ্যোৎকুমার উপস্থিত ছিলেন।

৩। ১৯১১ খ্রীঃ নয় কাঠা জমির উপরে তৎকালীন বাংলার গভর্নর স্যার উইলিয়াম ডিউক গ্রন্থাগার ভবনটির ভিত্তিস্থাপন করেন।

শ্রীরামপুরের গোস্বামী রাজপরিবার

হুগলী

বাংলার নবাবশাহী আমল ও পরে ইংরাজ বণিকদের শাসনকালে হুগলী জেলায় বাঁশবেড়িয়া, শেওড়াফুলী, উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি অঞ্চলের ইতিহাসে স্থানীয় মুখ্য জমিদারদের (রাজা) জীবন-বৃত্তান্ত এই অধ্যায়ের আলোচনার বিষয়। শ্রীরামপুরের রাজপরিবারের ইতিকথা পূর্বোক্ত শেওড়াফুলী রাজপরিবারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শেওড়াফুলীর **রাজা মনোহরচন্দ্র রায়** (মৃত্যু আনু: ১৭৬০ খ্রী:) তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিম তীরে শ্রীপুরে শ্রীরামচন্দ্র মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৭৫২ খ্রী:। অধিষ্ঠিত দেবতা শ্রীরামচন্দ্রের নামানুসারে শ্রীরামপুর নামকরণ হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ৮ অক্টোবর, ১৭৫৫ খ্রী: রাজা মনোহরচন্দ্র শ্রীপুর সহ পাঁচটি গ্রামের চিরস্থায়ী পাট্টা দেন দিনেমার বণিকদের বার্ষিক ১৬০১ টাকা খাজনায়। বণিকরা শ্রীপুরের নাম পরিবর্তন করে 'ফ্রেডরিক্ নগর' নাম দেয় ডেন্মার্কের রাজা পঞ্চম ফ্রেডরিকের নাম অনুযায়ী। এখানে দিনেমার বণিকদের স্থায়ী বসতি ছিল প্রায় ৯০ বছর। 'ফ্রেডরিক্ নগর' ও আরও দুটি অঞ্চল দিনেমাররা ১১ অক্টোবর, ১৮৪৫ খ্রী: ইংরাজ সরকারকে বিক্রি করে দেয় ১২ লাখ ২৫ হাজার টাকায়। 'ফ্রেডরিক্ নগর' বা শ্রীরামপুর কেবল বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠেনি, পশ্চিম বাংলার বিদ্যাচর্চার ও ইউরোপীয় শিক্ষা পদ্ধতির বিস্তারের প্রাণকেন্দ্র হিসাবেও চিহ্নিত হয়েছিল। খ্রীশ্চান ইউরোপীয় মিশনারীরা কেবল যে, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তা নয়, বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ও বাংলা ভাষার প্রসারের স্বার্থে বাংলা মুদ্রণ-শিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর জন্য ডঃ উইলিয়াম কেরী (১৭৯৩-১৮৩৪ খ্রী:) মার্সম্যান, উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৯৯ খ্রী:) প্রমুখ মিশনারীরা আমাদের কাছে অমর হয়ে আছেন।

প্রথমেই বলা হয়েছে শ্রীরামপুরের শ্রীরাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কথা। এই মন্দিরের প্রথম পুজারী-ব্রাহ্মণ **রাধাগোবিন্দ মিশ্র** (চক্রবর্তী)। রাজা মনোহর রায় রামগোবিন্দকে শ্রীরামপুরে ব্রহ্মোত্তর জমি দিয়ে মন্দিরের পূজা-পার্বণের ভার তুলে দেন। রামগোবিন্দের পূর্বপুরুষ জয়রাম মিশ্র ও তাঁর পুত্র বিখ্যাত তান্ত্রিক-ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ মিশ্র বর্ধমানে পাটুলি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবারকে প্রথমে বিষ্ণুপুরের রাজারাই তাঁদের বৈষ্ণব মন্দিরে পূজারী হিসাবে নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণ মিশ্র বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামার সময় (১৭৪২-৫১ খ্রী:) নবাব আলিবর্দী খানের ও মারাঠা

বর্গী সর্দারদের (ভাস্কর পণ্ডিত) সঙ্গে আঞ্চলিক চুক্তি বা সন্ধির মধ্যস্থতা করেছিলেন। তাঁর কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে নবাব লক্ষ্মণ মিশ্রকে 'চক্রবর্তী' উপাধি দেন। লক্ষ্মণ চক্রবর্তীর পুত্র রামগোবিন্দ বিবাহ করেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিষ্য-বংশের কন্যাকে। স্থানীয় পণ্ডিত সমাজ তাঁকে 'গোস্বামী' উপাধি দেন তাঁর সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির জন্য।

রামগোবিন্দ গোস্বামীর দুই পুত্র, রামগোপাল ও রাধাকান্ত। এঁদের জন্ম হয় শ্রীরামপুরে। সেই অক্ষত জন্ম-ভিটাটি এখনও দেখা যায়। রাধাকান্তের দুই পুত্র—রামনারায়ণ ও হরিনারায়ণ।[১] হরিনারায়ণ গোস্বামী শ্রীরামপুরের দিনেমার কোম্পানীর শুল্ক বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। হরিনারায়ণের দুই পুত্র—রাঘবরাম ও রঘুরাম। রাধাকান্তের জ্যেষ্ঠপুত্র রামনারায়ণ ইংরাজ কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর সময় (১৭৯৩ খ্রীঃ) আসামের দেওয়ান ছিলেন। এই সময়ে গোস্বামী পরিবার প্রভূত ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হন। রঘুরাম গোস্বামীর দুই পুত্র—গঙ্গাপ্রসাদ ও গোপীকৃষ্ণ।

রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী

গোপীকৃষ্ণ গোস্বামীর তৃতীয় পুত্র কিশোরীলাল-এর জন্ম হয় নভেম্বর, ১৮৫৩ খ্রীঃ। শৈশবে কিশোরীলাল বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হন পারিবারিক ধর্মীয় পরিবেশের সুবাদে। ধার্মিক ও সচ্চরিত্রের যুবক কিশোরীলাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ও কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ল-কলেজ থেকে এম. এ., বি. এল. পাশ করেন। কলকাতা হাইকোর্টে কয়েক বছর ওকালতি করেছিলেন। নিজস্ব পরিবারের বিষয়-সম্পত্তি ও ব্যবসার তাগিদে আইন ব্যবসা ছাড়তে বাধ্য হন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' ও 'জমিদার সভা'র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বঙ্গীয় আইন-পরিষদের সভ্য। ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রথম মনোনীত ভারতীয় সদস্য ছিলেন। তাঁর দানের টাকায় শ্রীরামপুর কলেজ ও মিউনিসিপ্যালিটির পানীয় জল সরবরাহ সম্ভব হয়। তাঁর সমাজসেবা ও কর্মদক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে, ইংরাজ সরকার ১ জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। জানুয়ারী ১৯১১ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী নিমন্ত্রীত অতিথিদের অন্যতম। তাঁর দেহাবসান ঘটে ৫ জানুয়ারী, ১৯২৩ খ্রীঃ।

রাজা কিশোরীলালের দুই স্ত্রী, প্রথমা কুমুদিনী দেবী ও দ্বিতীয়া কুসমণি দেবী।

১। রামনারায়ণ ও হরিনারায়ণের সময়ে পুরানো রাজবাড়ীতে কুলবিগ্রহ 'রাধামোহন জীউ' প্রতিষ্ঠিত হন। রাসমণ্ডপ তাঁদেরই তৈরী। আদি ঠাকুরবাড়ী (সম্পূর্ণ দেবোত্তর সম্পত্তি) রঘুরাম গোস্বামীর সৃষ্টি। এই প্রাচীন বিগ্রহ ('রাধামোহন জীউ') বিষ্ণুপুরের রাজাদের দেওয়া উপহার।

প্রথমার গর্ভে দুই পুত্র—অমূল্যচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র, দ্বিতীয়ার গর্ভে এক পুত্র ও এক কন্যা—তুলসীচন্দ্র ও সরলাদেবী। পূর্ণচন্দ্রের অকাল মৃত্যু হয়। অমূল্যচন্দ্রের পৌত্র তপনকুমার। তুলসীচন্দ্রের একমাত্র কন্যা অসীমা গোস্বামী।

রাজা কিশোরীলালের তৃতীয় পুত্র **তুলসীচন্দ্র** গোস্বামী রাজপরিবারের একজন কৃতী সন্তান। জন্ম হয় ১৮ জুন, ১৮৯৮ খ্রীঃ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক; অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও নামী ব্যারিষ্টার। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য পার্টিতে যোগ দেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর অন্যতম সহযোগী হওয়ায় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য ও বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য। শ্রীরামপুরের বিখ্যাত লাইব্রেরী ও মিউনিসিপ্যালিটির বাড়ী তুলসীচন্দ্র তাঁর পিতা রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে বহু অর্থব্যয়ে তৈরী করে দেন। তিনি বাংলায় ১৯৪৩ খ্রীঃ নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর দেহাবসান হয় ৩ জানুয়ারী, ১৯৫৭ খ্রীঃ।

ভুরশুটের রায় রাজপরিবার

প্রাচীন ভুরশুট বা ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্য দক্ষিণরাঢ়ের একটি সুসমৃদ্ধ নগর। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ রাজা টোডরমল সুবে বাংলার রাজস্ব খতিয়ান ও আবুলফজলের আইন-ই-আকবরীতে (১৫৯০) খ্রীঃ ভুরশুটের নাম পাওয়া যায়। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চতুরানন নিয়োগী। এই বংশের রাজা কৃষ্ণরায় (১৫৮৩-৮৪ খ্রীঃ) সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে ছিলেন। বংশের খ্যাতিমান রাজা প্রতাপনারায়ণ রায়ের (১৬৫২-৮৪ খ্রীঃ) নাম, রামদাস আদক রচিত 'আদিমঙ্গল' কাব্য-গ্রন্থে (১৬৬২ খ্রীঃ) উল্লিখিত আছে। প্রতাপনারায়ণের পুত্র রাজা নরনারায়ণ ও তাঁর পুত্র বড়তরফের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ রায় ১৭১২ খ্রীঃ। ছোট তরফের রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র ও নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-৬০ খ্রীঃ) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন :—

"ভুরশুট পরগণায় নৃপতি নরেন্দ্র রায়
মুখটি বিখ্যাত দেশে দেশে।
ভারত তনয় তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' সার
কহে কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে॥"

বর্ধমানের প্রতাপশালী জমিদার কীর্তিচাঁদ। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭ খ্রীঃ) পর বাংলায় শাসন-ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। সেই সুযোগে কীর্তিচাঁদ বলপ্রয়োগে ভুরশুট সমেত কমপক্ষে পাঁচটি জমিদারী দখল করেন। সেই সময় ভুরশুট জমিদারীর অন্তর্গত ছিল হুগলী, হাওড়া ও মেদিনীপুরের কয়েকটি অঞ্চল। রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় গদীচ্যুত হন। এই বংশের স্মরণীয়া রাণী ভবশঙ্করী, যশস্বিনী 'রায়বাঘিনী' নামে প্রসিদ্ধা।

মেদিনীপুর ও কয়েকটি খেতাবী রাজপরিবার

মেদিনীপুরের প্রাচীনত্বের ও ঐতিহ্যের সাক্ষী অতীতের তাম্রলিপ্তি বন্দরনগর, অধুনা তমলুক। বহু বিদেশী নাবিক, পর্যটক ও ঐতিহাসিক এই তাম্রলিপ্তি শহরের জাঁকজমক ও ব্যস্ততা দেখেছেন ও লিখে গেছেন। মেদিনীপুর দেখেছে একের পর এক হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজবংশের উত্থান-পতন। আরও দেখেছে, মুসলমান রাজশক্তির আধিপত্য বিশেষ করে, বাংলার **আফগান সুলতানদের** (সুলেমান কররানী ১৫৬৫-৭২ খ্রীঃ) মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি রাজা তোড়রমল্ল ও মুনিম খান এবং পরে দাউদ খান কররানীর (১৫৭৩-১৫৭৬ খ্রীঃ) মধ্যে সংঘর্ষ। মেদিনীপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। 'আইন-ই-আকবরীতে' আনুঃ (১৫৯০ খ্রীঃ) মেদিনীপুর, উড়িষ্যার জলেশ্বর সরকারের অন্তর্গত বড় শহর বলে উল্লেখ আছে। এখানে ১৬২২ খ্রীঃ মোগল সম্রাট-পুত্র খুররম (শাহ্‌জাহান) তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রায় দু'বছর শাসন চালিয়েছিলেন। ১৬২৪ খ্রীঃ তাঁকে মেদিনীপুর পরিত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়। বাংলার সুবাদার শাহজাদা শাহ্-সুজা (১৬৪৬-৬৮ খ্রীঃ) উড়িষ্যা থেকে সরকার জলেশ্বরকে বাংলার অন্তর্ভুক্ত করেন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও মেদিনীপুরের বিশেষ গুরুত্ব ছিল লবনমহলগুলির জন্য। ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠী হিজলী, তমলুক, কাঁথি, মহিষাদল ও অন্যান্য আরও কয়েকটি জায়গায় বাণিজ্য-কুঠী তৈরী করেছিলেন। ইংরাজ বণিকগোষ্ঠীর নেতা জব্ চার্ণক ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৬৮৭ খ্রীঃ হিজলীতে সামরিক শিবির গড়ে, মুঘল সৈন্যের সম্মুখীন হতে দ্বিধা করেননি। দু'পক্ষের মধ্যে বোঝাপড়া হওয়ায় কোন যুদ্ধ হয়নি। ১৬৯৬-৯৭ খ্রীঃ রাজা শোভা সিংহ ও তাঁর সহযোগীদের মোগল শক্তির বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। ঘাটাল, ক্ষীরপাই, রাধানগর ও সোনামুখীতে ফরাসী, ডাচ্ ও ইংরাজদের কুঠী ছিল।

১৬৯৬ খ্রীঃ স্থানীয় চেতুয়াবরদায় জমিদার **রাজা শোভা সিংহ** ও তাঁর সহযোগী উড়িষ্যার আফগান সর্দার রহিম খান ও হিম্মৎ সিংহ মোগল শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সৈন্যদের পর্যুদস্ত করেন। গঙ্গার পশ্চিম তীরের বিরাট এলাকা (সুতানুটি থেকে মুখসুসাবাদ) সামরিকভাবে অধিকার করেন। যদিও পরে, এই বিদ্রোহ তৎকালীন বাংলার সুবাদার আজি-মুস্-শান সম্পূর্ণভাবে দমন করেন। বাংলার প্রথম নবাব-নাজিম মুর্শিদকুলী খানের সময়ে (১৭০৩-২৭ খ্রীঃ) মেদিনীপুরে তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ সংঘর্ষ ঘটেনি। আলিবর্দী খানের সময়ে (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) মারাঠা বর্গীদের ক্রমাগত

আক্রমণের (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) ফলে, মেদিনীপুরের শান্তি ও সমৃদ্ধি বিপর্যস্ত হয়।[১] বহু জন বসতি এলাকা বন-জঙ্গলে পরিণত হয়। দস্যু তস্করের দৌরাত্ম্যে মেদিনীপুরের বহু অধিবাসীকে ঘর-ছাড়া হতে হয়েছিল। বাংলার নবাবদের সহযোগী হিসাবে ইংরাজ বণিকরা মেদিনীপুরের বিভিন্ন জমিদারদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ খ্রীঃ এক চুক্তির ফলে, মেদিনীপুর জমিদারীর দেওয়ানী সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ বণিকদের হাতে চলে যায়। ১৭৬৫ খ্রীঃ মোগল সম্রাটের দাক্ষিণ্যে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর, ইংরাজ বণিক কোম্পানী প্রকৃত-পক্ষে ঐ সব অঞ্চলের সর্বময় কর্তা হন। সঙ্গত কারণে চাকলা মেদিনীপুর একজন ইংরাজ 'রেসিডেন্ট' জনস্টোন-এর হাতে ন্যস্ত হয়।

ইংরাজ শক্তির আবির্ভাবের পূর্বেই মেদিনীপুরে (জঙ্গল মহল) বেশ কয়েকটি পুরানো, শক্তিশালী জমিদারীর (রাজাদের) অস্তিত্ব ছিল। মঙ্গলপোতা (বাগড়ী), ময়না, নারায়ণগড়, ঝাড়গ্রাম, তমলুক, কাশীজোড়া, চন্দ্রকোণা, বলরামপুর, সুজামুটি, ঘাটশিলা, কর্ণগড়, নাড়াজোল ও মহিষাদল প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। এই সব রাজপরিবারের ইতিহাসের মূল উপাদান—জনশ্রুতি, সমকালীন সাহিত্য, স্থাপত্য-নিদর্শনের ধ্বংসাবশেষ ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে কয়েকজন জমিদার[২] ইংরাজ কোম্পানীকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করলেও, পরে আনুগত্য স্বীকার করে রাজস্ব দিতে বাধ্য হন। ইংরাজদের পরোক্ষ মদতে জমিদাররা খাজনা আদায়ের তাগিদে অত্যাচার করায়, ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রজাদের মধ্যে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, যা পাইক বিদ্রোহ (১৭৯৩ খ্রীঃ), চুয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৯ খ্রীঃ) মুসঙ্গী আন্দোলন (১৮০৪ খ্রীঃ) ও পরে নায়ক বিদ্রোহের (১৮৩৩ খ্রীঃ) রূপ নেয়। তা ছাড়া মেদিনীপুরে 'গুপ্তসমিতি' (১৯০২ খ্রীঃ), অসহযোগ আন্দোলন (১৯০৫ খ্রীঃ) ও ১৯৪২ খ্রীঃ 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন (শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা) এবং সশস্ত্র বিপ্লব (শহীদ ক্ষুদিরাম বোস, প্রফুল্ল চাকী ও সত্যেন বসু) হয়েছে। বীরেন্দ্রনাথ শাসমল প্রমুখ স্বদেশ প্রেমিকদের নেতৃত্বে একাধিক আন্দোলনও হয়েছিল।

মঙ্গলপোতার বাগড়ী রাজপরিবার

মেদিনীপুর জেলার বাগড়ী গ্রাম প্রাচীনত্বের দাবী রাখে। আনুঃ ১৫৫৫ খ্রীঃ চৌহান সিংহ নামে এক রাজপুত বাগড়ী (গড়বেতা) অঞ্চলে 'সিংহ বংশে'র রাজত্বের সূচনা

১। উড়িষ্যা তথা মেদিনীপুর বেশ কিছুকাল মারাঠা শক্তির অধীনে ছিল।

২। কর্ণগড়ের রানী শিরোমণি, মঙ্গলপোতার ছত্র সিংহ, নাড়াজোলের অযোধ্যারাম ও ঘাটশিলার রাজা জগন্নাথ ধল নেপথ্যে বিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিলেন।

করেন। তাঁর রাজ্যকাল প্রায় ৫০ বছরের। বাগড়ী রাজাদের রাজধানী ছিল গড়বেতা। অতি প্রাচীন 'সর্বমঙ্গলা' দেবীর উত্তর-মুখী মন্দির এবং পুরানো দুর্গের ধ্বংসাবশিষ্ট এখনও দেখা যায়। ক্রমানুসারে পরবর্তী রাজারা—অউচ্ সিংহ (১৬১০-২০ খ্রীঃ), চাত্তর সিংহ (১৬২০-৪৩), তামুকচন্দ্র সিংহ (১৬ ৩-৭৬ খ্রীঃ), তেজচন্দ্র সিংহ (১৬৭৬-৯৭ খ্রীঃ) এই সময় মল্লরাজ দুর্জন সিংহ গড়বেতা আক্রমণ করেন ও তেজচন্দ্র রাজচ্যুত হন। ময়ূরভঞ্জের রাজার সাহায্যে সামশের সিংহ (১৭২০-৪৪ খ্রীঃ) রাজ্য পুনরুদ্ধার করে গড়বেতার পূর্বাঞ্চলে বর্তমান মঙ্গলপোতায় তাঁর প্রাসাদ তৈরী করেন। তাঁর পুত্র বৈষ্ণবচরণ সিংহ (১৭৪৪-৬০ খ্রীঃ)। পৌত্র যাদবচন্দ্র (১৭৬০-৭৯ খ্রীঃ) ও তস্যপুত্র ছত্র সিংহ (১৭৭৯-১৮২৫ খ্রীঃ) ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি কয়েকবার ইংরাজ সরকারকে সময়মত বার্ষিক কর দিতে না পারায় গদীচ্যুত হন। তা ছাড়া বাগড়ীতে 'নায়ক' জাতির বিদ্রোহের (১৮৩৩ খ্রীঃ) সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করেন। অবশ্য পরে মুক্তি পেয়ে, বার্ষিক ছয় হাজার টাকার বৃত্তিভোগী হন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। তাঁর দৌহিত্র মনোমোহন সিংহ তাঁর অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হন। তিনিও মাসিক ২৫০ টাকার বৃত্তিভোগী হন। তাঁর সময়েও দুর্গাপূজা, রাসযাত্রা ও অন্যান্য পূজা-পার্বন বজায় ছিল। তাঁর তিনপুত্র—জগৎজীবন, মিত্রজয় ও জগৎতারণ। জগৎজীবন সিংহের পুত্র রণকেশরী রামচন্দ্র সিংহ। জন্ম হয় ১৮৮৭ খ্রীঃ। তাঁর দুটি কন্যা। দৌহিত্র সন্তানদের বংধররা এখনও মঙ্গলপোতায় বাস করেন।

ময়না রাজপরিবার

তমলুক মহকুমায় ময়না (ময়না ছৌন্গ্রা) তমলুক শহর থেকে প্রায় ১৪ কি.মি. দূরে অবস্থিত। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকে সবঙ্গ-এর স্থানীয় জমিদার গোবর্ধন বাহুবলেন্দ্র ময়না রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। গোবর্ধন, মহারাষ্ট্রীয় মেদিনীপুর অধিপতি মহারাজা দেবরাজ বাহাদুরের অনুগ্রহপুষ্ট ছিলেন। এই রাজপরিবারের ইতিকথা, আধা-পৌরাণিক কাহিনী ও ধনরাম-কৃত 'ধর্মমঙ্গলতত্ত্ব'-এ পাওয়া যায়। ময়নার স্থানীয় জমিদার রাজা লালসেনের বংশধররা মারাঠা অধিপতিকে তাঁদের দেয় চৌথ ঠিক সময়ে দিতে না পারায়, মহারাজা দেবরাজ সবঙ্গ-এর জমিদার গোবর্ধনানন্দকে 'রাজা' ও 'বাহুবলেন্দ্র' [১] উপাধি এবং ময়না-র জমিদারী প্রদান করেন। রাজা গোবর্ধনের পুত্র রাজা পরমানন্দ বাহুবলেন্দ্র স্থায়ীভাবে ময়না দুর্গে অবস্থান করেন। এই দুর্গের ভগ্নাংশ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। সামুদ্রিক ঝড় ও প্লাবনে ময়নাবাসীদের কয়েকবার ঘরছাড়া হতে হয়েছিল।

রাজা পরমানন্দের পরে যথাক্রমে মাধবানন্দ, গোকুলানন্দ, কৃপানন্দ, জগদানন্দ, ব্রজানন্দ, আনন্দানন্দ ও রাধাশ্যামানন্দ বাহুবলেন্দ্র (১৮২৬-৮১ খ্রীঃ) ময়না জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। রাধাশ্যামানন্দের তিন পুত্র—প্রেমানন্দ (মৃত্যু ১৮৯৯), সচ্চিদানন্দ ও পূর্ণানন্দ। ইংরাজ সরকারকে রাজস্ব ঠিক সময়মত না দেওয়ায় ময়না জমিদারী নিলামে বিক্রী হয়ে টুকরো টুকরো অবস্থায় বিভিন্ন তালুকদারদের দখলে চলে যায়। বর্তমান ময়না রাজপরিবারের বংশধরদের, স্থানীয় মানুষের কাছে পরিচয় 'ছত্রপতি রাজা'।

নারায়ণগড় রাজপরিবার

মেদিনীপুর শহর থেকে (সুবর্ণরেখা নদীর উপর) নারায়ণগড় ৩৫ কি.মি দক্ষিণে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে (পুরী) যাওয়ার পথে এখানে এসেছিলেন। নারায়ণগড়ে গৌড় রাজশক্তির শাসনের অবসানের পর কৈবর্ত্ত রাজারা জমিদারী লাভ করেন। তাঁদের 'শ্রীচন্দন' উপাধি দেন উড়িষ্যার অন্তর্গত খুরদার রাজারা। বাংলার নবাবদের কাছ থেকে 'মাড়-ঈ-সুলতান' (পথের রাজা) উপাধি পান, ঐ অঞ্চলের জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরী করার স্বকৃতি স্বরূপ। ১৭৫০ খ্রীঃ নবাব আলিবর্দ্দী খান নারায়ণগড়ের রাজাদের সাহায্যে মারাঠাদের দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ মেদিনীপুর জমিদারীর অন্তর্গত নারায়ণগড় (জঙ্গল মহল) ইংরাজ বণিক কোম্পানীর হস্তগত হওয়ার পরে নারায়ণগড়ের রাজারা মারাঠা অভিযানের বিরুদ্ধে ইংরাজদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন এবং পরে ১৮০৩ খ্রীঃ ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এ ছাড়া 'চুয়াড় বিদ্রোহ' দমনেও তাঁরা ইংরাজদের সাহায্য করেছিলেন। এই রাজবংশের প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবে পর্যায়ক্রমে রাজাদের নাম দেওয়া হল না, যদিও প্রতিষ্ঠাতা গন্ধর্ব পাল (আনুঃ ১৩৬৪ খ্রী.)-এর পরবর্তী ২৬ জন রাজাদের নাম পাওয়া যায়। শেষ রাজা পৃথ্বীবল্লভ পাল মারা যান ১৮৮৩ খ্রীঃ। তিনি ১৮৭৩ খ্রীঃ রাজা দুর্গাচরণ লাহার (ঠনঠনিয়া, কলিকাতা) কাছ থেকে ৩,২০,০০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন। ঐ টাকা ফেরৎ দিতে না পারায় লাহা রাজপরিবার তাঁর 'নারায়ণগড়' জমিদারী অধিগ্রহণ করেন। রাজা দুর্গাচরণ লাহার মহানুভবতায়, রাজা পৃথ্বিবীল্লভ নারায়ণগড়ের রাজপ্রাসাদে থাকার সুযোগ ও জীবদ্দশায় ১২৫ টাকা মাসোহারা পেয়েছিলেন।

ঝাড়গ্রাম রাজপরিবার

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত শহর ও আদিবাসী অধ্যুষিত ঝাড়গ্রাম (দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের একটি স্টেশন) খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত 'জঙ্গলমহলের'

অন্তর্ভুক্ত নবাবদের শাসনাধীন ছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ মেদিনীপুর জমিদারী ও ১৭৬৫ খ্রীঃ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর ইংরাজ কোম্পানী ঝাড়গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকা জনৈক ইংরাজ লেফটেনান্ট্ ফার্গুসন-এর অধীনে নিয়ে আসেন ১৭৬৭ খ্রীঃ। তাঁরই নেতৃত্বে ইংরাজ সেনারা 'চুয়াড় বিদ্রোহ' ও অরাজকতা বন্ধ করতে ঝাড়গ্রামের দুর্গ দখল করেছিল ৬ ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৭ খ্রীঃ। ঝাড়গ্রামে বিষ্ণুপুরের মল্লবংশীয় রাজাদের আধিপত্য ছিল। কালক্রমে ছোট ছোট রাজ্য বা জমিদারীর সৃষ্টি হয়। ঝাড়গ্রাম এদের মধ্যে একটি। ১৫১৯ খ্রীঃ সর্বেশ্বর মল্লদেব (ভিন্ন মতে, বীরবিক্রম মল্লদেব) এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের রাজা রঘুনাথ মল্ল, চণ্ডীচরণ ও নরসিংহ মল্ল খ্যাতিমান। রাজা নারায়ণ মল্ল মারা যান ১৮৭৫ খ্রীঃ এবং তাঁর দুই নাতি—রঘুনাথ নারায়ণ মল্ল ও যদুনাথ নারায়ণ মল্ল নাবালক অবস্থায় জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। রঘুনাথ সাবালক হলে 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস' থেকে জমিদারীর ভার নেন ১৮৮৬ খ্রীঃ, যদিও প্রায় ২১ বছর পরে (১৯০৭ খ্রীঃ) পুনরায় জমিদারী 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের' হাতে চলে যায়।

তমলুক রাজপরিবার

ইতিহাস প্রসিদ্ধ তমলুক (তাম্রলিপ্তি) ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সমুদ্র বন্দরগুলির অন্যতম। মধ্যযুগের ইতিহাসে তমলুকে ক্ষত্রিয় রাজা রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের বংশধরগণ রাজত্ব করতেন। এই বংশের শেষ রাজা অপুত্রক নিশঙ্ক নারায়ণের মৃত্যুর পরে স্থানীয় রাজা কৈবর্ত্ত সর্দার কালু ভুইএ্যা ও তাঁর ৪১তম অধস্তন পুরুষ রাজা ভাঙ্গড় ভুইএ্যা (মৃত্যু ১৪০৩ খ্রীঃ)। তাঁর পরবর্তী রাজাদেরও নাম পাওয়া যায়, কিন্তু আবুল ফজলের গ্রন্থ 'আইন-ই-আকবরীতে' (আনুঃ ১৫৯০ খ্রীঃ) উদ্ধৃত এই অঞ্চলের রাজাদের বর্ণনার সঙ্গে মেলে না। তমলুককে দেখান হয়েছে জলেশ্বর সরকারের একটি মহল হিসাবে। এখানে সুদৃঢ় দুর্গ হল 'খণ্ডাইত' আর রাজারা কৈবর্ত্ত জাতীয় নয়।

তমলুকের পরবর্তী ইতিহাসে ভুইএ্যা (রায়) বংশের ৪৭ তম **রাজা শ্রীমন্ত রায়ের** (১৫৬৪-১৬১৬ খ্রীঃ) মৃত্যুর পর, তাঁর প্রপৌত্র রাজা নরনারায়ণ রায় ১৭০৩-৩৯ খ্রীঃ উত্তরাধিকারী হন। তাঁর রাজত্বে তমলুকে তাঁদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। নরনারায়ণ রায়ের মৃত্যুর পর, ১৭৫২ খ্রীঃ তাঁর পুত্রদ্বয় রাজা কৃষ্ণনারায়ণ ও রাজা কমলনারায়ণ উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু রাজস্ব জমা দিতে অপারক হওয়ায়, হিজলীর ফৌজদার মসনদ মহম্মদ খানের আদেশে, মির্জা দীদার আলি বেগকে তমলুকের জমিদারী দেওয়া হয় ১৭৫৭ খ্রীঃ। এই দীদার আলি বেগের নামে তমলুকে বন্যা-নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বাঁধ, এখনও 'খোজার বাঁধ' নামে পরিচিত। দীদার আলির নাম তমলুকের জমিদার হিসাবে নথিভুক্ত

হয়েছিল ১৭৬৫ খ্রীঃ। দীদার আলি মারা যান ১৭৬৭ খ্রীঃ। এই সময় দেওয়ান মহারাজা নন্দকুমার[১] ও দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অনুরোধে হিজলীর ফৌজদার তমলুকের জমিদারী, রাজা নরনারায়ণ রায়ের বিধবা পত্নী রাণী সন্তোষপ্রিয়া ও রাজা নরনারায়ণ রায়ের বিধবা পুত্রবধূ রাণী কৃষ্ণপ্রিয়াকে প্রত্যর্পণ করেন। তমলুক জমিদারী দুই রাণীর মধ্যে ভাগ হয়ে যায়।

১৭৭১ খ্রীঃ রাণী সন্তোষপ্রিয়ার মৃত্যুর পর, তাঁর অংশ পান তাঁর দত্তক পুত্র রাজা **আনন্দনারায়ণ রায়**। ১৭৮৯ খ্রীঃ রাণী কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যুর পর জমিদারীর দু'টি অংশ পুনরায় সংযুক্ত হয়। সম্পূর্ণ জমিদারীর মালিক হন রাজা আনন্দনারায়ণ রায় ১৭৯৫ খ্রীঃ। অপুত্রক রাজা আনন্দনারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁর দুই রাণী যথাক্রমে রুদ্রনারায়ণ ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায়কে দত্তক নেন। ১৮২১ খ্রীঃ রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হয় এবং পরবর্তী রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ জমিদারীর মালিক ছিলেন ১৮২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত। যদিও রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ মারা যান ১৮৫৭ খ্রীঃ, কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তমলুক জমিদারীর অর্ধাংশ মহিষাদল জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয় এবং অপর অংশ পার্শ্ববর্তী জমিদাররা কিনে নেন। পরে সম্পূর্ণ জমিদারীটি মহিষাদল জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের দুই পুত্র—উপেন্দ্রনারায়ণ (মৃত্যু ১৮৮০ খ্রীঃ) ও নরেন্দ্রনারায়ণ (মৃত্যু ১৮৯০ খ্রীঃ)। পরে রাজা হন যোগেন্দ্রনারায়ণ, সুরেন্দ্রনারায়ণ ও তার পুত্রগণ— হরেন্দ্র, ষড়েন্দ্র, বীরেন্দ্র ও ফণীন্দ্র। তাঁদের পরবর্তী বংশধরগণ এখনও তমলুকের দেবোত্তর ও লাখেরাজ জমির উপর নির্ভরশীল।

কাশীজোড়া রাজপরিবার

বর্তমান পাঁশকুড়া ও ডেবরা থানার সংলগ্ন এলাকা জুড়ে কাশীজোড়া জমিদারীর অবস্থান ছিল। রাজ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কায়স্থ বংশীয় গঙ্গানারায়ণ রায় (আনু ১৫৭৩-৮৬ খ্রীঃ)। তাঁর উত্তর পুরুষ রাজা প্রতাপনারায়ণের নামে প্রতাপপুর গ্রাম। তাঁর পুত্র হরিনারায়ণ ও পৌত্র লছমীনারায়ণ। রাজা লছমীনারায়ণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে চাঁচিয়াড়া গ্রামে একটি মসজিদ তৈরী করেন, যেটিকে এখনও ভগ্নাবস্থায় দেখা যায়। তিনি মারা যান ১৬৯২ খ্রীঃ। তাঁর পুত্র দর্পনারায়ণেরও ইসলাম-প্রীতি বজায় ছিল। তাঁরপর জিৎনারায়ণ রাজা হন। তিনি হিন্দু ছিলেন। বংশের অন্যান্য রাজারা নরনারায়ণ, রাজনারায়ণ ও সুন্দরনারায়ণ।

১। তমলুকে মহারাজা নন্দকুমারের নামে বাসুদেবপুর অঞ্চলে আছে 'নন্দকুমার হাট'। তমলুকের ভগ্নদশাপ্রাপ্ত বিশাল রাজবাড়া, বিখ্যাত বর্গভীমা দেবীর প্রাচীন মন্দির ছাড়া, রাজবাড়ীর সংলগ্ন প্রায় ১০টি বিভিন্ন দেব-দেবীর প্রাচীন মন্দির এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালা সত্যসত্যই দর্শনযোগ্য।

চন্দ্রকোণার রাজ পরিবার

চন্দ্রকোণার নাম 'আইন-ই-আকবরী' তে উল্লিখিত আছে। ষোলো শতকের মাঝামাঝি চৌহান বংশীয় বীর ভানুসিংহ এখানে রাজত্ব শুরু করেন। তাঁর পুত্র হরি ভানুসিংহ প্রথমে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের বশ্যতা স্বীকার করেননি, যদিও পরে মোগল সম্রাটের পাঁচ-হাজারী মনসবদার পদ গ্রহণ করেন ১৬১৭ খ্রীঃ। এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় 'তোজাক-ই-জাহাঙ্গীরি' গ্রন্থে। হরি ভানুসিংহের পুত্র মিত্রসেন অপুত্রক হওয়ায়, মাতুল বংশের রঘুনাথ সিংহ রাজা হন। রঘুনাথ সিংহ ১৬৯৬ খ্রীঃ চেতুয়া-বরদার জমিদার রাজা শোভা সিংহের নেতৃত্বে মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দলে যোগ দেন। পরে ১৭০৮-০৯ খ্রীঃ বর্ধমানের শক্তিশালী জমিদার রাজা কীর্তিচাঁদ চন্দ্রকোণা অধিকার করেন।

বলরামপুরের রাজপরিবার

সেকালের খড়্গপুর মহালের সীমানার মধ্যেই ছিল বলরামপুর। এই বলরামপুরের ওপর দিয়েই পুরীধাম যেতে হত। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ভীম। পরবর্তী রাজা হরিচন্দন, মুকুন্দরাম, পীতাম্বর ও শত্রুঘ্ন (১৭৬৮ খ্রীঃ)। শত্রুঘ্ন-এর পুত্র নরহরি নবাবদের দেওয়া 'চৌধুরী' উপাধি পেয়েছিলেন। বংশের শেষ জমিদার বীর প্রসাদ।

সুজামুঠার রাজপরিবার

হিজলী রাজ্যে মুসলমান শাসনের অবসানের পর সুজামুঠা জমিদারীর সূত্রপাত। সুজামুঠা বর্তমান ভগবানপুর থানার অন্তর্গত। প্রতিষ্ঠাতা রাজা গোবর্ধন রণঝাঁপ। তিনি নবাব দরবারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। পরবর্তী রাজাদের নাম যথাক্রমে—মাধবচন্দ্র, শ্রীধরনারায়ণ, গোপাল নারায়ণ, গোরাচাঁদ, নরেন্দ্র নারায়ণ, রাজেন্দ্র নারায়ণ, গজেন্দ্র নারায়ণ, মহেন্দ্র নারায়ণ, দেবেন্দ্র নারায়ণ, গোপালেন্দ্র নারায়ণ। গোপালেন্দ্র নারায়ণ অপুত্রক। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদারী 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের' অধীনে আসে ১৮৩৭ খ্রীঃ।

ঘাটশিলার রাজপরিবার

পলাশী যুদ্ধের অবসানের দশ বছর পার হতে না হতেই ইংরাজ সরকারী কোম্পানীর প্রতিনিধি ছিলেন ফার্গুসন সাহেব মেদিনীপুরে। ১৭৬৭ খ্রীঃ ভ্যান্সিটার্ট সাহেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ঘাটশিলার রাজা জগন্নাথ ধল তাঁর অধীনস্থ জমিদারীর বিভিন্ন পাইক সরদারদের মদতে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাংলায় মেদিনীপুরের অধিকাংশ জমিদারীগুলির বিলুপ্তির কারণ সময়মত দেয় রাজস্ব দিতে না পারায়। ফলে নীলামে মালিকানার হস্তান্তর। বিভিন্ন জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন—বর্ধমানের মহারাজারা, মুর্শিদাবাদের নবাব-বংশধররা, কলকাতার লাহা, শীল ও ঠাকুর পরিবার, উত্তরপাড়ার মুখার্জী, শ্রীরামপুরের গোস্বামী, ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ, বর্ধমানের রাজা বনবিহারী কাপুর ও মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী।

নাড়াজোলের খান রাজপরিবার

মেদিনীপুর

মেদিনীপুরের নাড়াজোল [১] রাজপরিবারের ইতিহাস **কর্ণগড়ের [২] রাজাদের** ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৭১২ খ্রীঃ রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচিত **'শিবায়ণ' কাব্য** [৩] থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের লোকপ্রিয় রাজা ছিলেন রাজা রাম সিংহের পুত্র রাজা **যশোবন্ত সিংহ**। তিনি নবাব মুর্শিদকুলী ও সরফ্রাজ খানের দেওয়ান ছিলেন। রাজা যশোবন্ত সিংহের গুনমহিমা ও কৃতীত্বের কথা বহু গ্রাম্য-গাথায় অমর হয়ে আছে। তিনি মারা যান ১৭৪৮ খ্রীঃ। তাঁর পুত্র রাজা **অজিত সিংহ** একজন বীর যোদ্ধা হিসাবে আজও স্মরণীয় পুরুষ। জঙ্গল মহলের সর্বাধিপতি ১৫ হাজার সৈন্যের অধিশ্বর। মারাঠা বর্গীর আক্রমণের সময়কালে (১৭৪২—৫১ খ্রীঃ) কর্ণগড় তথা মেদিনীপুর অঞ্চলের বহু মানুষের প্রাণরক্ষার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। তিনি ছিলেন অপুত্রক ও কর্ণগড়ের শেষ রাজপুরুষ। তিনি মারা যান ১৭৫৩ খ্রীঃ (ভিন্ন মতে ১৭৫৫ খ্রীঃ)।

রাজা অজিত সিংহের দুই রানীকে—রানী ভবানী ও রানী শিরোমণি—রাজকার্যের দায়িত্ব পালন করতে হয়। বর্গীর হাঙ্গামা ও পরে চুয়াড় গোবর্দ্ধন সর্দ্দারের নেতৃত্বে চুয়াড় বিদ্রোহীদের (১৭৫৭ খ্রীঃ) আক্রমণের ফলে রানীরা রাজা যশোবন্ত সিংহের মাতুল অভিরাম খাঁনের পুত্র নাড়াজোলের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার **ত্রিলোচন খাঁনের** আশ্রয়প্রার্থী হন ১৭৫৮ খ্রীঃ। দুই রানীকে জমিদারীর গদিতে বসিয়ে ত্রিলোচন খাঁন কর্ণগড়ের সুবৃহৎ জমিদারীর তত্ত্বাবধায়ক হন। [৪] অপুত্রক ত্রিলোচনের মৃত্যুর (১৭৬০ খ্রীঃ) পর

১। শীলাই নদীর উপর নাড়াজোল মেদিনীপুর শহর থেকে প্রায় ৪০ কিমি.।

২। (ক) মেদিনীপুর শহর থেকে কর্ণগড়-এর দুরত্ব ৯ কিঃ মিঃ। যশস্বী রাজা যশোবন্ত সিংহের আমলে তৈরী দন্ডেশ্বর ও মহামায়ার মন্দির এবং প্রসিদ্ধ কর্ণগড়ের দুর্গের ভগ্নাংশ এখন রয়েছে।

৩।
রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা
ধার্মিক রসিক রণবীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে
রাজা রাম সিংহ মহাবীর॥
তস্য সুত যশোবন্ত সিংহ সর্বগুণযুত
শ্রীযুক্ত অজিত সিংহের তাত,
মেদিনীপুরাধিপতি কর্ণগড়ে অবস্থিতি
ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥

৪। এই তথ্য পাওয়া যায় সদর আমিনের (মেদিনীপুর) মামলা নং ৭৭১—১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৪১ খ্রীঃ।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র **মতিরাম খাঁন** জমিদারীর দায়িত্ব নেন। এই সময়ে মেদিনীপুরের রাজনৈতিক চরিত্রের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ খ্রীঃ মেদিনীপুরের জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করেন ইংরাজ কোম্পানী, নবাব মীরকাশিমের সঙ্গে এক চুক্তিপত্র অনুযায়ী। এর ফলে নাড়াজোলের দেয় রাজস্ব বৃদ্ধি পায়। অধিকন্তু বকেয়া রাজস্ব জমা দেওয়ার ক্ষমতা না থাকায় কর্ণগড় ও নাড়াজোল জমিদারী, ইংরাজ কোম্পানীর দখলে চলে যায় (১৭৮৭-১৮০০ খ্রীঃ)। মতিরামের মৃত্যুর পর **সীতারাম** শাসন কর্তা হন। ১৭৮৪ খ্রীঃ সীতারামের পুত্র **আনন্দলাল খান** জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করেন। রানী শিরোমণির প্রজারা চুয়াড় বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে, ইংরাজ সরকার তাঁকে ও তাঁর জমিদারীর তত্ত্বাবোধক—চুনিলাল খানেকে (ত্রিলোচন খানের পুত্র) কলকাতায় আটক করে রেখেছিলেন। রানী শিরোমণির ৩০ জুন, ১৮০০ খ্রীঃ হেবানামার (দানপত্র)[১] সুবাদে কর্ণগড় ও নাড়াজোল দুটি জমিদারীর মালিক হিসাবে আনন্দলাল ইংরাজ সরকারের সঙ্গে রাজস্ব (বাৎসরিক ৯০,২১৪ টাকা) রফা করেন। সরকার আনন্দলালকে 'রাজা' উপাধি দেন। রাজা আনন্দলাল মারা যান ১৮১০ খ্রীঃ।

বৃদ্ধা রানী শিরোমণির মৃত্যু হয় ১৮১২ খ্রীঃ।[২] রাজা আনন্দলাল অপুত্রক হওয়ায় তিনি তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা **মোহনলাল খান**-কে মেদিনীপুরের চার পরগণার ও অপর ভাই নন্দলালকে নাড়াজোল জমিদারীর স্বত্ব দিয়ে যান। রাজা মোহনলাল মারা যান ১৮৩০ খ্রীঃ। তিনি মেদিনীপুরে বেশ কয়েকটি বড় বড় জলাশয় খনন করেন—এর মধ্যে লঙ্কাগড়ে ৬০ বিঘার দিঘী ও তার মধ্যে তৈরী 'গ্রীষ্মাবাস' বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। রাজা মোহনলালের চার রানী—প্রথমা ও দ্বিতীয়া নিঃসন্তান ছিলেন।

অযোধ্যারাম খান

রাজা মোহনলাল তাঁর দানপত্রে (১৯ ফাল্গুন, ১২৩৭ সন) ১৮৩০ খ্রীঃ নাবালক জ্যেষ্ঠ পুত্র (তৃতীয়া রানী কুন্দলতার গর্ভে জন্ম ১৮২১ খ্রীঃ) অযোধ্যারামকে রাজ্যাধিকারীর স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। নাবালক অবস্থায় তিনি পূর্বপুরুষদের টানা ৪৪ বছর ব্যাপী বেশ কয়েকটি মামলায় জড়িয়ে পড়ে আর্থিক দুরবস্থায় পড়েন। ১৮৪১ খ্রীঃ সাবালক হয়ে জমিদারীর কার্যভার গ্রহণ করেন। তাঁর জীবদ্দশাতে সব মামলা শেষ হয় ১৮৭৮ খ্রীঃ।

১। কর্ণগড়ের রাজপরিবারের বংশধর কন্দর্প সিংহ জমিদারীর মালিকানার দাবীদার হিসাবে মামলা করেন। শেষে 'প্রিভি কাউন্সিল' ৩ ডিসেম্বর, ১৮৪৭ খ্রীঃ রায়ে কন্দর্প সিংহের আবেদন খারিজ করে দেন। মামলা চলেছিল প্রায় ৩০ বছর।

২। নাড়াজোল জমিদারী 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস'-এর হাতে চলে যায়—১৮১৩-৩৬ খ্রীঃ।

মানসিক অশান্তির মধ্যে অযোধ্যারামের জীবনাবসান ঘটে ২৮ জুন, ১৮৭৯ খ্রীঃ। তাঁর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তিনি বর্ধমানের মহারানী নারায়ণকুমারীর কাছ থেকে তাঁর ১৮৫৩ খ্রীঃ হৃত জমিদারী পুনরুদ্ধার করেন। প্রজাদের কল্যাণার্থে বহু টাকা ব্যয় করেছিলেন। মেদিনীপুর হাই-স্কুল তাঁরই প্রতিষ্ঠা। ১৮৭৪ খ্রীঃ মন্বন্তরের ত্রাণকার্যে তিনি সম্ভব্য সব রকম সাহায্য করেছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে 'সার্টিফিকেট-অফ-অনার' দিয়ে সম্মানিত করেন। বোধহয় রাজা উপাধি তিনি পাননি।

রাজা মহেন্দ্রলাল খান

অযোধ্যারামের দুই পুত্র মহেন্দ্রলাল ও উপেন্দ্রলাল। জেষ্ঠ্য পুত্র মহেন্দ্রলালের জন্ম হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩ খ্রীঃ। বংশের প্রথা অনুযায়ী মহেন্দ্রলালই জমিদারীর মালিক হন। তিনি কৈশোরেই বিপন্ন জমিদারীর দুঃখদশার সাক্ষী। লেখাপড়া শেখবার বিশেষ সুযোগ না থাকলেও, নিজের অধ্যবসায়ে বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। সাবালক হয়ে জমিদারীর আর্থিক সংকট কিছু অংশে দূর করেছিলেন। হাসপাতাল, স্কুল ও পাঠাগার প্রভৃতি সৎকার্যে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। সংগীত ও সাহিত্যে তিনি বিশেষ অনুরাগী। তাঁর লিখিত 'সংগীত লহরী' (১৮৭১ খ্রীঃ)। 'মান-মিলন' গীতিনাট্য (১৮৭৮ খ্রীঃ), 'গোবিন্দ গীতিকা' (১৮৮০ খ্রীঃ), 'শারদোৎসব' (১৮৮১ খ্রীঃ), মথুরা-মিলন' (১৮৮২ খ্রীঃ) প্রভৃতি গ্রন্থ তৎকালীন বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বহুগুণের অধিকারী রাজা মহেন্দ্রলাল, খান বংশের গৌরব। ১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৭ খ্রীঃ ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষ্যে মহেন্দ্রলালকে তদানীন্তন ছোটলাট স্যার রিভার টমসন্ 'রাজা' উপাধি দেন। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ১ মাঘ, ১২৯৯ সন (১৮৯২ খ্রীঃ) তাঁর দেহাবসান ঘটে কলকাতার বাসভবনে।

রাজা নরেন্দ্রলাল খান

রাজা মহেন্দ্রলালের পুত্র নরেন্দ্রলালের জন্ম হয় ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭ খ্রীঃ। পিতার তত্ত্বাবধানে ও গৃহ-শিক্ষকের কাছে সংস্কৃত, ফার্সী ও ইংরাজী ভাষায় জ্ঞানলাভ করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য অনুযায়ী তিনি মুক্তহস্তে দান-ধ্যান করেছিলেন। নরেন্দ্রলালের রাজভক্তি ও আদর্শ চরিত্রের মানুষ হওয়ায় ইংরাজ রাজ-প্রতিনিধি স্যার চার্লস ইলিয়ট তাঁকে 'রাজা' খেতাবে ভূষিত করেন ২৯ নভেম্বর, ১৮৯৫ খ্রীঃ। তিনি রাজনীতিতে সম্মুখ আন্দোলন করার সপক্ষে ছিলেন না, কিন্তু আচার-ব্যবহার ও আদর্শে প্রকৃত স্বদেশ প্রেমিক ভারতীয়। তিনি স্বদেশী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইংরাজ শোষণের বিরুদ্ধে

মেদিনীপুরে গ্রামীণ হস্তশিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ সচেষ্ট হয়েছিলেন। সঙ্গত কারণে তিনি ইংরাজ প্রভুদের সুনজরে খুব বেশী দিন ছিলেন না। ১৯০৫ খ্রীঃ মেদিনীপুরে অসহযোগ আন্দোলনে নেপথ্যে সাহায্য করার অভিযোগে তাঁকে একবার গ্রেফতার করা হয়। হাজত বাসও করতে হয়েছিল। পরে অবশ্য বেকসুর খালাস পান। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি প্রায় সবসময় নাড়াজোলেই থাকতেন। উদ্দেশ্য, দেশের মানুষের সুখ-দুঃখের সাথী হওয়া। স্বদেশী শিল্পের প্রসার ছাড়া, বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নের প্রচেষ্টা তাঁর কর্মময় জীবনের অঙ্গ ছিল। 'গোপ প্রাসাদ'-এর ৩ চিত্ররাজি রাজা নরেন্দ্রলালের কলাবিদ্যায় পারদর্শিতার প্রত্যক্ষ পরিচয়। 'পরিবাদিনী শিক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। এক কথায় তিনি হলেন ইংরাজ সরকারের হাতে নিগৃহীত দেশহিতৈষী শেষ খেতাবী রাজা। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯২০ খ্রীঃ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর পিতা নাড়াজোল জমিদারীর সেরেস্তায় তহশিলদার ছিলেন। সেই সূত্রে রাজা নরেন্দ্রলাল ক্ষুদিরামকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। অগ্নিযুগের বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল।

রাজা নরেন্দ্রলাল খানের দুই পুত্র—**দেবেন্দ্রলাল** ও বিজয়কৃষ্ণ, কন্যা প্রমদাসুন্দরী (এঁর নামে গঙ্গা তীরে ঘাট আছে)। জেষ্ঠ্য পুত্র দেবেন্দ্রলালের জন্ম হয় ১৮৯৪ খ্রীঃ। স্বদেশ প্রেমিক দেবেন্দ্রলাল মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোসের অন্যতম সহযোগী এবং ভারতীয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্য। তিনি বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্য ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী। মারা যান ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৮ খ্রীঃ। দেবেন্দ্রলালের একমাত্র পুত্র অমরেন্দ্রলাল খান (১৯১৫-৬৪ খ্রীঃ)। তাঁর স্ত্রী অঞ্জলি খান বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যা ছিলেন (১৯৫৮ খ্রীঃ)। এঁদের একমাত্র কন্যা রাজ্যশ্রী ঘোষ। বর্তমানে অঞ্জলি খান ৭ দেবেন্দ্রলাল খান রোড, ভবানীপুর বাসভবনে দৌহিত্র সন্তান রাজদীপকে নিয়ে বসবাস করেন। রাজা নরেন্দ্রলাল খানের কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়কৃষ্ণের (স্বল্পায়ু) একমাত্র পুত্র অমিয়কৃষ্ণ। অমিয়কৃষ্ণ কলিকাতা হাইকোর্টের কৃতী আইনজীবী, বসবাস করেন ৭২, রাসবিহারী এভেনিউ বাসভবনে। কন্যা—মহুয়া বিশ্বাস ও শ্রাবনী পাল।

১৯০৮ খ্রীঃ তৈরী নাড়াজোলের রাজবাটী প্রায় ৩৩০ বিঘা বিস্তৃত জমির উপর এখনও দাঁড়িয়ে আছে। দুটি পরিখা (গড়) দিয়ে ঘেরা ছোট একটি দ্বীপের মাঝখানে মনোরম প্রাসাদটি অবস্থিত। এ ছাড়া রয়েছে পূজাদালান, বৈঠকখানা, তোষাখানা। একমাত্র প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে একটি করে বড় স্তম্ভ, যার উপরে নহবতখানা। সদগোপ খান রাজাদের গৃহদেবতা সীতারাম মন্দির, প্রাচীন শিবালয়, রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, দুর্গাদালান শ্রীহীন হলেও পর্যটকদের আকর্ষণের বস্তু। বর্তমানে 'গোপ প্রাসাদে' রাজা নরেন্দ্রলাল উয়্যান্ কলেজে। কর্ণগড়, নাড়াজোল ও মেদিনীপুর সহরে রাজাদের দুর্গাপূজা হয়।

মহিষাদলের গর্গ রাজপরিবার

মেদিনীপুর

সংবাদপত্রের শিরোনামায় মেদিনীপুরের খবর ছাপা হয় কেবল প্লাবন, ঘূর্ণিঝড়, খরা বা ছোটখাট রাজনৈতিক সংঘর্ষের। মাঝে মাঝে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কিছু পুরানো ইতিহাস, আর বছরে একবার মেদিনীপুরের মহিষাদলের[১] প্রাচীন রথ-মেলার বিবরণ অবশ্যই থাকে।

মহিষাদলের **গর্গ রাজপরিবার** খুব প্রাচীন না হলেও, তাঁদের তিনশো বছরের সাতপুরুষের ইতিহাস আছে। উত্তরপ্রদেশের বান্দা জেলায় কান্যকুব্জ (কনৌজ), ব্রাহ্মণবংশের **জনার্দন উপাধ্যায়** ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বাংলায় আসেন প্রায় সতেরো শতকের পাঁচ দশকে। তিনি দিল্লীর মোগল সম্রাটের কর্মচারী ছিলেন। জনার্দনের উত্তর-পুরুষদের বংশ-তালিকায় যথাক্রমে নাম পাওয়া যায়—দুর্যোধন, রামেশ্বর (রামশরণ), রাজারাম ও শুকলাল উপাধ্যায়। জনার্দন উপাধ্যায়ই, গঙ্গা মোহনার কাছে গেঁওখালির তৎকালীন জমিদার কল্যাণ রায়চৌধুরী রাজস্ব না দিতে পারায়-নিলামে তাঁর জমিদারী কিনে নেন। তিনি মোগল বাদশার কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। ১৭৩৮ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরপুরুষ (নবাব সুজউদ্দিনের আমলে)[২] **রাজা আনন্দলাল** ও তাঁর রানী **জানকী দেবী** মহিষাদলের গদীতে আসীন হন। অপুত্রক আনন্দলাল মারা যান ১৭৬৫ খ্রীঃ। আনন্দপুর গ্রাম ও আনন্দলাল খাল আনন্দলালের কীর্তি। 'দশশলা বন্দোবস্তে' জমিদারীর দায়িত্বভার পান সহধর্মিনী কর্মময়ী রানী জানকী দেবী।[৩] তিনি তাঁর সময়ে রাজবাড়ীতে পুজা-পার্বনে জাঁকজমকে সাড়া জাগিয়ে ছিলেন। মারা যান ১৮০৪ খ্রীঃ। তাঁর কীর্তি মহিষাদলের নবরত্ন মন্দির (১৭৭৮ খ্রীঃ), রামবাগের রামজীউ মন্দির, দেউলপোতার গোপীনাথের মন্দির (১৭৮৮ খ্রীঃ) প্রভৃতি।

রানী জানকী দত্তক নেন রাজা মতিলালকে। তিনি স্বল্পায়ু। পরে তাঁর দৌহিত্র **সুরপ্রসাদকে** দত্তক নেন। রাজা সুরপ্রসাদই প্রথম বংশীয় পদবী 'গর্গ' গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাদের মঙ্গলার্থে বহু অর্থ ব্যয় করেন। তিনি তাঁর ধর্মপ্রাণা মায়ের পথানুসরণে

১। মহিষাদল কলকাতা থেকে কোলাঘাট পেরিয়ে বাসে যেতে হয় প্রায় ১১২ কি. মি.।

২। আঠারো শতকের তৃতীয় দশকে মহারাজা নন্দকুমারের ভাই কেবলকৃষ্ণ ও তিনি নিজে মহিষাদলের কাছে হিজলীতে আমিন ছিলেন।

৩। রানী জানকী দেবী পর্তুগিজ 'হার্মাদ' দস্যুদের হাত থেকে ঐ অঞ্চলের মানুষকে রক্ষা করেছেন। পর্তুগিজ পদবীধারী ফারনেন্ডিজ, গোমেস্, এন্টনি লোকেরা এখানে বাস করেন।

খুব ধুমধামে দুর্গাপূজা ও রথযাত্রা আয়োজন করেন। রাজা সুরপ্রসাদের স্ত্রী রানী মন্থরা দেবী পর পর তিন জন দত্তক পুত্র নেন—রঘুমোহন, ভবানীপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ গর্গ। দুঃখের বিষয় প্রত্যেকেই অকালে মারা যান। **জগন্নাথ গর্গ** ১৮০৭ খ্রীঃ রাজা সুরপ্রসাদ গর্গের উত্তরাধিকারী হন। মারা যান ১৮২২ খ্রীঃ।[১] জগন্নাথের পুত্র সুপণ্ডিত রাজা **রমানাথ**। তাঁর স্ত্রী রানী বিমলাদেবী স্বামীর অকাল মৃত্যুতে ১৮৪১ খ্রীঃ সহমরণে জীবন বিসর্জন দেন। গর্গ বংশের 'সতী বিমলার গাথাটি' স্বামী-ভক্তির নিদর্শন হিসাবে, স্থানীয় নারীদের কাছে বিশেষ মর্যাদা এখনও পেয়ে থাকে।

রাজা লছমনপ্রসাদ রাজা রমানাথের দত্তক পুত্র। তিনি বংশের প্রথম ইংরাজী প্রথায় শিক্ষা লাভ করেন। মারা যান ১৮৮০ খ্রীঃ। রাজা লছমনপ্রসাদের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ রাজা **ঈশ্বরীপ্রসাদ** ১৮৮৮ খ্রীঃ মারা যান; মধ্যম জ্যোতিপ্রসাদ অপুত্রক, মারা যান ২০ জানুয়ারী, ১৯০১ খ্রীঃ, রাজা উপাধি পান ১৮৯০ খ্রীঃ; কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ, অকালমৃত্যু হয় ১৮৮৬ খ্রীঃ। পুত্ররা ইংরাজী শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষা লাভ করেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কাছে।

রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদের দুই পুত্র—রাজা সতীপ্রসাদ, জন্ম ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৮১ খ্রীঃ ও গোপালপ্রসাদ, জন্ম ১৮৮৫ খ্রীঃ এবং কন্যা বিভাবতী। **রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ** একজন যথার্থ সংগীত-প্রেমী মানুষ। তিনি যে কেবল সংগীত সম্মেলন আয়োজন করতেন তা নয়, তিনি গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গীত-চর্চায় নিজেদের আত্মনিয়োগ করার পক্ষে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। সতীপ্রসাদ গর্গ তাঁর সদ্‌গুণ, জনদরদী কাজ ও রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৯০৮ খ্রীঃ 'রাজা' ও ১৯১৩ খ্রীঃ 'রাজা বাহাদুর' খেতাব পান। মহিষাদলের জমিদারীর মধ্যে সমস্ত তমলুক পরগণা অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯০৩ খ্রীঃ রাজা সতীপ্রসাদের সময়ে। মারা যান ১৯২৬ খ্রীঃ। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার **দেবপ্রসাদ** (জন্ম ১৯১৬ খ্রীঃ) ও তাঁর স্ত্রী কল্যানী দেবী বংশের সংগীত-দরদী ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। এ বিষয়ে কনিষ্ঠ পুত্র কুমার **শক্তিপ্রসাদও** পিতার পথই অনুসরণ করে চলেছেন। সংস্কৃতিবাণ, শিল্পীদরদী দেবপ্রসাদ গর্গ খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। মৃত্যু হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৮৬ খ্রীঃ। তিনি ছিলেন অপুত্রক। পিতা রাজা সতীপ্রসাদের আমল থেকেই বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞানপ্রসাদ গোস্বামী, ফৈয়াজ খাঁ, বড়েগোলাম আলি খান, কণ্ঠেমহারাজ, আমিরউদ্দিন খাঁ, জ্ঞানপ্রসাদ ঘোষ, মুজাফর খাঁ, এনায়েৎ খাঁ প্রমুখ রাজবাড়ীর সঙ্গীত-আসর অলংকৃত করেছেন।

কুমার **গোপালপ্রসাদ** গর্গের দুই পুত্র—ভবানীপ্রসাদ ও ভূপালপ্রসাদ এবং এক

১। District Gazeteer—Midnapore, 1916. Cyclopedia of India, Vol. III, 1909.

কন্যা নন্দিনী। শক্তিপ্রসাদ-এর স্ত্রী তটিনী দেবী মুর্শিদাবাদের লালগোলার জমিদার রাজা রাও বীরেন্দ্রনারায়ণের কন্যা। তাঁদের একমাত্র পুত্র শঙ্করপ্রসাদ ও কন্যা মৃদুলা এবং পৌত্র শৌর্যপ্রসাদ। বর্তমানে শক্তিপ্রসাদ তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকেন নিজস্ব অট্টালিকায়—৭৮, রফি আহম্মদ কিদোয়াই রোডে। মহিষাদলে রাজবাটী ফুলবাগ' প্রাসাদেও তাঁকে প্রায়ই যেতে হয়।

মহিষাদলের দুটি রাজবাড়ী—পুরানো ও নতুন। প্রায় ১০০ ফুট চওড়া গড় (পরিখা) দিয়ে ঘেরা দুটি রাজবাড়ী, মন্দির, রাসমঞ্চ ও দুর্গামণ্ডপ প্রায় ১০০ একর জমির উপর এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পুরানো রাজবাড়ীটি তৈরী হয়েছিল রাজা লছমনপ্রসাদের আমলে। বর্তমানে বাড়ীটিকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে এষ্টেটের পূজা-পার্বণ ও অন্যান্য খরচ মেটানোর জন্য।

নতুন প্রাসাদ 'ফুলবাগ' ১৯২৪ খ্রীঃ রাজা সতীপ্রসাদের আমলে তৈরী হয়েছিল। দোতলা প্রাসাদের সামনে টানা লম্বা বারান্দা—নীচে ও উপরে। ছাদের উপর দুপাশে ও মাঝখানে একটি করে গোলাকার গম্বুজ। 'ফুলবাগ' কথাটির যথার্থ মর্যাদা এখন না থাকলেও, অবশিষ্টাংশ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, পুষ্পরাজি ও কয়েকটি পাথরের মূর্তি সহ কৃত্রিম ফোয়ারা আর তার পাশে বহু গাছপালা, একদিন এই প্রাসাদের রমরমার সাক্ষ্য বহন করে। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা এই বিশাল প্রাঙ্গনের বিরাট প্রবেশ দ্বারটি এখনও অটুট আছে। প্রাসাদের উপর-তোলায় ও নীচে বড় বড় ঘরগুলির মধ্যে রয়েছে বৈঠকখানা ও গান-বাজনার আসর। একটি ঘরে শিকার করা বন্য জন্তু-জানোয়ারদের প্রদর্শনী। প্রাসাদটি এখনও সুরক্ষিত তবে শ্রীহীন।

রাজবংশের ইষ্টদেবতা মদনগোপাল জীউর সুউচ্চ 'নবরত্ন' মন্দিরটি তৈরী হয়েছিল ১৭৭৮ খ্রীঃ রানী জানকীর আমলে। দেশজোড়া নাম মহিষাদলের রথ ও দোলের প্রাণকেন্দ্র এই মন্দিরটি। বাৎসরিক পার্বণ ও মেলা ছাড়া নিত্য-পর্যায়ে পূজার সুবন্দোবস্ত রয়েছে। আগে রাসলীলার বিরাট উৎসব অনুষ্ঠিত হত, এখন ভগ্নদশা-প্রাপ্ত মঞ্চটিতে রাসলীলা আর হয় না। বিরাট দুর্গামণ্ডপটি রানী জানকীদেবীর প্রতিষ্ঠিত। আজও অতি নিষ্ঠার সঙ্গে দেবী দশভুজা দুর্গা পূজিতা হচ্ছেন। পুরানো জাঁকজমকের দিনগুলির স্মৃতির মধ্যে সান্ত্বনা পেয়ে থাকেন রাজবংশীয়রা। প্রাসাদের চৌহদ্দীর মধ্যে যে কয়েকটি বিরাট দিঘী রয়েছে, তার মধ্যে 'সাহেব দিঘী' বা 'রাজ দিঘী' দর্শনযোগ্য।

দেশের সব জমিদারদের মত মহিষাদলের রাজপরিবারের বর্তমান আর্থিক অনটনের জন্য দান-ধ্যান সবই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এঁদের পূর্ব-পুরুষদের বদান্যতায় ঐ অঞ্চলে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও দাতব্য-চিকিৎসালয় সবই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

রাজা শোভা সিংহ

চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের জীবিতকালে বাংলার সুবাদার ইব্রাইম খানের (১৬৮৯-৯৬ খ্রীঃ) শাসনকালে মেদিনীপুর জেলায় ঘাটালে চন্দ্রকোণার চেতুয়া-বরদার একজন সাধারণ জমিদার, রাজা (স্বয়ং ঘোষিত) শোভা সিংহ ১ সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। শেভা সিংহ বর্ধমানের ইজারাদার রাজা কৃষ্ণরামকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কৃষ্ণরাম জানুয়ারী, ১৬৯৬ খ্রীঃ মারা যান। শোভা সিংহ বর্ধমান দখল করেন। উড়িষ্যার পাঠান সর্দার রহিম খানের সাহায্যে শোভা সিংহ ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রায় ১৮০ মাইল মুখসুদাবাদ-সহ বিস্তৃত ভূখণ্ডের মালিক হন। রাজা কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম ২ প্রাণে রক্ষা পেয়ে ঢাকায় নবাবের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হন। শোভা সিংহ রাজা কৃষ্ণরামের কন্যা সত্যবতীর উপর পাশবিক অত্যাচার করার উদ্যোগ নিলে, সত্যবতী লুকানো ছুরিকাঘাতে তাঁকে নিহত করেন। নিজেও আত্মঘাতী হন। ভিন্নমতে, উঁচু বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে শোভা সিংহ প্রাণ হারান।

শোভা সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর ভাই হিম্মৎ সিংহ ও কাকা মহা সিংহ কিছু দিনের জন্য জমিদারীর শাসনভার গ্রহণ করেন। পাঠান সর্দার রহিম খান, স্বঘোষিত রহিম শাহ, বাংলার বহু জায়গায় (হুগলী, মালদাহ, রাজমহল) লুঠতরাজে লিপ্ত হন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে বাংলার সুবাদার আজিমুস্‌খানের (সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নাতি) নির্দেশে জবরদস্ত খান রহিম শাহকে যুদ্ধে (ভগবানগোলায় প্রথমে মে, ১৬৯৭ খ্রীঃ ও পরে আগষ্ট, ১৬৯৮ খ্রীঃ) পরাজিত ও নিহত করেন। বিদ্রোহীদের অস্তিত্ব লোপ পায়।

অনেকের মতে, এই বিদ্রোহ, অন্ততঃ শেষের দিকে, মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বাঙালী-সংগঠিত একটি অভ্যুত্থান। কয়েক হাজার হিন্দু মুসলমান এই বিদ্রোহের পতাকাতলে জমায়েত হয়েছিলেন। এটিকে একটি সংঘর্ষ বলা ঠিক নয়, রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ। ৩ বিদ্রোহের প্রচণ্ডতা নবাব তথা মোগলদের বাধ্য করেছিল বিদেশী বণিক কোম্পানীগুলির সামরিক সাহায্য নিতে। বিদ্রোহের দু'বছর ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চল বিদ্রোহীদের অধীনে থাকায়, বিদেশী বণিকদের জলপথে বাণিজ্য করার অনুমতি প্রার্থনা করতে হত।

১। বর্ধমানের ব্যবসায়ী জমিদার রঘুনাথ সিংহের উত্তরপুরুষ দুর্জয় সিংহের পুত্র।

২। জগৎরাম পরে কৃষ্ণনগরের রাজা রামকৃষ্ণেরও আশ্রয়ে ছিলেন।

৩। ইংরাজ কোম্পানীর তৎকালীন এজেন্ট চার্লস আয়ার লিখেছেন—'এই হাতছাড়া অঞ্চলের রাজস্বের পরিমাণ হবে বছরে ৩০ লক্ষ টাকা, সৈন্য সংখ্যা হবে মোট ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩০ হাজার পদাতিক।

বীরভূমের পাঠান রাজারা (নবাব)

বীরভূমের ইতিহাসে কিংবদন্তী আর লোকশ্রুতির প্রবণতা থাকলেও প্রকৃত তথ্যের অমর্যাদা করা হয়নি। 'বীরভূম' নামের উৎপত্তির কাহিনীগুলির মধ্যে—'বীর' জাতি বা বংশ এবং 'বীর ভূঁইয়্যা' (সাঁওতালী ভাষায় জঙ্গল) উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া স্থানীয় স্বাধীন রাজা বীর সিংহ-এর (আনুঃ ১২২৬ খ্রীঃ) নামানুসারেও 'বীরভূম' নামের উৎপত্তি হতে পারে।

যদিও শতেরো শতকে বীরভূমের পাঠান জমিদাররা [১] মোগল সম্রাটের প্রভুত্ব মেনে চলে ছিল, বিশেষ করে বাংলার মোগল শাসনকর্তা ইসলাম্ খান ও শাহ্ সুজার সময়ে, কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৭ খ্রীঃ বীরভূমের পাঠান জমিদার (রাজা) **নবাব আসাদউল্লা খান** (আনুঃ ১৬৯৭ খ্রীঃ) ও বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজারা মোগল সম্রাটের বশ্যতা অস্বীকার করেন। পরে বাংলার মোগল শাসনকর্তা মুর্শিদকুলী খানের (১৭০৩-২৭ খ্রীঃ) সঙ্গে সংঘর্ষে ও পরাজয়ে পুনরায় মোগল সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করেন। আনুঃ ১৭১৮ খ্রীঃ দেওয়ান (রাজা) আসাদউল্লা খানের মৃত্যুর পর, পুত্র নবাব **বাদি-উজ্-জ্জামান খানের** সময় মারাঠা বর্গীদের অত্যাচারে ১৭৪২-৫১ খ্রীঃ বীরভূম বিধ্বস্ত হয়। বাংলার নবাব নাজিম আলিবর্দী খানের (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ) প্রবল প্রতিরোধ ও বীরভূমের নবাবদের (রাজা) সক্রিয় সহযোগিতায় বর্গীরা শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

নবাব বাদি-উজ্-জ্জামান খানের মৃত্যুর পর পুত্র আসাদ-উল্ জ্জামান দীর্ঘকাল যাবৎ অত্যন্ত মর্যাদার সঙ্গে বীরভূমের জমিদারী পরিচালনা করেন। ১৭৫৮-৫৯ খ্রীঃ নবাব মীরজাফর ও পরে মীরকাশিম ইংরাজদের [২] সাহায্যে নবাব **আসাদ-উল্-জ্জামানের** বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে লিপ্ত হয়েছিলেন। রাজা আসাদ উল্ জ্জামানের হিন্দু সেনাপতি দিলাপচাঁদ ও গোরাচাঁদ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেও বীরভূমের হেতমপুর দুর্গের পতন রক্ষা করতে পারেননি। মুর্শিদাবাদের নবাবের বশ্যতা স্বীকার করেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে ১৭৬৯-৭০ খ্রী চারিদিকে অন্নাভাব ও ডাকাত দলের আধিপত্য, বীরভূমের সমৃদ্ধি ও

১। 'সেইর মুতাক্ষরীণ'—অনুবাদক মঁসিয়ে রেমণ্ড (১৯০২ খ্রীঃ)। W. W Hunter—'Annals of Rural Bengal'। বীরভূম বিবরণ—মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী এবং হরেকৃষ্ণ মুখার্জী।

২। রাজা আসাদ উল্-জ্জামান, ইংরাজ-ফরাসী যুদ্ধে ১৭৪৬-৪৮ খ্রী ফরাসীদের সাহায্য করেছিলেন। মীরজাফরের পুত্র মীরণ ও ইংরাজ সেনাপতি মেজর কেইলাও সম্মিলিতভাবে, রাজা আসাদ উল্‌কে, মোগল সম্রাট শাহ্ আলমের সৈন্যদের ও স্থানীয় জমিদারদের সাহায্য সত্ত্বেও ১৭৬০ খ্রীঃ খেরওয়া যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন।

গৌরব ধূলিসাৎ হয়ে যায়।[১] বীরভূমের শেষ মুসলমান রাজা আসাদ-উল্-জ্জামান কলকাতায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ইংরাজ কোম্পানীর ১৭৬৫ খ্রীঃ দেওয়ানী লাভের সুবাদে বীরভূম প্রকৃতপক্ষে ইংরাজ শাসনভূক্ত অঞ্চলে পরিণত হয়।

প্রায় দেড়শ বছরেরও বেশী সময়ের রাজত্বকালে বীরভূমের মুসলমান রাজাদের বহু জনহিতকর কীর্তির নিদর্শন—মন্দির, মসজিদ, ইমামবাড়া, বিশাল দিঘী ও ইমারত—এখনও ভগ্ন-অবস্থায় সাক্ষ্য বহন করছে। বাংলার সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিগন্তে বীরভূমের চিরন্তন অবদান—জয়দেব ও চণ্ডীদাসের অমর সৃষ্টি, যথাক্রমে 'গীত গোবিন্দম' ও 'পদাবলী'। এই প্রসঙ্গে রাজা আসাদ-উল্-জ্জামানের অভূতপূর্ব ভূদানের কথা উল্লেখ করতে হয়। হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মস্থান, পণ্ডিত ও মৌলবীদের নিষ্কর জমি দান করা ছাড়া, শিব-রাউতরা গ্রামের অধিবাসীদের নিষ্কর জমি দান করেন, স্থানীয় হেতমপুর রাজাদের কল্যাণে ঈশ্বরের কাছে সব সময় প্রার্থনা করার জন্য। এ ছাড়া, মোউলপুর গ্রামবাসীদের জমি দান করেন, সারা বছর বাঁদরের উপদ্রব থেকে আশে-পাশের গ্রামগুলিকে রক্ষা করার শর্তে।

মুসলমান রাজাদের আমলে বৈষ্ণব সাহিত্যের সমৃদ্ধি ছাড়া, বাউল সঙ্গীত-মালায় ও গ্রামীন পূজা-পার্বন মেলার সম্ভারে, হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধ ধর্মের মিলন গাথা, প্রকৃতই বাংলার সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বীরভূমের অনন্য অবদান। বীরভূমে পর্যটক ও ধর্মার্থীদের চিরন্তন আকর্ষণ কেঁদুলি, নান্নুর, বক্রেশ্বর, ফুল্লরা, নন্দীনী, নাটেশ্বরী, তারাপীঠ, কেরমানী সাহেব, ফকির আলম সাহেব, মুকদম সাহেব ও শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী প্রভৃতি।

১। এই প্রসঙ্গে বীরভূমের ইংরাজ কোম্পানীর সুপারভাইজার মিঃ হিগ্‌গিন্‌সনের, ফেব্রুয়ারী ১৭৭১ খ্রীঃ, একটি রিপোর্টের উল্লেখ করা হল—"Truly concerned am I to acquaint you that the bad effects of the last famine appears in these places beyond description, dreadfull. Many hundreds of villages are entirely depopulated ; and even in the large towns, there are not a fourth part of the houses inhabited......".

হেতমপুরের চক্রবর্তী রাজপরিবার

বীরভূম

বীরভূমে পাঠান রাজাদের (নবাবদের) আমলে শোত্রীয় ব্রাহ্মণ **মুরলীধর চক্রবর্তী** আনুঃ ১৬৬০খ্রীঃ বীরভূমে রাজনগরে রাজাদের অধীনে কর্মরত ছিলেন। বাঁকুড়া নিবাসী মুরলীধরই হেতমপুরের [১] চক্রবর্তী রাজপরিবারের আদিপুরুষ। তাঁর পুত্র **চৈতন্যচরণের** জন্ম হয় আনুঃ ১৬৯৮ খ্রীঃ। রাজাদের দরবারে 'সঙ্গীতবিশারদ' হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। পাঠান সেনাপতি হাফিজ খান হেতমপুর দুর্গের অধ্যক্ষ। তাঁরই আনুকূল্যে চৈতন্যচরণ হেতমপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার সুযোগ পান। চৈতন্যচরণের চার পুত্রের মধ্যে **রাধানাথ** বীরভূমে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। পাঠান রাজাদের পতনের পর ইংরাজ সরকারের শাসন-ব্যবস্থায় রাধানাথ কুণ্ডোহিত জমিদারী কিনে নেন আনুঃ ১৭৯৬ খ্রীঃ। তাঁর জনহিতকর কাজ ও দানের জন্য বিশেষ সুনাম ছিল। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৩৫ খ্রীঃ।

রাধানাথের দুই পুত্র—বিপ্রচরণ ও গঙ্গানারায়ণ (আকালমৃত্যু হয়)। **বিপ্রচরণ** উত্তরাধিকারী হয়ে জমিদারীর আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—বীরভূমে ২০ জুলাই, ১৮৫৫ খ্রীঃ **সাঁওতাল বিদ্রোহ**। [২] ক্যাপ্টেন বার্ড বিদ্রোহ দমন করেন ১৭ আগস্ট, ১৮৫৫ খ্রীঃ। বিপ্রচরণ সর্বতোভাবে ইংরাজ সরকারকে বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করেন। এই প্রসঙ্গে সরকারের তদানীন্তন আণ্ডার সেক্রেটারী, গভর্নমেণ্ট অফ্ বেঙ্গল, এ. ইউ. রুপেন-এর লেখা, ২২ অক্টোবর, ১৮৬৬ খ্রীঃ একটি চিঠির উল্লেখ করা হল বিপ্রচরণের রাজভক্তির প্রমাণ-পত্র হিসাবে।

'To

I, Richardson, Collector of Birbhum,

I am directed to acknowledge the receipt of your Diary of 28th ultimo, and with reference to the intimation therein

১। দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত হেতমপুর গ্রাম, সদর কার্যালয় সিউড়ী শহর থেকে প্রায় ২১ কি. মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত।

২। স্বাধীন বীরভূমের স্বপ্ন শেষবার দেখেছিল দামিন-ই-কো অঞ্চলের বিদ্রোহী সাঁওতাল অধিবাসীরা, জমিদার, মহাজন ও ইংরাজ ব্যবসায়ীদের শোষণ-নীতির বলি হয়ে। কৃষক সাঁওতাল সর্দার সিদো ও কানহু ফাঁসির মঞ্চে শহীদ হন। কলকাতায় সিদো-কানহু ডহরে এঁদের একটি স্মৃতি-বেদী আছে।

contained of the public spirit envinced by Babu Bipra Charan Chakravarty in raising a force at his own cost from among his dependents to aid the military in suppression of the Santhal insurrection to inform you that Lt. Governor would be glad to hear more of the circumstances.'

ইংরাজ সরকারের বীরভূমের কলেক্টর মিঃ আই. রিচার্ডসন্ এই সাহায্যের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি প্রসংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন। বিপ্রচরণ দেবী সরস্বতীর নামে হেতমপুরে একটি বিশাল সৌধ তৈরী করেন। বর্তমানে এটিতে হেতমপুর রাজ কলেজের অবস্থান। এখানে 'গোবিন্দসায়র' নামে বড় দিঘীটি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। মারা যান ১৮৫৭ খ্রীঃ।

রাজা বিপ্রচরণের জেষ্ঠ্য পুত্র মহারাজা **কৃষ্ণচন্দ্রের** জন্ম হয় ১৮২৬ খ্রীঃ। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে অকালে মারা যান ১৮৬২ খ্রীঃ একমাত্র নাবালক পুত্র **রামরঞ্জনকে** রেখে। কৃষ্ণচন্দ্র প্রজাদের কল্যানার্থে অর্থদান করেছেন।

মহারাজা রামরঞ্জন চক্রবর্তী

রামরঞ্জনের জন্ম হয় ১৮৫১ খ্রীঃ। মাত্র ১১ বছর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। ১৮৬২ খ্রীঃ জমিদারীর ভার 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস' গ্রহণ করেন। ছাত্র-জীবন শুরু হয় পূর্ব কলকাতায় শুড়ার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত কলকাতা 'ওয়ার্ডস ইনস্টিটিউশনে'। ১৮৬৯ খ্রীঃ সাবালক হয়ে জমিদারীর কার্যভার গ্রহণ করেন। আদর্শ চরিত্রের মানুষ রামরঞ্জন দরিদ্র প্রজাদের দরদী জমিদার। প্রজাদের কল্যাণে মুক্তহস্তে দান করেছেন, বিশেষ করে ১৮৭৪ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের সময়।

তদানীন্তন ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থ ব্রুক রামরঞ্জনের সাধু চরিত্র ও বদান্যতার জন্য ১৭ মার্চ, ১৮৭৫ খ্রীঃ 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। এর দু' বছর পরে, ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতি-কল্পে কল্যাণমূলক কাজের জন্য ১৫ হাজার টাকা ও পরে মহারানী ভিক্টোরিয়ার নামে সেবামূলক কাজে ৫০ হাজার টাকা দান করেন। জানুয়ারী, ১৯১২ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রাজা বাহাদুর রমারঞ্জন নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম। ১৯১২ খ্রীঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ রাজা বাহাদুর রমারঞ্জনকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। হেতমপুরে হাইস্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয়, বারাণসী ও বৃন্দাবনে শ্রীশ্রী রাসবিহারী জীউ মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর পত্নী মহারানী পদ্মসুন্দরীর উদ্যোগে নবদ্বীপে ধর্মশালা ও মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মহারাজা রামরঞ্জনের মৃত্যু

হয় ১৯১৩ খ্রীঃ। তাঁর পাঁচপুত্র—নিত্যনিরঞ্জন, সত্যনিরঞ্জন, মহিমানিরঞ্জন, সদানিরঞ্জন ও কমলানিরঞ্জন। জ্যেষ্ঠ্যপুত্র নিত্যনিরঞ্জন ও তাঁর পুত্র জ্ঞাননিরঞ্জন। দু'জনেরই অকাল মৃত্যু ঘটে।

রাজা সত্যনিরঞ্জন চক্রবর্তী বাহাদুর

মহারাজা রামরঞ্জনের দ্বিতীয় পুত্র সত্যনিরঞ্জন জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। জমিদারীতে অপব্যয় বন্ধ করে শিক্ষার খাতে এবং সেবামূলক কাজে ব্যয় করেন। ব্যবসায়ে আগ্রহ থাকায় কয়লাখনির মালিক হন ও কলকারখানার উৎপাদন-ভিত্তিক কাজে মনোনিবেশ করেন। কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ডে ৩৫ হাজার টাকা এবং সিউড়ী দাতব্য চিকিৎসালয়ে ১৫ হাজার টাকা দান করেন। ইংরাজ সরকার সত্যনিরঞ্জনের বদান্যতার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে 'রাজা' খেতাব দেন ১৯২৬ খ্রীঃ এবং পরের বছর 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজা সত্যনিরঞ্জনের পুত্র কুমার ব্রহ্মনিরঞ্জনের পুত্র রাধিকারঞ্জন। বর্তমান বংশধর রাধিকারঞ্জনের পুত্র সুরঞ্জন চক্রবর্তী কলিকাতা হাইকোর্টের আইনজীবি।

মহারাজা রামনিরঞ্জনের তৃতীয় পুত্র কুমার মহিমানিরঞ্জন ও চতুর্থ পুত্র কুমার সদানিরঞ্জন অপুত্রক। পঞ্চম পুত্র কুমার কমলানিরঞ্জনের পুত্র বিশ্বরঞ্জনের দুই পুত্র—রেবতীরঞ্জন ও মাধবীরঞ্জন। রেবতীরঞ্জনের কন্যা প্রভাতী বন্দোপাধ্যায়। মাধবীরঞ্জনের দুই কন্যা—অনুরাধা ও বৈশাখী। কলকাতায় বালিগঞ্জে ফার্ন রোডে এঁদের বাসভবন।

রাজাদেরকীর্তি: হেতমপুরে চক্রবর্তী রাজপরিবারের বিগত দিনের ঐতিহ্যের নিদর্শন—রাজপ্রাসাদ—**রঞ্জন প্যালেস**। মুর্শিদাবাদের নবাবদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদের মত দীর্ঘায়তন না হলেও, প্রাসাদের ভিতরের দেওয়ালে চিত্রকলার অলংকরণ ও প্রাচীন দুর্লভ দ্রব্য সামগ্রীর সংগ্রহ দেখা যায়। সিংহদ্বারের উপর ঘড়িঘর বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৮৪৭ খ্রীঃ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত **চন্দ্রনাথ শিব মন্দিরের** গাত্রে পোড়া-মাটির ফলকে হিন্দু দেব-দেবীর ও পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এমন কি, ইউরোপীয় কলাবিদ্যার প্রভাবে উৎকীর্ণ জননায়ক, কবি ও ইংরাজ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রতিকৃতি ছাড়া, ইউরোপীয় অলংকার শৈলীও সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। মৃৎফলকে সাহেব, মেমসাহেব ও নৃত্যরতা নারীমূর্তিগুলি পর্যটকদের আকর্ষণ করে।

বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজপরিবার

বাঁকুড়া

খ্রীষ্টীয় তেরো শতকে বৃহৎ-বঙ্গে মল্লভূমি এলাকা (মালভূম) যেমন প্রাচীন, তেমনি গৌরবপূর্ণ। পাল বা সেন বংশীয় রাজাদের রাজত্বের আয়তনের তুলনায় মল্লরাজ্যের পরিধি অনেক কম। কিন্তু তাঁদের তৈরী বহু মন্দির ও দেব-দেউলগুলিতে ভাস্কর-শিল্পের অসামান্য কারুকার্যের যে নমুনা আজও দেখা যায়, তা পাল বা সেন রাজাদের চেয়েও কোনো অংশে কম নয়। মল্লরাজবংশের [১] প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় আদিবাসী (বাগ্দী) সম্প্রদায়ের কোন এক প্রতাপশালী নেতা। অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে নেতার নাম ছিল—**আদিমল্ল**, প্রায় ৬৯৫ খ্রীঃ (মল্লাব্দ ১ ; বঙ্গাব্দ ১০২)। [২] এই পরিচয় সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক-ভিত্তিক না হলেও, পরবর্তীকালের কয়েকটি গ্রন্থে রাজাদের বংশ তালিকায় পাওয়া গেছে। রাজবংশের অষ্টাদশ রাজা জগৎমল্ল খ্রীষ্টীয় দশ শতকের শেষভাগে পুরানো রাজধানী লাউ গ্রাম থেকে বিষ্ণুপুরে [৩] স্থানান্তরিত করেন।

সম্রাট আকবরের পার্ষদ আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরীতে' সমকালীন ঘটনাবলীর যে সব উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে এপ্রিল, ১৫৯০ খ্রীঃ রাজা মান সিংহ (আকবরের সেনাপতি ও বিহারের সুবাদার) ও তাঁর পুত্র জগৎ সিংহ বিষ্ণুপুরের জমিদার **'ধর হাম্বির'** (১৫৮৬ খ্রীঃ)-এর সাহায্যে উড়িষ্যার পাঠান নায়ক কুৎলুখানকে পরাজিত করেন। এই 'ধর হাম্বির' ছিলেন মল্লরাজবংশের ৪৯তম রাজা এবং মোগল সাম্রাজ্যের করদ (বার্ষিক ১০৭,০০০ টাকা) মিত্র-রাজা।

রাজা বীর হাম্বির

রাজবাড়ীর বংশতালিকায় 'ধর হাম্বিরের' পরবর্তী শাসক রাজা 'বীর হাম্বির' [৪]

১। বিষ্ণুপুর মল্ল রাজবংশে রক্ষিত 'বংশ-পরিচয়'। যদিও 'পণ্ডিত উপাখ্যান'-এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা-রাজার নাম দেওয়া হয়েছে রঘুনাথ সিংহ বা রঘুনাথ রাজা। এঁরা এখনও স্থানীয় লোকেদের কাছে 'বাগ্দী রাজা' নামে অভিহিত। ষোল-সতেরো শতকে বাংলার 'বার-ভূঁয়াদের' অন্যতম ছিলেন মল্লরাজ বীর হাম্বির।

২। সতেরো শতকের পূর্বের ইতিহাস, আলোচ্য পুস্তকের বিষয়বস্তু না হওয়ায় মল্ল রাজবংশের পরম্পরাক্রমে আগত রাজাদের পরিচিতি আলোচিত হয়নি, তবে রাজাদের অমরকীর্তি—মন্দির ও দেবালয়গুলির যথাযথ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। খড়্গপুর-আদ্রা রেলপথে বিষ্ণুপুর স্টেশন থেকে শহর প্রায় দেড় কি. মি.।

৪। পাকবিড়রা (মানভূম) দুর্গের তোরণদ্বারে লিখিত লিপি।

(আনুঃ ১৫৯১-১৬১৬ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা রাজা। প্রথমে মোগল সম্রাটের (জাহাঙ্গীর) বিরোধিতা করলেও বাংলার সুবাদার ইসলাম খানের কাছে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন ১৬০৮ খ্রীঃ। নিত্যানন্দ দাস (প্রণেতা 'প্রেম বিলাস') ও 'ভক্তি রত্নাকর'-এর প্রণেতা নরহরি চক্রবর্তী বলেছেন যে, রাজা বীর হাম্বির তাঁর প্রথম জীবনে অত্যাচারী ও বিবেক-বর্জিত হলেও, শেষ জীবনে শ্রীনিবাস আচার্যের সান্নিধ্যে পরম বৈষ্ণব হয়ে, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের জন্য সম্ভাব্য পৃষ্ঠপোষকতা করেন, মন্দির প্রতিষ্ঠায় ও বৈষ্ণব সাহিত্যের সম্প্রসারণের জন্য। তিনি নাকি বাংলা ও বিহারের সুলতান দাউদ কররানীদের হিন্দু-বিদ্বেশী সেনাপতি কালাপাহাড়কে বিষ্ণুপুর এলাকায় ঢুকতে দেননি।

পরম বৈষ্ণব রাজা বীর হাম্বীরের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের **'রাসমঞ্চ'** (চিত্ররাজি দ্রষ্টব্য) এক অসাধারণ সৌধ। রাসলীলার সময় স্থানীয় যাবতীয় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং বহু দূরেরও ছোট বড় বৈষ্ণব দেব-দেবীর বিগ্রহ এই মঞ্চে একত্র করা হত, যা দেখতে কয়েক লক্ষ লোক মঞ্চের চারিপাশে বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে সমিল হত। বাংলার মন্দির-স্থাপত্যের শৈলী 'চারচালা' ও 'দু'চালা' ছাড়া মন্দির-শীর্ষে চারটি ঢালু চাল (মিশরের পিরামিডের আকৃতিতে) ধাপে ধাপে উপরে উঠে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। রাজা বীর হাম্বীরের কীর্তির অপর একটি নিদর্শন রয়েছে, তাঁর সময়ে নির্মিত বিরাট কামান **'দলমর্দন'**-ওজন ২৯৫ মন ও সাড়ে বার ফুট দীর্ঘ।

কিছু ঐতিহাসিকদের মতে, রাজা বীর হাম্বীরের পরে উত্তরাধিকারী হন প্রথম **বীর সিংহ** (আনুঃ ১৬২২ খ্রীঃ), যদিও তাঁর কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যেহেতু পরবর্তী নির্দিষ্ট উত্তরাধিকারী রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহের সময়-কাল ১৬৪৩-৫৬ খ্রীঃ এবং রাজা বীর-হাম্বীরের রাজত্বের অবসান ঘটে আনুঃ ১৬১৬ খ্রীঃ, অতএব তাঁদের যুক্তি যে, রাজা প্রথম বীর সিংহই রাজা বীর হাম্বীরের পরবর্তী রাজা, কমপক্ষে কুড়ি বছর রাজত্ব করেছিলেন (১৬১৬-৪২ খ্রীঃ)।

রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহ (১৬৪৩-৫৬ খ্রীঃ) [১] মল্লবংশের সবচেয়ে কীর্তিমান রাজা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মন্দিরগুলির মধ্যে 'কালাচাঁদ' ১৬৫৬ খ্রীঃ 'কেষ্ট রায়' ও

১। প্রথম রঘুনাথ সিংহ প্রকৃতপক্ষে একজন শৌর্যশালী রাজা। তাঁর বীরত্ব ও সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার হিসাবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন একটি কিংবদন্তীতে। রাজা রঘুনাথ সিংহের দিল্লী দরবারে রাজস্ব পাঠাতে দেরি হওয়ায়, তাঁকে বলপূর্বক দিল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে। তিনি নাকি আট দিনের পথ মাত্র সাত ঘণ্টার মধ্যেই অতিক্রম করায় সম্রাটের কাছে অতীব সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার হিসাবে চিহ্নিত হন। তাঁর রাজ্যশাসনের দায়িত্ববোধের প্রতি আস্থাবান হয়ে সম্রাট তাঁকে সসম্মানে বিষ্ণুপুরে পাঠিয়ে দেন। তিনি বীর হাম্বিরের পুত্র।

শ্যামরায়ের (পঞ্চরত্ন) মন্দির (চিত্ররাজি দ্রষ্টব্য) বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। মন্দির গাত্রে পোড়া-মাটির ফলকে কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত করা আছে। ১৬৪৩ খ্রীঃ তৈরী শ্যামরায়ের মন্দিরটি এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ।

পরবর্তী রাজা **দ্বিতীয় বীর সিংহ** (১৬৫৬-৭৭ খ্রীঃ) ছিলেন লালজি, রাধাশ্যাম, ১৬৫৮ খ্রীঃ, মদন গোপাল (১৬৬৫ খ্রীঃ) ও রাধাকৃষ্ণের (১৬৭৮ খ্রীঃ) মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। বীর সিংহ মহিষী রানী চূড়ামণিও প্রতিষ্ঠাত্রী।

পরবর্তী রাজা **দুর্জন সিংহ** (১৬৭৮-৯৪ খ্রীঃ) মদনমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

রাজা দুর্জন সিংহের উত্তরাধিকারী রাজা **দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ** (১৬৯৪-১৭২৫ খ্রীঃ) ছিলেন মল্ল রাজবংশের একান্ত সংগীত-প্রেমী। তাঁর রাজসভায় বিখ্যাত সঙ্গীত সাধক মিয়া তানসেনের বংশধর বাহাদুরসেন উপস্থিত ছিলেন। বিখ্যাত মুসলমান নর্তকী লালবাঈ সংগীত উপাসক রাজা রঘুনাথকে, তাঁর অপরূপ নৃত্যসংগীতের মোহে বশীভূত করেন। বৈষ্ণব-ধর্মী রাজা নর্তকীর প্রভাবে রাজ্যে অবাঞ্ছিত কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়েন। দেশবাসীর অভিশাপ নিয়ে মারা যান। লালবাঈ-এর স্মৃতি-চিহ্ন বহন করে বিষ্ণুপুরে লালবাধ দিঘী ও লালগড়।

অভিশপ্ত রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের যোগ্য উত্তরাধিকারী রাজ **গোপাল সিংহ** (১৭২৬-৩৮ খ্রীঃ) রাধাগোবিন্দ মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। পরের রাজা **কৃষ্ণ সিংহ** গোবিন্দ মন্দির ১৭৩৯ খ্রীঃ নির্মাণ করেন। রাজা গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুরের 'জোড় মন্দিরের' ১৭২৬ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজত্বকালে বিষ্ণুপুর কুখ্যাত মারাঠা বর্গীদের আক্রমণের কবলে পড়ে। মোগল সুবাদার নবাব আলিবর্দী খানের সৈন বাহিনীর বাধা সত্ত্বেও, বিষ্ণুপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা যথেষ্ট উৎপীড়ন ও অত্যাচার ভোগ করেছিল। আনন্দের বিষয় যে, মন্দিরগুলিতে লুঠপাট হয়তো হয়েছিল, কিন্তু ভগ্ন-অবস্থায় পড়ে থাকেনি। কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী তাঁর সভা কবি ছিলেন।

পরবর্তী **রাজা চৈতন্য সিংহ** ১৭৫৮ খ্রীঃ রাধাশ্যাম মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর সময়ে ১৭৫৩ খ্রীঃ বিষ্ণুপুর রাজ্য আর্থিক দুরবস্থায় পড়ে। মুর্শিদাবাদের নবাব ও পরে ইংরাজ কোম্পানীর (বিশেষ করে ১৭৬৫ খ্রীঃ দেওয়ানী লাভের পর) বকেয়া রাজস্ব জমা দিতে অসমর্থ হওয়ায় [১] বিষ্ণুপুর রাজাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ে। রাজা

১। ১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ বাংলায় ভয়াবহ মন্বন্তরের ফলে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তা ছাড়া ১৭৮৯ খ্রীঃ প্রজারা ইংরাজ সরকারের রাজস্ব আদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় রাজা চৈতন্য সিংহকে দায়ী করেন। বৈষ্ণবধর্মের আতিশয্যই স্বাধীন করদ রাজ্য বিষ্ণুপুরের রাজ-শক্তির পতনের অন্যতম কারণ। রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ-এর সময়েই রাজ্যে স্বধর্ম বিঘ্নিত হওয়ায় প্রজারা বিদ্রোহের পথে যেতে বাধ্য হয়েছিল।

চৈতন্য সিংহকে শাস্তি হিসাবে কারাবাসে পাঠানো হয়েছিল। বিষ্ণুপুর জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হয় ১৭৯১ খ্রীঃ। চৈতন্য সিংহ গৃহ ত্যাগ করেন। রাজবংশের কুলদেবতা মদনমোহন বিগ্রহকে কলকাতায় বাগবাজারে মদনমোহনতলার জমিদার গোকুল মিত্রের দেবালয়ে পাঠানো হয় (ভিন্ন মতে, বিক্রী করা হয়)। রাজা চৈতন্য সিংহ হাওড়ায় বাড়ী ভাড়া করে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে ছিলেন। ইংরাজ বণিক সরকার চৈতন্য সিংহের কাছ থেকে বিষ্ণুপুরের দেয় রাজস্ব হিসাবে চার লক্ষ টাকা দাবী করেন। এর মধ্যে রাজা চৈতন্য সিংহ ও তাঁর পিতৃব্য পুত্র দামোদর সিংহের জমিদারীর স্বাত্বাংশ সংক্রান্ত বিবাদ চলতে থাকে বেশ কয়েক বছর। আদালতের নির্দেশে ১৭৮৭ খ্রীঃ রাজা চৈতন্য সিংহকে মালিক হিসাবে সাব্যস্ত করা হয়। দেনার দায় থেকে উদ্ধার পাননি। বিষ্ণুপুর জমিদারী বর্ধমানের রাজায় ২,১৫০০০ টাকায় কিনে নেন ১৮০৬ খ্রীঃ। অতি বৃদ্ধ রাজা চৈতন্য সিংহ বন্দী অবস্থায় মারা যান ১৮০৯ খ্রীঃ। লর্ড কর্নওয়ালিস-এর দাক্ষিণ্যে মল্ল রাজবংশের দেবোত্তর, ব্রাহ্মোত্তর ও পারিবারিক নিজস্ব সম্পত্তি বংশের উত্তরাধিকারীরা ভোগ করার অধিকার পেয়েছিলেন।

রাজা চৈতন্য সিংহের পর যথাক্রমে মাধব সিংহ (১৮০১ খ্রীঃ), দ্বিতীয় গোপাল সিংহ (১৮০৯ খ্রীঃ), রামকৃষ্ণ সিংহ (১৮৭৬ খ্রীঃ) নীলমণি সিংহ (১৮৮৯ খ্রীঃ) ও রামচন্দ্র সিংহ (মৃত্যু ১৯১৮ খ্রীঃ)। এঁরা সকলেই বৃত্তি-ভোগী ছিলেন। এই রাজবংশের 'ঠাকুর' কালিপদ সিংহ (১৯৩০ খ্রীঃ) ও তাঁর বংশধরেরা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে জামকুঁড়ি, ইঁদাস, কুচিয়াকোল প্রভৃতি এলাকায় আর্থিক অনটনের মধ্যে জীবন যাপন করলেও, স্থানীয় লোকদের কাছে মর্যাদা ও ভালবাসা পেয়ে থাকেন।

বিষ্ণুপুরের মাহাত্ম্য

পোড়া মাটির ভাস্কর্যের উৎকর্ষ ও বাহুল্যের উপলক্ষে আরও বেশ কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের নাম উল্লেখ করা হল। ভট্টাচার্যপাড়ায় মল্লেশ্বর মন্দির (১৬২২ খ্রীঃ), কামারপাড়ায় চন্দ্রমল্লের মন্দির (১৫২৯ খ্রীঃ), বেলড়ার সিদ্ধেশ্বর শিব, সন্দেশ্বর, শৈলেশ্বর শিব, কৃষ্ণরায় ও মহাপ্রভুর প্রভৃতি। ইটের তৈরী রথ ও দুর্গ-তোরণ ছাড়া, রাজাদের তৈরী আটটি বাঁধ (বড় দিঘীর মত)—কৃষ্ণ বাঁধ, শ্যাম বাঁধ, লাল বাঁধ, চৌখন বাঁধ, যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ ও গাঁতাত বাঁধ। এর মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছে।

বিষ্ণুপুর যে কেবল ভাস্কর-শিল্পের পীঠস্থান তা নয়, সাহিত্য, কলা, সংগীত প্রভৃতিরও তীর্থস্থান। মহারাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের সময় সংগীতকলা শাস্ত্রকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। রাজা রঘুনাথ প্রখ্যাত সংগীত সম্রাট মিয়া তান

সেনের বংশধর বাহাদুরসেনকে দিল্লী থেকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন বহু অর্থব্যয়ে। ১ **বিষ্ণুপুরের ঘরানার গায়কদের** মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গদাধর চক্রবর্তী, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (১৭৮১-৮২ খ্রীঃ), মোহন গোস্বামী (১৮৮২-৯০), অনন্তলাল বন্দোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায় ও রমেশ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। সংগীত যাদুকর যদুনাথ ভট্টাচর্য বা যদুভট্ট একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমের লীলাভূমি বিষ্ণুপুর **বৈষ্ণব সাহিত্যের** পীঠস্থান। বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীনিবাস আচার্যের পদধন্য বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব ধর্মের বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। শিবমঙ্গল কাব্য, বিষ্ণুপুরী রামায়ণ, মহাভারত ও বেশ কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলী মল্ল রাজাদের পৃষ্ট-পোষকতায় রচিত হয়েছিল। মুসলিম পুরাকীর্তি কোরবাণ সাহেবের 'মাজার' হিন্দু-মুসলমানের আরাধ্য পীঠস্থান। এখানে পুরাবস্তুর একটি সংগ্রহশালা আছে। ২

এ ছাড়া বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের **পট চিত্রকলা** বাংলা তথা ভারতের প্রাচীন লোক-চিত্র-শিল্পকে সমৃদ্ধশালী করেছে। এই সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মৃৎশিল্পের বিশিষ্টতা (ঘোড়া, হাতী ও আরও বহু জন্তু-জানোয়ারের মূর্তিগুলি), গালার খেলনা, গয়নাগাঁটি, আর চৌ-মুখোশ স্মৃতি-চিহ্ন সংগ্রাহকদের কাছে অদরণীয়।

দুর্গাপূজা — বিষ্ণুপুর রাজবংশের শক্তি-উপাসক অষ্টাদশ রাজা জগৎ মল্ল খ্রীষ্টীয় দশ শতকের শেষভাগে মৃন্ময় মহিষমর্দিনী দুর্গা মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি মন্দিরের মধ্যে। উনিশ শতকের শেষে রাজা রামকৃষ্ণ সিংহ (১৮৭৬ খ্রীঃ) বর্তমান ইটের তৈরী বিরাট মন্দিরটি নির্মাণ করেন। শারদীয়া দুর্গা পূজার সময়কালে রাজবাড়ীতে স্বতন্ত্র পদ্ধতি ও আচার অনুসারে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ষষ্ঠীর দিন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'ছোট ঠাকরুণ'-এর পূজা শুরু হলেও চতুর্থীর দিন 'মেজ ঠাকরুণ' (একটি ঘটক) ও নবমীর দিন 'বড় ঠাকরুণ'-এর (রূপোর পাতে মহিষমর্দ্দিনী মূর্তি) পূজা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক সপ্তাহব্যাপী মহাপূজা সুসম্পন্ন হয়। ৩

রাজবাড়ীর সংলগ্ন ইটের তৈরী একতলা দালান—বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের গৃহদেবী মৃন্ময়ীর মন্দিরে নিত্যপূজা হয়ে থাকে। ধ্যানে ও আকৃতিতে তিনি দেবী দুর্গার অনুরূপ।

১। 'রিয়াজু-উস্-সালাতিন' এবং উইলিয়াম হাণ্টার সাহেবের বর্ণনায়।

২। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর।

৩। দুর্গাপূজা সেকাল থেকে একাল—বিমল চন্দ্র দত্ত (পৃঃ ১১৫)

বর্ধমানের মহতব রাজপরিবার

মোগল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে (১৬২৭-৫৮ খ্রীঃ) পাঞ্জাবে লাহোরের কাছে কোটলির অধিবাসী কাপুর ক্ষত্রীয় বংশের ব্যবসায়ী **সঙ্গম রায়** ও তাঁর পুত্র বঙ্কুবিহারী রায় বাংলায় আসেন তাঁদের ভাগ্য নির্ধারণে। বঙ্কুবিহারীর **পুত্র আবু রায় আনুঃ** ১৬৫৭ খ্রীঃ বর্ধমানের সরকারী কোতওয়াল পদে নিযুক্ত ছিলেন। পরে ধন-সম্পত্তির মালিক হন। তিনিই বর্ধমানের প্রায় তিনশ বছরের মহতব রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। আবু রায়ের পুত্র **বাবু রায়** ও তাঁর পুত্র **ঘনশ্যাম রায়ের** সময়ে ভূসম্পত্তি যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করে। ঘনশ্যামের পুত্র **কৃষ্ণরাম রায়** মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারে স্বীকৃত জমিদার হিসাবে গণ্য হন (১৬৮৯ খ্রীঃ)। জমিদার কৃষ্ণরামের জনপ্রিয়তা না থাকায় তাঁকে শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হতে হয়। চন্দ্রকোণার চেতুয়া-বরদার জমিদার, স্বয়ং ঘোষিত রাজা শোভা সিংহ ও তাঁর সহযোগী আফগান নেতা রহিম খান মোগল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ১৬৯৫-৯৬ খ্রীঃ। জমিদার কৃষ্ণরাম রায় আক্রান্ত হন ও মারা যান ১৬৯৬ খ্রীঃ। তাঁর পরিবারের প্রায় ছাব্বিশ জন নিহত হলেও, তাঁর পুত্র **জগৎরাম রায়** ও কন্যা সত্যবতী রক্ষা পান এবং একটি বীরঙ্গনার কাহিনী সৃষ্টি হয়। শোভা সিংহ সত্যবতীর রূপে পাগল হয়ে অন্তঃপুরে তাঁর শ্লীলতাহানীর উদ্যোগ নিলে সত্যবতীর লুকানো ছুরিকাঘাতে রাজা শোভা সিংহ নিহত হন।[১] সত্যবতী নিজে আত্মঘাতী হন। জগৎরাম রায় পালিয়ে গিয়ে ঢাকায় বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খানের শরণাপন্ন হন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে ও সুবাদারের সাহায্যে জগৎরাম বর্ধমানের জমিদারীর গদীতে আবার অধিষ্ঠিত হন ১৬৯৭ খ্রীঃ। রাজা জগৎরাম নিহত হন ১৭০২ খ্রীঃ।

রাজা কীর্তিচাঁদ রায়

রাজা জগৎরামের দুই পুত্র কীর্তিচাঁদ ও মিত্রসেন। কীর্তিচাঁদ তাঁর ছোট ভাইকে কোগ্‌চিগড় দুর্গে বন্দী করে জমিদারীর সর্বময় মালিক হন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৭ খ্রীঃ বাংলায় শাসনব্যবস্থার অবনতি ঘটে। সেই সুযোগে কীর্তিচাঁদ বলপ্রয়োগে বেশ কয়েকটি জমিদারী (ভুরশুট, চন্দ্রকোণা, ঘাটাল, বরদা, বলঘোরা এবং বীরভূম ও

১। এ বিষয়ে তৎকালীন ফরাসী লেখক ফ্রাঙ্কোইস্ মার্টিনের মতে, শোভা সিংহ ছাদের উপর থেকে পড়ে মারা যান। অনেকে মনে করেন যে, শোভা সিংহকে হত্যা করার পর তাঁকে ছাদ থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

বিষ্ণুপুরের কিছু অংশ) দখলে আনেন। দক্ষিণ বাংলার তৎকালীন সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান জমিদার কীর্তিচাঁদ, সুবাদার নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী খানের সঙ্গে তাঁর জমিদারীর বাৎসরিক রাজস্ব বন্দোবস্ত করেন ২০,৪৭,৫০৬ টাকা ১৭২২ খ্রীঃ। হুগলী জেলার আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের (১৭৮৬ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠাতা জমিদার কৃষ্ণরাম মিত্র বর্ধমানের বিক্রমশালী রাজা কীর্তিচাঁদের দেওয়ান ছিলেন। কীর্তিচাঁদ মারা যান ১৭৪০ খ্রীঃ। ১

রাজা চিত্রসেন

রাজা কর্তিচাঁদের পুত্র চিত্রসেন পিতার ন্যায় আগ্রাসী জমিদার। তিনি অর্শা, মণ্ডল ঘাট, গোয়ালপাড়া, ব্রাহ্মণডুবি প্রভৃতি পরগণা বলপ্রয়োগে দখল করেন। সেই সময় সারা বাংলায় যে পাঁচটি (বিষ্ণুপুর, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, রাজসাহী) বৃহৎ জমিদারীর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, বর্ধমান সেগুলির অন্যতম। ১৭৩৭ খ্রীঃ সম্রাট মহম্মদ শাহ্ বর্ধমান অধিপতি চিত্রসেনকে 'রাজা' উপাধি দেন। তিনি রাজপরিবারের প্রথম খেতাবী রাজা। রাজগড় দুর্গ (এখন দেখা যায়) তাঁর তৈরী।[২] মারা যান ১৭৪৪ খ্রীঃ। অপুত্রক হওয়ায় পিতৃব্য পুত্র তিলকচাঁদকে গদীতে বসান।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তিলকচাঁদ

স্বাধীনচেতা জমিদার তিলকচাঁদ শাসনভার গ্রহণ করার পর, তাঁর জমিদারী এলাকায় ইংরাজ বণিক কোম্পানীর অনুপ্রবেশ পছন্দ করতেন না। তিনি ১৭৫৫ খ্রীঃ ইংরাজ বণিকদের বেশ কয়েকটি বাণিজ্যকেন্দ্র উচ্ছেদ করতে তৎপর হন। ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে দেশের বিপর্যয়ের পরেও তিনি ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে সমঝোতা করেননি।[৩] ১৭৬০ খ্রীঃ ইংরাজ বণিক-শক্তি তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভিযানে ব্রতী হন। কলকাতা থেকে ক্যাপ্টেন হোয়াইট ও মেদিনীপুর থেকে নাচেস্ সাহেব- সসৈন্যে বর্ধমান অভিমুখে যাত্রা করেন। কালনার যুদ্ধে তিলকচাঁদের সৈন্যদের পরাজয় স্বীকার করতে হয়। পরে অবশ্য বাংলার নবাবদের সুপারিশে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম তিলকচাঁদকে ১৭৬৮ খ্রীঃ 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' ও পাঁচ হাজারী 'মনসবদার' 'তিন হাজারী অশ্বারোহী সৈন্যাধ্যক্ষ' প্রভৃতি খেতাব উপহার দেন। মারাঠী বর্গীদের লুট-পাঠ ও অত্যাচার

১। কীর্তিচাঁদের সমাধি দৈনহাটে (কাটোয়া মহকুমা) এখনও দেখা যাবে।

২। বিদ্যানুরাগী চিত্রসেনের সভাকবি বানেশ্বর, যাঁর রচনা 'চিত্রচম্পু'—বর্গী আক্রমণের প্রামাণ্য ইতিহাস।

৩। ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ খ্রীঃ নবাব মীরকাশিম ইংরাজ কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টোগ্রামের জমিদারী ইজারা-দেন।

(১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) ও ১৭৭০ খ্রীঃ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাংলাকে বাঁচাবার তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন। ভগ্নহৃদয়ে মাত্র সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মারা যান ১৭৭১ খ্রীঃ বিধবা যুবতী স্ত্রী মহারানী বসন্তকুমারী ও নাবালক (৬ বৎসর) শিশু-সন্তান তেজচাঁদ (জন্ম ১৭৬৪ খ্রীঃ)-কে রেখে।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তেজচাঁদ

ইংরাজ শাসনকর্তা ওয়ারেন হেস্টিংস এই সুযোগে বর্ধমান জমিদারীর বিলুপ্তি ঘটাবার চেষ্টা করেন স্থানীয় জমিদার এবং তাঁর দুজন স্থানীয় উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী গ্রাহাম ও রিচার্ড **বারওয়েল** [১] সাহেবদের সাহায্যে। কিন্তু রানী বেষণকুমারী দিল্লীর দরবারে উপযুক্ত নজরানাসহ আর্জী পাঠিয়ে, সম্রাট শাহ আলমের ফরমানে বর্ধমানের গদী ও 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধি ও 'পাঁচহাজারী মনসবদার', 'ত্রিশ হাজারী পদাতিক সৈন্যাধ্যক্ষ' প্রভৃতি সম্মানসূচক পদবী আনিয়ে নেন ১৭৭১ খ্রীঃ। বর্ধমান রাজপরিবারের এই দুর্দিনে মহারাজা নন্দকুমার (হেস্টিংসের পরম শত্রু) মহারানী বেষণকুমারীকে সবরকম সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছিলেন। স্বাধীনচেতা মহারাজ তেজচাঁদ-এর রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাজা নবকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র গোপীমোহন দেব, প্যারীমোহন রায় প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিদের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল। বিখ্যাত কবি ও সাধক কমলাকান্তের গুণমুগ্ধ ভক্ত ছিলেন। মহারাজা তেজচাঁদের আটটি রানী ছিল। ষষ্ঠ রানী নান্কীকুমারীর গর্ভে **প্রতাপচাঁদ** জন্মগ্রহণ করেন ১৭৯১ খ্রীঃ। মাত্র তিরিশ বছর বয়সে ১৮২১ খ্রীঃ পিতার জীবদ্দশায় (অন্তর্ধান হন) [২] মারা যান। তেজচাঁদের পঞ্চম স্ত্রী কমলকুমারী তাঁর ভাই পরানচাঁদ কাপুরের পুত্র চুনীলাল কাপুরকে (জন্ম ১৭ নভেম্বর, ১৮২০ খ্রীঃ) দত্তক নিয়ে নাম রাখেন **মহতাবচাঁদ**।

১। বিবেকবর্জিত মিথ্যাবাদী বারওয়েল টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগের বিরুদ্ধে, বর্ধমানের রানী বসন্তকুমারীর নামে কুৎসা রটনা করেন—"most dishonest and unscruputous—is a vile prostitute."

২। এই প্রসঙ্গে রাজপরিবারের ইতিহাসে এক অধ্যায় সৃষ্টি হয়েছিল যা 'জাল প্রতাপ' নামে পরিচিত। রাজকুমার প্রতাপচাঁদ নাকি বর্ধমান ছেড়ে চলে যান সন্ন্যাসীর সঙ্গে, পরে লোকে তাঁকে মৃত বলে ধরে নেয়। চৌদ্দ বছর বাদে সন্ন্যাসীর বেশে 'কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী' নামে জনৈক সন্ন্যাসী বর্ধমানে আসেন এবং জমিদারীর গদী দাবী করেন (১৮৩৫ খ্রীঃ)। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়, মোকদ্দমা শুরু হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫ খ্রীঃ। স্থানীয় বহু লোক বিপক্ষে ও স্বপক্ষে সাক্ষী দেন। সংবাদপত্রেও সেইভাবে টানাপোড়েন চলতে থাকে। বিচারে সাব্যস্ত হয় যে, তিনি মহারাজা প্রতাপচাঁদ নন। জালিয়াতির দায়ে অপরাধী, ১০০০ টাকা জরিমানা ও ছয় মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন (৪ আগস্ট, ১৮৩৬ খ্রীঃ)।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর মহতবচাঁদ

তেজচাঁদের মৃত্যুর পর মহতবচাঁদ উত্তরাধিকারী হন ১৮৩২ খ্রীঃ। ভারতের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড বেন্টিঙ্ক মহতবচাঁদকে 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' উপাধি দেন ১৬ আগস্ট, ১৮৩২ খ্রীঃ। বাংলার আইন পরিষদের ও পরে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। মহতবচাঁদ তাঁর পূর্বপুরুষদের অনুসৃত ইংরাজ-বিদ্বেষী মনোভাব পরিত্যাগ করে সরকারের প্রতি সহযোগীতার ও আনুগত্যের পথ বেছে নেন। সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৬ খ্রীঃ) এবং সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭ খ্রীঃ) সময় তিনি ইংরাজ সরকারকে সবরকম সাহায্য দিয়েছিলেন। তাঁর রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ দিল্লীর দরবারে তাঁর সম্মানে তেরোটি তোপ দাগা হয়। তাঁকে বিশেষ সম্মানসূচক পদবী 'হিজ্-হাইনেস্' আখ্যায় ভূষিত করা হয়।

মহতবচাঁদের সনাতন ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকায় সংস্কৃত পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারত, রামায়ণ ও কয়েকটি ধর্মগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে বিনামূল্যে বিতরণ করেছিলেন। তিনি কলকাতার যাদুঘর ও আলিপুর চিড়িয়াখানার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। সম্রান্ত বিদেশী ও ভারতীয় নাগরিকদের কাছে তিনি বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হতেন। প্রায় সাতচল্লিশ বছর বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনাধ্যায়ে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ও অবদান নিশ্চয়ই স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৯ খ্রীঃ মাত্র ঊনষাট বছর বয়সে মারা যান ভাগলপুরে (বিহার)।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আফ্তাবচাঁদ মহতব

অপুত্রক মহারাজা মহতবচাঁদ নিজের শ্যালক-পুত্র ব্রহ্মপ্রসাদ নন্দকে দত্তক নেন, নামকরন করেন **আফ্তাবচাঁদ মহতব**। পরে এই 'মহতব' পদবীটি বংশধরদের প্রত্যেকের নামে যুক্ত হয়। তিনি মাত্র চার বছর গদীতে আসীন ছিলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বর্ধমানে পাবলিক লাইব্রেরী ও রাজ কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং জলের কল প্রভৃতি জনহিতকর কাজ করেছিলেন। মাত্র ২৪ বছর বয়সে মারা যান ২৫ মার্চ, ১৮৮৫ খ্রীঃ, তাঁর ষোল বছর বয়স্কা রানী বেনোদেহী দেবীকে রেখে। রানী তাঁর ননদ প্রণবদেহী দেবীর পুত্র বিজনবিহারী কাপুরকে (রাজা বাহাদুর বনবিহারী কাপুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র, জন্ম ১৯ অক্টোবর, ১৮৮১ খ্রীঃ) দত্তক নেন ৩১ জুলাই, ১৮৮৭ খ্রীঃ। দত্তক পুত্রের নামকরণ করেন বিজয়চাঁদ মহতব।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বিজয়চাঁদ মহতব

নাবালক বিজয়চাঁদ ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯০৩ খ্রীঃ সাবালক হয়ে 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের'

কাছ থেকে ২২ বছর বয়সে জমিদারীর দায়িত্ব নেন। বিজয়চাঁদ একজন চরিত্রবান, মেধাবী ও বুদ্ধিবৃত্তিশালী পুরুষ। ১ জানুয়ারী, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' বংশগত খেতাবে ভূষিত হন। জি. সি. এস্. আই. (১৯০৫ খ্রীঃ), কে. সি. আই. ই. (১৯০৯ খ্রীঃ) ও 'ইণ্ডিয়ান অর্ডার অফ্ মেরিট' সম্মান-সূচক উপাধি লাভ করেন। ফ্রেজার হাসপাতাল, কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ, ইণ্ডিয়ান রেড ক্রশ সোসাইটি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তিনি যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। সাহিত্য-প্রেমী ও সুলেখক বিজয়চাঁদের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—চার খণ্ডের 'বিজয় গীতিকা, গায়ত্রী, কতিপয় পত্র, একাদশী, ত্রয়োদশী, পঞ্চদশী, আবেগ, বিজন-বিজলী, রসখণ্ড, চিত্রিত, শিবশক্তি, কমলাকান্ত, মানসলীলা' ও ইংরাজীতে 'মেডিটেশন' প্রভৃতি। তিনি 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের' পৃষ্ঠপোষকদের অন্যতম, ১৯১৫ খ্রীঃ বর্ধমানে 'সম্মেলনের' অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন। ইংরাজ সরকারকে সন্তুষ্ট রেখে পরোক্ষভাবে 'স্বদেশী' ও 'বিপ্লবী' আন্দোলনকে সাহায্য করেছেন। তাঁর স্বাজাত্যবোধ প্রবল ছিল। রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভ্য ছিলেন প্রায় ১৫ বৎসর যাবৎ।[১] কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন বিশাল জমিদারী (১৯টি বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো, আয়তনে ৪২০০ বর্গ মাইল এবং দেয় রাজস্ব ছিল ৩৫, ৫৭, ৫৪৪ টাকা)। বিজয়চাঁদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিদের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। বেশ কয়েক বছর (১৯২৭—৩৬ খ্রীঃ) ইংলণ্ডে থাকার পর দেশে ফিরে আসেন। ৬০ বছর বয়সে তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ২৯ আগষ্ট, ১৯৪১ খ্রীঃ।

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর উদয়চাঁদ মহতব

মহারাজা বিজয়চাঁদের দুই পুত্র—উদয়চাঁদ (জন্ম ১৪ জুলাই, ১৯০৫ খ্রীঃ) ও অভয়চাঁদ (জন্ম ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ খ্রীঃ) ও দুই কন্যা—সুধারানী ও ললিতারানী। বিজয়চাঁদের অনুপস্থিতিতে (বিলাতে অবস্থানের সময়), জ্যেষ্ঠ পুত্র উদয়চাঁদ পৈত্রিক জমিদারী পরিচালনা করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের স্নাতক উদয়চাঁদ পিতার মৃত্যুর পর বংশ পরম্পরায় উপাধি 'মহারাজাধিরাজ বাহাদুর' লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তাঁর ছোট ভাই **অভয়চাঁদ** বড় ভাই উদয়চাঁদকে ১৯৪১ খ্রীঃ 'না-দাবী' পত্র লিখে দেন। উদয়চাঁদ তাঁর পিতার ন্যায় রাজনৈতিক ও সমাজ-সেবা-মূলক কর্ম-জীবন শুরু

১। কলকাতায় জানুয়ারী ১৯১২ খ্রীঃ, সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরীর উপস্থিতিতে রাজ্যাভিষেক দরবারে মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ বাংলার রাজন্যবর্গকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

করেন ১৯৩৭ খ্রীঃ। বঙ্গীয় আইন পরিষদের নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি ছিলেন প্রায় ১৪ বছর যাবৎ। জমিদারী উচ্ছেদ আইনের ফলে ১৯৫৪ খ্রীঃ বর্ধমান জমিদারীর বিলুপ্তি ঘটে। উদয়চাঁদ তাঁর নতুন কর্মজীবন শুরু করেন বিভিন্ন বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। প্রায় অর্ধশতাব্দীর ওপর কলকাতার মানুষের কাছে জনপ্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১০ অক্টোবর, ১৯৮৪ খ্রীঃ।

মহারাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহতব ও রানী রাধারানীর তিন পুত্র ও তিন কন্যা—বরুণা দেবী, জ্যোৎস্না দেবী, কুমার সদয়চাঁদ, করুণা দেবী, কুমার মলয়চাঁদ ও কুমার প্রণয়চাঁদ। জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার সদয়চাঁদ, একজন শিল্পপতি, কনিষ্ঠ পুত্র ডঃ প্রণয়চাঁদ বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ী। কলকাতায় আলিপুরে বর্ধমান রাজ রোডে 'বিজয় মঞ্জিল' প্রাসাদে ও বিশাল প্রাঙ্গনের বিভিন্ন অংশে গজিয়ে উঠা বহুতল বাড়ীতে এঁরা বসবাস করেন।

বাংলায় নাটোর রাজপরিবার ছাড়া, বর্ধমান রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও দেব-দেউলগুলির সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। বর্ধমান শহরের মন্দিরগুলি ছাড়া, কালনা মহকুমায় আশপাশের গ্রামে রাজবাটি ও রাজা-রানীদের সমাধী মন্দির ও সমাজ বাড়ী ছাড়া, কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দেবমন্দির হল—লক্ষ্মী মন্দির (ব্রজোকিশোরী দেবী—রাজা জগৎরামের পত্নী), রঘুনাথ মন্দির (রাজা চিত্রসেন), কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (রাজা কীর্তিচাঁদ), শিব মন্দির (রাজা তিলকচাঁদের মাতা লক্ষ্মীদেবী), নবকৈলাস, একশ আট শিব মন্দির—মহারাজা তেজচাঁদ, ১৮০৯ খ্রীঃ, প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির (প্রতাপচাঁদের স্ত্রী আনন্দকুমারী, ১৭৮৮ খ্রীঃ)। বর্ধমান শহরে মন্দিরগুলির মধ্যে—১০৮ শিব মন্দির (মহারাজা তিলকচাঁদের রানী বেষণকুমারী), সর্বমঙ্গলা মন্দির (মহারাজা কীর্তিচাঁদ), রাধাবল্লভ মন্দির (মহারাজা তেজচাঁদ), লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (মহারাজা মহতবচাঁদ), সোনার কালীমূর্তি (কালীবাড়ী)—মহতবচাঁদের রানী নারায়ণকুমারী। বর্ধমানে এইসব মন্দিরগুলি ছাড়া 'বিজয়ানন্দ বিহার' এবং বিশেষ করে সুউচ্চ 'বিজয়তোরণ' (১৯০৫ খ্রীঃ), মহারাজা বিজয়চাঁদের তৈরী উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন। বর্ধমানে তিনটি বড় জলাধার, শ্যামসায়র (ঘনশ্যাম রায় প্রতিষ্ঠিত), কৃষ্ণসায়র (কৃষ্ণরাম রায় প্রতিষ্ঠিত) ও রানীসায়র (১৭০৯ খ্রীঃ রানী ব্রজকিশোরী দেবীর প্রতিষ্ঠিত)। 'মহতব মঞ্জিল' (১৮৪৭ খ্রীঃ) মহারাজা মহতবচাঁদের তৈরী আর 'গোলাপ বাগ' রাজবাড়ী মহারাজা তেজচাঁদের। বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও কার্যালয়ের আবসস্থল।

রাজা বনবিহারী কাপুর বাহাদুর

বর্ধমান

বর্ধমান রাজপরিবারের ইতিহাস ও কাপুর বংশের ইতিবৃত্তান্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদ [১] মারা যাওয়ায়, তাঁর স্বজাতি বর্ধমানবাসী পরাণচাঁদ কাপুরের কনিষ্ঠ পুত্র চুনীলাল কাপুরকে দত্তক নেন এবং নামকরণ হয় মহতবচাঁদ। চুণীলাল কাপুরের (মহতবচাঁদ) বড় ভাই রাসবিহারী কাপুরের দত্তক পুত্র জহরিলাল কাপুর। বর্ধমানের মহারানী (মহতবচাঁদের স্ত্রী) নারায়ণকুমারী ঠাকুরানী, জহরিলালকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং রাজঅন্তঃপুরেই তাঁকে মানুষ করেন—নাম রাখা হয়েছিল বনবিহারী কাপুর।

রাজা বনবিহারী কাপুরের জন্ম হয় ২১ নভেম্বর, ১৮৫৩ খ্রীঃ। মহারাজা মহতবচাঁদ বনবিহারীর প্রতি বিশেষ আস্থাবান হওয়ায়, ১৮৭৭ খ্রীঃ তাঁকে 'দেওয়ান-ই-রাজ' আখ্যা দেন। বর্ধমান জমিদারীর রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তা ও পরে ১৮৭৯ খ্রীঃ রাজ-জমিদারীর মন্ত্রীসভার সহ-সভাপতি পদে আসীন হন। বনবিহারী কাপুর ১৮৮১ খ্রীঃ বর্ধমান রাজবাড়ী ছেড়ে নিজের নতুন বাড়ী 'বন-আবাস'-এ বসবাস শুরু করেন স্ত্রী প্রণবদেয়ী দেবী, দুই পুত্র—বিজনবিহারী, সুজনবিহারী এবং দুই কন্যা—শ্রীদেয়ী ও শক্তিদেয়ীকে সঙ্গে নিয়ে। জ্যেষ্ঠ পুত্র বিজনবিহারীকে বর্ধমান মহারাজা আফ্‌তাবচাঁদ দত্তক নিয়ে বিজয়চাঁদ মহতব নামকরণ করেন। সুজনবিহারী অল্প বয়সে মারা যান।

সুদক্ষ প্রশাসক ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ রাজা বনবিহারী বর্ধমান জমিদারীর তত্ত্বাবধান [২] করা ছাড়া সমাজসেবামূলক বহু সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সঙ্গত কারণে ইংরাজ সরকারের বিশেষ বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হন। তিনবার ১৮৫৫, ১৯০৫ ও ১৯০৭ খ্রীঃ—তিনি বঙ্গীয় মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। দিল্লী দরবার থেকে প্রাপ্ত 'সার্টিফিকেট অফ অনার' (১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ), 'রাজা' (২ জানুয়ারী, ১৮৯৩ খ্রীঃ) ও 'সি. এস. আই. ই.' (১ জানুয়ারী, ১৯০৩ খ্রীঃ), কাইজার-ই-হিন্দ্‌ (১৯১৪ খ্রীঃ) এবং বিশেষ সম্মানিত 'রাজা বাহাদুর' (১৯১৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শিকারী ও অশ্বারোহী। খেলা ধুলাতেও তিনি উৎসাহী ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯২৪ খ্রীঃ। স্ত্রী প্রণবদেয়ীর মৃত্যু হয় ১৮৮৬ খ্রীঃ।

১। এই প্রসঙ্গে 'জাল প্রতাপচাঁদ'—বর্ধমানের মহতব রাজপরিবার পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। মহারাজা আফ্‌তাবচাঁদ মহতবের মৃত্যুর পর রাজা বনবিহারী 'কোর্ট অফ্‌ ওয়ার্ডের' তরফ থেকে বর্ধমান জমিদারীর ম্যানেজার ছিলেন ১৮৮৫ খ্রীঃ থেকে ১৯ অক্টোবর, ১৯০২ খ্রীঃ পর্যন্ত।

বনওয়ারীলাল রাজপরিবার

বনওয়ারীবাদ, বর্ধমান

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকে রাঢ় বাংলার ইতিহাসে একাধিক স্থানীয় খেতাবী রাজা-পরিবারের বিশেষ উল্লেখ রয়েছে। এঁদের মধ্যে বনওয়ারীবাদের রাজপরিবার অন্যতম। বর্ধমান জেলায় কাটোয়ার কাছে সালার রেল স্টেশন থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে বনওয়ারীবাদের অবস্থান। গ্রামের আদি নাম ছিল সোনারুন্দি। পরে গ্রামের নাম রাখা হয়েছে রাজবংশের গৃহ দেবতা বনওয়ারীদেবের নামে। এখানেই আনুঃ ১৭৫০ খ্রীঃ রাজপরিবারের প্রাণ-পুরুষ **নিত্যানন্দ তাঁতির**[১] জন্ম হয়। আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় তাঁর ব্যুৎপত্তি থাকায় দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের (১৭৫৯—১৮০৬) দরবারে 'মীরমুন্সী' পদে নিযুক্ত হন। কর্মদক্ষতা ও বিশ্বাসভাজন হয়ে উপাধি পান 'দানেশবন্দ', 'মহারাজা' ও 'সাতহাজারী মনসবদার'। তাঁতি নিত্যানন্দ হলেন 'মহারাজা নিত্যানন্দ দানেশবন্দ, আমীর-উল্-মুল্‌ক্, আজমত্-উদ্দৌলা, সফ্‌দরজঙ্গ্'। তিনি রাজা হয়ে নিজের এলাকায় মন্দির, স্কুল ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করেন। পরিণত বয়সে মারা যান ১৮২১ খ্রীঃ।

রাজা নিত্যানন্দের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র **জগদীন্দ্র বনওয়ারীলাল** রাজ-গদীতে বসেন। ইংরাজ সরকারের তরফে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খ্রীঃ) তাঁকে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি দেন। তিনি ব্রহ্ম যুদ্ধের (১৮২১-২২ খ্রীঃ) সাহায্যে তিন লক্ষ টাকা ইংরাজ সরকারের হাতে তুলে দেন। কলকাতায় স্ট্র্যাণ্ড রোড তৈরীর জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। কলকাতায় 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠাকল্পে ২০ জানুয়ারী, ১৮১৭ খ্রীঃ তাঁর দান ছিল ত্রিশ হাজার টাকা।

মহারাজা জগদীন্দ্রের মৃত্যুর পর তার ছোট ভাই **জগভীন্দ্র বনওয়ারীলাল** ভারতের ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং-এর (১৮৫৬-৬২ খ্রীঃ) কাছ থেকে ২১ ডিসেম্বর, ১৮৫৭ খ্রীঃ 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি পান। তিনি ছিলেন রাজপরিবারের সর্বশেষ খেতাবী মহারাজা। বংশের উত্তর-পুরুষদের নামের সঙ্গে আজও 'বনওয়ারী' পদবী যুক্ত রয়েছে, যেমন 'বনওয়ারীলাল,' 'বনওয়ারীকিশোর,' বনওয়ারীমুকুন্দ' প্রভৃতি। বনওয়ারীবাদের পুরানো দোতলা ঠাকুরবাড়ী এখনও দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষী-স্বরূপ।

১। বংশ পরিচয়, তৃতীয় খণ্ড ; জ্ঞানেন্দ্রকুমার

সিহাড়শোলের মালিয়া রাজপরিবার

বর্ধমান

বর্ধমানের অন্তর্গত রানীগঞ্জ, সিহাড়শোল, অণ্ডাল প্রভৃতি কয়লা-খনি সমৃদ্ধ অঞ্চল। কাশ্মীরের অধিবাসী সারস্বত ব্রাহ্মণ **গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিত** সিহাড়শোলে বসতি শুরু করেন খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকের প্রথম দশকে। তাঁর চার কন্যা—শ্যামাসুন্দরী, হরসুন্দরী, সত্যভামা, উত্তমকুমারী। গোবিন্দপ্রসাদ তাঁর একক প্রয়াসে প্রথমে সরকারী পদে (ডেপুটি কলেক্টর, ২৪-পরগণা) ও পরে সিলেটে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন। তিনি তাঁর জামাইদের সাহায্য নিয়ে জমিদারী ও ব্যবসায় প্রচুর টাকা উপার্জন করেন। রানীগঞ্জে জেমিহারি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়লা-খনির মালিকানা-কর ('রয়েল্‌টি') ছিল তাঁর আয়ের অন্যতম উৎস। গোবিন্দপ্রসাদ ও তাঁর সহধর্মিনী দাড়িম্বীদেবীর ধর্ম-সেবায় দান, মন্দির প্রতিষ্ঠা ও প্রজাদের উন্নতিকল্পে কয়েকটি সুকর্মের জন্য তিনি স্থানীয় লোকেদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

গোবিন্দপ্রসাদের চার কন্যার মধ্যে, কেবল দ্বিতীয়া কন্যা হরসুন্দরীর বিবাহ হয় বাংলায় হুগলী জেলায় সিঙ্গুরের অধিবাসী রসিকলাল মালিয়ার দ্বিতীয় পুত্র **মতিলাল মালিয়ার** সঙ্গে। ১৮৬১ খ্রীঃ গোবিন্দপ্রসাদের মৃত্যু হয়। তাঁর প্রায় সব সম্পত্তি দেবোত্তর হওয়ায়, দেবসেবার কাজে সেবাইত হিসাবে তাঁর স্ত্রী দাড়িম্বীদেবী দায়িত্ব নেন। কন্যা হরসুন্দরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র **বিশ্বেশ্বর মালিয়া** (জন্ম—১৮৪৬ খ্রীঃ) কৈশোরেই দিদিমার জমিদারীর ব্যবস্থপনায় যুক্ত ছিলেন। দাড়িম্বীদেবী মারা যান ১৮৭২ খ্রীঃ। হরসুন্দরী দেবোত্তর এস্টেটের সেবাইত হন। তাঁর স্বামী মতিলাল মালিয়ার মৃত্যু হয় ১৮৬২ খ্রীঃ। তাঁর পুত্র বিশ্বেশ্বর মালিয়ার বিবাহ হয় হুগলী জেলার জগৎবল্লভ-পুরের সীতানাথ ঘোশীর কন্যা গোলাপকুমারী দেবীর সঙ্গে। মতিলালের (হরসুন্দরীর গর্ভে) মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বর।

রাজা বাহাদুর বিশ্বেশ্বর মালিয়া

রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর কর্মদক্ষতা ও জনদরদী কাজের জন্য লোক-প্রিয় হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে ১৮৭০-৭১ খ্রীঃ বাংলায় দুর্ভিক্ষের ত্রানকার্যে তাঁর প্রশংসণীয় ভূমিকা থাকায়। মাতা রানী হরসুন্দরী সর্বান্তঃকরণে পুত্র বিশ্বেশ্বরকে তাঁর সমর্থন ও অর্থ-সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি

লর্ড নর্থ ব্রুক্ ১৮৭৪ খ্রীঃ (ভিন্নমতে ১২ মার্চ, ১৮৭৫ খ্রীঃ) হরসুন্দরী দেবীকে 'রানী' ও বিশ্বেশ্বরকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে তাঁদের সৎকর্মের স্বীকৃতি দেন। দু'বছর পরে মহারানী ভিক্টোরীয়ার 'ভারতেশ্বরী' আখ্যা-সমারোহে ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ, বড়লাট লর্ড লিটন হরসুন্দরীকে 'মহারানী' ও বিশ্বেশ্বরকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, রাজা-বাহাদুর বিশ্বেশ্বর মালিয়া বেশী দিন তাঁর অর্জিত সম্মান ভোগ করতে পারেননি। মহারানী হরসুন্দরীর জীবদ্দশায় মারা যান ১৮৭৯ খ্রীঃ মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে। মহারাজা বিশ্বেশ্বরের এক পুত্র প্রমথনাথ ও দুই কন্যা শরৎকামিনী ও কুমুদকামিনী। রাজবাড়ী 'বিশ্বগোলাপ' প্যালেস রাজা বিশ্বেশ্বরের তৈরী।

মহারানী হরসুন্দারির মৃত্যুর পর তাঁর মধ্যম ও কনিষ্ঠ পুত্র রামেশ্বর ও দক্ষিণেশ্বর এস্টেটের মালিক হন। দক্ষিণেশ্বর হাওড়ায় কনেনপ্লেসে তাঁর বাসভবনে মারা যান ২৫ মার্চ, ১৯০৬ খ্রীঃ। তিনি ছিলেন অপুত্রক। তাঁর স্ত্রী ভবসুন্দরী ও ভাই রামেশ্বরের মধ্যে এস্টেট দু'ভাগ হয়ে যায়। রামেশ্বর হাওড়ায় কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মারা যান ৭ মে, ১৯১২ খ্রীঃ। রামেশ্বরের স্ত্রীর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। রামেশ্বরের স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী মারা যান ১৯১৫ খ্রীঃ। দক্ষিণেশ্বরের স্ত্রী ভবসুন্দরী পূর্বেই মারা যান ১৯১২ খ্রীঃ।

এঁদের মৃত্যুর পর রাজা বিশ্বেশ্বর মালিয়ার পুত্র কুমার প্রমথনাথ মালিয়া (জন্ম ১০ আগস্ট, ১৮৭০ খ্রীঃ) এস্টেটের মালিক হন ১৯১৫ খ্রীঃ। বিবাহ হয় কিষেণদেয়ী দেবীর সঙ্গে। রাজা উপাধি পান ১৯১৯ খ্রীঃ। তাঁর সময়েও সিয়াড়শোলের রাজাদের জাঁকজমকের পরিবেশ বজায় ছিল। তাঁর মৃত্যু হয় ৮ আগস্ট, ১৯৪০ খ্রীঃ। তাঁর দুই পুত্র কুমার পশুপতিনাথ (১৯০৮-৬৯ খ্রীঃ) ও কুমার ক্ষিতিপতিনাথ (১৯১০-৮০ খ্রীঃ)। পশুপতিনাথের এক পুত্র জবনলাল ও তাঁর পুত্র বিট্টস সিয়াড়শোলেই বাস করেন। ক্ষিতিপতিনাথের তিন পুত্র—পুষ্পেন্দ্রনাথ, প্রেমেন্দ্রনাথ ও বল্লভদাস। এখন দেহরাদুনে বসবাস করেন, যদিও প্রেমেন্দ্রনাথ তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী ক্রিস্টেল, দুই পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে ব্যবসার তাগিদে কলকাতায় ট্রিভোলি কোর্ট-এর বাসিন্দা।

মালিয়া রাজ-এস্টেটের জমিদারী বাংলায় ও বাংলার বাহিরে ছড়িয়ে ছিল—সিহাড়শোল, রানীগঞ্জ ও হাওড়া ছাড়া দেওঘর, জসিডি, রাঁচী, কাশী প্রভৃতি অঞ্চলে। জমিদারী ও কয়লা-খনির মালিকানা সরকারের হাতে ন্যস্ত হলেও, পরিবারের উত্তর-পুরুষরা ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। মালিয়ারা বৈষ্ণব। কুলদেবতা দামোদরচন্দ্র জীউ রাজবাড়ীতে নিত্যপূজা পান। তা ছাড়া দোল, দুর্গোৎসব, রাস, রথযাত্রা প্রভৃতি বাৎসরিক উৎসব আজও বন্ধ হয়ে যায়নি।

রাজা মণিলাল সিংহ রায় বাহাদুর

চাকদীঘি, বর্ধমান

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথম ভাগে রাজপুতানার অধিবাসী ছত্রি-বংশীয় জনৈক **ভিখারী সিংহ রায়** বর্ধমান জেলার চাকদীঘিতে [১] ভাগ্যান্বেষণের তাগিদে আসেন। অধস্তন বংশধরেরা বাংলায় নীল ও রেশমের ব্যবসায় যুক্ত হয়ে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন ও বড় জমিদারীর মালিক হন। ভিখারী সিংহ রায়ের চতুর্থ অধস্তন-পুরুষ **হরি সিংহ রায়** গণ্যমান্য ব্যক্তি—'মহাশয়' আখ্যায় সম্মানিত হন। তাঁর পুত্র **চিকনলাল** ইংরাজ সরকারের (লর্ড কার্জন, ১৮৯৯ খ্রীঃ) কাছ থেকে অনারারী 'মেজর' পদ পান। তিনি ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম 'মেজর'। মারা যান ২৮ ডিসেম্বর, ১৯০৩ খ্রীঃ। তাঁর তিন পুত্র বিনোদবিহারী, **রাজা মণিলাল** ও ঠাকুর রজনীলাল। [২]

রাজা মণিলাল সিংহ রায়ের জন্ম হয় ১৮৬৭ খ্রীঃ। সরকারের বিশেষ বিশ্বাসভাজন। ১৯০৭-৮ খ্রীঃ বাংলায় 'স্বদেশী আন্দোলন' দমনে নেপথ্যে সক্রিয় ভূমিকা নেন। লর্ড মিণ্টোর (১৯০৫-১০ খ্রীঃ) সভাপতিত্বে 'গুপ্ত পরামর্শ কমিটিতে' আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ইউরোপীয় প্রথম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রীঃ) ইংরাজ সরকারকে তাঁর সাধ্যমতো সাহায্য করেন। নিজ-পুত্র শৈলেশ্বর ও ভ্রাতুষ্পুত্র বিজয়প্রসাদকে অনারারী 'লেফ্‌টেন্ট' পাইয়ে দেন। রাজা মণিলাল বহুদিন যাবৎ বর্ধমানের জেলা বোর্ডের সভ্য ও অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। 'রায়-বাহাদুর' উপাধি পেলেন ১৯০৮ খ্রীঃ। ইংরাজ সরকারকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য 'ইম্পিরিয়াল লিগ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১ জানুয়ারী, ১৯১৬ খ্রীঃ লর্ড কারমাইকেল রাজা মণিলালকে 'রাজা' উপাধি দেন। পরে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব পান ৬ জুন, ১৯৩৪ খ্রীঃ।

রাজা মণিলাল ১৯১৩ খ্রীঃ দামোদরের বন্যাপীড়িত মানুষের ত্রাণকার্যে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাঁর চিত্রকলায় বুৎপত্তি ছিল। তাঁর আঁকা সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের একটি বড় তৈলচিত্র দার্জিলিং-এ 'লুইস্‌ জুবিলী স্বাস্থ্যনিবাসে' রাখা ছিল। তাঁর একমাত্র পুত্র শৈলেশ্বর সিংহ রায়ের ১৯৫০ খ্রীঃ মৃত্যু হয়। রাজা মণিলাল মারা যান ২৪ জানুয়ারী, ১৯৫৪ খ্রীঃ।

১। মেমারী স্টেশন থেকে ২০ কি. মি. দক্ষিণে।

২। রাজামণিলালের বড়ভাই বিনোদবিহারীর এক পুত্র চণ্ডীপ্রসাদ। ছোট ভাই ঠাকুর রজনীলালের চারপুত্র—বিজয়প্রসাদ, নিত্যানন্দ, প্রভানাথ ও পশুপতিনাথ। বিজয়প্রসাদ ১৯৩০ খ্রীঃ বঙ্গীয় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। তাঁর দুই পুত্র সুনিল ও দিলীপ বাস করেন হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটে। নিত্যানন্দের তিন পুত্র—নীলমোহন, অজয় ও অরুণ; প্রভানাথের পুত্র সোমনাথ; পশুপতিনাথের পুত্র রঞ্জিৎ। এঁরা ১৫, শরৎ বসু রোডে বাস করেন।

নবাব আবদুল জব্বরখান বাহাদুর

বর্ধমান

নবাব আবদুল জব্বরের পিতা গোলাম আসগর জাহেদা পাহাড়হাটীর (বর্ধমান জেলা) বাসিন্দা ছিলেন। আবদুল জব্বরের জন্ম হয় ১৮৩৭ খ্রীঃ। গ্রামের মক্তবে শিক্ষা শুরু করেন এবং পরে যোগ্য মৌলবীদের কাছে ফার্সী ভাষা, গণিত ও ইসলাম ধর্মীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। মেদিনীপুর সরকারী স্কুলে পঠনের পর প্রবেশিকা পাশ করেন কলকাতা মাদ্রাসা থেকে। তাঁর কর্মজীবনে উন্নতির পথ প্রশস্ত হল সদর আমিন-রূপে ইংরাজ সরকারকে ১৮৫৫ খ্রীঃ 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' দমনে সর্বতোভাবে সাহায্য করায়।

তাঁর সাহায্যের স্বীকৃতি-স্বরূপ তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হন ১৮৫৯ খ্রীঃ। পরে গাইবান্দা (পূর্ববঙ্গ) আদালতে বিচারপতি ও ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেট পদে আসীন ছিলেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত সদস্য (১৮৮৪-৯৩ খ্রীঃ) হন। প্রায় পাঁচ বছর (১৮৯৭-১৯০২ খ্রীঃ) তিনি ছিলেন ভূপালের নবাবের প্রধান মন্ত্রী। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিশ্ব-জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে, কলকাতায় টাউন হলে ৩ ডিসেম্বর, ১৯০৯ খ্রীঃ সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন।

খ্রীষ্টীয় উনিশ শতকে বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের নবজাগরণের চেতনার আন্দোলনকারীদের অন্যতম নেতা নবাব আবদুল লতিফ খানের সহযোগী নবাব আবদুল জব্বর পুরোপুরি রক্ষণশীল মুসলমান। প্রাচীনপন্থী হওয়ায় সমাজ-সংস্কারের কাজে বিশেষ মনোযোগ না দিলেও, মুসলমান নারীদের ধর্মশিক্ষার জন্য তিনি দুটি উর্দু পুস্তিকা এবং বাংলা ভাষায় 'ইসলাম ধর্ম পরিচয়' রচনা করেছেন। সরকারী চাকরী-জীবনে ধর্মনিরপেক্ষ বিচারক হিসাবে প্রশংসা লাভ করেন। তিরিশ বছরেরও বেশী সময় ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন এবং সমাজ সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি হিসাবে, ইংরাজ সরকার তাঁকে প্রথমে 'খান বাহাদুর' ও পরে 'নবাব' ও 'সি. আই ই.' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৮ খ্রীঃ।

তাঁর পুত্র আবদুল মোমিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস কেডারে মুসলিম সম্প্রদায়-ভুক্ত প্রথম বিভাগীয় কমিশনার হন, যদিও তিনি প্রথমে 'কানুনগো' হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি 'বঙ্গীয় আইন পরিষদে'র সভ্য ছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধি দিয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদ ও নবাবশাহি আমল

নবাব-পঞ্জী পরিক্রমা

ষোল শতকের মধ্যভাগে দিল্লীর সিংহাসনে ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট জালাল-উদ্দীন-আকবর শাহ্। আর সেই সময় বাংলায় গৌড়ের সুলতান বংশের আধিপত্যের অবসানের সূচনা হয়। তা ছাড়া, স্থানীয় স্বাধীনচেতা বড় বড় জমিদারদেরও (বারোভূঞা) প্রতিপত্তির সমাপ্তি ঘটে। এই প্রসঙ্গে মোগল শাসনকর্তা ও সেনাপতি **রাজা মানসিংহ** (১৫৮৯ খ্রীঃ) ও পরে ইসলাম্ খানের (১৬০৮-১৩ খ্রীঃ) নেতৃত্বে সুদীর্ঘ রক্তাক্ষয়ী যুদ্ধে বাংলার বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী সুলতান ও বারোভূঞাদের কৃতিত্বের কথা স্মরণীয়। অবশেষে সুবে বাংলা সম্পূর্ণভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রায় দুশো বছরেরও বেশী সময় দিল্লী সম্রাটের সুবাদার-নাজিমদের শাসনাধীনে ছিল। **সুবাদার শায়েস্তা খান** (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রীঃ) ও পরে সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলী খানের (১৭০৩—২৭ খ্রীঃ) সময় থেকে মুর্শিদাবাদের নবাবশাহির ইতিহাস শুরু হয়।

নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী খান

নদীমাতৃক বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুখসুসাবাদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭০৪ খ্রীঃ।[১] যদিও দিল্লীর স্বীকৃতি লাভ করে ১৭১৭ খ্রীঃ। মুখসুসাবাদের নাম মুর্শিদাবাদ হল নবাব মুর্শিদকুলী খানের নাম অনুসারে। দিল্লীর দুর্বল মোগল শাসনের সুযোগ নিয়ে, মুর্শিদকুলী কৌশলের সঙ্গে ক্রমশঃ তাঁর শাসনকার্যে দিল্লীর মোগল সম্রাটের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে আরম্ভ করেন। নবাবী দরবারের সঙ্গে জড়িত সব বড় বড় জমিদার বা খেতাবী রাজ-রাজড়াদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হওয়ায়, মুর্শিদকুলী খান তাঁদের সম্পূর্ণ সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ার মুর্শিদকুলীকে সন্তুষ্ট করতে অসামান্য পদমর্যাদার উপাধি দেন—'নবাব মুর্শিদকুলী মুতামান্-উল্-মুলক্-আলা-উদ্-দৌল্লা, জাফর খান, নাসির জঙ্গ'।

১। 'The city of Murshidabad is an extensive populous and rich as the city of London with this difference that there are individuals in the first possessing infinitly greater property than in the last city.'

২। মুর্শিদাবাদ ও নবাবদের বিষয়ে (১) 'শেইর মুতাক্ষরীণ'—গোলাম হোসেন; (২) 'রিয়াজুস্ সালাতিন'—(গোলাম হোসেন সেলিম) অনুবাদক আবদুস্ সালাম—দুটি আকর গ্রন্থ।

মুর্শিদকুলী প্রথম জীবনে হিন্দু-সন্তান, পরে পারস্যদেশবাসী হাজী সফির ক্রীতদাস—মির্জা হাদী। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সুনজরে পড়ে পোশাকী নাম রাখা হয় 'করতলব খান'। পরে বাংলার নাজিম (দেওয়ান) হলেন, তাঁর নাম হয় মুর্শিদকুলী জাফর খান।

কর্মদক্ষ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও চরিত্রবান পুরুষ 'জেন্দাপীর' মুর্শিদকুলীর মাদক দ্রব্য, নাচগান ও বিলাসিতায় মোটেই আসক্তি ছিল না। 'রিয়াজুস্ সালাতিন' গ্রন্থ লেখকের মতে, সেই সময় বাংলায় কঠোর শাসন-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ছিল সুস্থিত। সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) পরবর্তীকালে বাংলায় (বিহার ও উড়িষ্যা সমেত) ছিল ১টি সরকার ও ৬৮২ পরগণা, আর মুর্শিদকুলীর সময়ে ৩৪টি সরকার ও ১৬৬০টি পরগণা। এক টাকায় পাঁচ মনের চেয়েও বেশী চাল পাওয়া যেত।[১]

মুর্শিদকুলীর আমলে দিল্লীর জবরদস্ত প্রভুত্বের অবসান ঘটায়, বাংলার গুণী কৃতি সন্তানদের বেশ কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ সরকারী পদে বসার সুযোগ সৃষ্টি হয়। নবাবের দাক্ষিণ্যে ফার্সী ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অভিজাত বংশীয়, কর্মদক্ষ হিন্দুদের 'কানুনগো', 'বক্সি', 'মুন্সী', 'সিকদার', 'দস্তিদার', 'চাকলাদার', তালুকদার', 'লস্কর,' 'বিশ্বাস', 'তোপেদার', 'হালদার' প্রভৃতি পদে নিযুক্ত করা হয়। স্বাভাবিকভাবে এই সব পদের নামগুলি এখনও বংশগত পদবি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মুর্শিদকুলী খানের সময় বেশ কয়েকটি নতুন বড় বড় জমিদারীর (নাটোর, দিঘাপতিয়া, নদীপুর, কাশিমবাজার, মুক্তাগাছা, মহিষাদল প্রভৃতি) উৎপত্তি হয়। মুর্শিদকুলী খানের জীবনের অবসান ঘটে ৩০ জুন, ১৭২৭ খ্রীঃ[২] স্ত্রী বেগম নাসেরিবানু ও কন্যা জিন্নেতেন্নেসা বেগমকে রেখে।

নবাব নাজিম সুজা-উদ্দীন খান

অপুত্রক নবাব মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সুজা-উদ্দীন মহম্মদ খান সুবাদার নবাবের গদিতে বসেন জুন, ১৭২৭ খ্রীঃ।[৩] সুজা-উদ্দীনের অনেক গুণ থাকা

১। প্রসঙ্গত, কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে (ষোল শতক) উল্লেখ্য সেই সময়ের খাদ্যদ্রব্যের নামমাত্র মূল্য ছিল। ১৭২৯ খ্রীঃ পাওয়া যেত এক টাকায় ১ মণ ১০ সের থেকে ৫ মণ ২০ সের চাল ; গম—৩ মন ; তেল ২১ সের থেকে ২৪ সের ; ঘি ১০. ১/২ সের থেকে ১১. ১/৪ সের।

২। মুর্শিদকুলী খানের প্রতিষ্ঠিত কাটরা মসজিদ্ (১৭২৩/২৪ খ্রীঃ) ও তার পাশে তাঁর কবর। কাছেই দেখতে পাওয়া যাবে জনার্দন কর্মকারের তৈরী 'জাহানকোষা' বিশাল কামান আর রোসনীবাগে নবাব সুজা-উদ্দীনের কবর।

৩। মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ) তাঁকে বাংলা ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা পদে বহাল রাখেন। "মোতামিন-উল্-মুল্ক, সুজা-উদ্-দৌলা সুজাউদ্দীন মহম্মদ খান বাহাদুর আসাদ্ জঙ্গ", উপাধিতে ভূষিত করেন।

সত্বেও জাঁক-জমকপ্রিয়, বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হওয়ায়, তাঁর মন্ত্রীরা—হাজী আহম্মদ ও আলিবর্দী খান (দুই ভাই) এবং রায় রায়ান আলমচাঁদ ও ধনকুবের জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রমুখ ব্যক্তিদের চক্রান্তের[১] ফলে ঘাতকের হাতে মৃত্যু হয় মার্চ, ১৭৩৯ খ্রীঃ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুজা-উদ্দীনের তিন কন্যার সঙ্গে হাজী আহম্মদের (আলিবর্দীর ভাই) তিন পুত্রের বিবাহ হয়।

নবাব নাজিম সরফরাজ খান

সুজা-উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর অপদার্থ পুত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাব হন মার্চ, ১৭৩৯ খ্রীঃ। নবাবদের কলঙ্ক ও সম্পূর্ণ অযোগ্য নবাব সরফরাজকে 'গিরিয়ার' যুদ্ধে (১০ এপ্রিল, ১৭৪০ খ্রীঃ) বিশ্বাসঘাতক দেওয়ান আলিবর্দী খানই পরাস্ত করেন। নবাব নিহত হন। দিল্লীর দুর্বল মোগল সরকার সুযোদ্ধা সুবাদার আলিবর্দী খানকে বাংলার নবাব নাজিম হিসাবে স্বীকৃতি দেন।

নবাব নাজিম আলিবর্দী খান

বিহারের সুবাদার ও নায়েব-নাজিম আলিবর্দী মহবৎজঙ্গ্ বাংলার নবাব নাজিম হলেন ১৭৪০ খ্রীঃ। অধিকাংশ দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিকদের মতে, নবাব আলিবর্দীর অনেক গুণ ছিল। বহু সমর-সংগ্রামে তিনি একজন বীর যোদ্ধা। শাসনকার্যে কঠোর হলেও, সব সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতেন। তিনি সুখে-শান্তিতে বাংলায় নবাবী করতে পারেননি। **মারাঠা বর্গীদের** বারংবার (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) আক্রমণের ফলে প্রজাদের অকথ্য দুর্দশার দৃশ্য তাঁকে বিশেষ উতলা করেছিল। বর্গীদের অধিনায়ক **ভাস্কর পণ্ডিত**, নবাব সৈন্যদের আক্রমণে নিহত হবার পরেও বর্গীরা সশস্ত্র হামলা চালিয়েছিল। নবাব আলিবর্দী নিছক নিজের তাগিদে যতদূর সম্ভব ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে সচেষ্ট ছিলেন।[২] তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, ইংরাজদের ব্যবসা ভালভাবে চললেই তাঁর রাজকোষ শুল্ক ও অন্যান্য আদায়ের ফলে পূর্ণ হবে। স্বাভাবিকভাবে ইংরাজরাও নিশ্চিতভাবেই জানত যে, নবাবের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় না রাখলে, বাংলায় তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

আলিবর্দী খানের সময়ে কয়েকজন হিন্দু সরকারী কর্মচারী ও বড় বড় জমিদার তাঁর বিশেষ বিশ্বাসভাজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হন—রাজা দুর্লভরাম, রাজা

১। 'শেইর মুতাক্ষরীণ' ও 'রিয়াজুস সালাতিন'।

২। আলিবর্দী বলেছেন—বিদেশী বণিকরা এক ঝাঁক মৌমাছি। তাদের মধু থেকে দেশ কিছু লাভ করতে পারে বটে, কিন্তু মৌচাকে ঢিল ফেললে তারা কামড়ে শেষ করে ছাড়বে।"

জানকী রায়, রাজা দর্পনারায়ণ, রাজা রামনারায়ণ, উমিচাঁদ, শেঠ কিরীটচাঁদ, উমিদ রায়, বীরু দত্ত, রাম সিংহ, গোকুলচাঁদ প্রমুখ।

শেষ জীবনে অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অশান্তি থেকে রেহাই পাননি। প্রিয় দৌহিত্র ভাবী নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার কাছে তাঁকে কয়েকবার লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। এমনকি, বিদ্রোহের হুমকিও তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল। সংগ্রামী জীবন ও স্বধর্মে আস্থাবান হওয়ায় তিনি মাথা উঁচু করে রাজ্যভার বহন করেছেন। ১০ এপ্রিল, ১৭৫৬ খ্রীঃ তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে অশীতি বৎসর অতিক্রান্তে।[১] তাঁর তিন কন্যা—মেহের-উন্-নিসা (ঘসেটি বেগম) নিঃসন্তান; মধ্যমা কন্যা শাহ বেগম (শওকৎ জঙ্গ-এর মা) আর তৃতীয়া কন্যা আমিনা বেগম (সিরাজের মা)। আলিবর্দীর জীবদ্দশায় তাঁর তিন জামাই-এর মৃত্যু হয়। নবাব আলিবর্দী খান তাঁর জীবদ্দশায় প্রিয় দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলাকে বাংলার নবাবী মসনদে অভিষিক্ত করেন। ১১ এপ্রিল, ১৭৫৬ খ্রীঃ সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন।

নবাব নাজিম সিরাজ-উদ্-দৌলা

দাদামহাশয়ের অত্যাধিক আদরের ফলে সিরাজের লেখাপড়া কিছুই হয়নি। তিনি হলেন দুর্দান্ত, স্বেচ্ছাচারী, কামাসক্ত, দুবিনীত ও নিষ্ঠুর যুবক।[২] সিরাজ-উদ্-দৌলা গদিতে বসার আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর মেজ মাসীর পুত্র শওকৎজঙ্গ, বড়মাসী ঘসেটি বেগম, এমন কি সেনাপতি মীরজাফর মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের দাবীদার। নবাবী আসনে বসেই তিনি সঙ্গত কারণে, তাঁর বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী ষড়যন্ত্রের দমনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে সিরাজের কোনো দিন সদ্ভাব ছিল না। তিনি রাজনৈতিক বা কূট ছল-বলের আশ্রয় গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না।

ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে ছোটখাট সংঘর্ষ ঘটলেও (২ জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ কাশিমবাজার কুঠী আক্রমণ), তাঁদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান প্রথম শুরু করেন ১৫ জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ কলকাতার অভিমুখে। প্রায় বিনা বাধায় ২০ জুন সিরাজের সৈন্যদের হাতে

১। মুর্শিদাবাদের খোশবাগে নবাব আলিবর্দীর ও তাঁর বেগমের কবর।

২। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার (মির্জা মহম্মদ) জন্ম আনুমানিক ১৭৩৩ খ্রীঃ। মা আমিনা বেগম, পিতা জাইনউদ্দীন; স্ত্রী একাধিক তবে লুৎফউন্নেসা ছিলেন তাঁর জীবনের সব সময়ের সাথী। ইংরাজ কোম্পানীর 'ল' সাহেবের মতে, নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা—"The greatest scoundrel the earth has ever borne."

ভিন্নমতে, অসৎ চরিত্রের যুবক ইংরাজ-বিদ্বেষী স্বাধীনচেতা নবাব সিরাজ, বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের পথ-নির্দেশক।

কলকাতা শহর ও দুর্গ[১] অবরুদ্ধ হয়। ইংরাজদের বাড়ীঘর লুঠ, ধ্বংস ও কিছু প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। হলওয়েল্ সাহেব ও পরে আরও কয়েকজন সফররত ইউরোপবাসীদের লেখনী-প্রসূত মিথ্যা ও অতিরঞ্জিত বিবরণ 'অন্ধকূপ হত্যা'[২] সৃষ্টি হয়। সিরাজের আত্মতুষ্টি ও অদূরদর্শিতার ফলে ইংরাজরা পুনরায় শক্তি সঞ্চয়ের ও নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সুযোগ পায়। মাত্র ১৯৫ দিনের মধ্যে, ২ জানুয়ারী, ১৭৫৭ খ্রীঃ, ইংরাজরা পুনরায় কলকাতা অধিকার করেন। অতর্কিত আক্রমণ ও পরে অর্থলোভী কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীর পরামর্শে, সিরাজ ইংরাজদের সন্ধি প্রস্তাবে ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭ খ্রীঃ রাজি হন।

ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজ-উদ্-দৌলার আপত্তি ও বাধাদান সত্ত্বেও, ইউরোপীয় সপ্তবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) সূত্র ধরে ফরাসী চন্দননগর অধিকার করে নেন ২৩ মার্চ, ১৭৫৭ খ্রীঃ। ফলে ফরাসীদের সব রকম সাহায্য থেকে সিরাজ বঞ্চিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সিরাজ-উদ্-দৌলার বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী নন্দকুমার, দুর্লভরাম ও মাণিকচাঁদ নবাবের আদেশ অমান্য করে, সেই সময়েই নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রথম দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন। পরে এই ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন সেতাব রায়, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, রাজা নবকৃষ্ণ, রাজা রামলোচন, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, রাজা দেবী সিংহ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন ঘসেটি বেগম, জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খান, রাজা রায় দুর্লভ আর ঘৃণ্য মীরজাফর।

গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সুনিশ্চিত পরাজয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনায়, সামান্য অজুহাতে রবার্ট ক্লাইভ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ ভাগীরথীতীরে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। মীরজাফর ও রায় দুর্লভের

১। ১৭০৭ খ্রীঃ কলকাতায় (গোবিন্দপুরে) পুরানো ফোর্ট উইলিয়াম্ দুর্গের অবস্থিতি ছিল অধুনা জেনারেল পোস্ট অফিস যেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ইংরাজরা সাময়িকভাবে ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। পুরানো কেল্লার জীর্ণ অবস্থা দেখে চিন্তিত রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রীঃ কোম্পানীর অধ্যক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়ে ছিলেন। পরে ১৭৫৮ খ্রীঃ ক্লাইভেরই প্রস্তাবে পুরানো দুর্গের এক মাইল দক্ষিণে এবং ভাগীরথীর ধারে, স্ট্রাণ্ড রোডের উপর কলকাতায় নতুন দুর্গ তৈরী শেষ হয় ১৭৭৩ খ্রীঃ। ইংলণ্ডের সম্রাট তৃতীয় উইলিয়ম্ (১৬৮৯-১৭০২ খ্রীঃ)-এর নাম অনুসারে দুর্গটির নামকরণ করা হয়।

২। সিরাজের হুকুমে বেশ কয়েকজন মদ্যপ ইংরাজ সৈন্যকে একটি ঘরে (১৮ ফুট × ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি) বন্দী করা হয়েছিল। অপরিসর, আলো বাতাস-বিহীন ঘরে অধিকাংশ সৈন্যদের মৃত্যু ঘটে। ঐ স্থানে একটি স্মারক-বেদী তৈরী করা হয়েছিল। স্বাধীনতার পরে ঐ বেদী ভেঙ্গে দেওয়া হয় জুলাই, ১৯৪০ খ্রীঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আন্দোলনের ফলে। এই যুদ্ধে বিজয়ী সিরাজ কলকাতা থেকে ইংরাজদের তাড়িয়ে কলকাতার নাম দিয়েছিলেন—'আলিনগর'।

ষড়যন্ত্রের শর্ত অনুসারে নবাবের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রাখা হল। অপরপক্ষে প্রধান সেনাপতি মীরমদন ও মহারাজা মোহনলাল অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্যের সাহায্যে ক্লাইভের সৈন্যদের বিপক্ষে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ, মীরমদনের আকস্মিক মৃত্যু সিরাজ-উদ্-দৌলাকে বিচলিত করে। ষড়যন্ত্রী মীরজাফরের পরামর্শে সিরাজ-উদ্-দৌলা মোহনলালকেও পলাশীর যুদ্ধ [১] বিরতির নির্দেশ দেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে ইংরাজদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হল। সিরাজ ভাগলপুরের ফরাসী কুঠীর অধ্যক্ষ মসিঁয়ে ল-এর সাহায্যের আশায়, গোপনে বিহারের (রাজমহল) পথে যাত্রা করেন। কিন্তু ভাগ্য বিমুখ হওয়ায় তিনি ধরা পড়েন। মীরজাফরের আদেশে তাঁর পুত্র মীরণ সিরাজকে হত্যা করেন ২ জুলাই, ১৭৫৭ খ্রীঃ জাফরগঞ্জ প্রাসাদে (নেমকহারামী দেউড়ী)। সিরাজের খণ্ডিত দেহ হাতির পিঠে চাপিয়ে গোটা মুর্শিদাবাদ শহর পরিক্রমা করা হয়। অদৃষ্টের পরিহাস। [২]

১। পলাশীর যুদ্ধের স্মারক গ্রাম্য গাথা :—

কি হলোরে জান।
পলাশীর ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে।
একলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্তি গায়ে।
হাঁটু গেড়ে মারছে তীর মীরমদনের গায়ে।
কি হলোরে জান।
পলাশী ময়দানে নবাব হারালো পরাণ।
নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতি।
কলকেতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী।
কি হলোরে জান।
পলাশীর ময়দানে উড়ে কোম্পানীর নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজী নবাব বুঝতে পাল্লে মনে,
সৈন্ত সমেত মারা গেল পলাশীর ময়দানে।

২। এই প্রসঙ্গে, ২৪ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ সিরাজের ধনাগার থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও ইংরাজ সহকারীদের লুন্ঠিত ধনরাশির পরিমাণ—তিন কোটি, তিন লক্ষ, অষ্টআশি হাজার, পাঁচশো পঁচাত্তর পাউণ্ড— জানা যায় 'হাউস অফ কমন্স' সভায় ১৭৭৩ খ্রীঃ এক বক্তৃতায়। এই বিষয়ে ২৮ পৃষ্ঠায় আরও কিছু উল্লেখ করা হয়েছে।

সিরাজ-উদ্-দৌলার চারটি বিবাহিতা বেগমের অস্তিত্ব জানা যায়—ওমদাৎউন্নেসা, লুৎফউন্নেসা, ফৌজী ও মোহনলালের ভগিনী। ১

নবাব নাজিম মীরজাফর

বিশ্বাসঘাতক কথাটি নবাব সেনাপতি মীরজাফরের (১৭৫৭-৬০ ও ৬৩-৬৫ খ্রীঃ) নামের সঙ্গে প্রায় ২৫০ বছর ধরে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত হয়ে আছে। তাই বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গ উঠলেই মীরজাফরের কথা মনে পড়ে। নবাব আলিবর্দী খানের মত মীরজাফরও ক্রীতদাস হিসাবে ভারতে এসে নিজের প্রতিভায় (আলিবর্দীর ভগ্নীপতি) ছলে বলে কৌশলে সর্বোত্তম আসন লাভ করেছিলেন। তিনি কোরাণ হাতে শপথ নিয়েও একাধিকবার বিশ্বাসঘাতকতার কাজে বিরত হননি। তাঁর বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার-স্বরূপ ২৯ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ রবার্ট ক্লাইভের অনুগ্রহে বাংলার নবাব মসনদে অধিষ্ঠীত হন। বিনিময়ে প্রচুর অর্থ ও ২৪ পরগণার জমিদারী, তাঁকে ইংরাজদের হাতে তুলে দিতে হয়। রাজকোষ শূন্য হওয়ায় ২ আর্থিক ও সামরিক ক্ষেত্রে দুর্বল নবাবী-শাসন, ইংরাজদের সাহায্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল হয়ে ওঠে। ১৯ আগষ্ট, ১৭৫৮ খ্রীঃ লর্ড ক্লাইভের নির্দেশে মীরজাফর রাজা রায়দুর্লভ ও রাজা নন্দকুমারকে দেওয়ানী পদে বসিয়েছিলেন। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯ খ্রীঃ) মীরজাফরকে 'নসীর-উদ্-দৌলা, সবৎজঙ্গ বাহাদুর, জাবৎ-উল্-মুল্‌ক' প্রভৃতি বিশেষ সম্মান-সূচক খেতাব দেন। ৩ মীরজাফরের হীনবল শাসনের সুযোগে মেদিনীপুরের জমিদার রাজা রামসিংহ, পূর্ণিয়ার জমিদার হাজির আলি খান এবং পাটনার শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। পরে তিনি ইংরাজদের সাহায্যে দমন করেন। মীরজাফরের অযোগ্যতা, অকর্মণ্যতা, এমনকি বিশ্বাসযোগ্যতাতেও (ওলন্দাজদের প্রতি তাঁর

১। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বংশ পরিচয়—সিরাজ-উদ্-দৌলার একমাত্র কন্যা উম্মৎ-সারিয়া বেগম, বিবাহ হয় মোরাদ-উদ্-দৌলার সঙ্গে। তাঁদের পাঁচ পুত্র, জ্যেষ্ঠ পুত্র সামসের আলি খানের দুই পুত্র—সৈয়দ লৎফ আলি ও সৈয়দ জয়নাল আবেদিন (স্বল্লায়ু)। সৈয়দ লৎফ আলির কন্যা ফতেমা বেগম। তাঁর তিন কন্যা লুৎফুন্নেসা, হাসমৎ আরা ও অলফুন্নেসা। হাসমৎ আরার পুত্র মৌলবী সৈয়দ জাকি রেজা। বাংলার সাব-রেজিষ্ট্রার এর পদে নিযুক্ত ছিলেন। মৃত্যু হয় ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রীঃ। তাঁর পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা। মুর্শিদাবাদ শহরে ও শহরের বাইরে এবং কলকাতায় এঁদের বংশধরগণ অস্বচ্ছল অবস্থায় জীবন-যাপন করেন।

২। মসনদে বসার সেলামীর অঙ্ক—২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা, এর মধ্যে রবার্ট ক্লাইভের নিজস্ব অংশে ৩৩,৪০০ পাউণ্ড।

৩। পরে জানুয়ারী, ১৭৬৫ খ্রীঃ পাওয়া মীরজাফরের দ্বিতীয় খেতাব—"সুজা-উল্-মুলক্, হিসামুদ্দৌলা মীরজাফর আলি খান বাহাদুর মহবৎ জঙ্গ"।

সহযোগিতা) অসন্তুষ্ট হয়ে ইংরাজ কোম্পানীর গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট ২০ অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রীঃ তাঁকে গদীচ্যুত করে, তাঁর জামাতা **মীরকাশিমকে** বসান। **মীরকাশিম** নবাব-গদীতে বহাল ছিলেন মাত্র দু'বছর কয়েক মাস, ২৪শে জুলাই, ১৭৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত।

দ্বিতীয় দফায় নিছক ক্ষমতা লাভের স্বার্থে ইংরাজদের সঙ্গে এক চুক্তিতে (১০ জুলাই, ১৭৬৩ খ্রীঃ), **মীরজাফর** মুর্শিদাবাদের নবাব হলেন। কিন্তু তাঁর অভ্যাসমত নিজ-স্বার্থে পুনরায় ইংরাজ-শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন অযোধ্যার নবাব উজীর ও মোগল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে গোপন আলোচনার মাধ্যমে। ইংরাজ কোম্পানী পুনরায় তাঁর প্রতি আস্থা হারান এবং বয়সের ভারে পীড়াগ্রস্ত নবাবকে অবসর গ্রহণে বাধ্য করেন। ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৭৬৫ খ্রীঃ কুষ্টরোগে মারা যাবার [১] আগেই তাঁর নাবালক পুত্র নজম্‌-উদ্‌-দৌলাকে নবাব গদীতে বসিয়ে যান। অবশ্যই ইংরাজদের অনুমতি সাপেক্ষে। নবাব মীরজাফরের দুই পত্নী মণি বেগমের ও বব্বু বেগম, তাঁদের এক কন্যা ও চার পুত্র। কন্যার নাম ফতেমা বেগম। পুত্ররা—নজম্‌-উদ্‌-দৌলা, সৈইফ-উদ্‌-দৌলা, আশ্রাফ-আলি খান এবং মোবারক্‌-উদ্‌-দৌলা। নবাব মীরজাফরের জীবদ্দশায় জ্যেষ্ঠ পুত্র মীরণ (সিরাজ-উদ্‌-দৌলার ঘাতক) বজ্রাঘাতে মারা যান ৩ জুলাই, ১৭৬০ খ্রীঃ।

নবাব নাজিম মীরকাশিম

নবাব মীরজাফরের প্রথম দফার নবাবী পদ বরখাস্তের পর, ২২ অক্টোবর, ১৭৬০ খ্রীঃ ইংরাজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের জামাতা মীরকাশিমকে গদীতে বসান। [২] মীরকাশিমের পিতা কাজী খান বিহারের এক ছোট জমিদার। নবাব আলিবর্দী খানের আগ্রহে মীরজাফরের কন্যা ফতেমা বেগমের সঙ্গে মীরকাশিমের বিবাহ হয়। ইংরাজ কোম্পানীকে সেলামী দিতে রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ায়, জমিদার ও প্রজাদের নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। কোম্পানীর আদেশে পাটনার সুবাদার রাজা রামনারায়ণের অতুল সম্পত্তি, ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের হাতে তুলে দেওয়া হয়। মীরকাশিমের আদেশে

১। কথিত আছে যে, মীরজাফর মারা যাবার আগে তাঁকে তাঁর দেওয়ান রাজা নন্দকুমার মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত খাইয়েছিলেন।

২। মীরকাশিমকে বাধ্যতামূলক নজরানা বা সেলামী দিতে হয়েছিল ৩২ লক্ষ টাকার বেশী। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ভ্যান্সিটার্ট সাহেব ও তাঁর সহকর্মীদের পদানুযায়ী প্রাপ্য হয়েছিল মোট ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। এছাড়া ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ খ্রীঃ নবাব মীরকাশিম ইংরাজ বণিক কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারীর ইজারা দেন। মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম নবাব মীরকাশিমকে যথোপযুক্ত রাজকীয় খেতাব 'নবাব নাসির'-উল্‌-মুলক্‌ ইমতিয়াজ-উদ্‌-দৌলা 'মীর মহম্মদ কাশিম আলি খান নসরৎ জঙ্গ' দিয়ে ভূষিত করেন।

১৭৬৩ খ্রীঃ রাজা রামনারায়ণকে হত্যা করা হয়। কিছুদিন বাদে মহারাজা রাজবল্লভ সেন ও তাঁর পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসকেও মুঙ্গেরে, বন্দী অবস্থায় ভাগীরথীতে নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয় (সেপ্টেম্বর, ১৭৬৩ খ্রীঃ)।

আত্মবিশ্বাসী, স্বাধীনচেতা ও প্রতিহিংসাপরায়ণ নবাব মীরকাশিম বিশেষ কারণে, মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। বিশেষ কারণটি আর কিছুই নয়, কেবল ইংরাজদের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থেকে, তাঁর সৈন্যবাহিনীকে ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তোলা। সেই উদ্দেশ্যে ইউরোপীয় সেনাপতি গ্রেগরি (আর্মেনিয়ান), মার্কার, ও সামরুর প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তাঁর প্রায় আড়াই বছরের রাজত্বে তিনি শান্তিতে বাস করতে পারেননি। কারণ সব সময় ইংরাজদের সম্বন্ধে তাঁকে সতর্ক থাকতে হয়েছিল। তাঁর শাসন-কার্যে ইংরাজদের হস্তক্ষেপ তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। অবাধ্য হতেন। গিরিয়ার যুদ্ধে (২ আগষ্ট, ১৭৬৩ খ্রীঃ) পরাজিত ও পাটনায় বিতাড়িত হবার পরই মীরকাশিমকে গদীচ্যুত করে মীরজাফরকে দ্বিতীয় দফায় নবাব করা হয়। পরে পাটনায় অবস্থানকালে ১০ অক্টোবর, ১৭৬৪ খ্রীঃ, ইংরাজ সেনাপতি মেজর মন্‌রো সসৈন্যে মুঙ্গের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং বক্সার রণক্ষেত্রে ২২ অক্টোবর, ১৭৬৪ খ্রীঃ মীরকাশিম ও নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে পরাস্ত করেন। মীরকাশিম সপরিবারে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার সঙ্গে রোহিলখণ্ডে পালিয়ে যান। সম্ভবত, ১৭৭৭ খ্রীঃ অতি দরিদ্র অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে তিনি মারা যান।

মীরকাশিমের পতনের পর গভর্নর ভান্সিটার্ট লিখেছেন—'নবাব কোনদিন আমাদের ব্যবসায়ের কোন অনিষ্ট করেন নাই। কিন্তু আমরা প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত……তাঁর শাসন-ব্যবস্থায় পদাঘাত করিয়াছি। নবাব অপমান, লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন……কিন্তু প্রতিশোধ নেন নাই।' অপর পক্ষে Sir Phillips লিখেছেন—'His short administration may rather be deemed a regular pillage than a system of Government. He ruined almost all the wealthy families of the country and massacred great number and carried of an immense treasure with him when driven out of the country.'

নবাব নাজিম নজম্-উদ্-দৌলা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, নবাব মীরজাফর তাঁর জীবিতাবস্থাতেই পুত্র নজম্-উদ্-দৌলাকে ইংরাজ কোম্পানীর অনুমতি-ক্রমে নবাব গীদতে আসীন করেন ফেব্রুয়ারী,

১৭৬৫ খ্রীঃ। নবাবের প্রায় সব ক্ষমতা ইংরাজ কোম্পানী তাঁদের হাতে নেন। নাম-সর্বস্ব নবাব নজম্-উদ্-দৌলা যথারীতি ১৪ লক্ষ টাকা নজরানা হিসাবে ইংরাজ কোম্পানীকে দেন। এই সময় ১২ আগষ্ট, ১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হওয়ায় মোগল বাদশা দ্বিতীয় শাহ্ আলম বার্ষিক মাত্র ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব (বৃত্তি) পাওয়ার বিনিময়ে (অঙ্গীকারে) ইংরাজ কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী স্বত্ব প্রদান করেন। এক কথায়, উত্তর-পূর্ব ভারতে ইংরাজ কোম্পানী হলেন প্রকৃত ভাগ্য-বিধাতা, আর নাম-সর্বস্ব ভারতেশ্বর মোগল সম্রাট শাহ্ আলমকে ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তিভোগী ও আশ্রয়-প্রার্থী হতে হল। উল্লেখ্য যে, মে, ১৭৬৬ খ্রীঃ লর্ড ক্লাইভ মুর্শিদাবাদ মতিঝিল প্রাসাদ দরবারে এক আড়ম্বর-পূর্ণ সমাবেশে নবাবের দক্ষিণে দেওয়ানের আসনে বসেছিলেন।

নবাব নাজিম সৈয়ফ্-উদ্-দৌলা

নবাব মীরজাফরের পুত্র নজম্-উদ্-দৌলার ৩ মে, ১৭৬৬ খ্রীঃ মৃত্যু হলে, তাঁর ষোল বছর বয়স্ক ছোট ভাই সৈইফ্-উদ্-দৌলা নবাব হলেন। নবাব-মাতা মণি বেগমের হাতে কর্তৃত্ব পড়ে। ১৭৬৯ খ্রীঃ ছিয়াত্তরের (১১৭৬ সন) মন্বন্তরের সময় নবাব সৈইফ্-উদ্-দৌলার অকাল মৃত্যু ঘটে ১০ মার্চ, ১৭৭০ খ্রীঃ বসন্ত রোগে। সেই সময় নবাবের বর্ষিক বৃত্তি ছিল প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা।

নবাব নাজিম মোবারক্-উদ্-দৌলা

মীরজাফরের পঞ্চম পুত্র মাত্র ১২ বছর বয়সেই নবাব-গদীর উত্তরাধিকারী হন। এক্ষেত্রেও সৎ-মা মণি বেগম ও দেওয়ান রাজা গুরুদাস (রাজা নন্দকুমারের পুত্র) অভিভাবক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। **মণি বেগম** ছিলেন সিরাজের একজন নর্তকী। পরে মীরজাফরের প্রধানা বেগম। বুদ্ধিমতী ও প্রচুর ধনের অধিকারিণী মণি বেগম ছিলেন বাংলার স্মরণীয়া বেগমদের অন্যতমা। মারা যান ১৮০৯ খ্রীঃ। এই প্রসঙ্গে নবাব সিরাজের বেগম লুৎফ উন্নেসার নামও উল্লেখের দাবী রাখে। নবাব মোবারক্-উদ্-দৌলার মৃত্যু হয় ৬ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৩ খ্রীঃ। নবাবদের বার্ষিক বৃত্তি ছিল ৩১,৮১,৯৯১ টাকা। পরে কমিয়ে ১৬ লক্ষ টাকা করা হয়।

সংক্ষেপে পরবর্তী নবাবদের কেবলমাত্র নাম উল্লেখ করা হচ্ছে। কারণ তাঁরা

১। নবাব নাজিম নজম্-উদ্-দৌলা, সৈইফ্-উদ্-দৌলা ও মোবারক্-উদ্-দৌলার সময়ে কোম্পানীর শর্ত হিসাবে রাজ্যভার ন্যস্ত ছিল দেওয়ান মহম্মদ রেজা খান, মহারাজা রায় দুর্লভ ও জগৎশেঠ খোশালচাঁদের উপর।

সকলেই ছিলেন ইংরাজ কোম্পানীর বৃত্তি-ভোগী ও নাম-সর্বস্ব নবাব। এমন কি, তাঁরা নিজেদের বৃত্তির টাকাও ইচ্ছামত খরচ করতে পারতেন না।

মোবারক্-উদ্-দৌলার পরবর্তী যথাক্রমে নবাব-নাজিম হয়েছিলেন তাঁর পুত্র দীলার জাহ্ (মৃত্যু ২৮ এপ্রিল, ১৮১০ খ্রীঃ); পুত্র সৈয়দ জৈনুল আহদুন্ আলি খান (আলি জাহ্, মৃত্যু ৬ আগষ্ট, ১৮২১ খ্রীঃ); ভ্রাতা সৈয়দ আহম্মদ আলি খান (ওয়ালা জাহ্, মৃত্যু ৩০ অক্টোবর, ১৮২৪ খ্রীঃ); পুত্র সৈয়দ মোবারক্ আলি খান (হুমায়ুন জাহ্,[১] মৃত্যু অক্টোবর, ১৮৩৮ খ্রীঃ); পুত্র সৈয়দ মনসুর আলি খান (ফেরাদুন জাহ্); পুত্র সৈয়দ হাসান আলি মির্জা ; তাঁর পাঁচ পুত্র—জ্যেষ্ঠ ওয়াসিফ্ আলি মির্জা, শেষ খেতাবী নবাব। এঁদের সম্বন্ধে পৃথকভাবে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

এঁরা প্রত্যেকেই নবাব-নাজিম কেবল নামে, শক্তি ও প্রভুত্ব-হীন। দায়িত্ব-হীন, বিলাস-বহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হওয়ায়, সব সময় আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। ইংরাজ সরকারের মনোনীত ব্যবস্থাপক বা দেওয়ানদের শৃঙ্খলা ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দৈনন্দিন জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে হত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, শোভাবাজার রাজপরিবারের রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব (আনুঃ ১৮৪৮ খ্রীঃ) এবং দেব রাজ-বংশের দৌহিত্র-সন্তান রাজা সীতানাথ বোস মুর্শিদাবাদে ইংরাজ কোম্পানীর মনোনীত দেওয়ান-নিজামত ছিলেন। নবাব নাজিমরা ব্যক্তিগতভাবে ১৯টি তোপধ্বনির অভিবাদনের হক্‌দার ছিলেন।

শেষ খেতাবী নবাব ওয়াসিফ্ আলি মির্জার অপর চার ভাই—সৈয়দ নাসির আলি মির্জা (১৮৭৬-১৯৪৫ খ্রীঃ), সৈয়দ আসিফ আলি মির্জা (১৮৮১-১৯২৪ খ্রীঃ), সৈয়দ তাকুব আলি মির্জা (জন্ম ১৮৮৩ খ্রীঃ) ও সৈয়দ মহসিন আলি মির্জা (জন্ম ১৮৮৫ খ্রীঃ)।

নবাব ওয়াসিফ্ আলির তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ নবাব সৈয়দ ওয়ারিস্ আলি মির্জা (১৯০১-২০ নভেম্বর, ১৯৬৯ খ্রীঃ)। নবাব ওয়ারিস্ আলির দুই পুত্র, সৈয়দ ওয়াকিফ্ আলি মির্জা (জন্ম ১৯২২ খ্রীঃ) এবং সৈয়দ ওয়াকুয়ার আলি মির্জা (জন্ম ১৯৩১ খ্রীঃ), এঁরা দু'জনেই ভারতের নাগরিকত্ব ত্যাগ করে বিদেশে বসবাস করেন।

নবাব ওয়ারিস্ আলির মেজ ভাই—সৈয়দ ফতেইয়ব আলি মির্জা (জন্ম ১৯০৬ খ্রীঃ) নবাবী পদের দাবীদার। বর্তমানে ৮৫ পার্ক ষ্ট্রীট, কলকাতায় বসবাস করেন। ছোট ভাই সৈয়দ কাজিম আলি মির্জা (জন্ম ১৯১১ খ্রীঃ) বাংলায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সক্রিয়ভাবে জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলার

১। হুমায়ুন জাহ্-এর সময়ে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত নবাব প্রাসাদ 'হাজার দুয়ারী' ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ার ম্যাক্‌লয়েড্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে তৈরী, সম্পূর্ণ হয় ১৮৩৭ খ্রীঃ।

আইন সভার সদস্য ছিলেন—১৯৩৭, ৪৬ খ্রীঃ। ১৯৬২ খ্রীঃ তিনি ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রি সভার সদস্য ছিলেন। ১৯৭৭ খ্রীঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধিদের অন্যতম। ১৯৭৯ খ্রীঃ লোকসভার নির্বাচিত সদস্য হন। মারা যান ১৪ জুলাই, ১৯৮৮ খ্রীঃ। কাজিম আলির তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ—শাহান শাহ্ আলি মির্জা (গালিব আলি), মধ্যম—সৈয়দ শারিয়ার আলি মির্জা (আলিম আলি), কনিষ্ঠ—সৈয়দ ওয়াসিফ্ আলি (আব্বাস আলি), কলকাতায় আলিপুরে ১১, অশোক রোডে বাস করেন। এঁরা বেশীর ভাগ সময় ব্যবসায়িক কাজে বিদেশেই থাকেন।

বর্তমানে নবাব বংশের জীবিত উত্তরাধিকারীরা তাঁদের 'নবাব' উপাধি ব্যবহার করার আইনগত অধিকার হারালেও, সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে 'নবাব সাহেব' আখ্যায় পরিচিত আছেন। ভারত সরকারের কাছে তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে মামলা ঝুলছে গত প্রায় তিরিশ বছর যাবৎ।

নবাব স্যার কুক্রু সৈয়দ হাসান আলি মির্জা

প্রথম খেতাবী নবাব নাজিম স্যার সৈয়দ হাসান আলি মির্জা 'খান বাহাদুর', 'বরিস-উদ্-দৌলা', 'আমির-উল-ওমরাহ', মহবৎ জঙ্গ, 'জি. সি. আই. ই.' প্রভৃতি সম্মান-সূচক উপাধিধারী-মান্যবর মানুষটির জীবন-চরিত মুর্শিদাবাদের নবাব-শাহী ঐতিহ্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

নবাব স্যার সৈয়দ হাসান আলি মির্জার পিতা নবাব নাজিম **সৈয়দ মনসুর আলি খান**—'মুন্তাজেম-উল্-মুলক্', 'মোসেন-উদ্-দৌলা', **ফেরাদুন জাহ্**-এর জন্ম হয় অক্টোবর, ১৮৩০ খ্রীঃ। বাংলার শেষ 'নবাব নাজিম' (উত্তরাধিকারী সূত্রে) হিসাবে বাদশা শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ) ও ইংরাজ কোম্পানী তাঁকে স্বীকার-পত্র দেন ১৯ ডিসেম্বর, ১৮৩৯ খ্রীঃ। তিনি বহু বছর বিলাতে কাটান। ১ নভেম্বর, ১৮৮০ খ্রীঃ মুর্শিদাবাদের শেষ 'নবাব নাজিম' উপাধিধারী সৈয়দ মনসুর আলি খান বাহাদুর 'নসির-উল্-মুল্ক', ইংরাজ সরকারের কাছে তাঁর বংশগত 'নবাব নাজিম' উপাধি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। তিনি দশ হাজার পাউণ্ড বার্ষিক বৃত্তি পান। ইংরাজ সরকার আরও ১০ লক্ষ টাকা নগদ ও বিলাতে অবস্থিত তাঁর সন্তান-সন্ততিদের ভার-পোষণের মাসোহারার বন্দবস্ত করেন। পুরানো নবাবী বংশের বিশেষ নির্দিষ্ট অধিকারের বিলুপ্তি ঘটে। মুর্শিদাবাদে নবাবের পক্ষাঘাতে মৃত্যু হয় ৫ নভেম্বর, ১৮৮৪ খ্রীঃ।[১]

১। ১৮৫৩-৬১ খ্রীঃ রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেব মুর্শিদাবাদের দেওয়ান ছিলেন। নবাব মনসুর আলির সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য ঘটায় চাকরীতে ইস্তফা দেন।

নবাব মনসুর আলি খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র **প্রথম খেতাবী নবাব—নবাব-ওয়ালা কুদ্র** সৈয়দ হাসান আলি মির্জার জন্ম হয় ২৫ আগষ্ট, ১৮৪৬ খ্রীঃ। হাসান আলি সাহেবের সর্বসাকুল্যে ১৪টি ভাই ও ৯টি বোন ছিল।[২] তাঁর জীবনের বেশী সময় কেটেছে মুর্শিদাবাদে। ইংরাজ শিক্ষকের কাছে তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। পিতার ইচ্ছায় বিলাতে যান উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ খ্রীঃ। সঙ্গে ছিল তাঁর আরও দুটি ভাই ও ইংরাজ গৃহ-শিক্ষক কর্নেল হারবার্ট। ইংলণ্ডে পড়াশোনার কোন ব্যবস্থা না করেই, তাঁরা কেবল ঐ দেশের দ্রষ্টব্য ঐতিহাসিক ও বাণিজ্যিক শহরগুলিতে পর্যটক হিসাবে পরিভ্রমণে ব্যস্ত ছিলেন।

রাজপ্রাসাদে মহামান্যা সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরীয়া ও যুবরাজ এডোয়ার্ড সকাসে উপস্থিত হয়ে নিজ-বংশের রাজভক্তির পরিচয় ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। ইউরোপীয় মহাদেশে প্রসিদ্ধ শহরগুলি পরিদর্শন করে প্রায় এক বছর পরে মুর্শিদাবাদে ফিরে আসেন ২ মার্চ, ১৮৬৬ খ্রীঃ। ইতিমধ্যে পিতা নাসির-উল্-মুল্‌ক নিজের বিষয় সম্পত্তি ও সরকারের দেওয়া বৃত্তির ব্যাপারে অসন্তোষের আর্জি নিয়ে ইংলণ্ডে যান সেক্রেটরী অফ্ এস্টেট-এর কাছে ১৮৬৯ খ্রীঃ। সঙ্গে ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাবজাদা সৈয়দ হাসান আলি মির্জা। ১২ বছর ইংলণ্ডে থাকার পরে দেশে ফেরেন ১৮৮১ খ্রীঃ। সরকারের সঙ্গে চুক্তির ফলে নবাবজাদা হাসান আলি মির্জাকে দেওয়া হয় 'নবাব বাহাদুর' বংশগত উপাধি ১৭ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮২ খ্রীঃ। নবাব বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখা ছাড়া, সৈয়াদ হাসান আলি মির্জার রাজভক্তি ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের জন্য ১৮৮৭ খ্রীঃ কে. সি. আই. ই. ও পরে জি. সি. আই. ই. সনন্দ পান। তা ছাড়া চারটি উচ্চ সম্মান-যুক্ত উপাধি—'ইন্টিশাম্ উল্-মুল্ক্', 'রহিস-উদ্-দৌলা', 'আমির-উল্-ওমরাহ' ও 'মহব্বৎ-জঙ্গ' তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার অনুমতিও সরকার দেন। 'নবাব বাহাদুর' উপাধি ও তাঁর বাৎসরিক বৃত্তি ও নিজস্ব ভূ-সম্পত্তির পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয় ১২ মার্চ, ১৮৯১ খ্রীঃ এক চুক্তিতে। বাংলার মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের মুখ্য ও প্রধান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করেন। শেষ জীবনে তিনি প্রায় সব সময় কাটিয়েছেন মুর্শিদাবাদে বিরাট প্রাসাদে, যা বাংলার সবচেয়ে বড় প্রাসাদ হিসাবে গণ্য। আয়তনে ৪২৫ ফুট লম্বা, ২০০ ফুট চওড়া ও ৪০ ফুট উঁচু। ১২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ ভূকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাসাদ, এখনও সব পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণীয়

মুর্শিদাবাদ নবাব পরিবারের প্রথম সরকারী খেতাবী বেগম Her Highness Nawab Shums-i-Johan Begum, Nawab Begum of Murshidabad (১৮৩৪-১৯০৫ খ্রীঃ) ছিলেন নবাব মনসুর আলি খানের বেগম ও নবাব হাসান আলি মির্জার মা। ১৮টি সন্তানের গর্ভধারিণী। কলকাতায় মহিলাদের উন্নতিকল্পে তাঁর যথেষ্ট দান আছে। সি. আই. উপাধি পান।

স্থাপত্য। ভোজগৃহে উৎসবের বন্যা বয়ে গেছে। অমূল্য বড় বড় রোশনাই ঝাড়-বাতির আলোক সজ্জা, দেওয়ালে টাঙ্গানো বিরাট মাপের সুসজ্জিত আয়নাগুলি ও বহু দুষ্প্রাপ্য তৈলচিত্র। বিলাস-বহুল জীবনযাত্রায় স্বপ্ন-বিভোর নবাব বাহাদুর সৈয়দ হাসান আলি মির্জার আর্থিক অনটন থাকা সত্বেও, ব্যক্তিত্ব ও পদমর্যাদা খুন্ন হবে এমন কোন কাজ করেননি। সসম্মানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯০৬ খ্রী: সাধের জন্মভূমি মুর্শিদাবাদে। নবাবের পাঁচ পুত্র—পূর্বেই নবাব বংশ পরিচয়ে উল্লেখ করা হইয়েছে।

নবাব স্যার সৈয়দ হাসান আলি মির্জার অপর ১৩টি ভাইদের নাম দেওয়া হল—(১) হুমায়ুন কুদ্রু সৈয়দ মহম্মদ আলি মির্জা, (২) সোরিয়া কুদ্রু সৈয়দ মহম্মদ টাকি মির্জা, (৩) অসম কুদ্রু সৈয়দ আসাদ আলি মির্জা, (৪) সোলিমান কুদ্রু সৈয়দ ওয়াহেদ আলি মির্জা, (৫) ফল্লুক কুদ্রু সৈয়দ নাসির আলি মির্জা, (৬) কুর্সীদ কুদ্রু সৈয়দ ইস্কান্দর আলি মির্জা[১], (৭) খুস্রো কুদ্রু সৈয়দ বুরহাম মির্জা, (৮) দারা কুদ্রু সৈয়দ খাকান মির্জা, (৯) কাওস কুদ্রু সৈয়দ ফরহাদ মিজা, (১০) অনজুন কুদ্রু সৈয়দ দাউদ মির্জা, (১১) হালিম কুদ্রু সৈয়দ কাই কাওস মির্জা, (১২) কুদ্রু সৈয়দ জাফর মির্জা, (১৩) কুদ্রু সৈয়দ বকর মির্জা।

নবাব আসিফ্ কুদ্রু সৈয়দ ওয়াসিফ্ আলি মির্জা

নবাব স্যার সৈয়দ হাসান আলি মির্জার জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব ওয়াসিফ্ আলি মির্জার জন্ম হয় ৭ জানুয়ারী, ১৮৭৫ খ্রী:। বারো বছর বয়সে ইংরাজ শিক্ষাবিদ মিঃ কোলস্ (প্রিন্সিপাল ডেভেটন কলেজ)-এর তত্বাবধানে বিলাত যান উচ্চশিক্ষাকল্পে। শেরবোর্ন, রাগবী ও অক্সফোর্ড প্রভৃতি কলেজে অধ্যয়ন করেন, দেশে ফিরে আসেন ১৮৯৫ খ্রী:। তিনি ছিলেন মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ও বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য। 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে' (১৯০৫-১১ খ্রী: সরকারের পক্ষ অবলম্বন করা সত্বেও, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড-এর রাজ্যাভিষেকের সময় (১৯০২ খ্রী:) নবাব ওয়াসিফ্ আলি বাংলার অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডনে রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী সূত্রে নবাব-মসনদে বসেন ও 'নবাব বাহাদুর' আমির-উল্-ওমরা' প্রভৃতি খেতাবগুলি নিজস্ব ব্যবহারের জন্য ইংরাজ সরকারের অনুমোদন লাভ করেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর রাজ্যাভিষেকে ১৯১১ খ্রী: তাঁকে কে. সি. ভি. ও. উপাধি দেওয়া হয়। তিনি কলকাতা, মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার স্বীকৃত ও সম্মানিত শেষ খেতাবী নবাব।

১। মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ১৮৯১ খ্রী:।

মৃত্যু হয় ২৩ অক্টোবর, ১৯৫৯ খ্রীঃ, তিন পুত্রকে রেখে। এঁদের সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিহাসে কাশিমবাজার

কলকাতার তিনশ বছরের ইতিহাসের (১৬৯০-১৯৯০ খ্রীঃ) সঙ্গে সমকালীন দ্বৈত-শহর কাশিমবাজার-মুর্শিদাবাদের [১] কাহিনী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভাগীরথীর পশ্চিম উপকূলে প্রাচীন বন্দর সপ্তগ্রামের ধ্বংসান্তে কাশিমবাজারকে (ভাগীরথীর পূর্ব প্রান্তে) আন্তর্জাতিক বন্দর-রূপে দেখেছিলেন ইউরোপীয় নাবিক এ-টান (আনুঃ ১৬৩২ খ্রীঃ)। কাশিমবাজার তখন একটি প্রতিষ্ঠিত জনপদ, যখন মুখসুসাবাদ [২] একটি ছোট গ্রাম। খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের শুরুতেই কাশিমবাজারে আরমেনিয়ানগণ প্রথম বাণিজ্যকুঠী তৈরী করেছিলেন। [৩] ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকদের বানিজ্য-বসতি (কুঠীগুলি) [৪] তৈরী হয়েছিল কিছুকাল পরে। ১৬৪০ খ্রীঃ ইংরাজ বণিকদের কর্মকর্তা মিঃ জন্ কেন্ ও সহকারী জোব চার্ণক ইংরাজদের কাশিমবাজারের কুঠীর পরিচালনায় ছিলেন। ১৬৯০ খ্রীঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের ফরমানে, বছরে তিন হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে বাংলায় সুতানুটি (শোভাবাজার, হাটখোলা, নিমতলা, জোড়াসাঁকো), গোবিন্দপুর (ফোর্ট উইলিয়ম, বৌবাজার, ড্যালহৌসী স্কোয়ার) এবং কলকাতা (কালীঘাট, ভূকৈলাস, হেষ্টিংস) প্রভৃতি তিনটি গ্রামে ব্যবসা ও বসবাসের স্বত্ব লাভ করেন ইংরাজ বণিক কোম্পানী।

কাশিমবাজার বন্দরের যোগা-যোগের উল্লেখ-পর্বে, স্থলপথের বিবরণ ছাড়া জলপথের সংকীর্ণতার কারণে বিশেষ অসুবিধার কথা বলেছেন বর্ণিয়ে (১৬০৬ খ্রীঃ), ট্রাভেণিয়ার (১৬৭৬ খ্রীঃ) হেজেস্ (১৬৭৯ খ্রীঃ), হলওয়েল্ (১৭৫২ খ্রীঃ) প্রমুখ বিদেশী পর্যটকরা। রেশম, মসলিন, ও নীল শিল্পের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে পরিচিত ছিল কাশিমবাজার। ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে নবাবদের সংঘাত লেগে থাকত এই বাণিজ্য শুল্ক বিষয়ে। বাংলার সুবাদার নবাব শায়েস্তা খানের নির্দেশে

১। মুর্শিদাবাদ থেকে কাশিমবাজরের দূরত্ব মাত্র ৭ কি.মি.। বহরমপুর থেকে কাশিমবাজারের ব্যবধান মাত্র ২ কি.মি.। কলকাতা থেকে রেলপথে ১৯০ কি.মি. ও সড়ক পথে ২১২ কি মি.।

২। ১৭০৪ খ্রীঃ 'মুখসুসাবাদ' নবাব মুর্শিদকুলী খানের নামে 'মুর্শিদাবাদ' নামকরণ হয়।

৩। সতেরো শতকের প্রতিষ্ঠিত প্রথম আরমেনিয় গীর্জা (মেরী) এখনও কাশিমবাজারে শ্বেতর্থার বাজারে দেখা যাবে।

৪। ফরাসী বাণিজ্যকুঠী সৈদাবাদ-এ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫০ খ্রীঃ; ওলন্দাজরা কুঠী স্থাপন করেন কালিকাপুর-এ। ভিন্ন মতে ইংরাজরা শুরু করেন ১৬৫৮ খ্রীঃ।

ইংরাজদের কাশিমবাজারের কুঠী ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল ১৬৮৬ খ্রীঃ। পরে আবার তৈরী করা হয় মিটমাটের পর। নবাব আলিবর্দীর সময়ে কুঠীকে দুর্গে পরিণত করা হয়েছিল মারাঠা বর্গীদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ)। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ২ মে, ১৭৫৬ খ্রীঃ কাশিমবাজার কুঠীর উপর হামলা করে যথেষ্ট ক্ষতি করেন। তখন মিঃ উইলিয়াম্ ওয়াটস্ ছিলেন অধ্যক্ষ আর ওয়ারেন হেস্টিংস ছিলেন একজন সাধারণ কর্মচারী।

মুখসুসাবাদ (মুর্শিদাবাদ) রাজধানীতে পরিণত হলে কাশিমবাজারের গুরুত্ব বেড়ে যায়। তৎকালীন বড় বড় জমিদার ও রাজরাজড়ারা এখানে বসবাস শুরু করেন। এখনও রয়েছে তাঁদের তৈরী দর্শনীয় প্রাসাদ, মন্দির, দেব-দেউল, জলাশয় প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে জগৎশেঠ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী, নৃসিংহপ্রসাদ রায়, মহারাজা নন্দ কুমার, দেবী সিংহ প্রমুখ রাজরাজড়ারা বিশেষ উল্লেখ্য। কাশিমবাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছড়িয়ে আছে—শেঠেদের জৈন-মন্দির মহাজনটোলিতে, নন্দী, সিংহ ও রায় রাজপরিবারের প্রাসাদ, কুঞ্জঘাটার রাজা নন্দকুমারের রাজবাড়ী। নবাব মুর্শিদকুলী-খানের কানুনগো রাজা দর্পনারায়ণ ঢাকা থেকে নবাবের সঙ্গে কাশিমবাজারের আসেন ও ডাহাপাড়ায় এক বিশাল অট্টালিকা তৈরী করেছিলেন, এখন সেটির অস্তিত্ব নেই। কাশিমবাজারে বহু পুরানো কবরখানায় হেস্টিংস সাহেবের প্রথমা স্ত্রী মিসেস মেরী হেস্টিংস ও তাঁদের কন্যা এলিজাবেথ (জুলাই, ১৭৫৯ খ্রীঃ) ও অন্যান্য কয়েকজন ইংরাজদের কবর এখনও পর্যন্ত সুরক্ষিত। জৈনদের প্রাচীন মন্দির নেমিনাথও দেখতে পাওয়া যাবে। কাশিমবাজারে স্থানীয় লোকেরা কামান ও বারুদ তৈরী করত।

ঢাকা থেকে সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলী খান তাঁর কর্মক্ষেত্র স্থানান্তরিত করেন মুখসুসাবাদে (মুর্শিদাবাদ) ১৭০৪ খ্রীঃ। সেই সময় ঢাকার বিত্তবান মহাজন জগৎশেঠ ও তাঁর আত্মীয়রা মুর্শিদাবাদের কাছে কাশিমবাজারে মহিমাপুরে (মহাজনটোলি) এসে বসতি করেন। এই ধনী জগৎশেঠরা বংশানুক্রমে মুর্শিদকুলী খান থেকে শুরু করে আলিবর্দী, সিরাজ-উদ্-দৌলা, মিরজাফর প্রমুখ নবাবদের ও পরে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ণধারদের (ক্লাইভ, হেস্টিংস প্রমুখ) এবং ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক সংস্থানগুলিকেও অর্থ সাহায্য করেছেন। তা ছাড়া ১৭১৭ খ্রীঃ শেঠেরা এখানে ট্যাক্‌শাল বসিয়ে ছিলেন। সম্রাট মহম্মদ শাহকে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এক কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন সৈন্যবাহিনীর বকেয়া বেতন দেওয়ার জন্য ১৭২২ খ্রীঃ।

ইংরাজ বণিক কোম্পানী (মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর কিছুদিন আগে) মার্চ, ১৭২৭ খ্রীঃ

নবাবের কাছ থেকে কাশিমবাজার তথা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা আদায় করে নিয়েছিলেন উপযুক্ত নজরানা দিয়ে। সেই সময় দেশে শান্তি বিরাজ করেছিল এবং স্বাভাবিকভাবে কাশিমবাজার 'বন্দর রানী' রূপে চিহ্নিত হয়েছিল। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ১৭২৭ খ্রীঃ বিলাতে রেশম রপ্তানি করা হয়েছিল ১,৩৪,৯১৯ পাউণ্ড। এই পরিমাণ ১৭৪০ খ্রীঃ কিছু কমে যায় ১, ২৬, ৭৫৫ পাউণ্ডে। হয়ত এর কারণ, কাশিমবাজার ছাড়া ঢাকা, মালদহ, চট্টগ্রাম, লক্ষ্মীপুর, ঘাটাল, পাটনা প্রভৃতি অঞ্চলে রেশম ও সুতীবস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানি শুরু হওয়ায়। কাশিমবাজারের রেশম ও সুতীবস্ত্র ব্যবসা সম্পর্কে গুজরাটী ব্যবসায়ী গিরিধারী দাসের গোমস্তা সদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৭৮৯ খ্রীঃ কুমারখালির রেসিডেন্টের কাছে দেওয়া তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন যে, '১৭৮৭-৮৮ খ্রীঃ এক হাজার মন কাঁচা রেশম কাশিমবাজার থেকে সুরাটে পাঠান হয়।'

এই প্রসঙ্গে ১৭৬৫ খ্রীঃ থেকে হেস্টিংসের আনুকুল্যে কাশিমবাজারের নন্দী রাজ পরিবারে ভূমিকা উল্লেখ করতে হয়। কাশিমবাজারের ইতিহাসে প্রায় ২০০ বছর (১৬৫০-১৮৫০ খ্রীঃ) একটি গৌরবময় অধ্যায়। ঐ সময় কাশিমবাজার পূর্বভারতে বন্দর ও শিল্প নগর হিসেবে বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। ১৬৬০-৬১ খ্রীঃ ইটালী থেকে আগত ভেনিসীয় পর্যটক **নিকোলাস্ মানুচি** কাশিমবাজারে এসে নিজে লিখে গেছেন যে, এই নগরে সব জাতিরই বণিকরা তাঁত-শিল্প-বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। কেবল ওলন্দাজ বণিকদের কুঠীতে (কালিকাপুরে) প্রায় সাতশো তাঁতী রেশম বয়ন-শিল্পে রত ছিলেন।

সেই সময় মনে হয় ফরাসীদের ব্যবসায় বেশ ভাঁটা পড়েছিল। ১৭৩৪ খ্রীঃ জোসেফ্ ডুপ্লে সাহেবের চেষ্টায় ফরাসী কুঠীগুলির সংস্কার করা হয় ও পুর্ণজীবন লাভ করে। ফরাসডাঙার তাঁতের কাপড় বিশ্ব-বিখ্যাত হয়েছিল। কাশিমবাজারে ফরাসীদের বাণিজ্য কুঠী ছিল সৈদাবাদে। ফরাসী সম্রাট পঞ্চদশ লুই-এর সময় (-১৭১৬-৭৩ খ্রীঃ) ফ্রান্সে এই সৌখিন বস্ত্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যদিও পঞ্চাশ ভাগেরও বেশী রেশম ও সুতী বস্ত্র রপ্তানি হত ইংলণ্ডে।

প্রায় সব বণিকগোষ্ঠীর কুঠীগুলি একাধিকবার ধ্বংস করা হয়েছিল। ১৬৯৬-৯৭ খ্রীঃ মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণার জমিদার শোভাসিংহের সহযোগী মহা সিংহ ও পাঠান সর্দার রহিম খান মোগলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সময় কুঠীগুলিতে লুঠ-তরাজ হয়। এমনকি বিদেশী বাণিজ্য জাহাজগুলির ভাগীরথী নদীতে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ ও মাশুল আদায় করা হত। পরে অবশ্য বণিকরা নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ফিরে পেয়েছিল। মোগল রাজশক্তি ও বাংলার নবাবরা বিদেশী বণিকদের কুঠী-নির্মানকে ভাল চোখে দেখতেন না। তাঁরাও বেশ কয়েকবার বাণিজ্য কুঠীগুলি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসা

কোনদিন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়নি। কারণ দেশীয় মহাজন ও জমিদাররা বিদেশী বণিকদের সহযোগী হয়ে ব্যবসায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কাশিমবাজারের কৃষ্ণকান্ত নন্দী রেশম ব্যবসা শুরু করেন। তাঁর বংশধরেরা ১৭৭৪-৭৫ খ্রীঃ মোট রেশম সরবরাহ করেছিলেন ১১,১৮,৮১৮ টাকার। কাশিমবাজারের বস্ত্র-শিল্পকে বিভিন্ন অঞ্চলের উৎপন্ন বস্ত্র-সামগ্রীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ফলে কাশিমবাজরের বস্ত্র-শিল্পের পতনের সূত্রপাত হয়। ১৮৩৯ খ্রীঃ কাশিমবাজার বন্দরকে পুনরুজ্জীবিত করবার শেষ চেষ্টা করেন কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ নন্দী। এখানে তিনি জাহাজ তৈরী ও মেরামতি করার কারখানা স্থাপন করেন। কিন্তু তৎকালীন ইংরাজ সরকারের অসহযোগিতার ফলে জাহাজ তৈরী সম্ভব হয়নি। ইংরাজ কোম্পানী কাশিমবাজারের সঙ্গে সমস্ত ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করে, কলকাতাকে তাঁদের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন এবং কাশিমবাজারে তাঁদের সমুদয় সম্পত্তি—বাড়ীঘর, জমি, দুর্গ ইত্যাদি বিক্রি করে দেন (১৮৫৮-৬২ খ্রীঃ)।

বাংলায় ইউরোপীয় বণিকগোষ্ঠি

প্রথমেই মনে পড়ে দক্ষিণ ইউরোপের **পর্তুগালের নাবিক ভাস্কো-ডা-গামার** সমুদ্রপথে দক্ষিণ ভারতে কালিকট বন্দরে অবতরণ ১৪৯৮ খ্রীঃ। পরে ১৫১৭ খ্রীঃ পর্তুগীজ বণিকরা কোচিন ও ক্যানানোর অঞ্চলে বাণিজ্য শুরু করেন। তারপর চট্টগ্রাম ও সপ্তগ্রামে আসেন ১৫৩০ খ্রীঃ। মোগল সম্রাট আকবরের অনুমতিতে হুগলীতে কুঠী তৈরী করেন ১৫৮০ খ্রীঃ, কিন্তু ১৬৩২ খ্রীঃ সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে হুগলী থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করা হয়। শেষ পর্যায়ে তাঁরা গোয়া, দমন ও দিউ-তে উপনিবেশ স্থাপন করেন।[১]

ওলন্দাজ নাবিকরা প্রথমে ১৬৫৩ খ্রীঃ চুচুড়ায় এবং পরে (১৬৫৮ খ্রীঃ) কাশিমবাজারে ও পাটনায় বাণিজ্য শুরু করেন। সম্রাট ফারুকৃশিয়ার (১৭১৩-১৯ খ্রীঃ) শতকরা আড়াই টাকা শুল্ক ধার্য করে, ওলন্দাজদের বাণিজ্য করার অনুমতি দেন মাত্র চল্লিশ হাজার টাকা নজরানা নিয়ে। ১৬৬৫ খ্রীঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর ফরমানে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে সৈদাবাদে এক খণ্ড জমি দিয়ে **আর্মেনিয়ানদের** বসতি করার অনুমতি দেন। তাঁরা চুঁচুড়ায় একটি গীর্জা তৈরী করেন ১৬৯৫ খ্রীঃ। আঠারো দশকের প্রথম দশকে ঢাকা ও

১। প্রসঙ্গতঃ পর্তুগীজদের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুটি অবাঞ্ছিত ঘটনার আবির্ভাব হয়। খ্রীষ্ট ধর্ম-প্রচার ও জল-স্থলে জলদস্যু 'ঠগ'দের অত্যাচার। এই দস্যুরা তাদের অভিযানে লুট-পাট ছাড়া, বহু নর-নারীকে বন্দী করে নিয়ে গিয়ে 'ক্রীতদাস' রূপে বিক্রী করত।

কলকাতায় আর্মেনিয়ানদের বসতি শুরু হয়। ১৭২৪ খ্রীঃ তাঁরা কলকাতায় আর্মেনিয়ান চার্চ তৈরী করেন। কিন্তু অধ্যাপক বিনয় ঘোষের মতে, **জোব চার্ণকের কলকাতায়** ১৬৯০ খ্রীঃ বসতি করার অর্ধ শতাব্দীর আগে আনুঃ ১৬৪০ খ্রীঃ আর্মেনিয়ানরা এখানে বসবাস শুরু করেছিলেন। তবে এটাও ঠিক যে, কলকাতায় ইংরাজ খ্রীষ্টানদের বসতি ছিল সতেরো শতকের মধ্যভাগে যদিও সেণ্ট্ জন্স্ পুরানো চার্চের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ১৭৮৭ খ্রীঃ। কিন্তু বর্তমান গীর্জাটির বাড়িটি তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিল ওয়ারেন্ হেস্টিংসের সময়। সম্পূর্ণ হয় ১৭৮৭ খ্রীঃ।

ফরাসীরা ভারত-ভূখণ্ডে প্রথমে সুরাট ও পরে আরও কয়েকটি অঞ্চলে—(কালিকট, পণ্ডীচেরী, কারিকল, মাহে এবং বাংলায় কাশিমবাজার, চুঁচুড়া ও ১৭৪০ খ্রীঃ চন্দননগরে তাঁদের বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। ইংরাজদের সঙ্গে কয়েকদফা খণ্ডযুদ্ধের পর তাঁরা কেবল কয়েকটি উপনিবেশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকেন।

ডেনমার্কের বণিকরাও (**দিনেমার**) বাণিজ্য শুরু করেন দক্ষিণ ভারতে তাঞ্জোর জেলায় ট্রানকুইবার ও বাংলায় হুগলীতে ১৭৫৩ খ্রীঃ। পরে নবাব আলিবর্দীর অনুমতিক্রমে ৮ অক্টোবর, ১৭৫৫ খ্রীঃ শ্রীরামপুরে, শেওড়াফুলীর রাজাদের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে বার্ষিক ১৬০১ টাকার বিনিময়ে। কিন্তু ব্যবসায়ে সুবিধা করতে না পারায়, তাঁরা শ্রীরামপুর ইংরাজ কোম্পানীকে বিক্রি করে দেন ১১ অক্টোবর, ১৮৪৫ খ্রীঃ।

ভারতে পর্তুগীজ বণিকদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে, **ইংরাজ বণিকরা** ইংলণ্ড-সম্রাজ্ঞী প্রথম এলিজাবেথের ১৬০০ খ্রীঃ এক সনন্দে 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান পত্তন করেন। ১৬০৮ খ্রীঃ ক্যাপ্টেন হকিন্স্ ইংলণ্ড সম্রাট প্রথম জেমসের (১৬০৩-২৫ খ্রীঃ) সুপারিশ-পত্র নিয়ে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হলেও বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি পাননি। তবে ১৬১৫ খ্রীঃ **স্যার টমাস্ রো** ঐ দরবার থেকেই ভারতে বেশ কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য করার সুযোগ সুবিধা আদায় করেছিলেন, সম্রাট পরিবারে সুচিকিৎসার বিনিময়ে।

ইংরাজ বণিকদের সম্বন্ধে একটু বেশী তথ্য পরিবেশনে করতেই হয়। প্রথমে বাণিজ্যক্ষেত্রে তাঁরা মোটেই সুবিধা করতে পারেননি, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হওয়ায় বাংলার সুবাদার নাজিম শাহজাদা মহম্মদ সুজার কাছ থেকে ১৬৫০ খ্রীঃ বাংলায় বাণিজ্য করার অনুমতি পান ও পরের বছর হুগলীতে কুঠী তৈরী করেন ১৬৫১ খ্রীঃ। ১৬৬৮ খ্রীঃ ঢাকা এবং পরে রাজমহল ও মালদহে কুঠী তৈরী হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ইংরাজ বণিকদের ঔদ্ধত্যের শাস্তি হিসাবে ১৬৮৬ খ্রীঃ বাংলা থেকে ইংরাজদের বিতাড়িত করা হয়। ১৬৮৭ খ্রীঃ হিজলিতে সামরিক শিবির গড়ে জোব চার্ণক মোগল সৈন্যের বিরোধীতা

করেছিলেন। জোব চার্ণকের দৌত্যে ও ক্ষমা প্রার্থনায়, ঔরঙ্গজেবের অনুমতিতে প্রথমে ডিসেম্বর, ১৬৮৭ খ্রীঃ সুতানুটি গ্রামে (বর্তমান শোভাবাজার এলাকায়) ও পরে ২৪ আগষ্ট ১৬৯০ খ্রীঃ কলকাতায় বসতি শুরু করেন। এইভাবে কলকাতা মহানগরীর পত্তন করেন জোব চার্ণক।[১] অনেক পরে ব্যবসার তাগিদে ইংরাজরা সুতানুটি ও গোবিন্দপুরে ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট বিশেষ করে, কলকাতায় একটি দুর্গ তৈরী করেন।[২] ইংরাজরা ১০ নভেম্বর, ১৬৯৮ খ্রীঃ মাত্র ১৩০০ টাকায় সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা-এই তিনটি গ্রামের জমিদারীর খাজনা আদায়ের স্বত্ব খারিদ করেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের কাছ থেকে। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র বাংলার শাসনকর্তা শাহজাদা আজিম-উস্-শান্ (১৬৯৭-১৭১২ খ্রীঃ) মাত্র ১৬,০০০ টাকা নজরানা নিয়ে ইংরাজদের সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা গ্রামের জমিদারীর অধিকার দেন।

ইংরাজ প্রতিনিধি মিঃ সুরম্যান্ ১৭১৭ খ্রীঃ সম্রাট ফারুক্‌শিয়ারের কাছ থেকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা আদায় দিয়ে সারা বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার ও কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৩৮টি গ্রামের জমি ইজারা নিয়ে বসবাস করার সুযোগ লাভ করেন।

নবাব আলিবর্দী নিছক নিজের স্বার্থের তাগিদে যতদূর সম্ভব ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে সদ্ভাব রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, কারণ ইংরাজদের ব্যবসা ভালভাবে চললেই রাজকোষের শূন্য ভাণ্ডার পূর্ণ হবে—কর, উপঢৌকন ও সেলামী বাবদ। ইংরাজরাও বুঝতে পেরেছিলেন নবাবের প্রতি বিরুদ্ধাচারণে ব্যবসার উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। তা ছাড়া খেতাবী রাজা ও জমিদারদের নিজেদের ব্যবসায় অসাধু মুনাফার ব্যগ্রতা, তাঁদের ইংরাজ প্রীতির অতি বাস্তব কারণ।

ইংরাজদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক[৩] প্রভাব ও প্রতিপত্তির মূলে ছিল নবাবী শাসনের আর্থিক সংকট ও সামরিক দুর্বলতা। জমিদার ও সাধারণ মানুষ তুলনামূলকভাবে

১। কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্ণক কলকাতাতেই মারা যান ১০ জানুয়ারী, ১৬৯২ খ্রীঃ। চার্চ লেনে সেন্ট জনস্ চার্চের প্রাঙ্গণে তাঁর সমাধি মন্দির আছে। ভিন্নমতে ১৬৯৩ খ্রীঃ।

২। ১৬৯৬ খ্রীঃ চন্দ্রকোণার স্থানীয় প্রভাবশালী জমিদার রাজা শোভাসিংহের নবাবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনের দোহাই দিয়ে, এই ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গটি (ইংলণ্ড সম্রাট তৃতীয় উইলিয়মের নামে) ইংরাজরা তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন ১৭০০ খ্রীঃ। এর পরে এই পুরানো দুর্গটি ষ্ট্রাণ্ড রোডে ভাগীরথীর ধারে স্থানান্তরিত করা হয় (১৭৫৮-৭৩ খ্রীঃ)। ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে উলুবেড়িয়াতেও ইংরাজদের একটি কুটী ছিল।

৩। নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীঃ চুঁচুড়ায় ইংরাজদের কাছে যুদ্ধে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ওলন্দাজদের এবং ফরাসী বণিক কোম্পানীর ২৩ মার্চ, ১৭৫৭ খ্রীঃ চন্দননগরের যুদ্ধে ইংরাজদের নিকট পরাজয়ের পর প্রতিপত্তি খর্ব হয়।

ইংরাজদের কাছ থেকে একটি সুস্থিত ও নির্ভরশীল শাসন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দেশের ও দশের আর্থিক উন্নতির ১ আলো দেখতে পেয়েছিলেন। উপরন্তু নবাব মীরকাশিমের বক্সারের যুদ্ধে (২২শে অক্টোবর, ১৭৬৪ খ্রীঃ) পরাজয় আর তার পরেই ১২ আগষ্ট, ১৭৬৫ খ্রীঃ টলমলে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলমের প্রদত্ত বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকারে, ইংরাজ-বণিকদের 'মানদণ্ড' 'রাজদণ্ডে' পরিণত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে, ব্যবসা-বাণিজ্যে কোম্পানীর আগ্রহ কিছুটা কমলেও, ইংরাজ ব্যবসায়ীগোষ্ঠী তাদের বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যাদি ও কৃষিজাত পণ্যের ২ (নীল, পাট ও চাল) উৎপাদন ও রপ্তানি প্রায় একচেটিয়া অধিকারে রেখেছিলেন।

বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা

বহু প্রচলিত পুরানো ছড়ায় ৩ বাংলায় মারাঠা সৈন্যের নয় বছর যাবৎ দিন-রাতে আক্রমণ ও লুঠতরাজের বিভীষিকা বা দুঃস্বপ্নের ছবি আমাদের মনে ভেসে ওঠে। ছত্রপতি রাজা শিবাজী (১৬২৭-৮০ খ্রীঃ) ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে স্বাধীন মারাঠা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের প্রবল পরাক্রান্ত শক্তিকে বারংবার প্রতিহত করে। প্রায় ষাট বছর পরে মারাঠা সামন্ত রাজ্যের প্রধান, নাগপুরের ভোঁসলে, তাঁর অনুগত মারাঠী সৈন্য নিয়ে উড়িষ্যার মধ্য দিয়ে বাংলায় বর্ধমানে পৌঁছন এপ্রিল, ১৭৪২ খ্রীঃ। তাদের অভিপ্রায় রাজ্য জয় করা বা মারাঠা শক্তির সম্প্রসারণ ঘটানো মোটেই ছিল না।

১। সেকালে প্রতি মণ ধানের বাজার দর—(হুগলি গেজেটিয়ার ১৯৭২ খ্রীঃ)
১৬৭০ খ্রীঃ—১ আনা ৪ পয়সা, ১৭৯০ খ্রীঃ—১ আনা ৮ পয়সা, ১৮০৪ খ্রীঃ—১আনা ৩ পয়সা।

২। নীল চাষের কাজ শুরু করেন ফরাসী ব্যবসায়ী লুইস্‌ বনাউড হুগলী জেলায় তালডাঙ্গা ও গোঁদলপাড়া অঞ্চলে। ১৭৭৭ খ্রীঃ সাহেব ব্যবসায়ীদের অত্যাচারে নীলচাষী বিদ্রোহ ১৮৫৯-৬০ খ্রীঃ।

৩ (ক)। ছেলে ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো, বর্গী এলো দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে?"

(খ) গঙ্গারাম 'মহারাষ্ট্র পুরাণে' লিখেছেন—

"চাহর দিগে লোক পালাঞ ঠাঞি, ঠাঞি।
ছত্তিশ বর্ণের লোক পলায় তার অন্ত নাঞি॥
এই মতে সব লোক পলাইয়া জাইতে।
আচম্বিতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে॥
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া।
সোনা রুপা লুটেনেএ আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে, কারু নাক কান।
একি চোটে কারো বধএ পরান॥"

একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আক্রান্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের আসুরিক বলপ্রয়োগে সর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিজেদের ধনভাণ্ডার পূর্ণ করা। বাংলার নবাব আলিবর্দী খান সর্বতোভাবে বাধাদানে যথেষ্ট তৎপর হলেও, মারাঠীরা **ভাস্কর পণ্ডিতের** নেতৃত্বে একাধিকবার কাটোয়া [১] পর্যন্ত দখল করে বীভৎস অত্যাচারে রত হয়েছিল। অগণিত লোক তাদের অত্যাচারের জ্বালায় ভিটে-মাটি ছেড়ে ভাগীরথীর অপর পারে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। বাংলায় শিল্প বাণিজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। বাঙালীরা এই মারাঠী সৈন্যদের 'বর্গী' বলত। নবাবের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি সম্ভব হত আক্রমণকারীদের হাতে রাজস্বের বড় অংশ তুলে দিলে। ৩০ মার্চ, ১৭৪৩ খ্রীঃ মারাঠীদের সঙ্গে এক চুক্তির ফলে পেশোয়া বালাজী রাও বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্বের 'চৌথ' আদায়ে করতে থাকেন। লুণ্ঠতরাজ যাদের পেশা তাদের চুক্তি মানার প্রশ্ন ওঠেনা। ফের লুঠতরাজ আরম্ভ হয় মার্চ, ১৭৪৪ খ্রীঃ। মারাঠী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে সন্ধি করার নামে, আলিবর্দী খান তাঁর নিজের তাঁবুতে নিমন্ত্রিত করে, হত্যা করেন। প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ আক্রান্ত হয় [১] ২১ ডিসেম্বর, ১৭৪৫ খ্রীঃ। আলিবর্দী ৭৪ বছর বয়সে স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে রঘুজী ভোঁসলেকে কাটোয়ার যুদ্ধে পরাস্ত করেন মার্চ, ১৭৪৭ খ্রীঃ। বাংলায় বর্গীর আক্রমণের পালা শেষ হল না, উড়িষ্যা ও মেদিনীপুর মারাঠাদের অধিকারে থাকে। পরে আবার নবাব আলিবর্দী মারাঠীদের একাধিকবার আক্রমণ প্রতিহত করতে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন। তাঁকে শেষ যুদ্ধ করতে হয়েছিল ৬ মার্চ, ১৭৫০ খ্রীঃ। অবশেষে মে, ১৭৫১ খ্রীঃ এক শান্তি চুক্তিতে চৌথ-এর দেয় অংশ নির্ধারিত হয় ও বাংলায় শান্তি ফিরে আসে। বর্গীর হাঙ্গামা তথা মারাঠী সৈন্যদের অমানুষিক অত্যাচার, বাঙালীর চোখে মারাঠীদের গৌরবময় ইতিহাসে এক কলঙ্কিত অধ্যায়।

বাংলায় ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ)

আঠারো শতকের তৃতীয় ভাগে বাংলায় ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সরকার সুপ্রতিষ্ঠিত। ১২ আগষ্ট, ১৭৬৫ খ্রীঃ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা পাওয়ার শর্তে, কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকার

১। বর্গীদের আক্রমণে মেদিনীপুর, বীরভূম, হুগলী ও বর্ধমান জেলার অধিকাংশ গ্রামগুলির মানুষ ভীষণভাবে অত্যাচারিত হয়েছিল, স্থানীয় রাজা-জমিদারদের সংগঠিত বাধা দান সত্ত্বেও।

২। সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতায় ইংরাজ বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও বসতি রক্ষার উদ্দেশ্যে কোম্পানীর সাহেবরা ও স্থানীয় বাসিন্দাদের চাঁদার টাকায় (২৫,০০০ টাকা) উত্তর কলকাতায় 'মারাঠা ডিচ্' নামে খালটি কাটা হয়েছিল।

লাভ করে। অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব কোম্পানীর উপর বর্তায়। তাছাড়া রবার্ট ক্লাইভ বাংলার নবাবকে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা দেওয়ার বিনিময়ে রাজস্বের সব অধিকারও নিজের হাতে গ্রহণ করেন। এই শাসন-ব্যবস্থার (দ্বৈত শাসনের) ফলে নবাবের উপর ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানীর হাতে দায়িত্বহীন সম্পূর্ণ ক্ষমতা এসে যায়। রবার্ট ক্লাইভের পরে ভেলেরেস্ট ও কার্টিয়ার সাহেব ইংরাজ কোম্পানীর গভর্নর, আর নবাব সৈইফ্-উদ্-দৌলা বাংলার নাম-সর্বস্ব নবাব (১৭৬৬-৭০ খ্রীঃ)।

বাংলার রাজস্ব আদায়ের ভার নায়েব সুবাদার **মহম্মদ রেজা খানের** হাতে। ইংরাজদের খুশী করতে ও নিজের ক্ষমতা প্রতিপন্ন করার তাগিদে, তিনি প্রজা ও জমিদারদের ওপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। এমনকি, তাঁদের পরিবারের স্ত্রীলোকদের কাছারিতে এনে শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। এই অত্যাচারের ইন্ধন জোগাতে নশীপুরের কুখ্যাত জমিদার **রাজা দেবীসিংহ** ও পরে কান্দীর **গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ** বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। তাঁদের অকথ্য পীড়নের নিদারুণ কাহিনীর বর্ণনা পাওয়া যায় মহামতি **এডমণ্ড বার্ক** সাহেব ও পরে অন্যান্য সরকারী রিপোর্টে। সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এ বিষয়ে তাঁর গ্রন্থে একাধিকবার উল্লেখ করেছেন।

খাজনা আদায়ের নামে প্রজা ও ছোট জমিদারদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের (অভূতপূর্ব খরা) সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল ১১৭৬ সনের ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ। বাংলার সর্বহারা মানুষ খাদ্যাভাবে রোগগ্রস্থ হয়ে মৃত্যুর কবলে পড়ে। তৎকালীন সরকারী তথ্যে ও ইতিহাসের পাতায় বলা হয়েছে যে, দুর্ভিক্ষের সময় বাংলার প্রায় একতৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর জের কমপক্ষে বিশ বছরেরও বেশী স্থায়ী ছিল। শস্য-শ্যামলা বাংলায় সর্বত্র শ্মশানের দৃশ্য। সমৃদ্ধ লোকালয়ের একতৃতীয়াংশ জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বর্ণনায় দুর্ভিক্ষের চিত্র তুলে ধরা হল, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায় "বাংলার দুরাবস্থা কল্পনা ও বর্ণনার অতীত— এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, বহুস্থানে মৃতের মাংস খাইয়া লোকে জীবন-ধারণের চেষ্টা করিয়াছে"—বাংলা দেশের ইতিহাস। আর এক বিদেশীর লেখায় আছে—"এই দুরবস্থার সুযোগে কোম্পানীর অসাধু কর্মচারী ও আশ্রিত ব্যবসায়ীরা চাল কিনে মজুত করে রেখেছিলেন চড়া দামে বিক্রী করার উদ্দেশ্যে। ফলে গরীবদেরই অন্নকষ্টে মারা পড়তে হয়'। কিন্তু সমকালীন সরকারী নথিতে মন্বন্তরের প্রথম বছরে চালের দাম নাকি পাঁচ শতাংশ হ্রাস করা হলেও, পরের বছর দশ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। তখন নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষের প্রাধান্য বেড়েই ছিল, কমেনি। চালের দাম টাকায় তিন মণ থেকে তিন সের।

জন শোর (পরে লর্ড টেইনমাউথ), সহকারী 'মুর্শিদাবাদ কাউন্সিল' লিখেছেন—

"Still fresh in Memory's eye the scene I view
The shrivelled limbs, sunk eyes and lifeless hue ;
Still hear the mother's shrieks and infant's moan
Cries of despair and agonising groans lie ;
In wild confusion dead and dying
Hark to the jackal's yell and vulture's cry,
The dogs fell howl, as admist the glare of the day
They riot unmolested on their prey ;
Dire scenes of horror which no pen can trace
Nor rolling years from memory's page efface." ১

প্রচলিত গ্রাম্য গাথা—

'নদ-নদী খাল বিল সব শুকাইল,
অন্নাভাবে লোক সব যমালয়ে গেল ॥
দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
দেশ ছারখার হল রেজাখাঁর ভয়ে ॥
একচেটে ব্যবসা, দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর ॥
পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে ॥'

মিঃ রিচার্ড বেচার, কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী, ২৪ মে, ১৭৬৯ খ্রীঃ বিলাতে কর্তৃপক্ষকে লিখেছিলেন—"কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের ফলে প্রজাসাধারণের যেরূপ দুর্দশা হইয়াছে ইহার পূর্বে কখনও সেইরূপ হয় নাই। বহু স্বেচ্ছাচারী নবাবের আমলেও যে দেশ অতুল সুখ ও সম্পদের অধিকারী ছিল, তাহা ধ্বংসের সীমানায় পৌঁছাইয়াছে।"

বীরভূমের সুপারভাইজার মিঃ হিগিন্‌সন, ফেব্রুয়ারী, ১৭৭১ খ্রীঃ তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন—"Truly concerned am I to acquaint you that the bad effects of the last famine appear in these places beyond description—dreadful ; many hundreds of villages are entirely de-

১। Annals of Rural Bengal by W. W. Hunter.

populated; and even in the large towns there are not a fourth part of the houses inhabited." ১

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ মর্মান্তিক বর্ণনা বিশদভাবে লেখা আছে W. W. Hunter রচিত 'Annals of Rural Bengal' রিপোর্টে—"In the cold weather of 1769, Bengal was visited by a Famine whose ravages two generations failed to repair" ..."When the British undertook the direct management of the District-nearly 24 years after the famine, they found the jail filled with revenue prisioners.... Considerable portions of the districts had turned into dense jungles, infested with wild and dangerous animals."

তৎকালীন সরকারী রিপোর্টে দুর্ভিক্ষের ব্যাপক হাহাকারে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় **ত্রাণ সাহায্যের** ঝুলিতে নগদ অর্থ সাহায্যের তালিকা ছিল—মহামান্য ইংরাজ কোম্পানী ৪০,০০০ টাকা; নবাব নাজিম মুবারক্-উদ্-দৌলা ২১,০০০ টাকা; দেওয়ান রেজা খান ১৫,২৫০ টাকা; রাজা রায় দুর্লভ ৬,০০০ টাকা; জগৎশেঠ খোশাল চাঁদ ৫,০০০ টাকা। তুলনামূলকভাবে এই দানের পরিমাণ খুবই সামান্য, কোনোক্রমে মুখরক্ষা করা নির্লজ্জ হৃদয়হীনতার পরিচয়। অথচ দুর্ভিক্ষের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় জমিদাররা (নাটোর, কাশিমবাজার, নাড়াজোল, বর্ধমান প্রভৃতি) সম্ভাব্য সব রকম সাহায্য করতে দ্বিধাবোধ করেননি। কোম্পানী ত্রাণ-তহবিলে দ্বিতীয় দফায় দেন ৬৫,১৯৩ টাকা। সর্বসাকুল্যে সরকারী ও আধা-সরকারী দানের পরিমাণ ১,৫২,৪৪৩ টাকা। এটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে, ক্ষুধা মেটাবার ন্যূনতম প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু বাখরগঞ্জের মোটা চাল, মুর্শিদাবাদের কোষাগার থেকে আগাম ১,২৪,৮০৬ টাকা নিয়ে ন্যায্যমূল্যে বাজারে বিক্রির জন্যই কোম্পানী কিনেছিল। সব চাল বিক্রির পর দেখা গেল, কোম্পানীর মুনাফা হয়েছে ৬৭,৫৯৩ টাকা। এই হল মুনাফাখোর ইংরাজ কোম্পানীর ব্যবসায়ী চরিত্রের পরিচয়।

ভয়াবহ মন্বন্তরের ফলে সরাসরি আর একটি ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়েছিল **সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহের** সমুত্থানে। ইংরাজ কোম্পানী সরকার ও বড় বড় জমিদাররা ব্যতিব্যস্ত ও বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বুভুক্ষু হিন্দু-মুসলমান রাইয়তরা বিদ্রোহে যোগ দিয়ে লুটতরাজ ও রাহাজানিতে লিপ্ত হয়। মজনুশাহ্ ও ভবানী পাঠকের নেতৃত্বে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল—ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি অঞ্চলে। পরে বিদ্রোহ দমন হলেও, দেশে অশান্তি ও করাল

১। N. K. Sinha.—The Economic History of Bengal—Vol. II. 1962.

পরিবেশ অক্ষুন্ন ছিল বিশ বছর পর্যন্ত। তবে এটা নিশ্চিত যে, এই মন্বন্তর ইংরাজ কোম্পানীকে লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুতে ব্যথিত না করলেও, যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল রাজস্ব সংগ্রহের সমস্যায়।

মুর্শিদাবাদে নবাবশাহী আমলের পুরাকীর্তি

মুর্শিদাবাদ জেলাতেই প্রাচীন বাংলার প্রথম রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ আর আঠারো শতকে হল মুখসুসাবাদ (পরে মুর্শিদাবাদ), নবাব মুর্শিদকুলী খানের সৌজন্যে। এখানে সমাধি-সৌধ, মসজিদ, প্রাসাদ ও উদ্যান-বাটীগুলির মধ্যে রয়েছে নবাবশাহি আমলের আড়ম্বরপূর্ণ ঐতিহ্য। এই বিষয়ে একের পর এক নবাব-চরিত্রের বর্ণনাকালে কয়েকটি পাদটীকায় সংক্ষেপে কিছু বলা হয়েছে, এখন আরও কিছু জ্ঞাতব্য দেওয়া হল। সুবে বাংলার নবাব নাজিম সৈয়দ মুবারক্ আলি খান (হুমায়ুন জাহ্)-এর বসবাসের জন্য ইউরোপীয় আদলে (মূল পরিকল্পনা উইলিয়াম্ লক্) ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভাগীরথীর পূর্ব উপকূলে নবাব জমানার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য—সুবিশাল **হাজার দুয়ারী প্রাসাদ,** বাংলার দীর্ঘতম অট্টালিকা।[১] প্রাসাদের ভিত্তিস্থাপন হয়েছিল ১৮২৯ খ্রীঃ, প্রায় আট বছর যাবৎ ইংরাজ স্থপতি ডানকান্ ম্যাকলয়েড সাহেবের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ হয় ১৮৩৭ খ্রীঃ। এই প্রাসাদে বেগম-মহল না থাকায় নবাব নাজিম হুমায়ুন জাহ্ এখানে থাকেননি, পুরাতন প্রাসাদেই ছিলেন। কার্যতঃ এই বিশাল প্রাসাদটি ইংরাজ রাজ প্রতিনিধিদের সরকারী মন্ত্রণা ও আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল।

প্রাসাদের নীচের তলায় আছে তোষাখানা, মহাফেজখানা ও বহু ছোট বড় ঘর। একতলায় আছে দরবার হল, খাবার ঘর, বসবার ঘর আর বিলিয়ার্ড খেলার ঘর। দোতলায় বিখ্যাত নাচ ঘর ছাড়া সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার, চীনে-ঘর এবং কয়েকটি শয়নকক্ষ। প্রাসাদে ছিল বহু মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য-সামগ্রী, অলংকার, দেশ-বিদেশের তৈলচিত্র, পুরানো আমলের অস্ত্রশস্ত্র, বর্ম, এবং কোরানের প্রাচীন প্রতিলিপি ও ইসলাম্ সাহিত্যের গ্রন্থরাজি। প্রাসাদের নামের সঙ্গে হাজার দরজার সংখ্যা মিলিয়ে দেখা যায় মোট দরজার সংখ্যা নশোটি এবং বাকী একশো নকল। বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই প্রাসাদটিকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কার করে একটি জাতীয় সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারে পরিণত করেছেন।

নিজামত কেল্লার চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে ৬৮০ ফুট লম্বা বাংলার সবচেয়ে বড় **ইমামবাড়া**, ১৮৪৭ খ্রীঃ নবাব ফেরাদুন জাহ্-এর তৈরী। প্রায় দুই কি.মি. দূরত্বে দেখা

১। ভিন্নমতে হুগলী জেলায় চুঁচুড়ার পুরাতন 'ব্যারাক্' বাংলায় সবচেয়ে দীর্ঘ অট্টালিকা।

যাবে সুবৃহৎ কামান্ **জাহান কোষ**। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে সুবাদার ইসলাম খানের জমানায় জনার্দন নামে এক কর্মকারের দ্বারা ১৬৩৭ খ্রীঃ তৈরী।

নবাব মুর্শিদকুলী খানের আমলে তৈরী **'ত্রিপুলিয়া গেট'** [তোরণ] এবং নবাবেরই তৈরী **কাটরা মসজিদ** ও তাঁর নিজের কবর-স্থান। প্রায় সিকি মাইল দূরত্বে **'কদমরসুল-শরীফ'** মসজিদ—ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের পদচিহ্নে উৎসর্গীকৃত।

নাঙ্গতাখালি বা নাগিনাবাগে নবাব সরফরাজ খানের পুরানো প্রাসাদ। এখানে নবাব এবং তাঁর স্ত্রী ও মায়ের কবর আর **বেগম মসজিদ** দেখা যাবে। কাছে গঙ্গার ধারে **রোশনীবাগে** নবাব সুজা-উদ্-দীনের কবর (সমাধি-সৌধ)। সিরাজের হীরাঝিল প্রাসাদ ছিল মনসুরগঞ্জে, এখন স্থাপত্যের ধ্বংশাবশেষেরও অস্তিত্ব নেই।

হাজার দুয়ারী প্রাসাদ থেকে দেড় মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে **মতিঝিল** (মুক্তা সরোবর)। এখানে মনোরম প্রাসাদ ও ঝিল তৈরী হয়েছিল নবাব আলিবর্দীর কন্যা ও নবাব দরবারে বিতর্কিত চরিত্রের ধনশালিনী ঘসেটি বেগমের জন্য। নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

এই মতিঝিলের প্রাসাদে (বর্তমানে ভগ্নপ্রায়) মে, ১৭৬৬ খ্রীঃ, লর্ড ক্লাইভ নবাব নাজিম নজম্-উদ্-দৌলার দক্ষিণে দেওয়ানের আসনে বসেন এক আড়ম্বরপূর্ণ সমাবেশে। এর পরের বছর ইংরাজ কোম্পানীর গভর্নর ভেলেরেস্ট সাহেব নবাব সৈইফ্-উদ্-দৌলার পাশে বসে আর একটি সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। মতিঝিলের পূর্বদিকে নবাব মুবারক-উদ্-দৌলার প্রাসাদ **মুবারক্ মঞ্জিল**—নবাবদের সময়ের এক অতীব সুসজ্জিত প্রমোদ উদ্যান।

মতিঝিল থেকে প্রায় ১ কি. মি. পশ্চিমে গঙ্গার ওপারে **'খোসবাগ'**। এখানে নবাব আলিবর্দী ও তাঁর বেগম এবং কন্যা আমিনা বেগম আর নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ও তাঁর বেগম লুৎফ উন্নেসার কবর আছে।

হাজার দুয়ারী প্রাসাদের ১ কি. মি. উত্তরে **'জাফরগঞ্জ'**। এখানে একটি পুরানো মসজিদ ছাড়া, অধিকাংশ নবাবদের (মীরজাফর থেকে হুমায়ুন জাহ্ পর্যন্ত) এবং মীরজাফরের স্ত্রী মণি বেগম ও অন্যান্য বেগমদের কবর দেখা যাবে। নবাব মীরজাফরের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ এখনও পড়ে আছে। এক সময়ে এই প্রাসাদে ইংরাজদের সঙ্গে (মিঃ ওয়াটস্) মিরজাফরের ষড়যন্ত্রের চক্রান্ত ও নবাব সিরাজের নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। এই জন্য এই প্রাসাদের নাম নেমকহারামী দেউড়ী।

মুর্শিদাবাদ-বহরমপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নবাবদের তৈরী বা তাঁদের নামে উৎসর্গীকৃত স্থাপত্যের নিদর্শনগুলি ছাড়াও, রয়েছে বেশ কয়েকটি দেশীয় রাজাদের দর্শনীয়

অতীত-গৌরবের সাক্ষী-প্রাসাদগুলি। মুর্শিদাবাদ শহর (লালবাগ) থেকে উত্তরে গঙ্গার পশ্চিম তীরে **বড়নগর,** সড়কপথে ২৩ কি. মি. দূরত্বে অবস্থিত। বড়নগর মুর্শিদাবাদের বারাণসী। একদিন এই স্থান ছিল দেবমন্দিরে পরিপূর্ণ। খ্রীষ্টীয় সাতরো শতকের শেষ ভাগে বড়নগর, রাজা উদয়নারায়ণ-এর সুবিস্তৃত রাজসাহী জমিদারীর রাজধানী ছিল। প্রাতঃস্মরণীয়া **রাণীভবানী**[১] এখানে তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন। বড়নগরের প্রায় সব মন্দিরগুলি আপাত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে অথবা গঙ্গার ভাঙ্গনে অবলুপ্ত, তা সত্ত্বেও বড়নগরের প্রসিদ্ধ প্রাচীন দেবী **কিরীটেশ্বরী-মন্দির** আজও ভগ্নাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন মূর্তি নেই। একটি বেদীতে রয়েছে এক খণ্ড বিশাল পাথরের উপর উৎকীর্ণ নানাবিধ শিল্পকর্ম ও দেবীর কেবল মুখাবয়ব। মন্দির সংলগ্ন শিবমন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরে তৈরী ভৈরব মূর্তি। কিরীটেশ্বরী দেবীর মাহাত্ম্য ফার্সী গ্রন্থ 'শৈইর মুতাক্ষরীণ' থেকে জানা যায় যে, রাজা নন্দকুমার নবাব মীরজাফরকে মৃত্যুশয্যায় দেবীর চরণামৃত খাইয়েছিলেন তাঁর আরোগ্য কামনায়। প্রথমে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ দেবীর মন্দির সংস্কার করেছিলেন, পরে কাশীমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীও সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন।

বড়নগরের ২ কি. মি. পরিধির মধ্যে **আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জে** রয়েছে বেশ কয়েকটি জৈন-মন্দির। বড়নগর থেকে মুর্শিদাবাদ[২] ফেরার পথে দেখা যাবে **নসীপুরের বিশাল রাজবাড়ী।** শ্রীহীন রাজবাড়ীতে বর্তমানে বেশ কয়েকটি দেব-দেবীর নিত্যপূজা হয়ে থাকে, দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ে। মুর্শিদাবাদ থেকে বহরমপুর সড়ক পথে ৭ কি.মি.। বহরমপুর থেকে প্রাচীন শহর **কাশিমবাজার** (শ্রীপুর) ২ কি. মি.। কাশিমবাজারের **নন্দী রাজপরিবারের প্রাসাদোপম অট্টালিকা** অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। গৃহদেবতার নিত্য পূজা হয়। এই কাশিমবাজারেই দেখা যাবে ব্রাহ্মণ-বংশীয় **রায় রাজপরিবারের সুবৃহৎ রাজভবন।** অশীতিপর রাজা কমলারঞ্জন রায় মাঝে মাঝে কলকাতা থেকে এসে এখানে বসবাস করেন। দুর্গাপূজা, কালীপূজা ও অন্যান্য পূজা-পার্বণে নিজে উপস্থিত থাকেন। কাশিমবাজারে **নেমিনাথের জৈন মন্দির, বিষ্ণুপুর কালীবাড়ী ও আর্মেণীয় গির্জা** দ্রষ্টব্য। বহরমপুর শহরের মধ্যেই রয়েছে **কুঞ্জঘাটায়** (সৈদাবাদ) **মহারাজা নন্দকুমারের বাস-ভবন।** বাড়ীটি জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হলেও, একটি অংশে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত বহরমপুর জেলা-লাইব্রেরী। বংশধরদের কয়েকজন এখানে বাস করেন। বহরমপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিম তীরে **কান্দীতে সিংহ রাজপরিবারের রাজপ্রাসাদ,** সড়ক পথে দূরত্ব ৩০ কি. মি.। মুর্শিদাবাদ থেকে **পলাশীর** যুদ্ধক্ষেত্র (আমবাগান) সড়কপথে ৫৩ কি. মি.। এখানেই নবাব সিরাজের পরাজয়ে ভারতের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটে আর বিজয়ী রবার্ট ক্লাইভ হন **'Baron of Plassey'।**

১। 'নাটোরের রায় রাজপরিবার' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ রেলপথে ১৯৭ কি. মি.।

জগৎশেঠ রাজপরিবার

মুর্শিদাবাদ

ইতিহাসের পাতায় জগৎশেঠদের বংশ-পরিচয়ে, প্রথম যে কয়েকটি লাইন বিদেশীদের লেখাতে পাওয়া যায়, তাতে তাঁদের জীবন কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। **'The rupees of the Hindu banker, equally with the sword of the English colonel contributed to the overthrow of the Mahamedan power in Bengal'**। বাংলার ধন-কুবের শেঠরা সারা ভারতের রাজনীতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের পুরোধা। বাদ্‌শা-নবাবদের ভালো-মন্দ কপাল নিয়ন্ত্রণ-কর্তা। নবাব মুর্শিদকুলী খানের (১৭০৩—২৭ খ্রীঃ) ভাগ্য-লক্ষ্মী তাঁদের দৌলতে স্থায়ী হয়েছিল ২৭ বছর। আবার তাঁদেরই তীব্র বিরোধিতায় নবাব সরফরাজ খান এক বছরও গদী রক্ষা করতে পারেননি। গিরিয়ার যুদ্ধে (১৭৪০ খ্রীঃ) নবাব আলিবর্দী জয়ী হলেন তাঁদের কৃপায়। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে শেষ করলো তাঁদেরই টাকার খেলায় নীচ চক্রান্ত। ইংরাজ কোম্পানী এবং পরবর্তী নবাব ও জমিদাররা তাঁদের কৃপাধন্য।[১]

রাজনীতিতে ন্যায়-অন্যায়ের কোন স্থান নেই। মা লক্ষ্মীর বর-পুত্র হয়েও, তাঁরা যে তীক্ষ্ণ দূরদর্শিতা ও কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে উচ্চ প্রশংসার দাবী রাখে। ১৬৫২ খ্রীঃ, প্রায় ৩৪০ বছরের আগেকার কথা। যোধপুরে (রাজস্থান) নৌগর শহরের বাসিন্দা শেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের মাড়োয়ারী **হীরানন্দ সাহু** (পিতার দেওয়া সার্থক নাম) পাটনায় এসেছিলেন তাঁর ভাগ্য ফেরাতে। ইতিহাসে কিংবদন্তীর স্থান হয়তো কিছুটা আছে। অতএব হীরানন্দের ধনরাশি প্রাপ্তির অলৌকিক একটি ঘটনা হয়ত শেঠদের ধন-কুবের করেছিল।[২]

নগরশেঠ মানিকচাঁদ

হীরানন্দ পাটনায় ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা করে ধনবান্ হন। তাঁর সাত চাঁদ পুত্র—মানিক, গোলক, নামক, আমীর, সদানন্দ, গোবর্দ্ধন ও দীপ। কন্যা ধনবাই। জ্যেষ্ঠ পুত্র মানিকচাঁদকে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকায় তাঁর গদীতে বসিয়ে হীরানন্দ শান্তিতে মারা গেলেন ১৭১১ খ্রীঃ। সেই সময় দিল্লীতে মোগল সম্রাট যথাক্রমে ঔরঙ্গজেব ও প্রথম বাহাদুর শাহ্ (১৭০৭—১২ খ্রীঃ)। আর তাঁর পুত্র আজিম-উস্-খান

১। ফার্সী গ্রন্থ—'রিয়াজুস্ সালাতীন' এবং 'শেইর মুতাক্ষরীণ'-এ উল্লেখ আছে।

২। জগৎশেঠ—নিখিল নাথ রায়, ১৩৮৯ সন।

বাংলার সুবাদার। বাংলার দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান সুবাদারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে, ঢাকা থেকে মুখসুসাবাদে (মুর্শিদাবাদ) রাজধানী সরিয়ে আনেন ১৭০৪ খ্রীঃ। মুর্শিদকুলী শেঠদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের হাতে তুলে দেন ও বাংলার শাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব নিজের হাতে নেন।

সম্রাট ফারুকশিয়ার (১৭১৩—১৯ খ্রীঃ)-এর কৃপা-দৃষ্টিতে নগরশেঠ মানিকচাঁদের ভাগ্য প্রসন্ন হল একই সঙ্গে। পেলেন পোদ্দারী আর তবিলদারী। নবাব থেকে শুরু করে ছোট বড় সব জমিদাররা শেঠদের আশ্রয়-প্রার্থী। টাকার প্রয়োজন সকলেরই। ব্যবসায়ী ইংরাজরাও শেঠদের কাছে বহুবার হাত পেতেছেন। ইতিমধ্যে শেঠরা নূতন বাসস্থানে চলে আসেন মুর্শিদাবাদে—ভাগীরথীর পূর্ব-তীরে মহিমাপুর অঞ্চলে। মানিকচাঁদ পাকা ব্যবসায়ী, রাজনীতি বোঝেন, কিন্তু সেদিকে তত মাথা ঘামান না। তার পরামর্শে নবাবের আজ্ঞায় ঢাকা থেকে ট্যাঁকশালকে উঠিয়ে আনা হল মুর্শিদাবাদে যদিও তখন কর্তা ছিলেন রঘুনন্দন। ১৭১৭ খ্রীঃ রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর শেঠরাই ট্যাঁকশালের দায়িত্ব পান।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ

মানিকচাঁদ অপুত্রক হওয়ায় দত্তক নেন ভগিনেয় ফতেচাঁদকে। মানিকচাঁদ মারা যান ১৭১৪ খ্রীঃ। ফতেচাঁদ মুর্শিদকুলী খানের অন্তরঙ্গ ও বিশ্বাস-ভাজন। ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে কাশিমবাজার কুঠী ও ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্ত আলাপ-আলোচনা ও শেষে চুক্তি-পত্রেও, তিনি নবাবের প্রতিভূ হিসাবে দস্তখত্ করতেন। ১৭২২ খ্রীঃ সম্রাট মহম্মদ শাহ্ (১৭১৯—৪৮ খ্রীঃ) ফতেচাঁদকে 'জগৎশেঠ' উপাধি দেন।[১] ১৭২৭ খ্রীঃ মুর্শিদকুলী খানের পর নবাব সুজাউদ্দীন বাংলার সুবাদার হন। সুজাউদ্দীন জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, প্রধান মন্ত্রী হাজী মহম্মদ ও রায়রায়ান আলমচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্যশাসন করতেন। সুবাদার নবাব আলিবর্দী ১৭৪০ খ্রীঃ বাংলার মসনদে বসেন। ফতেচাঁদের প্রতিপত্তি চরমে ওঠে। ট্যাঁকশালে টাকা তৈরীর ব্যাপারে ইংরাজ বণিক কোম্পানীকে ফতেচাঁদের কাছে অনেকবার আসতে হয়েছে, কারণ তিনি দেশের মুদ্রা ও অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ-কর্তা। মারাঠী বর্গীদের 'চৌথ'-এর বড় অংশ শেঠদেরই দিতে হয়েছিল বারে বারে (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ)।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদের সম্বন্ধে সমকালীন ঐতিহাসিক বিবরণ—'শেইর মুতাক্ষরীণ'-এ

১। এই উপাধি দানের সুপারিশ করার জন্য মুর্শিদকুলী ফতেচাঁদের কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা আদায় করতে ভুলে যাননি।

লেখার ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হল। "Their riches were so great that no such bankers were ever seen in Hindusthan or Deccan"

জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদ

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মারা যান ২৬ ডিসেম্বর, ১৭৪৪ খ্রীঃ। ফতেচাঁদের তিন পুত্র—আনন্দচাঁদ, দয়াচাঁদ, ও মহাচাঁদ। তাঁর জীবদ্দশায় আনন্দচাঁদ ও দয়াচাঁদ মারা যাওয়ায়, আনন্দচাঁদের পুত্র মহাতপচাঁদ ও দয়াচাঁদের পুত্র স্বরূপচাঁদ, দুজনকেই দত্তক নেন ফতেচাঁদ। সম্রাট মহম্মদ শাহ্ মহাতপচাঁদকে 'জগৎশেঠ' আর স্বরূপচাঁদকে 'মহারাজা' উপাধি দেন ১৭৪৮ খ্রীঃ। আলিবর্দীর সঙ্গে শেঠদের সুসম্পর্ক বরাবর বজায় ছিল। ইংরাজ কোম্পানী মনে মনে শেঠদের উপর অসন্তুষ্ট থাকলেও, প্রকাশ্যে তেমন কিছু দেখাননি। নবাবের ট্যাকশাল শেঠদের করতলগত হওয়ায়, কোম্পানী বহুবার অসুবিধায় পড়েছে। নবাবের কাছে অভিযোগও করেছে। তা সত্ত্বেও শেঠরা ও ব্যক্তিগতভাবে ইংরাজ বণিকরা, নিজেদের মধ্যে আমদানী-রপ্তানীর ব্যবসায় অংশীদার ছিলেন।

১০ এপ্রিল, ১৭৫৬ খ্রীঃ নবাব আলিবর্দী মারা যাবার পূর্বে, ভাবী নবাব সিরাজকে শেঠদের পরামর্শ মত কাজ করতে সচেষ্ট হতে বলেছিলেন। কিন্তু সিরাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্যেরবশে শেঠদের যোগ্য মর্যাদা দেননি। সিরাজের ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, দিল্লী সম্রাটের কাছ থেকে তাঁর প্রাপ্য 'নবাব' উপাধি ও খিলাৎ এই শেঠদের জন্যে বিলম্বিত হয়েছিল। সিরাজের হুকুম মত শেঠরা জমিদার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত তিন কোটি টাকা আদায় না করায়, সিরাজ নাকি জগৎশেঠ মহাতপচাঁদের উপর শারীরিক নির্য্যাতন করতে ছাড়েননি। শেঠরা এই অযৌক্তিক হুকুম ও অপমান এবং নিজেদের স্বার্থ প্রণোদনে, বেশ কয়েকজন রাজপুরুষ, ও জমিদার এমনকি, ক্লাইভ সাহেবের বণিকবৃন্দের সঙ্গে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে [১] লিপ্ত হয়েছিলেন। নবাব মীরকাশিমের আদেশে ঘাতকের হাতে জগৎশেঠ মহাতপচাঁদ ও মহারাজা স্বরূপচাঁদের মৃত্যু হয় অক্টোবর, ১৭৬৩ খ্রীঃ।

জগৎশেঠ খোশালচাঁদ ও মহারাজা উদয়চাঁদ

মহাতপচাঁদ ও স্বরূপচাঁদের—দুই জ্যেষ্ঠ পুত্র, খোশালচাঁদ ও উদয়চাঁদ ১৭৬৬ খ্রীঃ

১। ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ সেন, কৃষ্ণদাস, রাজা দুর্লভরাম, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ (আমীর চাঁদ), মীরজাফর, ঘসেটী বেগম ও ইয়ার লতিফ খান প্রমুখ ব্যক্তিদের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাদশা শাহ্ আলমের কাছ থেকে যথাক্রমে 'জগৎশেঠ' ও 'মহারাজা' উপাধি পান। ইংরাজ বণিকদের দেওয়ানী লাভের পরে (১২ আগষ্ট, ১৭৬৫ খ্রীঃ) নবাব মীরজাফর ও মীরকাশিমের জমানায় শেঠদের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে পড়ে। দেশের অর্থ নৈতিক বিপর্যয়—১৭৭০ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ ও বিশেষ করে ট্যাকশালের দায়িত্ব কোম্পানীর হাতে ন্যস্ত ও রাজস্ব বিভাগ (খালসা) কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে শেঠদের আধিপত্য শেষ হয়। শেঠদের আবেদনে ক্লাইভ ও পরে হেস্টিংস্ জগৎশেঠ খোসালচাঁদকে কোম্পানীর 'সরফ্' (গদীয়ান) পদে নিযুক্ত করেন। খোশালচাঁদ মিতব্যয়ী ও ধার্মিক পুরুষ। তিনি শেতাম্বর জৈনদের পীঠস্থান পরেশনাথে মন্দির ও ধর্মশালা প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। মুর্শিদাবাদে মহিমাপুরে তিনি দুটি জৈন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন। মারা যান ১৭৮৩ খ্রীঃ। অপুত্রক হওয়ায় দত্তক নেন ভ্রাতুষ্পুত্র **হরকচাঁদকে**। তাঁকে 'জগৎশেঠ' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। মারা যান ১৮১৪ খ্রীঃ।

হরকচাঁদের দুই পুত্র—**ইন্দ্রচাঁদ** ও **বিষাণচাঁদ**। ইন্দ্রচাঁদ ইংরাজদের কাছ থেকে 'জগৎশেঠ' উপাধি পান। তিনি শেষ 'জগৎশেঠ' উপাধিধারী। ইন্দ্রচাঁদ অকালে মারা যান ১৮৪০ খ্রীঃ। তাঁর পুত্র **গোবিন্দচাঁদ**[১] ইংরাজ সরকারের বৃত্তিভোগী (মাসিক ১২০০ টাকা) হলেন ১৮৪৩ খ্রীঃ। তাঁর দত্তক পুত্র **গোলাপচাঁদ** সামান্য বৃত্তিভোগী হয়ে দুঃখ-দৈন্যের মধ্য দিয়ে জীবন কাটান। মারা যান ১৮৬৪ খ্রীঃ। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে ফতেচাঁদ ও উদয়চাঁদের প্রপৌত্রদের অনেকেই এখন মুর্শিদাবাদের গ্রামে-গঞ্জে বাস করেন। গোলাপচাঁদের ইংরাজ সরকারের কাছে বারংবার অর্থ সাহায্যের আবেদনে কোন কাজ হয়নি। ৮ জুন, ১৮৯২ খ্রীঃ এক পত্রে মুর্শিদাবাদের কলেক্টর এফ. আর. স্টানলে লিখেছেন গোলাপচাঁদকে—**"Govt. of India is unable to accede to his request for the grant to him of a pension of Rs. 1200 a month."**

ধন্য-কুবের জগৎশেঠ-বংশের মহিমাপুরের বাস্তুভিটায় প্রসাদোপম বাসভবন ও বিস্তৃত এলাকার অধিকাংশ ভাগীরথীর গর্ভস্থ হওয়ায়, বাকী অংশের বিক্ষিপ্ত ভগ্নাবশেষ ছাড়া, শেঠদের ঠাকুরবাড়ী—গোবিন্দদেবের মন্দির, (জৈন শেঠদের উত্তর-পুরুষরা অনেকেই বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রিত হন) দেখতে অনেকেই আসেন, কিন্তু অজান্তে দীর্ঘশ্বাস নিশ্চয়ই পড়ে।

১। ডিসেম্বর, ১৮৪৪ খ্রীঃ মৃত্যু হয়।

মহারাজা নন্দকুমার

মুর্শিদাবাদ

ইতিহাসের পাতায় যে কয়েকটি বিতর্কিত চরিত্র—সে রাজাই হোন বা আমলাই হোন—দেখা যায়, তার মধ্যে মহারাজা নন্দকুমার অন্যতম। এ বিষয়ে বেশ কয়েকজন দেশী বিদেশী জীবনীকারদের লেখনী-প্রসূত পরস্পর-বিরোধী সমালোচনাগুলির কিছু অংশ উল্লেখ করা হয়েছে।[১] আজ থেকে প্রায় দুশো চল্লিশ বছর আগে বাংলার বিষময় রাজনৈতিক পরিবেশ ও লোকচরিত্র, নন্দকুমারের উত্থান ও পতনের জন্য কতটা দায়ী, তা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। তাঁর নিজের কুকর্ম বা বিশ্বাসঘাতকতা যতই থাক, তিনি বঞ্চক ইংরাজ বণিকদের সম্পূর্ণভাবে না চিনে—তাঁদের সাহায্য করতে গিয়ে অন্যায়ের পথ নিয়েছিলেন। তাঁর ভুলের মাশুল তিনি গুনেছিলেন ফাঁসীর আসামী হয়ে।

মুর্শিদাবাদে জঙ্গীপুরে জারিতল (জরুল) গ্রামে নৈকষ্য কুলীন রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ নন্দকুমারের পিতৃপুরুষের বাস। নন্দকুমারের প্রপিতামহ রামগোপাল রায়, তাঁর শ্বশুরবাড়ী ভদ্রপুরে (বর্তমান বীরভূম জেলায়) চলে আসেন। তাঁর পৌত্র পদ্মনাভের পুত্র বংশতিলক মহারাজা নন্দকুমারের জন্ম হয় ভদ্রপুরে (ভাদুর)[২] আনুঃ আঠারো শতকের প্রথম দশকে (১৭০০-০৫ খ্রীঃ)। জন্ম-ভিটাটি এখনও ভগ্নাবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে।

পদ্মনাভ নবাব মুর্শিদকুলী খানের সরকারের অধীনে রাজস্ব বিভাগের কর্মী ছিলেন।

১। (i) Malleson—Life of Warren Hastings—P 212.

(ii) Mills—History of British India, Vol. III. P. 640.

(iii) Walsh—History of Murshidabad District.—P. 223.

(iv) Orme—Indostan, Vol. II. P. 194.

(v) Burke—Impeachment of Warren Hastings.

(vi) মহারাজা নন্দকুমার চরিত—সত্য শাস্ত্রী, ১৩০৫ সন।

(vii) মুর্শিদাবাদ কাহিনী—নিখিলনাথ রায়।

(viii) মহারাজা নন্দকুমার—চণ্ডীচরণ সেন, ১৩৮৭ সন।

২। ভদ্রপুরের লোকপ্রিয় নাম 'ভাদুর'—নন্দকুমারের লক্ষাধিক ব্রাহ্মণ ভোজনের স্তুতি—

'ভাদুরের নন্দকুমার। লক্ষ বামুন করলে শুমার।

কেউ খেলো মাছের মুড়ো। কেউ খেল থন্দুকের হুড়ো।'

তিনি চাকরীরত অবস্থায় যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। পিতার সান্নিধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন নন্দকুমার কৈশোরেই রাজস্ব বিষয়ে বিশেষ তালিম পান। পরে নবাব আলিবর্দীর শাসনকালে হিজলী ও মহিষাদলে আমীনের পদে নিযুক্ত হন। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি পাওয়ার জন্য তাঁকে বেশ কিছু বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। একটি দলিলে দেখা যায় যে, সম্ভবত ১৭৪৯ খ্রীঃ নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা তাঁর চাহিদামত অর্থ না পাওয়ায়, নন্দকুমার কে প্রহার করেছিলেন। পরে অবশ্য সব ঠিক হয়ে যায়। তাছাড়া, নন্দকুমারের প্রচুর অর্থাগম হওয়ায়, তিনি ৯ ডিসেম্বর, ১৭৫০ খ্রীঃ ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সাতান্ন হাজার টাকা ধার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফৌজদার ইয়ারবেগ খাঁ নন্দকুমারকে হুগলীর দেওয়ানী পদে বসিয়ে ছিলেন।

১১ এপ্রিল, ১৭৫৬ খ্রীঃ নবাব হলেন সিরাজ-উদ-দৌলা। দেওয়ান নন্দকুমারকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার জন্য হুগলীর গুরুত্বপূর্ণ ফৌজদারের পদে নিযুক্ত করেন। এ বিষয়ে সকলেই সাধারণভাবে একমত যে, নন্দকুমার নবাবের শত্রুপক্ষ ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে সব সময় গোপনে যোগাযোগ রেখেছিলেন। নবাবের আদেশ সত্বেও, নন্দকুমার, রাজা দুর্লভরাম ও বর্ধমানের মাণিকচাঁদ ২৩ মার্চ, ১৭৫৭ খ্রীঃ চন্দননগরে ফরাসী বণিকদের ইংরাজদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ সাহায্য করেননি। সিরাজের প্রতি রাজা নন্দকুমারের বিশ্বাসঘাতকতার এটাই প্রথম নিদর্শন।

পলাশীর যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ইতিহাসের কলঙ্কিত বিশ্বাসঘাতকতার চরম নজীরের সৃষ্টি হয়েছিল অপরাহ্ন, ২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ। অবশ্য এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়েছিল সিরাজ-উদ্-দৌলার নবাব মসনদ কায়েম করার সঙ্গে সঙ্গে। নন্দকুমার প্রথম পর্যায় ষড়যন্ত্রকারীদের [১]অন্যতম না হলেও, পরে তিনি নিশ্চয়ই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। পলাশীর সম্মুখ সমরে ষড়যন্ত্রের নায়ক ছিলেন সেনাধক্ষ মীরজাফর, দুর্লভরাম, ইয়ার লতিফ আর পরোক্ষে নন্দকুমার ও তাঁর সহযোগীর।[১] ২৪ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ মীরমহম্মদ জাফর আলি খান বাংলার নবাব। ইংরাজ বণিক কোম্পানী ১৭৬৫ খ্রীঃ বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের ফলে, দেশের শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব এড়িয়ে, রাজস্ব ও ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নেন। কর্ণেল রবার্ট ক্লাইভের বিশেষ বিশ্বাসভাজন নন্দকুমার। ক্লাইভ ও ইংরাজ বণিকদের কাছে তিনি '**ব্লাক কর্ণেল**' পোষা নামে পরিচিত। ১৯ আগষ্ট, ১৭৫৮ খ্রীঃ নন্দকুমার নবাব মীরজাফরের খাস্ দেওয়ান। লর্ড ক্লাইভের বিশেষ সুপারিশে দিল্লীর দরবার থেকে 'নসীর-উদ্দৌলা-সবৎজঙ্গ বাহাদুর, আবৎ-উল্-মুলক্'

১। চক্রীদের মধ্যে মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব, জগৎ শেঠ মহতপচাঁদ, রাজা মাণিকচাঁদ, মহারাজা মহতবচাঁদ ও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ।

প্রভৃতি বিশেষ সম্মান-সূচক খেতাব পেয়েছিলেন। 'রায়-রায়ান' পদবী তিনি পূর্বেই পেয়েছিলেন। রাজস্ব বিভাগে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তহশিলদার পদে আসীন হয়ে তাঁর প্রতিপত্তি ও প্রভাব চরমে ওঠে। নন্দকুমারকে একাধিকবার পাটনায় যেতে হয়েছিল, তবে মুর্শিদাবাদই ছিল তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র। লর্ড ক্লাইভের ছত্রছায়ায় প্রায় দশ বছর বিশিষ্ট রাজপুরুষের মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

নন্দকুমারের সুদিনের অবসান হল লর্ড ক্লাইভের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ২৬ জানুয়ারী, ১৭৬৭ খ্রীঃ। পরবর্তী বাংলার গভর্নর ও নবাবদের কাছে তাঁর সমাদর ক্রমেই কমতে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিপদ ঘনিয়ে আসে ১৭৭২ খ্রীঃ, যখন ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ এলেন বাংলার গভর্নর হয়ে। প্রায় বারো বছর আগে ১ ফেব্রুয়ারী, ১৭৬০ খ্রীঃ ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ ও গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের সুপারিশে নন্দকুমারকে, কোম্পানীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার অপরাধে, কলকাতায় প্রায় এক বছর প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় থাকতে হয়। রাজস্ব আদান-প্রদানের ব্যাপারে হেস্টিংসের সঙ্গে নন্দকুমারের প্রথম বিরোধ শুরু হয়েছিল প্রায় চোদ্দ বছর আগে যখন হেস্টিংস্ মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট্ ছিলেন ১৭৫৭ খ্রীঃ। সেই সময় থেকে হেস্টিংস্ ঠিক করেছিলেন যে, নন্দকুমারকে যেমন করে হোক শেষ করতে হবে।

যদিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হেস্টিংসের অনুপস্থিতিতে ও ক্লাইভের ভারতে প্রত্যাবর্তনের (মে, ১৭৬৫ খ্রীঃ) আগে, দ্বিতীয়বার মার্চ, ১৭৬৫ খ্রীঃ নন্দকুমারকে কলকাতায় তাঁর নিজের বাড়ীতে নজরবন্দী করে রাখা হয়েছিল, অবশ্য পরে ছেড়ে দেওয়া হয়।

হেস্টিংস্ দ্বিতীয়বার ভারতে আসেন ১৩ এপ্রিল, ১৭৭২ খ্রীঃ এবং ইংরাজ সরকারের একছত্র অধিপতি হিসাবে আসীন ছিলেন ১৭৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত। তিনি প্রথম দফায় নন্দকুমারকে দেশদ্রোহীতার অপরাধে (দিল্লীর বাদশাহ্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র) দোষী সাবস্ত্য না করতে পারায়, একটি অঙ্গীকার পত্রে নন্দকুমারকে স্বাক্ষর জালিয়াতীর মামলায় অভিযুক্ত করেন।[১] এই মিথ্যা মামলায় নিরপেক্ষ না থেকে, হেস্টিংসকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর বন্ধু সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা

১। জনৈক শেঠ বুলাকীদাস মুর্শিদাবাদের একজন নামী বেনিয়া। নন্দকুমার বুলাকীদাসকে তাঁর কয়েকটি মূল্যবান জহরত বিক্রয়ার্থে দেন। বুলাকীদাস জহরত লুট হয়ে যাওয়ায়, নন্দকুমারকে মূল্যস্বরূপ ৪৮,০২১ টাকার একটি অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করে দেন (৭ ভাদ্র, ১১৭২ সন; ১৭৬৫ খ্রীঃ)। বুলাকীদাসের মৃত্যুর পর তাঁর এক আত্মীয় গঙ্গাবিষ্ণু এবং বিধবা স্ত্রীর এক আমমোক্তার মোহনপ্রসাদ এই ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে পড়েন। হেষ্টিংস্ নন্দকুমারকে বিপদে ফেলার জন্য গঙ্গাবিষ্ণু ও মোহনপ্রসাদকে প্রভাব ও টাকায় বশ করে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে বুলাকীদাসের অঙ্গীকার-পত্রের স্বাক্ষরটি যে জাল, তা প্রতিপন্ন করার জন্য মোকদ্দমা করতে প্ররোচিত করেন।

ইম্পে। ১ ভাড়া করা রাজ-সাক্ষীর অভাব হয়নি। ৮ মার্চ, ১৭৭৫ খ্রীঃ নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ আবেদন পত্র দাখিল করেন। নন্দকুমারকে হেনস্থা করার উদ্দেশ্যে দেশীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা—মহম্মদ রেজা খান, সেতাব রায়, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (কান্দী) মহারাজা নবকৃষ্ণ (শোভাবাজার), রাজা রামলোচন (আন্দুল), কৃষ্ণকান্ত (কাশিমবাজার), রাজা দেবী সিংহ (নসীপুর), রাজা চৈৎ সিংহ (কাশী) প্রমুখ, হেস্টিংসকে পরোক্ষে উৎসাহিত করেছিলেন। এঁরা প্রত্যেকেই চেয়েছিলেন তাঁদের অন্নদাতা হেস্টিংসকে খুশী রাখতে এবং নন্দকুমারকে বাঙালী সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করতে।

ইংরাজ ব্যারিস্টার ক্যারো সাহেব মহারাজা নন্দকুমারের কাউন্সেল ছিলেন। মামলা শুরু হয় ৬ মে, ১৭৭৫ খ্রীঃ এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে জেল হাজতে পাঠান হয়। বিচার আরম্ভ ৮ জুন। ইংরাজ জুরীরা ১৬ জুনের আদেশে স্বাক্ষর জাল করার অপরাধে নন্দকুমারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডীত করেন। শনিবার, ৫ আগষ্ট, ১৭৭৫ খ্রীঃ কুলীবাজারে (বর্তমান হেস্টিংস-এ, রেসকোর্স-এর কাছে) মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসী হয়। **উইলিয়াম্ হিকি** সাহেবের 'স্মৃতিকথা' (১৭৭৭—১৮০৯ খ্রীঃ) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো—"যেদিন মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি হয়, সেদিন কলকাতা শহরের অধিকাংশ হিন্দু ভোরবেলায় উঠে ঘৃণায় ও বিরক্তিতে শহর ছেড়ে চলে যান।...তাঁর মতন প্রতিপত্তিশালী হিন্দু রাজাকে এই অপরাধের জন্য ফাঁসি দেওয়া, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ইতিহাসে একটা কলঙ্কের মতন হয়ে আছে।'

এ ছাড়া কোম্পানীর কাউন্সিলের সভ্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস, মাদ্রাজে স্যার এডওয়ার্ড হিউজেস্‌কে ৭ আগস্ট, ১৭৭৫ খ্রীঃ (নন্দকুমারের ফাঁসীর এক দিন পরে) চিঠিতে লিখেছিলেন—

"The death of Rajah Nundakumar, will probably surprise you. He was found guilty of a forgery committed seven or eight years ago: condemned, executed on saturday last. My brother-in-law in virtue of his office was obliged to attend him. Through every part of the ceremony he behaved himself with the utmost dignities and composure, and met his fate with an appearance or resolution, that approached to indifference. Strange judgements, I fancy,

---

১। দুর্নীতির অভিযোগে ১২ ডিসেম্বর, ১৭৮৭ খ্রীঃ বিচারপতি ইম্পে সাহেবের 'হাউস-অফ-লর্ডস'-এ বিচার আরম্ভ হয়। কারাদণ্ডে দণ্ডিত না হলেও, তাঁকে বাংলার সদর দেওয়ানী আদালতের জজ থাকাকালিন তাঁর পাওয়া সব মাহিনা সরকারকে ফেরৎ দিতে হয়েছিল।

will be formed of this event in England. Whether he was guilty or not of a crime laid to his charge. I believe no man here has a doubt that, if he had never stood forth in politics, his other offences would not have hurt him. This is a delicate subject, and rather open to speculation than discussion."

নন্দকুমারের বিচার আইনানুগ কিনা তা তর্ক সাপেক্ষ। প্রথমেই মহাবাগ্মী **এডমণ্ড বার্ক**-এর বিস্তৃত উদ্ধৃতির মাত্র একটি লাইন—'And the general obloquy of English nation, was an account of his (Nandakumar's) attachment to his own prince and the liberties of his country'.

এফ. এস. বেভারিজ সাহেবের গ্রন্থের নাম—'The trial of Maharaja Nandakumar, a narrative of Judicial murder'.—'There is a strong circumstantial evidence that Hastings was the real prosecutor'.

জেমস্ মিলস্ সাহেবের—History of British India vol. III P. 640—'The severest censures were very generally passed upon this trial and excution; and it was afterwards exhibited as matter of impeachment against both Mr. Hastings and the Judge who presided in the tribunal'.

ওয়ালস্ সাহেবের—History of Murshidabad district—'personally I think with Mr. Beveridge that the execution of Nandakumar was grave miscarriage of justice'.

ভারতীয় জীবনীকারদের মধ্যেও মত পার্থক্য দেখা যায়। কিছু বিদ্বেষমূলক ও একপেশে সমালোচনা রয়েছে **এন. এন. ঘোষ**-এর 'Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur' গ্রন্থে—'Taken all round, he was an ambitious scheming, intriguing villian, absolutely selfish, throughbly unprincipled, dead to a sense of gratitude'. শ্রী ঘোষের একপেশে উক্তির তীব্র বিরোধীতা করেছেন বেশ কয়েকজন ঐতিহাসিক। তাঁরা অবশ্য একথা মানেন না যে, মহারাজা নন্দকুমার দেশের জন্য প্রাণ দিয়ে শহীদ হয়েছেন।

মহারাজ নন্দকুমারের রাজনৈতিক চরিত্রের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর প্রথম প্রভু নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে ইংরাজদের সঙ্গে, দ্বিতীয় প্রভু নবাব মীরজাফরের স্বপক্ষে ও ইংরাজদের বিরুদ্ধে এবং পরে মীরজাফরের বিপক্ষে মীরকাসিমের

স্বপক্ষে (ইংরাজদের বিরুদ্ধে)—একের পর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাঁর চরিত্র মূল্যায়নে এখনও ঠিক করা যায় নি যে, তিনি এসব করেছিলেন নিজের স্বার্থে, না দেশের স্বার্থে? মহারাজা নন্দকুমারের দোষ-গুনের চরিত্র। কিন্তু তিনি যে যথেষ্ট লোকপ্রিয় ছিলেন, তার প্রমাণ-স্বরূপ একটি গ্রাম্য গাথা উদ্ধৃত করা হল—

'মহারাজ নন্দকুমার রে,
তোর রাজপাট জমিদারী কারে দিলি রে,
নন্দকুমার রায় ছিল বাঙ্গলার অধিকারী।
হেস্টিং সাহেব এলো জান্ করিবারে বারি॥
নন্দকুমারের মা কাঁদে ঐ গঙ্গার পানে চেয়ে
আর না আসিবে বাছা যোড়া ডিঙ্গি বেয়ে॥
খোপেতে কৌতর কাঁদে ফোঁহারাতে হাঁস।
যোড় বাঙ্গলায় কাঁদে সোণার গুলতি বাঁশ॥
ছোট রানী উঠে বলে বড় রানী গো দিদি।
সিঁতে ছিল কড়া সিঁদুর বঞ্চিত করিলেন বিধি॥'

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, যদিও তাঁর পূর্ব-পুরুষরা শাক্ত। হুগলীতে থাকাকালীন অবসর সময়ে ভক্ত-প্রবর **রামপ্রসাদ সেনের** (১৭২০ খ্রীঃ) গান শুনতে হালিশহরে আসতেন। তিনি ছিলেন বহুগুনের আধার। আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য তাঁর বাড়ীর দরজা সব সময়ে খোলা থাকত। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি সম্ভবপর প্রতিবাদ এমনকি, তাঁর বৈবাহিক কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে, মহাপণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে উৎপীড়ন করার জন্য কটূক্তি করতে ছাড়েননি। ১৭৭০-৭১ খ্রীঃ ভয়াবহ মন্বন্তরের সময় বুভুক্ষু মানুষদের সম্ভবপর সবরকম সাহায্য করেছিলেন। কুঞ্জঘাটায় রাজবাড়ীতে এক পুত্র **গুরুদাস** ও তিন কন্যা—বড়, সম্মানী, মেজ, আনন্দময়ী ও ছোট, কিনুমণি এবং পত্নী ক্ষেমাঙ্করী দেবীকে নিয়ে তাঁর পারিবারিক জীবন মোটামুটি শান্তিময় হলেও, তাঁর শেষ জীবন ছিল বড়ই দুঃখময়।[১] বড় জামাই **জগচ্চন্দ্র রায়** আর ছোট জামাই রায় রাধাচরণ। নন্দকুমারের বড় জামাই জগচ্চন্দ্র রায়ের[২] হীন বৈরিতা তাঁর মনঃকষ্ট ও নৈরাশ্যের অন্যতম কারণ। জগচ্চন্দ্র নন্দকুমারের জালিয়াতির মামলায় প্রধান বিরোধী পক্ষ মোহনপ্রসাদকে সবরকম সাহায্য দিয়েছিলেন।

১। কলকাতা মহানগরীতে তাঁর দুটি স্মারণিক পথ রয়েছে উত্তর কলকাতা ও দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জে 'মহারাজা নন্দকুমার রোড।'

২। বর্তমান কুঞ্জঘাটার রাজপরিবারের আদিপুরুষ।

মহারাজা নন্দকুমারের জীবদ্দশায় পুত্র **গুরুদাস**[১] ইংরাজ কোম্পানীর কর্মচারী ছিলেন। তাঁর পিতার পরামর্শে তিনি কোম্পানীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে ভালোই ব্যবহার করতেন। তার ফল-স্বরূপ নন্দকুমারের মৃত্যুর পর, গুরুদাস হেষ্টিংসের নির্দেশে নবাব নাজিম মোবারক-উদ্দৌলার ১৭৭১ খ্রীঃ দেওয়ান হন। তাঁকে সম্মান-সূচক 'গৌড়াধিপতি' ('গৌড়পৎ') উপাধি ও 'রাজার' স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

অপুত্রক রাজা গুরুদাসের মৃত্যুর পর তাঁর রানী **জগদম্বা দেবী** সম্পত্তির অধিকারিণী হন। তাঁর জীবদ্দশায় দৌহিত্র রাজা **মহানন্দ** (জগচ্চন্দ্রের পুত্র) দিদিমার সব সম্পত্তি হস্তগত করেন। তিনি ছিলেন নিজামতের দেওয়ান। নবাব কুঞ্জঘাটার বাড়ীতে গিয়ে মহানন্দকে 'রাজা' খেলাৎ দেন। এটি বোধ হয় জগচ্চন্দ্রের নন্দকুমারের বিরুদ্ধে কোম্পানীকে সাহায্য করার উচ্ছসিত প্রতিদান।

মহানন্দের পুত্র **বিজয়কৃষ্ণ** রাজপরিবারে সর্বশেষ 'রাজা' উপাধিধারী। এই বংশের সনন্দগুলি এখনও সৈদাবাদে **কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে** রক্ষিত আছে। বিজয়কৃষ্ণের পর যথাক্রমে—কৃষ্ণচন্দ্র, দুর্গানাথ, দেবেন্দ্রনাথ ও তস্য পোষ্য-পুত্র গৌরীশংকর। তাঁর কাছে মহারাজা নন্দকুমারের লিখিত কিছু চিঠি ও দানপত্র রক্ষিত আছে। রাজপরিবারের অতি প্রাচীন দুর্গাপূজা এখনও অতি সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে রাজবাড়ীর একাংশ বহরমপুর সরকারী গ্রন্থাগারের কার্যালয়।

১। ১৭৭২ খ্রীঃ পুত্র গুরুদাসের নিকট লিখিত মহারাজা নন্দকুমারের পত্রে তাঁর পারিবারিক জীবনে মনঃকষ্টের আভাষ পাওয়া যায়—'তোমার মঙ্গল সর্বদা কামনা করণক অত্র কুশল পরন্তু ২৫ তারিখের পত্র ২৭ রোজ মাত্রে পাইয়া সমাচার জানিলাম ... ...। শ্রীযুত রায় জগচ্চন্দ্র (জ্যেষ্ঠ জামাই) বিষ রোজের পর বাটী (কুঞ্জঘাটা) হইতে আসিয়াছেন যেমত ২ প্রচেষ্টা পাইতেছেন তাহা জানাই গেল। তিনি যথা ২ যাউন ফলত কাজের দ্বারাতেই বুঝিবেন স্পষ্ট হইয়া আপনারই মন্দ করিতেছেন সে সকল লোকও অবশ্য বুঝিবেক।'—ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৭১ সন—৯৬ পৃষ্ঠা।

রাজা উদয়নারায়ণ রায়

বড়নগর, মুর্শিদাবাদ

রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের জন্ম হয় মুর্শিদাবাদে ভাগীরথী তীরে বড়নগরের কাছে 'বিনোদ' গ্রামে। বড়নগর (মুর্শিদাবাদ থেকে ২৩ কি. মি.) ছিল উদয়নারায়ণের রাজধানী। পরে নাটোরের মহিয়সী রাণী ভবানী তাঁর শেষ জীবন এই বড়নগরে [১] অতিবাহিত করেন। রাজা উদয়নারায়ণের কৌলিক উপাধি ছিল 'লালা' (উত্তর ভারতের কায়স্থ)। ভিন্ন মতে, তাঁরা 'রাঢ়ীয়' বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।

উদয়নারায়ণের বিবাহ হয় জঙ্গীপুরের 'গণকর' গ্রাম নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ঘনশ্যাম রায়ের কন্যার সঙ্গে। তাঁদের পুত্র সাহেব রাম। উদয়নারায়ণ একজন দক্ষ সৈনিক ও পরে যোগ্য জমিদার হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন। বাংলার নবাব নাজিম **মুর্শিদকুলী খানের** (১৭০৩-২৭ খ্রীঃ) সময়ে বৃহৎ রাজসাহী জমিদারী শাসনের ভার উদয়নারায়ণের উপর ন্যস্ত ছিল। তাঁর যোগ্যতায় নবাব বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন।

রাজা উদয়নারায়ণের সেনানায়ক **গোলাম মহম্মদ** একজন সাহসী যোদ্ধা ও কর্মদক্ষ আধিকারিক। উদয়নারায়ণ তাঁকে বড়নগরের সমস্ত জমিদারীর ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। নবাব মুর্শিদকুলী খানের অদূরদর্শিতা ও ঈর্ষার বশে এবং গোলাম মহম্মদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি খর্ব করার অভিপ্রায়ে, বিনা প্ররোচনায়, হঠাৎ নবাব সৈন্য বড়নগর আক্রমণ করে। উদয়নারায়ণ বড়নগর ছেড়ে বীরকিটে তাঁর সুরক্ষিত গড় জগন্নাথপুরে সৈন্য সমাবেশ করেন। 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত'-এ এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। নবাবের সেনাপতি লহরীমল ও মহম্মদজান বীরকিটে হানা দেয়। সেই সময় নদীয়ার রাজা বলবীর্যবান রঘুরাম (১৬৯০-১৭০৮ খ্রী), (নদীয়া-রাজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা) নবাবের আদেশে লহরীমলের সঙ্গে যোগ দেন। গোলাম মহম্মদ নিহত হন। রাজা উদয়নারায়ণ ও তাঁর পুত্র **সাহেব রাম** যুদ্ধে নবাব সৈন্যের হাতে বন্দী হন। এ সম্বন্ধে ১৮৭৩ খ্রীঃ 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় রাজা উদয়নারায়ণ সম্বন্ধে জানা যায় যে, তিনি ১৭১১ খ্রীঃ নবাবের কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন ও পরে সুলতানাবাদের পর্বতে আশ্রয় নেন। অপর একটি সূত্র অনুযায়ী নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন (১৭১০-২৪ খ্রীঃ), রাজা উদয়নারায়ণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্দী অবস্থায় নবাবের হাতে তুলে দেন। তার পুরস্কার-স্বরূপ নবাব রঘুনন্দনের বড় ভাই রামজীবনকে রাজসাহীর জমিদারী প্রদান করেন।

১। বড়নগরে রাণী ভবানীর প্রতিষ্ঠিত 'রাজ-রাজেশ্বরী' মন্দিরের পূর্ব দক্ষিণে অবস্থিত 'মদন-গোপাল' মন্দিরের দারুমূর্তি রাজা উদয়নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত। এই সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

কান্দীর সিংহ রাজপরিবার

মুর্শিদাবাদ

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথম ভাগে বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হ'ত নবাব-নাজিম-মসনদ্ মুর্শিদাবাদ থেকে। যদিও নবাবী হুকুমতের গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পায় ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ে, কিন্তু বাংলার নবাবরা—মুর্শিদকুলী খান (১৭০৪-২৯ খ্রীঃ), আলিবর্দী খান (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ), সিরাজ-উদ্-দৌলা (১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ), মীরজাফর (১৭৫৭-৬০ ও ১৭৬৩-৬৫ খ্রীঃ), মীরকাশিম (১৭৬০-৬৩ খ্রীঃ)—প্রত্যেকেই তাঁদের দরবারে মুসলমানদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদে প্রাধান্য দিলেও, দক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ হিন্দুদের দাবী কোনভাবেই অগ্রাহ্য করতেন না। তার প্রমাণ রয়েছে রাজা জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, রাজা দর্পনারায়ণ, চায়েন রায়, দেওয়ান কৃষ্ণবল্লভ, মহারাজা জানকীরাম, মহারাজা রায়দুর্লভ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, মহারাজা নবকৃষ্ণ, মহারাজা নন্দকুমার, দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী, সেনাপতি মীরমদন, সেনাপতি মোহনলাল, **দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ** (কান্দী) প্রমুখ ক্ষমতাসীন রাজপুরুষদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে।

ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত কান্দী মুর্শিদাবাদের একটি ছোট গ্রাম। সিংহ বংশের প্রাণপুরুষ (ভাগীরথীর পূর্বতীরে বোয়ালিয়া গ্রামের আদি অধিবাসী) উত্তররাঢ়ী কায়স্থ বংশীয় **হরেকৃষ্ণ সিংহ** ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী ও তেজারতি কারবারী। হরেকৃষ্ণের পুত্র মুরলীধরও ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। তাঁর তিন পুত্র—নারায়ণ, গৌরাঙ্গ ও বিহারী। নবাবী আমলের সরকারী চাকুরে মধ্যম পুত্র **গৌরাঙ্গ সিংহ**।[১] ভ্রাতুষ্পুত্র (বিহারী সিংহের পুত্র) **রাধাকান্তকে** দত্তক নেন ১৭২৮ খ্রীঃ। নবাব আলিবর্দী ও সিরাজের সময় কানুনগো রাধাকান্ত রাজস্ব বিষয়ে নিজ দক্ষতার পরিচয় দেন। পরে এই রাধাকান্তই নাকি ছিলেন সিরাজের বিরুদ্ধে হীন চক্রান্তের নায়কদের অন্যতম। পুরস্কার-স্বরূপ ক্লাইভ ১৭৫৮ খ্রীঃ রাধাকান্তকে রাজস্ব বিভাগে একজন তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন। পরে দেওয়ান হয়েছিলেন। রাধাকান্ত সৎ ও ধর্মভীরু মানুষ। কান্দীর বিখ্যাত রাধাবল্লভের মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত, যদিও মন্দিরের নিষ্কর জমি মোগল বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলমের দান।

১। গৌরাঙ্গ সিংহ কান্দীতে তাঁর নূতন বাসভবনের কার্নিশ তৈরী করেন নবাব সিরাজের রাজপ্রাসাদের অনুকরণে। ক্ষিপ্ত হয়ে সিরাজ-উদ-দৌলা গৌরাঙ্গকে বন্দী করেন ও বাসভবন ধ্বংস করেন। সিংহ পরিবারের কুলদেবতা শ্রীরাধাবল্লভ জীউ-এর মন্দির তাঁরই প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের নহবতখানা মুর্শিদাবাদের ত্রিপুলিয়া গেটের অনুকরণে তৈরী।—(Calcutta Review. 1874)

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ

কোম্পানীর বিশ্বস্ত দেওয়ান রাধাকান্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বহু বিতর্কিত চরিত্রের গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। নায়েব-দেওয়ান কুখ্যাত মহম্মদ রেজা খানের অধীনে রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন ১৭৬৯ খ্রীঃ। বিহারী সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের জন্ম হয় ১৭৩৯ খ্রীঃ (ভিন্নমতে, ১৭১৪ খ্রীঃ)। ইংরাজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস্[১] মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন ১৭৭২ খ্রীঃ। মুর্শিদাবাদের রেসিডেন্ট্ মিডিলটন্ সাহেবের সুপারিশে, হেস্টিংস গঙ্গাগোবিন্দকে খালসা বিভাগে 'রায় রাঁইয়া' রাজা রাজবল্লভের অধীনে সহকারী দেওয়ানের পদে (সাতশো টাকা বেতনে) নিযুক্ত করেন। গঙ্গাগোবিন্দ নিজের বুদ্ধি ও দক্ষতায় ধাপে ধাপে ইংরেজ বণিক কোম্পানীর বিশেষ করে, হেস্টিংসের বিশ্বস্ত বন্ধু ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হয়ে, কোম্পানীর কলকাতাস্থ উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন 'রাজস্ব সমিতির' দেওয়ান পদে আসীন হন ১৭৭৪ খ্রীঃ। হেস্টিংস্ সাহেবের লক্ষ লক্ষ টাকার 'উপরি' আমদানী, এই গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মারফতেই হয়েছিল। গঙ্গাগোবিন্দ এই অর্থের একটি বড় অংশ হস্তগত করেছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীঃ এই অপকর্মের জন্য গঙ্গাগোবিন্দের পদচ্যুতি ঘটে, কিন্তু হেস্টিংসের হস্তক্ষেপে তিনি আবার গদী ফিরে পান।

গঙ্গাগোবিন্দের জমিদার[২] ও প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের নামে স্বেচ্ছাচারিতা, অত্যাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার ও সরকারী টাকার আত্মসাৎ প্রভৃতি কুকর্মের কাহিনী আমরা জানতে পারি **'Minutes of Evidence in Hastings Trial : David Anderson's Evidence'—P 1226.** এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, গঙ্গাগোবিন্দ ও হেস্টিংসের অবসরকালীন জীবন যথেষ্ট সচ্ছল হলেও, ধিক্কৃত ও দুঃখময় ছিল। গঙ্গাগোবিন্দের জীবনে অন্ধকার নেমে আসে ১৭৮৫ খ্রীঃ যখন হেস্টিংস স্বদেশে ফিরে গেলেন। তিনি তাঁর অপকর্মের উপার্জিত কয়েক লক্ষ টাকা সৎকার্যে ব্যয় করেছিলেন। তিনি নাকি তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ বিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অভূতপূর্ব জাঁকজমকে সম্পন্ন করেন। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেবালয় প্রতিষ্ঠা, (গঙ্গার পশ্চিমতীরে মায়াপুরে (নবদ্বীপ) শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন

১। গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে হেস্টিংস সাহেবের পরিচয় হয়, ১৭৫৩ খ্রীঃ কাশিমবাজারে কোম্পানীর কুঠীতে, যখন হেস্টিংস ছিলেন একজন কর্মচারী। গঙ্গাগোবিন্দের দেওয়ানী পদে নিয়োগের মূল কারণ হল, হেস্টিংস সাহেবের স্বার্থজনিত অন্যায় উপার্জনের উদ্দেশ্য সাধন।

২। ১৭৮০ খ্রীঃ দিনাজপুরের নাবালক জমিদার রাজা রাধানাথ রায়ের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে অত্যাচারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বহু সম্পত্তি ও অর্থ, হেস্টিংস সাহেবের সঙ্গে ভাগাভাগি হয়।

যদিও সেটির অস্তিত্ব এখন নেই) ও জনহিতকর কাজের দ্বারা শেষজীবনে শান্তির আশ্রয় লাভ করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটে ১৭৯৯ খ্রীঃ ৬০ বৎসর বয়সে।[১] গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র **প্রাণকৃষ্ণ সিংহ** (১৭৫৫-১৮০৮ খ্রীঃ) নবাব দরবারে দেওয়ান ছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীঃ যশোহরের নলদি তালুক কেনেন নাটোরের জমিদারদের কাছ থেকে।

দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ

প্রাণকৃষ্ণের পুত্র প্রাতঃস্মরণীয় কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ। তিনি লালাবাবু[২] নামে সুপরিচিত। জন্মগ্রহণ করেন ১৭৭৫ খ্রীঃ। কান্দীর সিংহ রাজপরিবারে সবচেয়ে খ্যাতিমান পুরুষ। মাত্র ১৭ বছর বয়সে কৃষ্ণচন্দ্র, কলকাতায় প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের পর, কর্মজীবন শুরু করেন জেলা জজের অফিসে সেরেস্তাদারীর কাজে ১৭৯২ খ্রীঃ। সেই সময়ে কেবল সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তানরাই ঐ সব কাজে নিযুক্ত হতেন। পরবর্তীকালে তিনি ইংরাজ কোম্পানীর উড়িষ্যার জমিদারীর দেওয়ান পদে আসীন হন। আজীবন সৎ ও ধর্মপ্রাণ কৃষ্ণচন্দ্র ১৮০৮ খ্রীঃ কান্দীর জমিদারীর মালিক হন। পিতামহের বিপরীত চরিত্রের মানুষ কৃষ্ণচন্দ্রের দেব-সেবা ও অতিথি-সেবাই ছিল তাঁর মনের বাসনা। পূর্ণ হয়েছিল তাঁর প্রতিষ্ঠিত বাংলা, উড়িষ্যা ও উত্তরপ্রদেশে বেশ কয়েকটি মন্দির, অতিথিশালা ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবাসত্র প্রভৃতি সুকর্মের মাধ্যমে। বিখ্যাত 'গোবর্ধনকুঞ্জ', 'কৃষ্ণচন্দ্রমাজীর' মন্দির ও 'রাধাকুণ্ডের' সংস্কার, তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। বৃন্দাবনে এইসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়ভার (বাৎসরিক প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা) তিনি বহন করেছিলেন।

লালাবাবুকে ইংরাজ সরকার 'মহারাজা' খেলাত দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে, তিনি সবিনয়ে প্রত্যাখান করেন। মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য তিনি মাত্র ৩৫ বছর বয়সে, হঠাৎ ১৮০৫ খ্রীঃ, স্ত্রী রাণী কাত্যায়নী ও একমাত্র নাবালক পুত্র নারায়ণ সিংহ এবং বিশাল জমিদারী ছেড়ে দিয়ে বৃন্দাবনে চলে যান। সেখানে বৈষ্ণব সাধু কৃষ্ণদাস-বাবাজীর আশ্রিত হন এবং প্রকৃত ত্যাগী-সন্ন্যাসীর জীবন-যাপন করেন। বৃন্দাবনে থাকাকালীন মাত্র ৪৬ বছর বয়সে মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ঘোড়ার পায়ের আঘাতে তাঁর জীবনাবসান হয় ১৪ মে, ১৮২১ খ্রীঃ।

১। গঙ্গাগোবিন্দের চরিত্রের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এডমণ্ড বার্ক বলেছেন—'Ganga Govinda, a name at the sound of which all India turns pale—the most wicked, the most atrocious, the boldest, the most dexterous villain that ever the rank servitude of that country has produced.'

২। উত্তর ভারতে কায়স্থদের 'লালা' বলা হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের নাবালক একমাত্র পুত্র নারায়ণ সিংহের মাতা ও অভিভাবিকা দানশীলা রাণী কাত্যায়নী জমিদারী পরিচালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কাশীপুরে গোপালজীউ-এর ঠাকুরবাড়ী প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং আরও কয়েকটি ধর্মীয় সংস্থা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা দান করেন। তাঁর সময়ে কলকাতায় পাইকপাড়ার সিংহ-রাজবাড়ী তৈরী হয়।

অপুত্রক ও স্বল্পায়ু রাজা নারায়ণ সিংহের তিনটি বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী তারাসুন্দরী ও তৃতীয়া করুণাময়ী, দুজনেই দত্তক নেন, যথাক্রমে হরিমোহন (রাজা প্রতাপচন্দ্র) ও রামমোহনকে (রাজা ঈশ্বরচন্দ্র)। দুই দত্তক পুত্রই রাণী কাত্যায়নীর ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষের পুত্র।

রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ

রাজা প্রতাপচন্দ্রের জন্ম হয় ২৪ জানুয়ারী, ১৮২৭ খ্রীঃ। প্রতাপচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন মহারাজা সতীশচন্দ্র (কৃষ্ণনগর) ও রাজা প্রসন্ননাথ রায় (দিঘাপতিয়া)। রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রজাদের উন্নতিকল্পে কান্দীতে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৫৯ খ্রীঃ। পরে আর একটি স্কুল পাইকপাড়ায় তাঁর অনুদানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃতিবান রাজা প্রতাপচন্দ্র সঙ্গীত, নাটক ও সাহিত্য অনুশীলনে উল্লেখযোগ্যভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বেলগাছিয়া বাগান বাড়ীতে 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' উদ্বোধন হয় ৩১ জুলাই, ১৮৫৮ খ্রীঃ। প্রথম দিন রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখিত 'রত্নাবলী' নাটক অভিনীত হয়েছিল: অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন কলকাতার সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবকবৃন্দ। কুমার ঈশ্বরচন্দ্রও অন্যতম অভিনেতা ছিলেন। অনুষ্ঠানে বাংলার ছোটলাট স্যার ফ্রেডরিক হ্যালিডে ছাড়া, দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।[১] প্রতাপচন্দ্রের আগ্রহে বেলগাছিয়ার বাগান বাড়ীতে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। মাইকেল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক এখানে অভিনীত হয়েছিল।

প্রতাপচন্দ্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন', বঙ্গীয় আইন পরিষদ ও 'জমিদার সভার' সভ্য ছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে কল্যাণমূলক কাজ ও রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ 'রাজা বাহাদুর' ও 'সি. এস. আই.' উপাধিতে ভূষিত করেন, এপ্রিল, ১৮৫৪ খ্রীঃ। প্রতাপচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নারী-শিক্ষা-প্রসার আন্দোলনে বিশেষভাবে সাহায্য

১। 'বেলগাছিয়া ভিলা'—বাগান বাড়ীটি রাজা প্রতাপচন্দ্র প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছ থেকে কিনে ছিলেন।

করেছিলেন। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ২৯ জুলাই, ১৮৬৬ খ্রীঃ, মাত্র ৩৯ বছর বয়সে। রাজা প্রতাপচন্দ্রের চারপুত্র—গিরীশচন্দ্র (রাজা), পূর্ণচন্দ্র (রাজা), কুমার কান্তিচন্দ্র (স্বল্পায়ু) ও কুমার শরৎচন্দ্র।

জ্যেষ্ঠপুত্র **রাজা গিরীশচন্দ্র** একজন নিরহঙ্কারী, প্রকৃত সজ্জন ব্যক্তি। কান্দীতে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে ১,২৫,০০০ টাকা দান করেছিলেন। অপুত্রক হওয়ায়, তিনি তাঁর ভাই পূর্ণচন্দ্রের পুত্র শ্রীশচন্দ্রকে দত্তক নেন। রাজা গিরীশচন্দ্রের মৃত্যু হয় ১৮৭৭ খ্রীঃ। **রাজা শ্রীশচন্দ্রের** দুই পুত্র ফণীন্দ্র (স্বল্পায়ু) ও মণীন্দ্র। **রাজা মণীন্দ্রের**[১] তিন পুত্র—কুমার বিমলচন্দ্র, অমরেশচন্দ্র ও বৃন্দাবনচন্দ্র। বিমলচন্দ্রের পুত্র অতীশ সিংহ। বঙ্গীয় আইন সভার নির্বাচিত সদস্য। তাঁর পুত্র আনন্দ। অমরেশ সিংহের পুত্র অধীশ সিংহ (অপুত্রক)। বৃন্দাবন সিংহের পুত্র বিকাশ সিংহ ও তাঁর পুত্র অমর্ত্য সিংহ। রাজা মণীন্দ্রের সব বংশধরেরা দক্ষিণ কলকাতায় শরৎ বসু রোডে নিজ নিজ বাসভবনে বাস করেন।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের দ্বিতীয় **পুত্র রাজা পূর্ণচন্দ্র** ভ্রমণপিপাসু হওয়ায়, ভারতবর্ষের বহু ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান ও বিভিন্ন প্রদেশের শহরগুলিতে একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন পরিস্থিতি ও সমস্যাগুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন সভা সমিতিতে বক্তব্য রেখেছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁর সমাজ সচেতনতা ও রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ পূর্ণচন্দ্রকে 'রাজা-বাহাদুর' উপাধি দেন ১৮৮৫ খ্রীঃ। ১৮৭৭ খ্রীঃ দিল্লীতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার 'ভারত সম্রাজ্ঞী' অভিষেক দরবারে রাজা পূর্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৯০ খ্রীঃ। তাঁর চার পুত্র—সতীশচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র (রাজা গিরীশচন্দ্রের দত্তক), দীনেশচন্দ্র ও জিতেন্দ্র।

রাজা প্রতাপচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র **শরৎচন্দ্রের** জন্ম হয় ১৮৫৯ খ্রীঃ। শিক্ষা লাভ করেন মেট্রোপলিটান ও হিন্দু স্কুলে। 'উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ সভার' প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সময়ে কান্দীর রাজবাড়ী (১৮৩৫ খ্রীঃ তৈরী) ও কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ী এবং বেলগাছিয়া ভিলার সংস্কার করা হয়েছিল। বড়লাট সহ কলকাতার রুচি-সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষদের সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর দুই পুত্র—বীরেন্দ্রচন্দ্র (জন্ম ১৮৮১ খ্রীঃ) ও জিতেন্দ্রচন্দ্র (জন্ম ১৮৮৫ খ্রীঃ)। বীরেন্দ্রের পুত্র জগদীশচন্দ্র। জগদীশচন্দ্রের পুত্র দেবাশীষ। এঁরা বেলগাছিয়া ভিলায় বসবাস করেন।

১। উত্তর কলকাতায় রাজা মণীন্দ্র রোড (পাইকপাড়া) তাঁর স্মারক।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ

রাজা নারায়ণ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের (দত্তক) জন্ম হয় ১৮৩১ খ্রীঃ। চিকিৎসাশাস্ত্র ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আগ্রহী ছিলেন। পাইকপাড়া রাজবাড়ীতে দাতব্য চিকিৎসালয়ে দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসার পর, নিজে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করতেন। বড় ভাই রাজা প্রতাপচন্দ্রের সহযোগী হিসাবে, বেলগাছিয়া ভিলায় নাট্যাভিনয়ে উদ্যোগী হয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ দুই ভাই সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ সরকারকে সম্ভাব্য সবরকম সাহায্য করেছিলেন। ভারত ভ্রমণে আগত যুবরাজ সপ্তম এডওয়ার্ড-এর সম্মানে আয়োজিত দরবারে (১৮৭৫-৭৬ খ্রীঃ) আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। 'রাজা ঈশ্বরচন্দ্র 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের' সম্পাদক ছিলেন বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৬০ খ্রীঃ।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের দুই পুত্র—**ইন্দ্রচন্দ্র** ও অমরচন্দ্র (স্বল্পায়ু)। ইন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৫৭ খ্রীঃ। অমিতব্যয়ী ও বিলাসী চরিত্রের মানুষ হলেও, সাহিত্য ও সংগীত-প্রিয় ছিলেন। তাঁর বিলাসিতার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, রাজবাড়ীর একটি বিড়ালের বিবাহ উপলক্ষে, তিনি নাকি তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। কলকাতার 'ষ্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক ও মালিক মিঃ রবার্ট্ নাইট্ বর্ধমানের রাজার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করায়, মানহানির-দায়ে বিপন্ন হলে, ইন্দ্রচন্দ্র তাঁকে বিপদমুক্ত করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক দরবারে উপস্থিত ছিলেন ও লর্ড লিটনের ভিক্টোরিয়া স্মারক তহবিলে যথেষ্ট দান করেন। শেষ জীবনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, নাম হয় স্বামী বোধানন্দ নাথ। তাঁর অকাল মৃত্যু হয় ১৮৯৪ খ্রীঃ মাত্র ৩৭ বছর বয়সে। ইন্দ্রচন্দ্রের দুটি বিবাহ। প্রথমা স্ত্রীর একমাত্র কন্যা সরস্বতীর বিবাহ হয় ঘোষ-মৌলিক বংশে। তাঁদের এক পুত্র সত্যেন্দ্রচন্দ্র ও দুই কন্যা—শৈলেশকুমারী ও কনককুমারী। ইন্দ্রচন্দ্রের দ্বিতীয়া স্ত্রী সুপরিচিতা লেখিকা মৃণালিনী দেবী। 'প্রতিধ্বনি', 'কল্লোলিনা' 'নির্ঝরিণী' নামে কয়েকটি কবিতার বই তাঁর লেখনী-প্রসূত। তাঁর কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি স্বামী ইন্দ্রচন্দ্রের অনুমতিতে অরুণচন্দ্রকে দত্তক নেন। ১৯ জুন, ১৯০৫ খ্রীঃ মাত্র আঠাশ বৎসর বয়সে বৈধব্য-দশায় প্রখ্যাত কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয় পুত্র নির্মলচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পুনর্বিবাহ হয়।

কাশিমবাজারের নন্দী রাজপরিবার

মুর্শিদাবাদ

খ্রীষ্টীয় আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার দুই যমজ-সহর কাশিমবাজার আর মুর্শিদাবাদ ছিল নবাব, খেতাবী রাজা ও জমিদারদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতার মূল কেন্দ্র। ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের পরেই বিজয়ী ইংরাজ কোম্পানীর হাতে দেশ শাসনের প্রকৃত ক্ষমতা এসে যায়। নাম-সর্বস্ব নবাব, জমিদার, রাজারা—সবাই ইংরাজ কোম্পানীর মুখাপেক্ষী। ১৭১৭ খ্রীঃ সম্রাট ফারুকশিয়ারের ফর্মানে ইংরাজরা বিনা শুল্কে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার পায়। আর ১৭৬৫ খ্রীঃ সম্রাট শাহ্ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানীর আধিপত্য আদায়ের পর, কলকাতায় বসে রবার্ট ক্লাইভ, ভ্যান্সিটার্ট, ভেরেলস্ট, কার্টিয়ার এবং ওয়ারেন্ হেস্টিংস্—একের পর এক, বাংলার তথা ভারতের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ কর্তা হন।

কৃষ্ণকান্ত নন্দী

ইংরাজ কোম্পানীর কাশিমবাজারের কুঠীতে ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ (১৭৫৩-৬৩ খ্রীঃ) ছিলেন প্রথমে একজন সাধারণ কর্মচারী ও পরে বিশিষ্ট কর্মকর্তা। কোম্পানীর সঙ্গে নবাবদের রাজস্ব বা ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদ লেগেই থাকত। সেই সময়ে কাশিমবাজার সংলগ্ন শ্রীপুর গ্রামের বাসিন্দা সীতারাম নন্দীর পুত্র **রাধাকৃষ্ণ নন্দীর** চার পুত্রের মধ্যে, কৃষ্ণকান্ত নন্দী **"কান্ত মুদী"** একজন ব্যবসায়ী। কান্তবাবু অনুন্নত শ্রেণীর তেলী-সম্প্রদায়ের মানুষ হলেও, ব্যবসা ছাড়া ইংরাজ কোম্পানীর কুঠীতে, তাঁর যাতায়াত ছিল। ১৭৫৩ খ্রীঃ কাশিমবাজরের কুঠীতে ওয়ারেন্ হেস্টিংস্-এর অধীনে কর্মচারী ছিলেন।[১] ইংরাজরা কান্তবাবুকে 'ওয়েল ম্যান' বলে সম্বোধন করতেন। তাঁর জন্ম হয় আনুঃ ১৭২০ খ্রীঃ। নবাব সিরাজ কাশিমবাজার কুঠী আক্রমণ করেন ২ জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ এবং অধ্যক্ষ উইলিয়ম ওয়াটস্ ও হেস্টিংস্কে বন্দী করেন। ৯ জুন তারিখে কান্তবাবু হেস্টিংস সাহেবকে তিন হাজার টাকার জামিনে, নবাবের কবল থেকে মুক্ত করে নিজের প্রাণ উপেক্ষা করে গোপন আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। কান্তবাবু, তাঁর অমূল্য উপকারের প্রতিদানে পেলেন খোদ হেস্টিংস্ সাহেবের মুৎসুদ্দির পদ।

১। The Cyclopedia of India Vol. II. 1908.
Life and Times of Canto Baboo, the Banian of Warren Hastings
by Dr. Somendra Chandra Nandi—Vol. I, II.

হেস্টিংস্‌-এর আনুকূল্যে ও কোম্পানীর দাক্ষিণ্যে, কৃষ্ণকান্ত প্রচুর অর্থ ও ভূসম্পত্তির মালিক হন। এমন কি, নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর ১ চাকলা মুর্শিদাবাদ জমিদারীর অন্তর্গত নিজের বাস্তভিটা শ্রীপুর ১৭৬০ খ্রীঃ তিনি খরিদ করেন। তেলী-সম্প্রদায়ের মানুষ হয়েও কান্তবাবু, হেস্টিংস্‌-এর হুকুমে 'জতিমালা কাছারীর' সভাপতি হয়েছিলেন। ১৭৬৪ খ্রীঃ হেস্টিংস্‌ প্রথম দফায় স্বদেশে চলে গেলে, কৃষ্ণকান্ত মিঃ সাইকস্‌-এর সময়েও মুৎসুদ্দি পদে বহাল থাকেন মাসিক আট টাকা মাহিনায়। কিন্তু ১৭৭১-৭২ খ্রীঃ তাঁর সব সম্পত্তির আয় ছিল বছরে দশ লক্ষ টাকারও বেশী। ২

১৭৭২ খ্রীঃ ওয়ারেন্‌ হেস্টিংস্‌ ফিরে এলেন বাংলার গভর্নর হয়ে। কৃষ্ণকান্তের মর্যাদা ও প্রভাব ক্রমে ক্রমে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি কোম্পানীর তথা হেস্টিংস্‌-এর তরফে জমিদার, রাজরাজড়া, এমন কি, বারাণসীর **রাজা চৈৎসিংহের** ৩ সঙ্গে ১৭৮১ খ্রীঃ রাজনৈতিক বিষয়ে মধ্যস্থতা করার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। সামান্য একজন 'ওয়েলম্যান্‌'-'মুদী', বাংলার সর্বময় কর্তার সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন-পুরুষ, কারণ ধন-তৃষ্ণায় দুজনের স্বার্থ ও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। অবশ্য দুজনেই ধনকুবের হয়েও নিজেদের কুকর্মের মাশুল গুণে অপযশের চরম বোঝা নিয়ে মারা যান। কৃষ্ণকান্তের

১। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হেস্টিংস্‌ সাহেবের হুকুমে রাণী ভবানীর রাজসাহী জমিদারীর অন্তর্গত বাহারবন্দ পরগণা কান্তবাবুর পুত্র লোকনাথকে বেআইনী ইজারা দেওয়া হয় ১৭৭৭ খ্রীঃ। এমনকি, পরে ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৩ খ্রীঃ রংপুরের কলেক্টরকে লেখা একটি চিঠিতে হেস্টিংস বলেছেন: "Kanto Babu my Dewan, having obtained my permission to visit the Pargona of Baharbund which is his zamindary, the ryots of which have proved very refractory in paying their rents, I request you that you will afford him your protection and support in collecting the same, enforcing his authority and that of his agent or agents whom he may leave in the management"—Calcutta Review, 1878.

২। ১৭৭২ খ্রীঃ কোম্পানীর রাজস্ব সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ নিয়ম অনুসারে কান্তবাবুর বিশাল ভূসম্পত্তির মালিকানা কি আইন সম্মত ছিল? "That no Peshcar, banyan, or other servant, of whatever denomination, of collector, or relation, or dependant of any such servant, be allowed to farm lands, nor directly or indirectly to hold concern in any farm.........a bereach of this regulation, he shall stand ipso facto dismissed."—Mill's History of India Vol. III. P. 646.

৩। হেষ্টিংস সাহেব কান্তবাবুর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে, রাজা চৈৎসিংহের দরবার হল থেকে অধিকৃত রাজ-সিংহাসনটি কান্তবাবুকে উপহার দেন। পরে সেই সিংহাসন কাশিমবাজার রাজবাড়ীর দরবার হলে রাখা হয়।

শেষ জীবনে পাপের প্রায়শ্চিত্তের তাগিদে, কিছু সুকর্মের খতিয়ান থেকে জানা যায় যে, তিনি প্রায় এগার লক্ষ টাকা বিভিন্ন লোকহিতকর কাজে ব্যয় করেন। ১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় তাঁর প্রজাদের খাজনা রেহাই করা ছাড়া, ত্রাণকার্যে সবরকম সম্ভাব্য সাহায্য করেছিলেন। কাশিমবাজারের বাস্তুভিটা ছাড়া কলকাতায় শোভাবাজার—চিৎপুর অঞ্চলে ১৭৭৩ খ্রীঃ জমি কিনে একটি বাড়ী তৈরী করেছিলেন। তাঁর চার/পাঁচটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল। তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব। মারা যান পৌষ, ১২০০ সন (৯/১০ জানুয়ারী, ১৭৯৪ খ্রীঃ)।

কৃষ্ণকান্তের পুত্র (স্ত্রী খুডুমণির গর্ভে) **লোকনাথের** জন্ম হয় ৪ এপ্রিল, ১৭৬৪ খ্রীঃ। ইংরাজদের প্রতি তাঁর বিশেষ অবদান ও রাজভক্তির স্বীকৃতি হিসাবে ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি স্যার জন শোর, তাঁকে 'মহারাজা' উপাধিতে সম্মানিত করেন। স্বল্পায়ু মহারাজা লোকনাথ মারা যান ১২ মে, ১৮০৪ খ্রীঃ মাত্র চল্লিশ বছর বয়সে, নাবালক পুত্র কুমার **হরিনাথ** ও রাণী সুসারমোহিনীকে রেখে। হরিনাথের জন্ম হয় ১৮০২ খ্রীঃ। সাবালক হয়ে ১৮২০ খ্রীঃ নিজের হাতে জমিদারীর ভার নেন। ইংরাজ সরকারের রাজ-প্রতিনিধি লর্ড আমর্হার্স্ট 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাবে তাঁকে ভূষিত করেন ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮২৫ খ্রীঃ। ফার্সী ভাষাবিদ্, সংস্কৃতজ্ঞ, বিদ্যোৎসাহী রাজা হরিনাথ হিন্দু কলেজে ২০,০০০ টাকা দান করেছিলেন। মারা যান ১৮৩২ খ্রীঃ। তাঁর স্ত্রী রানী হরসুন্দরীর গর্ভে দুই পুত্র—রাজা **কৃষ্ণনাথ** (১৮২২-৪৪ খ্রীঃ) ও **রমানাথ** (জন্ম ১৮২৪ খ্রীঃ) ও এক কন্যা **গোবিন্দসুন্দরী** (১৮২৬-৬২ খ্রীঃ)। শিক্ষাবিদ্ দিগম্বর মিত্র (রাজা) কৃষ্ণনাথের গৃহ শিক্ষক ছিলেন, পরে জমিদারীর ম্যানেজার হয়েছিলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ ১৮৪০ খ্রীঃ সাবালক হয়ে জমিদারীর মালিক হন। ১৮৪১ খ্রীঃ লর্ড অকলণ্ড তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন। কৃষ্ণনাথ বিলাস-প্রিয় হওয়ায় বিপথগামী হন। রাজা কৃষ্ণনাথ মাত্র ২২ বছর বয়সে এক কল্পিত কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি পেতে আত্মহত্যা করেন ৩১ আগষ্ট, ১৮৪৪ খ্রীঃ, স্ত্রী প্রাতস্মরণীয়া মহারানী স্বর্ণময়ীকে রেখে।

মহারানী স্বর্ণময়ী

মহারানী স্বর্ণময়ী কাশিমবাজারের জমিদারীর দায়িত্ব নেন ১৮৪৪ খ্রীঃ। তিনি অনেক মামলা ও পারিবারিক অশান্তির মধ্যে থেকেও, বহু লোকহিতকর কাজ করে গেছেন। তাঁর সময় রাজবাড়ীতে প্রতিদিন আঠারো মন চাল দুঃস্থ পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হত। তাছাড়া, দেবোত্তর, ব্রাহ্মণোত্তর এমনকি, মুসলমান ফকিরদেরও

জমি দান—বহু দান-পত্রে উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তাঁর নিষ্ঠাবান ও সুযোগ্য দেওয়ান রায় বাহাদুর রাজীবলোচনের সৎ উপদেশ ও সাহায্যে, মহারানী স্বর্ণময়ী বাংলার তৎকালীন বৃহৎ জমিদার-পরিবর্গের অন্যতমা-রূপে পরিচিতি লাভ করেন। কলকাতার চিড়িয়াখানা প্রকল্পে দশ হাজার টাকা দান করেছিলেন। রানী স্বর্ণময়ীর জন্ম হয় বর্ধমান জেলার ভাটাকুল গ্রামে ১৮২৮ খ্রীঃ। বিবাহ হয় ১৮৩৮ খ্রীঃ দশ বছর বয়সে। বিধবা রানী প্রায় তিপান্ন বছর স্বহস্তে জমিদারীর ভার বহন করেছেন। তাঁর দানশীলতা ও পরোপকারী মহান আদর্শের স্বীকৃতি হিসাবে, ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি লর্ড মেয়ো তাঁকে 'মহারানী' উপাধিতে ভূষিত করেন ১০ আগষ্ট, ১৮৭১ খ্রীঃ। পরে ১২ মার্চ, ১৮৭৫ খ্রীঃ ইংরাজ সরকার রানীর বংশজাত পুত্র সন্তানের জ্যেষ্ঠ পুত্র উত্তরাধিকারীকে 'মহারাজা' উপাধি দানের অঙ্গীকারবদ্ধ হন। মহারানী স্বর্ণময়ীই একমাত্র বাংলায় 'সি. আই. ই.' খেতাবধারিণী রানী। ১ জানুয়ারী, ১৮৭৮ খ্রীঃ মহারানী 'ইম্পিরিয়াল অর্ডার অফ দি ক্রাউন অফ ইণ্ডিয়া' খেতাব পান ১৪ আগষ্ট, ১৮৭৮ খ্রীঃ। প্রাতঃস্মরণীয়া মহারানীর কর্মজীবনের অবসান ঘটে ৬৯ বছর বয়সে, ভাদ্র, ১৩০৪ সন (আগষ্ট, ১৮৯৭ খ্রীঃ)।

মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

মহারানী স্বর্ণময়ীর দুই কন্যা। উভয়েই মারা যান রানীর জীবদ্দশায়, যদিও দ্বিতীয় কন্যার একটি কন্যা ছিল। মহারানী স্বর্ণময়ী অপুত্রক। তাঁর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথের একমাত্র ভগিনী **গোবিন্দসুন্দরীর** পুত্র (অষ্টম গর্ভ) মনীন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয় ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৭ সন (জুন, ১৮৬০ খ্রীঃ)। কাশিমবাজারের ভাবী জমিদার মনীন্দ্রচন্দ্রের পিতা নবীনচন্দ্র নন্দী বর্ধমান জেলার মথরুণ গ্রামের মানুষ। মনীন্দ্রচন্দ্র তাঁর পিতামাতা উভয়ের মৃত্যুর পর, তাঁর মেজ বোন বিশ্বেশ্বরী দেবীর কাছে পালিত হন। বেশ কয়েক বছর তাঁর বাল্যজীবন কাটে বর্ধমানে, যদিও তাঁর জন্ম হয়েছিল কলকাতায় শ্যামবাজারে রামকান্ত বসু লেনের বাড়ীতে। তাঁর লেখাপড়া শুরু হয় শ্যামবাজার বাংলা স্কুলে, পরে হিন্দু স্কুলে। কৈশোরে মনীন্দ্রচন্দ্র মাতামহী রাণী হরসুন্দরী ও মামী মহারানী স্বর্ণময়ীর কাছ থেকে বিশেষ কোনো সাহায্য পাননি, মাসিক কয়েক'শ টাকা ভাতা ছাড়া। দারুণ অর্থাভাবে মনীন্দ্রের প্রথম জীবন কেটেছিল। মহারানী স্বর্ণময়ী তাঁর আত্মীয় পরিজনের কুপরামর্শে মনীন্দ্রচন্দ্রের মুখদর্শনেও অপারগ ছিলেন, বলতেন 'মনী আমাকে মেরে ফেলবে, ওর মুখ দেখতেও ইচ্ছে করে না।' ১৮৭৫ খ্রীঃ মাত্র পনের বছর বয়সে মনীন্দ্রচন্দ্রের বিবাহ হয় বর্ধমানের রামগোপাল নন্দীর কন্যা কাশীশ্বরী দেবীর সঙ্গে।

সাঁইত্রিশ বছর বয়সে কাশিমবাজারের জমিদারীর মালিক হন ১৮৯৭ খ্রীঃ, যদিও ইংরাজ সরকারের স্বীকৃতি পান ৩০ মে, ১৮৯৮ খ্রীঃ। ইংরাজ সরকার মনীন্দ্রচন্দ্রের আদর্শ চরিত্র ও দান-শীলতার স্বীকৃতি-স্বরূপ ৩০ মে, ১৮৯৮ খ্রীঃ তাঁকে 'মহারাজা' ও 'কে. সি. আই. ই' উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৯০১ খ্রীঃ বঙ্গীয় আইন পরিষদ ও পরে ভারতীয় আইন সভার মনোনীত সভ্য হন। মনীন্দ্রচন্দ্রের প্রথম পুত্র মহারাজ কুমার মহিমচন্দ্রের জন্ম হয় ১৮৮১ খ্রীঃ। মারা যান বৃন্দাবনে ২৬ মার্চ, ১৯০৭ খ্রীঃ। দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ কুমার কীর্তিচন্দ্রের জন্ম ১৮ মে, ১৮৯৫ খ্রীঃ এবং মৃত্যু ২৮ অক্টোবর, ১৯০৩ খ্রীঃ। তৃতীয় পুত্র ও ভাবী মহারাজা শ্রীশচন্দ্র-এর জন্ম হয় ১১ অক্টোবর, ১৮৯৭ খ্রীঃ কলকাতায় রাজবাড়ী 'রানী কুঠিতে', ৩০২, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডে।

মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র মুক্তহস্তে দান ও বহুমুখী জনসেবার কাজে মহারানী স্বর্ণময়ীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তাঁর সময়ে বাহারবন্দ, রংপুর, বেলডাঙ্গা ও অন্যান্য জমিদারী এবং কয়লাখনি (একরা) প্রভৃতি থেকে আয় হলেও ঋণের বোঝা কমেনি। বিদ্যোৎসাহী মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র ১৯০৬ খ্রীঃ (১৩১৪ সন) কাশিমবাজারে 'বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন'-এর প্রথম অধিবেশনের প্রধান আয়োজক ছিলেন। সভাপতি—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সম্পাদক-উদ্ভ্রান্ত প্রেম রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় আর স্বয়ং মনীন্দ্রচন্দ্র অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। বৈষ্ণব ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি ও প্রচারের উদ্দেশ্যে, তিনি 'বৈষ্ণব সম্মেলনীর' প্রথম অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। তাঁকে 'শ্রী গৌর-রাজর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বিদ্যোৎসাহী রাজার পৈত্রিক বাসভূমিতে মথরুণ ইনিষ্টিটিউশন, গোবিন্দসুন্দরী হাইস্কুল, দৌলতপুর ছাত্র নিবাস, নবদ্বীপে বৈষ্ণব-দর্শন বিদ্যালয়, রংপুর কারমাইকেল কলেজ, কলকাতা মহাকালী পাঠশালা, বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ, বোস ইনষ্টিটিউট, প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাঁর দানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর [১] বর্তমান বাড়ী তৈরীর জন্য ১৯০১ খ্রীঃ রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র সাত কাঠা জমি দান করেন। কবি রজনীকান্ত সেন এবং আরও কয়েকজন সাহিত্যিককে আর্থিক সাহায্য ছাড়া, দেশনেতা সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার আর্থিক দুরবস্থা থেকে তাঁকেই বাঁচাতে

১। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর সূচনা হয় ৮ শ্রাবণ, ১৩০০ সন (২৩ জুলাই, ১৮৯৩ খ্রীঃ) বিনয়কৃষ্ণদেবের উৎসাহে, শোভাবাজার রাজবাড়ীতে 'বেঙ্গল এ্যাকাডেমী অফ লিটারেচার'-এর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। পরিষৎ-এর নামকরণ হয় ১৭ বৈশাখ, ১৩০১ সন (২৯ এপ্রিল, ১৮৯৪ খ্রীঃ)। সভাপতি—রমেশচন্দ্র দত্ত; সহ-সভাপতিদ্বয়—নবীনচন্দ্র সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; যুগ্ম সম্পাদক—লিওটার্ড সাহেব ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

হয়েছিল। মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্রের সভাপতিত্বে ৭ আগষ্ট, ১৯০৫ খ্রীঃ কলকাতায় টাউন হলে বিলাতী বর্জনের আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। তাঁর পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ। কর্মবীর মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২৬ কার্তিক, ১৩১৮ সন (জুন, ১৯০৯ খ্রীঃ)।

মহারাজা শ্রীশচন্দ্র

মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র মহারাজা শ্রীশচন্দ্র তাঁর জমিদারীর ব্যয়ভার বেড়ে যাওয়া ও দান-ভাণ্ডারে অর্থ জোগান দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'গিলেণ্ডার আরবুথনট্ কোম্পানীর' সহায়তায়, কাশিমবাজার জমিদারী বন্ধক রেখেপ্রায় এক কোটিটাকার 'ইংলিশ ডিবেঞ্চার' ধার নেন। মহারাজা মাসিক মাত্র ৩৫ হাজার টাকার বৃত্তিভোগী হন ১৯২২ খ্রীঃ। জমিদারী 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস'-এর অধীনে চলে যায় ১৯২৯ খ্রীঃ। মহারাজার মনের নিদারুণ দুঃখে শরীর ভেঙ্গে পড়ে।

শ্রীশচন্দ্র বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে লেখাপড়া শুরু করে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। বিবাহ হয় দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমাদানাথ রায়ের দ্বিতীয়া কন্যা নিলীমাপ্রভার সঙ্গে এপ্রিল, ১৯১৭ খ্রীঃ। ৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৮ খ্রীঃ একমাত্র পুত্র সোমেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয়। ১৯২৪ খ্রীঃ বঙ্গীয় আইন পরিষদ-এর সভ্য নির্বাচিত হন। বংশগত 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। জীবনের অবসান ঘটে ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২ খ্রীঃ। মহারাজা শ্রীশ্চন্দ্রের পুত্র ডঃ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী রাজপরিবারের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাক্রমে ডি. লিট. ও পি. এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত স্বীকৃত গবেষক। তাঁর লেখনী-প্রসূত মূল্যবান বই—**Life and Times of Canto Baboo, the Banian of Warren Hastings (1742-1804 A. D.)**। কলকাতায় 'কাশিমবাজার রাজবাড়ী' ৩০২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড বাসভবনে স্ত্রী শ্রীমতী রত্না, পুত্র শমিত নন্দী, পুত্রবধূ রেবতী এবং পৌত্র সুদর্শনকে নিয়ে তাঁর সংসার।

লালগোলার রায় রাজপরিবার

মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা (রেলওয়ে ষ্টেশন) মুর্শিদাবাদ শহর থেকে প্রায় সাতাশ কিলোমিটার। লালগোলা রাজপরিবারের ইতিহাসের[১] জন্ম হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের গাজীপুর জেলার এক পল্লীগ্রামে। কৌশিক বংশীয় ভূমিহার **মহিম রায়** লালগোলার রাজবংশের আদিপুরুষ। খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের শেষ ভাগে মহিম রায় গাজীপুর থেকে রাজসাহীর সুন্দরপুর গ্রামে চলে আসেন। সুন্দরপুর পদ্মাগর্ভে বিলীন হওয়ায়, তাঁর দুই পুত্র **দুলাল রায়** ও রাজনাথ রায় বসতি করেন ভাগীরথী তীরে লালগোলায়। সেই সময় বাংলার নবাব নাজিম্ সরফরাজ খান (১৭৩৯-৪০ খ্রীঃ) দেওয়ান সরাইয়ের শিবিরে অবস্থানরত ছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন দুলাল রায় বহু উপঢৌকন ও নজরানা নিয়ে হাজির হন নবাব সমীপে। সদয় হয়ে নবাব তাঁকে কিছু জায়গীর ও রাজকর্মচারী পদের মর্যাদা দেন। রাজকার্যে যুক্ত থাকায় বিত্তশালী জমিদার হতে তাঁকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দুলাল রায় নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যান, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নীলকান্ত রায় জমিদারীর মালিক হন।

নীলকান্ত রায় নবাবের সুবাদার রাও অগ্নু সিংহ-এর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং পরে সুবাদার পদে আসীন হন। তিনি 'রাও' উপাধি লাভ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই পুত্র **রাও আত্মারাম** অকালে মারা যান।

রাও রামশংকর

রাও আত্মারামের পুত্র রাও রামশংকর রায় ছিলেন লালগোলার রায় রাজবংশের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও উন্নতীর উদ্যোগী পুরুষ। তিনি পিতার ন্যায় কিছুদিন নাজিমের সুবেদারী করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত লালগোলার রঘুনাথদেবের মন্দির ছাড়া,[২] কালী মন্দিরের যে বিগ্রহ তিনি বসান, তা অনন্য সাধারণ! মা কালী এখানে মহাদেবের বুকে নৃত্যরতা, উপরের দুই হাত পরস্পরে আবদ্ধ, অপর দুটি হাতে 'বরদা' ও 'অভয়-মুদ্রা'।

১। History of Murshidabad—Walsh.

২। রাও রামশংকর রায়ের সময়ে লালগোলায় রথযাত্রা উৎসব ও মেলা মুর্শিদাবাদে আলোড়ন সৃষ্টি করত।

রাও রামশংকরের পুত্র **রাও মহেশনারায়ণ রায়** জমিদারীর মালিক হন। সাওতাল বিদ্রোহের সময় (১৮৫৭ খ্রী:) ইংরাজ সরকারকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ঠিক সেই সময় জঙ্গীপুরের জেলাশাসক ছিলেন মিঃ এস্‌লি ইডেন্ (পরে বাংলার ছোটলাট)। রাও মহেশনারায়ণের সঙ্গে এক সময় ইংরাজ সরকারের ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ভগবানপুরের ইংরাজ ম্যানেজার গোপনে মহেশনারায়ণের বিরুদ্ধে সিপাহি বিদ্রোহে সহযোগিতা না করার মিথ্যা তথ্য পাঠিয়েছিলেন। ফলে প্রায় সাতশো সশস্ত্র সৈনিক বাহিনী লালগোলায় হাজির হয়। সরজমিন তদন্তে অভিযোগ মথ্যা প্রমাণিত হয় এবং মহেশনারায়ণকে শান্তিকামী ও রাজভক্ত জমিদার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

রাজা রাও যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর

মহেশনারায়ণ অপুত্রক এবং স্বল্পায়ু ছিলেন। তাঁর স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী দেবী যোগীন্দ্র নারায়ণরায়কে দত্তক নেন। কৈশোরে নিজগৃহে খুব বেশী লেখাপড়া শেখার সুযোগ সুবিধা না পেলেও, পরে কয়েকটি বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান সঞ্চয় করেন। সাহিত্য-অনুরাগী যোগীন্দ্রনারায়ণ বেশ কয়েকটি প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের অনুবাদ বা পুনর্মুদ্রণে অর্থব্যয় করেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ'-এর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। স্বীয় জমিদারী সুষ্ঠ পরিচালনা ছাড়া, তাঁর নিরলস জনহিতকর কাজের জন্য তিনি লালগোলা ও সংলগ্ন এলাকার মানুষের প্রাতঃস্মরণীয়। কৃষ্ণপুর, বিষ্ণুপুর, গদাইপুর, কাটোয়া, ব্যাসপুর, বালুচর, মাজা প্রভৃতি গ্রামে কালী বা শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। লোকশিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য 'মহেশনারায়ণ একাডেমি' জঙ্গীপুর ছাত্রাবাস, সাধারণ পাঠাগার ও দাতব্য চিকিৎসালয়, অবস্থানগৃহ প্রভৃতি তাঁরই একান্ত চেষ্টায় তৈরী হয়েছে। মুর্শিদাবাদে জল সরবরাহের কাজে এক লক্ষ টাকা দান করেন।

বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পেল ১৮৭৭ খ্রীঃ যোগীন্দ্রনারায়ণকে 'সম্মানসূচক সার্টিফিকেট' প্রদান করেন। মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক জয়ন্তী সমারোহে (২২ জুন, ১৮৯৭ খ্রী:) আরেকটি 'সার্টিফিকেট' (১৯০৩ খ্রী:), 'রাজা' (১৯০৯ খ্রী:) 'রাজা বাহাদুর' (১৯১৩ খ্রী:), 'কাইজার-ই-হিন্দ', 'সি.-আই.-ই.' প্রভৃতি খেতাবে ভূষিত হন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে অনুকরণীয় গুণ হলো, তিনি পুরাকালের রাজর্ষিদের মত জীবন-যাপন করতেন। সব সময়ে রুদ্রাক্ষের মালা ছিল গলায় আর বসনে গেরুয়া। তাঁর প্রগাঢ় ধর্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠার জন্য তাঁকে 'বঙ্গরত্ন' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১৮ আগষ্ট, ১৯৪৬ খ্রীঃ। রাজা যোগীন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র-হেমেন্দ্রনারায়ণ ও সত্যেন্দ্রনারায়ণ (অপুত্রক) ও দুই কন্যা। হেমেন্দ্রনারায়ণ পিতার জীবিত অবস্থায় মারা যান, তাঁর পুত্র ধীরেন্দ্রনারায়ণকে রেখে।

রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় ৪ নভেম্বর, ১৮৯৭ খ্রীঃ। রাজবংশের কৃতী সন্তান ধীরেন্দ্রনারায়ণ সুসাহিত্যিক ও লেখক। তাঁর লেখনী-প্রসূত 'স্পর্শের প্রভাব', 'অচলপ্রেম', 'নীলশাড়ী', 'চিরন্তনীর জয়', 'পতিব্রতা' নাটক প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজনা। ধীরেন্দ্রনারায়ণ মনীষী রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর কাছে বিদ্যালাভ করার সৌভাগ্য ও পরে সাহিত্য-চর্চ্চার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর জনহিতকর কাজ, রাজভক্তি ও চারিত্রিক গুণাবলীর স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৯৪৫ খ্রীঃ স্যার রিচার্ড্ জে. কেসি (বাংলার গভর্নর) তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। দক্ষ শিকারী হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। কয়েকটি শিকার কাহিনীও তাঁর লেখা। শরীর চর্চ্চা ও খেলাধূলায় তিনি নিজে অংশগ্রহণ করে উৎসাহিত করতেন। মৃত্যু হয় ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৪ খ্রীঃ। কলকাতায় ৪, মালিন পার্ক বাসভবন তৈরী করেন ১৯৩৯ খ্রীঃ ও তাঁর জীবনের শেষ ৩০ বছর এখানেই বাস করেছেন।

রাজা রাও ধীরেন্দ্রনারায়ণের এক পুত্র বীরেন্দ্রনারায়ণ ও পাঁচটি কন্যা।[১] বীরেন্দ্র নারায়ণের বিবাহ হয় হেতমপুর রাজবাড়ীর কুমার রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তীর কন্যা প্রণতি দেবীর সঙ্গে। তাঁদের এক পুত্র—রূপেন্দ্রনারায়ণ ও দুই কন্যা—অনিন্দীতা (স্বামী প্রদীপ বক্সী) ও কুমারী ডাঃ মধুমিতা রায়। বীরেন্দ্রনারায়ণ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ও বঙ্গীয় বিধান সভার নির্বাচিত প্রাক্তন সদস্য।

১। তৃতীয়া কন্যা তটিনী দেবী মহিষাদলের কুমার শক্তিপ্রসাদ গর্গের স্ত্রী।

পাটনার দেওয়ান রাজা রামনারায়ণ

নবাব আলিবর্দী খানের শাসনকালে প্রভাবশালী রাজনীতিবিদদের মধ্যে রাজা রামনারায়ণ অন্যতম। ১৭৫৩ খ্রীঃ নবাব আলিবর্দী পাটনায় রাজা দুর্লভরামকে দেওয়ান ও রামনারায়ণকে নায়েব নাজিমের গদিতে বসান। অনেকেই মনে করেন যে, রাজা রামনারায়ণই একমাত্র উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যিনি প্রতিপালক নবাব আলিবর্দীর নাম স্মরণ করে, তাঁর উত্তরাধিকারী নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্রের বাইরে থেকেছেন। ২৯ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ মীরজাফর নবাব মসনদে বসেন, কিন্তু পাটনার দেওয়ান রামনারায়ণ নূতন নবাবকে প্রথমে স্বীকার করেননি। ফলে নবাব সসৈন্যে পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন। রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে রামনারায়ণের হৃদতা থাকায় পরিত্রাণ পান।

চুঁচুড়ার কাছে বেদারায় ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে ইংরাজদের সংঘর্ষ ঘটে ২১ নভেম্বর, ১৭৫৯ খ্রীঃ। রাজা রামনারায়ণ মীরজাফরের আদেশে ওলন্দাজদের পাটনার কুঠী অবরোধ করেন। যুদ্ধে পরাজিত ওলন্দাজরা বাংলা থেকে বিতাড়িত হন। এছাড়া মোগল সম্রাট দ্বিতীয় আলমগীর ও অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা পাটনা অবরোধ করে রামনারায়ণকে বন্দী করেন। নবাব মীরজাফর মেজর কাইলাণ্ডের নেতৃত্বে, ইংরাজ সৈন্যদের সাহায্যে পাটনা মুক্ত করেন।

নবাব মীরকাশিমের শাসনকালে রাজা রামনারায়ণ শান্তিতে বাস করতে পারেননি। তিনি একজন বিশেষ ঐশ্বর্যশালী রাজপুরুষ। মীরকাশিম ইংরাজ কোম্পানীকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য রামনারায়ণের কাছে সময়ে অসময়ে মোটা অঙ্কের টাকার দাবী করতেন। ইংরাজদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও, মীরকাশিমের মিথ্যা অভিযোগ-পত্রের [১] (১৭ জুন, ১৭৬১ খ্রীঃ) ভিত্তিতে, ইংরাজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট-এর আদেশে, ইংরাজ সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল কূট ও মেজর কারণ্যাক্ রামনারায়ণকে বন্দী করে মীরকাশিমের হাতে তুলে দেন সেপ্টেম্বর, ১৭৬১ খ্রীঃ। রামনারায়ণের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করেন। পরে উধুয়ানালার তীরে ইংরাজদের কাছে মীরকাশিম পরাস্ত হলেন ৪ সেপ্টেম্বর, ১৭৬৩ খ্রীঃ। প্রতিহিংসাপরায়ণ মীরকাশিম রাজা রামনারায়ণকে বন্দী অবস্থায় হত্যা করেন। ইংরাজ ও নবাব—উভয়ের কাছে তিনি অবাঞ্ছিত।

রাজা রামনারায়ণ একজন বিশেষ শিক্ষিত রাজপুরুষ। ফার্সী ভাষায় তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত। তাঁর রচিত অনেকগুলি শেইর (কবিতা) পাওয়া যায়। তাঁর কবি প্রতিভার স্বীকৃতি হিসাবে তাঁকে 'মৌজুন' উপাধি দেওয়া হয়েছিল।

১। রাজা রামনারায়ণ নাকি পাটনার রাজস্বের মোটা অংশ আত্মসাৎ করেছেন। হিসাব দাখিলে অস্বীকার করেছেন ও ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন, ইত্যাদি মিথ্যা অভিযোগ।

নসীপুরের সিংহ রাজপরিবার

মুর্শিদাবাদ

সুদূর ইংলণ্ডে ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে দাঁড়িয়ে মহামতী এডমণ্ড বার্ক তাঁর ভাষনে নিন্দিত রাজা দেবী সিংহকে অমর করে গিয়েছেন। বার্কের জ্বালাময়ী বক্তৃতায় রাজা দেবী সিংহের নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি ও দুর্বিষহ অত্যাচার যে ভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা বাক্য-পরম্পরায় শুনে আজ আড়াইশ বছর পরেও, বহু স্ত্রীলোক শোকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তে পারেন। মারাঠী বর্গীদের অমানুষিক অত্যাচারও (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) কোন অংশেই দেবী সিংহের বর্বর নিষ্ঠুরতার চেয়ে বেশী নয়।

রাজা দেবী সিংহের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রবার্ট ক্লাইভ ও মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিম মুর্শীদকুলী খানের দৌহিত্র ও বাংলার নায়েব-দেওয়ান (১৭৬৫-৭২ খ্রীঃ), নৃশংস পরাক্রমশালী কুখ্যাত নবাব সৈয়দ মহম্মদ রেজা খান। ১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ ভয়াবহ ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ-কবলিত বৃহৎ-বঙ্গে প্রজা-জমিদাররা কল্পনাতীত দুঃখ কষ্টে পড়েন। এই ভয়াল দুর্দিনের বিবরণ 'নবাবশাহি আমল' পরিচ্ছেদে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকে বাংলায় ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে বিশৃঙ্খলতা ও অরাজকতার মধ্যে সুদূর পাণিপথ থেকে মুর্শিদাবাদে আসেন আগরওয়াল বৈশ্য সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যবসায়ী রায় **তারাচাঁদ সিংহ**। তাঁর জ্যেষ্ঠ প্র-পৌত্র রায় **অমর সিংহ**। তাঁর চার পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ রায় **দেওয়ালী সিংহের** তিন পুত্র—তুলসী রাম সিংহ, দেবী সিংহ ও বাহাদুর সিংহ। **দেবী সিংহ** ব্যবসায়ী হলেও তাঁর মনের বাসনা ছিল রাজ্য সরকারের কোন উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার। সুযোগও এসে গিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ কোম্পানীকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করেন। ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে মহম্মদ রেজা খান আর পাটনায় রাজা সেতাব রায়কে নায়েব-দেওয়ান পদে বসান, নির্দিষ্ট অঙ্কের রাজস্ব আদায়ের নির্দেশ দিয়ে। পরোক্ষে শক্তি প্রয়োগের ইঙ্গিত নিশ্চয়ই ছিল।

মহম্মদ রেজা খানের অর্থাভাব সব সময়ই লেগে আছে। দেবী সিংহ রেজা খানকে চাহিদা মত টাকা দিতে থাকেন। পুরস্কার স্বরূপ পুর্ণিয়ার ইজারা ও শাসনভার দেবী সিংহ লাভ করেন। 'মহারাজা' উপাধি পান। রাজস্ব আদায়ের নামে রাজ্যে পৈশাচিক তাণ্ডব চালাতে থাকেন প্রজা-জমিদারদের উপর।[১] ফলে পুর্ণিয়া ছেড়ে বহু মানুষ চলে যায়।

১। ১৮৭৪ খ্রীঃ বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে এই অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন—'বার্ক দেবী সিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার পর্বোতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময়ী বাক্য-স্রোতে অনন্তকাল সমীপে পাঠাইয়াছেন। আজও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর লোমাঞ্চিত ও হৃদয় উন্মত্ত হয়।'

২। নসীপুর মুর্শিদাবাদে লালবাগ্ শহরের সংলগ্ন এলাকা।

ষোল লক্ষ টাকার বন্দোবস্ত ইজারায়, মাত্র ছয় লক্ষ টাকা আদায় হয়। এই বিপর্যয়ের সামাল দিতে ও দুর্নাম থেকে বাঁচার তাগিদে, হেষ্টিংস সাহেব ১৭৭২ খ্রীঃ দেবী সিংহকে গদীচ্যুত করেন এবং অমানুষিক অত্যাচারের কথা জন-সমক্ষে প্রচার করেন। কয়েকজন ছোকরা ইংরাজকে সভ্য করে মুর্শিদাবাদে একটি 'প্রাদেশিক সমিতি' গঠন করা হয় ১৭৭৩ খ্রীঃ ও রাজা দেবী সিংহকে সহকারী কার্যাধক্ষ নিযুক্ত করা হয়। দেবী সিংহ তাঁর আভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সেই সব অপরিণত ইংরাজ যুবকদের সুন্দরী নায়িকা ও বাঈজীদের সাহায্যে উশৃঙ্খল জীবন-যাত্রার পথে চালিত করেন।[১] নিজেই প্রকৃত কর্তা-হয়ে পুনরায় তাঁর দক্ষযজ্ঞ সুরু করেন। এই নক্কার-জনক ব্যাপারে শীঘ্রই কোম্পানীর উর্দ্ধতন কর্মচারীদের নজরে পড়ে ও তাঁরা দেবী সিংহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

হেস্টিংস্ সাহেব এই সব জেনে-শুনেও, তাঁর নিজস্ব অসৎ উপায়ে আয়ের যোগানদার রাজা দেবী সিহংকে পুনরায় দিনাজপুর, রংপুর, ইদ্রাকপুর প্রভৃতি ইজারা দিয়ে **দিনাজপুরের** নাবালক জমিদার **রাজা রাধানাথ রায়ের** দেওয়ান নিযুক্ত করেন এক হাজার টাকা মাসিক বেতনে। হেস্টিংস্ মুর্শিদাবাদের 'প্রাদেশিক সমিতি' আগেই ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। এই দিনাজপুরই দেবী সিংহের অত্যাচারে বধ্য ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। সেই সময়ে কান্দীর **গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ** (১৭৭৫-৭৬)[২] ও কাশিমবাজারের **কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে** হেস্টিংস সাহেব যথাক্রমে কোম্পানীর দেওয়ান ও স্বীয় কার্যালয়ের দেওয়ান নিযুক্ত করেন।

রাজা দেবী সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও রংপুরের কলেক্টর গুডল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে যেন তেন প্রকারেণ অর্থ সংগ্রহ করার পাশবিক পন্থা অবলম্বন করেন। প্রজাদের উপর কল্পনাতীত নিপীড়ন, এমন কি, নারী জাতির সতীত্বের চরম লাঞ্ছনা[৩]

১। 'Accordingly in plain terms he (Devi Singh) opened a local brothel, out of which he carefully reserved the very flower of his collection for the entertainment of his young superiors.'—Edmund Burke.

২। ১৭৭৫ খ্রীঃ উৎকোচ গ্রহণ অপরাধে গঙ্গাগোবিন্দকে অপসৃত করা হলেও, ১৭৭৬ খ্রীঃ তাঁকে পুনঃ নিয়োজিত করা হয় হেষ্টিংসের হুকুমে। মুর্শিদাবাদের কলেক্টরের লেখা চিঠিতে, ৩০ এপ্রিল, ১৮০৫ খ্রীঃ, দেবী সিংহকে 'মহারাজা' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৩। 'Leading yeomen, chiefs of villages and leading farmers were tied two and two by legs together throwing them with their heads downwards over a bar, beat them......, they (the tormentors) applied instead of batan and bamboo, whips made from branches of Bale tree (বেল গাছ) full of sharp and strong thorns'.

তাঁর আদেশেই সম্ভব হয়েছিল। ছোট বড় জমিদার ও প্রজাদের জমিদারী নাম-মাত্র মূল্যে নিলামে অধিগ্রহণ করাই ছিল নৈমিত্তিক রীতি। এই প্রসঙ্গে গ্লেজিয়ার সাহেবের রিপোর্টে (২৮ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৩ খ্রীঃ) দেখা যায় যে, সেই সময়ে উত্তরবঙ্গে রংপুরে প্রজা বিদ্রোহ হয়েছিল মোগলহাট ও পাটগ্রামে। খণ্ড যুদ্ধে লেঃ ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড-এর সিপাহীদের হাতে দরাশীল (দয়ারাম) ও নুরুলউদ্দিন নামে দুই নেতার মৃত্যু হয়। রাজস্ব আদায়ের কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ইংরাজ কোম্পানী একজন নির্ভিক ও সাধু চরিত্রের মানুষ পেট্রারশন্ সাহেবকে রংপুরের কলেক্টর করে পাঠান। তিনি সরজমিনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সফর করার পর, দেশের দুর্দশা ও দেবী সিংহের কঠোর অত্যাচারের কথা কয়েকবার জানিয়েছিলেন। 'কলিকাতা কমিটি' দেবী সিংহের প্রতি দস্তক জারি করে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বভার থেকে মুক্তি দেন। তাঁকে কান্দীতে বন্দী অবস্থায় বেশ কিছু কাল থাকতে হয়েছিল। দেবী সিংহের আপীলে, কোম্পানী, হেস্টিংসের হস্তক্ষেপে পেট্রারশন্ সাহেবের অভিযোগ অগ্রাহ্য করেন। দেবী সিংহকে দেওয়ানী আদালতে অভিযুক্ত না করে ফৌজদারী আইনে বিচার করা হয়। প্রধান বিচারক দেবী সিংহের পুরানো মালিক ও বন্ধু মহম্মদ রেজা খান। প্রত্যাশিত রায়ে দেবী সিংহ খালাস পান যদিও লোক-চক্ষুতে তিনি একজন ঘৃণিত হত্যাকারী অপরাধী। হেস্টিংস ১৭৮৫ খ্রীঃ দেশে ফিরে যান। লর্ড কর্নওয়ালিস্ (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। কর্নওয়ালিস্ মহারাজা দেবী সিংহকে সব রকম কাজকর্ম থেকে অব্যাহতি দেন। বিপুল ধন-সম্পত্তি নিয়ে মুর্শিদাবাদে নসীপুরে তাঁর কলঙ্কিত জীবনের শেষ দিন (এপ্রিল, ১৮০৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত বাস করেন।

দেবী সিংহের দুই স্ত্রী—মুন্নুকিশোরী ও কৃষ্ণা। দুজনেই নিঃসন্তান হওয়ায় দেবী সিংহ দত্তক নেন, তাঁর ছোট ভাই বাহাদুর সিংহের দ্বিতীয় পুত্র **বলবন্ত সিংহকে**। বলবন্ত সিংহের পুত্র **গোপাল সিংহ**। বাহাদুর সিংহের তৃতীয় পুত্র রাজা **উদবন্ত সিংহ** তাঁর কলঙ্কিত পূর্ব-পুরুষের (দেবী সিংহ) ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর আমলে প্রজাদের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তিনি কিছুকাল মুর্শিদাবাদের নবাব-নাজীমের দেওয়ান ছিলেন। তিনি ২৭ নভেম্বর, ১৮১৯ খ্রীঃ তাঁর কলকাতার সম্পত্তি নসীপুরের রাজবংশের কুলদেবতা 'রঘুনাথ' মন্দিরের নামে দেবোত্তর করেন। পরবর্তী উত্তরাধিকারী যথাক্রমে রাজা কিষাণ চাঁদ ও রাজা কিরীট চাঁদ।

রাজা কিরীট চাঁদের দত্তক পুত্র **মহারাজা রণজিৎ সিংহ**। রণজিৎ সিংহের জন্ম হয় ৯ জুন, ১৮৬৫ খ্রীঃ। তাঁর নাবালক অবস্থায় 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্'-এ জমিদারী চলে

যায়। লেখাপড়া শুরু করেছিলেন বহরমপুর কলেজে। তাঁর বিবাহ হয় ১৮৮৩ খ্রীঃ। ৯ জুন, ১৮৮৬ খ্রীঃ সাবালক হয়ে জমিদারী নিজের হাতে নেন। জমিদারীর ভার নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। নিজের অধ্যবসায় ও দক্ষতায় জমিদারের কর্তৃত্ব প্রমাণ করেন ও জমিদারীকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। মহারাজা রণজিৎ সিংহ ছিলেন একজন প্রগতিশীল জমিদার। সরকারী কর্মচারীদের ন্যায়, তাঁর জমিদারীর কর্মচারীদেরও বেতন, পেনসন এবং ছুটির বন্দোবস্ত করেন। তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ১৮৮৭ খ্রীঃ। মুর্শিদাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন ১৮৮৮ খ্রীঃ। মহারাজা রণজিৎ সিংহ নসীপুর রাজপরিবারে সবচেয়ে স্মরণীয় রাজপুরুষ। তাঁর বহু জনহিতকর কাজ ও সরকারের তহবিলে মুক্তহস্তে দানের স্বীকৃতি-স্বরূপ ইংরাজ সরকার তাঁকে, ১ জানুয়ারী, ১৮৯১ খ্রীঃ 'রাজা' ও পরে ২২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন ১৮৯৯ খ্রীঃ। ১ জানুয়ারী, ১৯১০ খ্রীঃ 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাব পান, আর 'রাজা বাহাদুর' খেতাব নসীপুরের বংশানুক্রমিক অধিকার বলে সরকার ঘোষণা করেন। জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে মহারাজা রণজিৎ সিংহ নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম। মহারাজা রণজিৎ সিংহ মারা যান মে, ১৯১৮ খ্রীঃ। তার চার পুত্র—ভূপেন্দ্রনারায়ণ, নৃপেন্দ্রনারায়ণ, রাজেন্দ্র-নারায়ণ ও বীরেন্দ্রনারায়ণ।

মহারাজা রণজিৎ সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় ১৮৮৮ খ্রীঃ। শিক্ষালাভ করেন ন্যাশ্‌নল্‌ হাই স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক হন। তিনি ছিলেন লোকপ্রিয় দক্ষ জমিদার। অপর দুই ভাইয়ের সহযোগিতা তিনি পেয়েছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব দেন ১৭ মার্চ, ১৯১৮ খ্রীঃ। মারা যান ১৯৪৯ খ্রীঃ। তিনি ১৯২৯ খ্রীঃ বাংলার মন্ত্রিপরিষদের সভ্য ছিলেন। রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণের এক পুত্র রণেন্দ্রনারায়ণ (ব্যবসায়ী) এবং একমাত্র পৌত্র রঞ্জনারায়ণ, ইলেকট্রনিক্‌স্‌ ইন্‌জিনিয়ার। এঁরা ৭, প্রসন্ন নস্কর লেন, তিলজলা অঞ্চলে নিজেদের বাসভবনে থাকেন। কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের চার পুত্র—অমরেন্দ্র, সৌরেন্দ্র, অজিতেন্দ্র ও গুণেন্দ্র। সৌরেন্দ্র নসীপুর ভিটায় এখনও থাকেন। কুমার রাজেন্দ্রের এক পুত্র—জিতেন্দ্র। তাঁর তিন পুত্র—রবীন্দ্র, দিলীপ, শচীন্দ্র ও পৌত্র উদয়, সুজয়, সুজিত, সুমীত। কলকাতায় পশ্চিম যাদবপুরে বাসভবনে থাকেন। কুমার বীরেন্দ্রের দুই পুত্র—সমরেন্দ্র ও বিজয়েন্দ্র (অপুত্রক)। সমরেন্দ্রের চার পুত্র—রথীন, প্রদীপ, সুভাষ, প্রবীর।

কাশিমবাজারের রায় রাজপরিবার

মুর্শিদাবাদ

নবাবশাহি বাংলায় মুর্শিদাবাদ জেলা জমিদারদের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র—কেবল কাশিমবাজারেই একাধিক প্রতিষ্ঠিত জমিদারদের অবস্থান দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের ভগবান গোলায় পিরোজপুর গ্রামের আদি বাসিন্দা কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ **অযোধ্যানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়**[১] আঠার শতকের প্রথম ভাগে কাশিমবাজারে আসেন। তাঁর পুত্র **দীনবন্ধু** চট্টোপাধ্যায় (রায়) ইংরাজ কোম্পানীর কাশিমবাজারের রেশম কুঠীর দেওয়ান ছিলেন। নবাব দরবার থেকে খেলাত ও রূপোর ছড়ি উপহার পান। তাঁর পুত্রদ্বয় **জগবন্ধু** ও **ব্রজমোহন**ও কোম্পানীর রেশম ফ্যাক্টরীর দেওয়ান হয়েছিলেন এবং তাঁরই কাশিমবাজারে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৭৯৫ খ্রীঃ জগবন্ধু হিজলীর কাঁথিতে নিমক মহলে ও মেদিনীপুরে কলেক্টরীতে দেওয়ান ছিলেন। পরে ময়মনসিংহ জেলায় দেওয়ানীর কাজ করেছিলেন। তিনি ১৮০২ খ্রীঃ সরাইল পরগণা (ব্রাহ্মণবেড়িয়া) ও মুর্শিদাবাদে জোবেড়িয়া এলাকায় জমিদারী খরিদ করেন। তাঁর দুই পুত্র রামচন্দ্র ও নরসিংহ প্রসাদ।

নরসিংহপ্রসাদের সঙ্গে কাশিমবাজারের দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর তিন কোটি টাকার মামলায় কৃষ্ণকান্ত হেরে যান। নরসিংহপ্রসাদ তাঁর দানশীলতা ও প্রজানুরঞ্জনের জন্য খ্যাতি লাভ করেন। নরসিংহপ্রসাদের দুইটি বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী রুক্মিণীদেবীর গর্ভে **রাজকৃষ্ণ** রায়ের জন্ম হয়। স্বল্পায়ু রাজকৃষ্ণ তাঁর একমাত্র নাবালক পুত্র অন্নদাপ্রসাদকে রেখে মারা যান।

অন্নদাপ্রসাদের জন্ম হয় ১৮৪৮ খ্রীঃ। সাবালক হয়ে ১৭৬৯ খ্রীঃ 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্'-এর কাছ থেকে জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ সরাইলে অন্নদা হাই স্কুল ও ১৮৭৫ খ্রীঃ ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় অন্নদা হাই স্কুল তাঁর প্রতিষ্ঠিত। ১৮৭৪-৭৫ খ্রীঃ বাংলার দুর্ভিক্ষে যথেষ্ট অর্থ দান করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ছোট লাট স্যার রিচার্ড টেম্পল তাঁর জনহিতকর কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপ তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেন। তাঁর মৃত্যু হয় ২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খ্রীঃ, মাত্র ৩২ বছর বয়সে।

---

১ ক। 'বংশ পরিচয়' প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫১—জ্ঞানেন্দ্রকুমার, ১৩২৮ সন।

খ। কলকাতার বাসভবনে লেখকের সঙ্গে রাজা কমলারঞ্জনের সাক্ষাৎকার—২৭ নভেম্বর, ১৯৯১ খ্রীঃ।

রাজা আশুতোষ নাথ রায়

অন্নদাপ্রসাদের রাণী আন্নাকালীর গর্ভে একমাত্র পুত্র আশুতোষ নাথ রায়ের জন্ম হয় ১৮৭৬ খ্রীঃ। নাবালক অবস্থায় পিতৃবিয়োগ ঘটায় 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস' জমিদারীর তত্ত্বাবধানের ভার নেয়। ৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খ্রীঃ আশুতোষ নাথ সাবালক হয়ে জমিদারীর কর্তৃত্ব ফিরে পান। বিবাহ হয় হাইকোর্টের বিচারপতি অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী সরোজিনী দেবীর সঙ্গে ২৯ জানুয়ারী, ১৮৯৩ খ্রীঃ। রায় রাজপরিবারে দান-যজ্ঞের তিনি ছিলেন অগ্রণী। লেডী ডাফরিন্ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাকল্পে এক লাখ টাকা দান করেন। কাশিমবাজার ছাড়া মুর্শিদাবাদে কয়েকটি অঞ্চলে তাঁর জনহিতকর কাজের নজীর আছে। তিনি ছিলেন দক্ষ শিকারী ও ক্রীড়া-প্রেমী। গীত, বাদ্য ও সুকুমার কলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল।

আশুতোষ নাথের সদ্‌গুণ ও সরকারের প্রতি আনুগত্যের স্বীকৃতিতে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্সী বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার সি.ই. বাক্‌ল্যাণ্ড কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদে প্রকাশ্য দরবারে তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন ২১ মে, ১৮৯৮ খ্রীঃ। বড় লাট লর্ড কার্জন কাশিমবাজার রাজপ্রাসাদে অতিথি হয়েছিলেন ফেব্রুয়ারী, ১৯০২ খ্রীঃ। রাজা আশুতোষ নাথের দুই কন্যা—অতীন্দ্র মোহিনী ও মহারাণী **জ্যোতির্ময়ী**[১] এবং এক পুত্র কমলারঞ্জন। আশুতোষ নাথের দেহাবসান হয় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯০৬ খ্রীঃ।

রাজা কমলারঞ্জন রায়

রাজা আশুতোষ নাথের একমাত্র পুত্র কমলারঞ্জনের জন্ম হয় ২৭ জুন, ১৯০৬ খ্রীঃ। তখন পিতৃহারা শিশু পুত্রের ছয় মাস বয়স।[১] অভিভাবিকা ছিলেন মা, রাণী সরোজিনী দেবী। মারা যান ১৯৫১ খ্রীঃ। কুমার কমলারঞ্জন পড়াশোনা শুরু করেন বহরমপুর স্কুল ও পরে কৃষ্ণনাথ কলেজে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন ১৯২৪ খ্রীঃ। কমলারঞ্জন[২] সাবালক হয়ে জমিদারীর ভার নেন জুন, ১৯২৭ খ্রীঃ 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্' থেকে। পূর্ব-পুরুষদের অনুসরণে দানশীল কমলারঞ্জন প্রায় ৬০টি জনহিতকর ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মানুষ ও মাটির প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসা ছিল। ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ অবদান—'সরোজিনী গার্লস হাই স্কুল' ১৯৩৬ খ্রীঃ। তা ছাড়া, তিনি কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করার জন্য একটি

১। জ্যোতির্ময়ী দেবীর বিবাহ হয় নদীয়ার মহারাজা ক্ষৌনীশচন্দ্রের সঙ্গে ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ। প্রথমা কন্যা অতীন্দ্রমোহিনীর বিবাহ হয় পানিহাটীর চুনীলাল বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে।

২। রাজা কমলারঞ্জনের বিবাহ হয় হেনারাণী দেবীর সঙ্গে ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ (১৯২৫ খ্রীঃ)

এলাকার স্থায়ী প্রদর্শনী খামার পরিচালনা করতেন। তিনি ব্রাহ্মণবেড়িয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান বিশ্ববিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ **ওস্তাদ আলাউদ্দিন খান** সাহেবকে ব্রহ্মণবেড়িয়া শহরে হালদারপাড়ায় একটি বসত-বাড়ী উপহার দেন। এটি সংগীত-প্রেমী রাজা কমলারঞ্জনের সংগীত সাধকদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন। দেশ বিভাগের পরেও ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মানুষের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রেখে চলেছেন, যদিও ১৯৫১ খ্রীঃ পূর্ব-পাকিস্তানসরকারের জমিদারী বিলুপ্তি আইন বলে রাজপরিবারের কর্তৃত্ব লোপপ্রাপ্ত হয়। কমলারঞ্জনের দানশীলতা, রাজভক্তি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ইংরাজ সরকার (লর্ড লিনলিথগো) ৯ জুন, ১৯৩৮ খ্রীঃ, (সম্রাট পঞ্চম জর্জের জন্ম দিনে), তাঁকে 'রাজা' খেতাব দেন। সারা বাংলার তিনিই শেষ খেতাবী রাজা এবং এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছেন। কাশিমবাজারের রাজবাড়ীতে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। কলকাতায় তাঁর প্রাসাদোপম সুসজ্জিত বাড়ীটিতে (১/২ হরিশ মুখার্জী রোড, ভবানীপুর) নিজস্ব গ্রন্থাগারে মূল্যবান সংগ্রহ তাঁর বর্তমানের অন্যতম সঙ্গী। অশীতিপর রাজা এখনও যথেষ্ট কর্মক্ষম। তাঁর একমাত্র পুত্র কুমার প্রশান্ত (জন্ম ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ খ্রীঃ) ও দুই কন্যা—দেবীকা দেবী ও ভারতী দেবী। প্রশান্ত কুমার কলকাতায় একজন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তাঁর স্ত্রী সুপ্রিয়া দেবী ও একমাত্র পুত্র পল্লব রায়।[২]

এখনও পর্যন্ত কাশিমবাজারের রাজবাড়ীতে প্রাচীন দুর্গা পূজাটি রাজা কমলারঞ্জনের উপস্থিতিতে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ্মী পূজা ও কালী পূজাও যথারীতি হয়। ৪৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও, দেশ বিভাগের পরে কাশিমবাজার রায় রাজপরিবারের জনহিতকর কাজের উচ্ছসিত প্রশংসা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণবেড়িয়া অন্নদা সরকারী উচ্চবিদ্যালয়ের শতবর্ষ পূর্তি (১৮৭৫-১৯৭৫ খ্রীঃ) উপলক্ষ্যে—ঐ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র মোঃ হাবিবুল্লাহ্-এর প্রকাশিত স্মারকপত্রে (৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭ খ্রীঃ)—'রাজপরিবারের কৃতী পুরুষ জগবন্ধু রায় সরাইল পরগণার পাঁচ আনা বারো গণ্ডা অংশ নিলামে খরিদ করেন ১৮০২ খ্রীঃ[১] এবং সরাইল ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় জনহিতকর কার্য শুরু করেন। জগবন্ধু রায়ের পুত্র অন্নদাপ্রসাদ রায় ছিলেন সংস্কৃতিবান এক মহানুভব ব্যক্তি। ১৮৭১ সালে তিনি 'সরাইল অন্নদা হাই স্কুল' এবং ১৮৭৫ সালে 'ব্রাহ্মণবেড়িয়া অন্নদা হাইস্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। অন্নদাপ্রসাদ রায়ের পুত্র রাজা আশুতোষ কৃষকদের উৎপাদিত ধান পাট ইত্যাদির একটি স্থায়ী বাজার 'আশুতোষ বাজার' প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০০ খ্রীঃ। বর্তমানে মেঘনার তীরে আশুগঞ্জ বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ নদী-বন্দর।

১। কাশিমবাজার রায় রাজপরিবারের জমিদারী মুর্শিদাবাদ ও কুমিল্লা ছাড়া, ত্রিপুরা, রংপুর, ময়মনসিংহ, বর্ধমান, হুগলী ও বীরভূম প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল।

২। এটাই লক্ষণীয় যে, এই রাজপরিবারে কোনো দত্তক পুত্রের ভূমিকা নেই।

কৃষ্ণনগরের রায় রাজপরিবার

নদীয়া

পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর ভাঙন ও প্লাবন সত্ত্বেও প্রাচীন নদীয়া—নবদ্বীপ আজও সগৌরবে তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বিরাজিত। গত এক হাজার বছরে নদীয়া দেখেছে পাল ও সেন রাজাদের এবং পাঠান সুলতান ও মোগল সম্রাটদের নবাব-নাজিম আর ইংরাজ গভর্নরদের। সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) আনুকূল্যে নদীয়ার রায় রাজপরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজপরিবারের বংশ-তালিকায় অষ্টাদশ অধস্তন পুরুষ ভট্টনারায়ণ—নীপ থেকে শুরু করে—রাজা কাশীনাথ রায় (আনুঃ ১৫৬৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত, সকলেই বিক্রমপুরের (ঢাকা) জমিদারীতেই বাস করতেন। কাশীনাথ রাজস্ব সংক্রান্ত বিবাদে বাংলার মোগল সুবাদারের নির্দেশে সৈন্যদের হাতে নিহত হন। ভিন্ন মতে, তিনি সস্ত্রীক দেশত্যাগী হয়ে, নদীয়া জেলার বাগোয়ান পরগণায় **বিশ্বনাথ** (হরেকৃষ্ণ) **সমাদ্দারের** আশ্রয় লাভ করেন। এখানেই কাশীনাথের পুত্র শ্রীরামের জন্ম হয় ও পালিত অভিভাবকের ইচ্ছায় শ্রীরাম 'সমাদ্দার' পদবিতে পরিচিত হন। নিঃসন্তান বিশ্বনাথ সমাদ্দার শ্রীরামকে তাঁর জমিদারী (পটকাবাড়ী ও বাগোয়ান) দান করেন।

রাজা ভবানন্দ রায়

শ্রীরাম সমাদ্দারের চার পুত্র দুর্গাদাস (ভবানন্দ), জগদীশ, হরিবল্লভ ও সুবুদ্ধি। জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানন্দের রাজভাষা ফার্সীতে ব্যুৎপত্তি থাকায়, ঢাকার সুবাদারের অধীনে 'কানুনগো' পদে আসীন ছিলেন। পরে তাঁর নিজ কর্মদক্ষতায় ও সুবাদারের সুপারিশে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দিল্লী দরবার থেকে **'মজুমদার'** উপাধি পান। তখন তিনি বাস করতেন বাগোয়ান পরগণার বল্লভপুর গ্রামে। ভবানন্দ যশোহরের **'বারোভূঞা'** রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মোগল শাসনকর্তা রাজা মানসিংহকে সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধে জয়লাভের পর ১৬০৬ খ্রীঃ সম্রাট জাহাঙ্গীর, এক ফরমানে ভবানন্দকে তাঁর পিতামহ রাজা কাশীনাথের হৃত জমিদারীর বড় অংশ ও নদীয়া, মহৎপুর, লেপ, সুলতানপুর সমেত চৌদ্দটি পরগণার মালিক করে দেন। পরে ১৬১৩ খ্রীঃ উথরা, ভালুকা ও ইসলামপুর পরগণা জমিদারী এবং 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। রাজা ভবানন্দ জমিদারী পরিচালনার কাজে সুবিধার জন্য মাটিয়ারীতে একটি প্রাসাদ তৈরী করেন। রাজা ভবানন্দই নদীয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

ভবানন্দের তিন পুত্র—শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। মধ্যম পুত্র গোপাল পিতৃ-

আশীর্বাদে জমিদারীতে বসেন। বড় ভাই শ্রীকৃষ্ণ দিল্লী দরবারে নালিশ করে জমিদারীর কিছু অংশ লাভ করলেও বেশী দিন ভোগ করতে পারেননি। তাই রাজা গোপালের কাছেই সব ফিরে আসে। গোপাল সাত বছর রাজত্ব করেন।

রাজা রাঘব রায় ও পরবর্তী রাজারা

রাজা গোপালের তিন পুত্র—নরেন্দ্র, রামেশ্বর ও রাঘব। পিতার ইচ্ছানুসারে কনিষ্ঠ পুত্র রাঘব রায় (১৬৩২-৮৩ খ্রীঃ) জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। পিতামহের প্রতিষ্ঠিত মাটিয়ারীর প্রাসাদ ছেড়ে রাঘব রায় রেউই (রেবতী) গ্রামে তাঁর সদর স্থাপন করেন। তাঁর দুই পুত্র **রুদ্র** ও **প্রতাপনারায়ণ**। প্রতাপনারায়ণ পিতার অবাধ্য হওয়ায়, মোগল সম্রাটের অনুমতিক্রমে রাঘব রায় রুদ্রকে জমিদারীর স্বত্ব দিয়ে যান। সম্রাট ঔরঙ্গজেব ১৬৮৩ খ্রীঃ এক ফরমানে রুদ্রকে গণেশপুর, হোসেনপুর, খাড়ি, জুরি প্রভৃতি কয়েকটি পরগণার মালিকানা দিয়ে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজা রুদ্র রায় 'রেউই' গ্রামের নাম বদল করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামে **'কৃষ্ণনগর'** [১] রাখেন। তিনি পিতামহ ভবানন্দ রায় (মজুমদার) প্রতিষ্ঠিত (১৬০৬ খ্রীঃ) দুর্গাপূজা কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে ১৬৮৩ খ্রীঃ নিয়ে আসেন ও এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। জাঁকজমক ও রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে সংগতি রেখে পূজার আয়োজন করা হয়। মহারাজা রুদ্র রায়ের দুই পত্নী। প্রথমার গর্ভে দুই পুত্র—রামচন্দ্র ও রামজীবন এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে এক পুত্র রামকৃষ্ণ। মহারাজা রুদ্র রায় [২] তাঁর দানপত্রে কনিষ্ঠ পুত্র **রামকৃষ্ণকে** উত্তরাধিকারী [৩] করায় পুত্রদের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র ঢাকার নবাব ও হুগলীর ফৌজদারের সাহায্যে নদীয়ার রাজসিংহাসনে বসেন। মধ্যম পুত্র রামজীবন রামচন্দ্রের বিরোধিতা করায় রাজ্যত্যাগী হতে বাধ্য হন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর নবাব মুর্শিদকুলী খান রামকৃষ্ণ ও রামজীবন—দুই ভাইকে কারাবাসে পাঠান। দুর্ভাগ্যবশতঃ অপুত্রক রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয় এবং **রামজীবন** নদীয়ার রাজসিংহাসনে আসীন হন ১৭১৫ খ্রীঃ।

রাজা রামজীবনের তিন পত্নীর গর্ভে চার পুত্র। প্রথমার গর্ভে রাজারাম ও কৃষ্ণরাম, মধ্যমার গর্ভে রঘুরাম ও তৃতীয়ার গর্ভে রামগোপাল। রাজা রামজীবন কর্মদক্ষ ও বলবীর্যবান পুত্র **রঘুরামকে** তাঁর উত্তরাধিকারী করে যান। রঘুরাম ছিলেন একজন

১। নদীয়া জেলার সদর কৃষ্ণনগরের কলকাতা থেকে দূরত্ব ৮০ কি. মি.।

২। মহারাজা রুদ্র রায় মারা যান ১৬৯৪ খ্রীঃ, ১১ বছর রাজত্ব করে।

৩। ১৬৯৬ খ্রীঃ চন্দ্রকোণার (মেদিনীপুর) বিদ্রোহী রাজা শোভা সিংহ বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামকে যুদ্ধে পরাস্ত করে হত্যা করেন। কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম রাজা রামকৃষ্ণের (১৬৯৪-১৭০৫ খ্রীঃ) আশ্রয় প্রার্থী হয়ে নদীয়ায় কিছুকাল বসবাস করেন। পৃষ্ঠা ১২৬ দ্রষ্টব্য।

নামী সৈনিক পুরুষ, নয় হাজার সৈন্যের অধ্যক্ষ। এক সময়ে রাজস্ব অনাদায়ের অভিযোগে নবাব মুর্শিদকুলী খানের নির্দেশে, রঘুরাম রাজসাহীর তাহিরপুরের রাজা উদয়নারায়ণকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্দী করেন। নবাব দরবারে রঘুরামের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, তিনি তাঁর জমিদারীর সম্যক বন্দোবস্ত করে নেন। কিন্তু পরে রাজস্ব দেনার দায়ে তাকেও একাধিকবার নবাবের নির্দেশে কারাবরণ করতে হয়। রাজা রঘুরাম মারা যান ১৭২৮ খ্রীঃ তেরো বছর রাজত্ব করার পর।

মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র রায়

যোদ্ধা রাজা রঘুরামের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের (রাধানাথ) জন্ম হয় ১৭১০ খ্রীঃ। কৃষ্ণচন্দ্র পিতা রাজা রঘুরামের তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষক পণ্ডিত কালীদাস সিদ্ধান্তের কাছে সংস্কৃত, কলোয়াৎ বিশ্রাম খানের কাছে সঙ্গীত এবং মুজাহার হোসেনের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। নাবালক অবস্থায় তাঁর প্রথম বিবাহ হয়। পিতার মৃত্যুর পূর্বেই আঠারো বছর বয়সে তাঁর রাজপদে অভিষেক হয়েছিল ১৭২৮ খ্রীঃ।[১] ভিন্ন মতে, 'রাজা রঘুরাম পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উত্তরাধিকারী না করিয়া নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে করিবার জন্য নবাবের সম্মতি লইয়া ছিলেন, কিন্তু কি কারণে পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া ভ্রাতাকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদানের বাসনা করেন, তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত কেহই অবগত নহেন'। দুই প্রার্থীই নবাবের কাছে রাজ্যের মালিকানার বিনীত দাবি পেশ করেছিলেন। সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র নবাবের উপদেষ্টাদের কাছেও তদবির করেন। রামগোপালের বিদ্যা-বুদ্ধি প্রায় কিছুই ছিল না। পরন্তু ধূমপান পরতন্ত্র ছিলেন। তিনি নাকি তামুক সেবনে লিপ্ত হয়ে নবাব দরবারে যথা সময়ে হাজরি দিতেই পারেননি। অপরপক্ষে, 'নবাব সরকার সমীপস্থ কৃষ্ণচন্দ্র অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বিনয় বচনে আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন'। স্বভাবতই 'নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে রঘুরামের স্থলাভিষিক্ত করিবার আদেশ দিলেন'।[২] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের এই অমূল্য পুরস্কার লাভের মূলে ছিলেন তাঁর পরম হিতৈষী অবৈতনিক মন্ত্রী, দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ)।[৩] নদীয়া জমিদারীর বহু ঝড়-ঝাপটার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে। তাঁর ষোলো বছর দেওয়ানী আমলে নদীয়ার জমিদারীর ঋণ-ভারের বোঝা কমে যাওয়ায়, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সৎ কর্মযজ্ঞ

১। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রস্য চরিত্রম্', ১৮৩৪। ডঃ অলোক কুমার চক্রবর্তী —মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।

২। কার্তিকেয় চন্দ্র রায় (সংকলিত, ১৯৩২ খ্রীঃ) 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত', ১৮৭৬ খ্রীঃ।

৩। এই প্রসঙ্গে—'রাজা রামচন্দ্র সেন' পরিচ্ছেদ ৯২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাস্তবে রূপায়িত হয়। সারা বাংলায় কৃষ্ণনগর ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মান-মর্যাদা তুঙ্গে ওঠে।

মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম্ (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ) কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রথমে 'মহারাজা' ও পরে 'মহারাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি, পতাকা, নাকড়া, ঝালদার পালকি প্রভৃতি রাজ-পুরস্কার প্রদান করেন। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমল ছিল এক যুগ-সন্ধীক্ষণ—মোগল তথা নবাবী শাসনের তিরোধান আর ইংরাজ বণিক রাজশক্তির আবির্ভাব। কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে একাধিক জীবনীকারের উক্তিতে তাঁকে—সুচতুর, স্বার্থপর, সুবিধাবাদী, অমিতব্যয়ী, সুরাসক্ত প্রভৃতি বিরূপ বিশেষণে বিভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খল পরিবেশের কথা চিন্তা করলে, তাঁকে নিশ্চই কিছুটা অভিযোগ-মুক্ত করা যেতে পারে। তা ছাড়া, এই কর্মযোগীর সমস্ত কলঙ্ক সম্পূর্ণভাবে চাপা পড়ে গেছে, তাঁর অসামান্য সর্বজনহিত কর্মযজ্ঞ আর রাজসিক আড়ম্বর-বহুল ধর্মানুষ্ঠানের জাঁকজমকের মধ্যে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অমিতব্যয়ীতার জন্য কেবল যে নদীয়ার প্রজাদের মাশুল গুনতে হয়েছিল তা নয়, কৃষ্ণনগর রাজবংশের মান-সম্মান একাধিকবার খোয়া গিয়েছিল—জমিদারী নিলামে ওঠা ও ইজারা দেওয়ায়।

যদিও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন একজন পরাক্রমশালী জমিদার, কিন্তু নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ভোগ করার জন্যই, তাঁকে নবাব ও ইংরাজদের অনুগ্রহপ্রার্থী হতে হয়েছিল। সমাজপতি হয়েও সমাজ সংস্কারক হিসাবে তাঁর বিশেষ কিছু অবদান ছিলনা, কারণ তিনি ছিলেন সংরক্ষণপন্থী। তা সত্ত্বেও, তাঁর হিন্দু-সমাজপতির আসন শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল। কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে বাংলার তথা ভারতের ভাগ্য বিপর্যয়ের পালা শুরু হয়—পলাশীর জাল যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রীঃ) এবং পরে কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ থেকে। তা ছাড়া, ছিল বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) আর ছিয়াত্তরের (১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ) ভয়াবহ মন্বন্তর। অনেকে ঠিকই মনে করেন যে, এই সব দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কৃষ্ণচন্দ্রের ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাট জমিদারীর অন্তর্গত ছিল উনপঞ্চাশটি সম্পূর্ণ পরগণা আর পঁয়ত্রিশটি পরগণার বেশ কিছু অংশ। **রায়গুণাকর ভরতচন্দ্রের** গাঁথায় 'রাজ্যের উত্তর-সীমায় মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ, দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার, পূর্ব সীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পাড়'। রানী ভবানীর রাজসাহী জমিদারী ছাড়া বাংলায় নদীয়া জমিদারী আয়তনে সবচেয়ে বড়। ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরে নদীয়া জমিদারীর রাজস্ব দায় ছিল বাৎসরিক মোট ১০,৯৭,৪৫০ টাকা।

প্রায় ২৪০ বছর আগেকার কৃষ্ণনগরের **'রাজ-সভা'** রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সবচেয়ে

স্মরণীয় কীর্তি। এই প্রসিদ্ধ 'রাজ-সভা' সম্বন্ধে নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায় সভাকবি **রায়গুণাকর ভরতচন্দ্রের** (১৭১২-৬০ খ্রীঃ) **'অন্নদা মঙ্গল'** কাব্যে। 'রাজ-সভার' মহাপণ্ডিত ও গুণীজনদের অন্যতম ছিলেন গদাধর তর্কালংকার, কালীদাস সিদ্ধান্ত, কন্দর্প সিদ্ধান্ত, অনুকূল বাচস্পতি, গোবিন্দরাম (বৈদ্য), গোপাল চক্রবর্তী, শংকর তরঙ্গ, কিংকর লাহিড়ী (মুন্সি), নীলকণ্ঠ রায় ও দেওয়ান রঘুনন্দন। এই সভায় লোক-প্রিয় বিদূষক **'গোপাল ভাঁড়'**-এর অস্তিত্বের কথা অনেকে নিছক কল্পনা-প্রসূত বলে মনে করলেও, লোকপরম্পরাগত তাঁর কৌতুক কাহিনীগুলি চিরকাল আমাদের কাছে আমোদের খোরাক হয়ে থাকবে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরে ও নদীয়ার বহু স্থানে ঐ যুগের বিশিষ্ট স্থাপত্য-শিল্পের বেশ কয়েকটি নিদর্শন রেখে গেছেন। যদিও তার প্রপিতামহ মহারাজা রুদ্র রায় **কৃষ্ণনগরের রাজপ্রাসাদ**[১] চক্ ও নহবৎখানা তৈরী করে গিয়েছিলেন, কিন্তু প্রসাদের দরবার কক্ষ বা 'বিষ্ণু মহল' পূজামণ্ডপ এবং সবচেয়ে দর্শনীয় 'নাট মন্দির', মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রেরই তৈরী। এছাড়া, কৃষ্ণচন্দ্রের দ্বিতীয় **রাজপ্রসাদ গঙ্গাবাস'** (কৃষ্ণনগর থেকে নয় কি.মি পশ্চিমে) তৈরী হয়েছিল ১৭৭৪ খ্রীঃ। বর্তমানে এখানকার ভগ্নদশাপ্রাপ্ত স্থাপত্য-নিদর্শনগুলি—কেবল দর্শনার্থীদের দীর্ঘ-নিশ্বাসের কারণ হয়ে আছে। মহারাজা প্রতিষ্ঠিত **দেব দেউল**গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—আরাংঘাটার 'যুগল কিশোর' গঙ্গাবাসের 'হরিহর', বিরহীর 'মদনগোপাল', আমডাঙ্গার 'করুণাময়ী', অগ্রদ্বীপের 'গোপীনাথ', শ্রীনগরের 'সিদ্ধেশ্বরী' ও 'রাজ মাতার' মন্দির।

বাংলায় **পূজা-পার্বণ ও ধর্মানুষ্ঠানের যজ্ঞে** কৃষ্ণচন্দ্র কেবল যে পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা নয়, অকাতরে ব্যয় করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। বাংলায় অন্নপূর্ণা পূজার প্রবর্তক ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র। 'দেবী রাজবল্লভী' (দুর্গা, কালী ও স্বরস্বতী ত্রিমূর্তির একত্রীকরণে), জগদ্ধাত্রী, সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রভৃতি মূর্তিগুলি এখানকার দেব-দেউলে দেখা যাবে। তবে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন যোদ্ধার সাজে বিরাট মৃন্ময়ী দুর্গা মূর্তি, রাজ-রাজেশ্বরীর কল্পনাতীত জাঁকজমকের পূজা ও উৎসবের জন্য। পূজা চলতো সতেরো দিন ধরে—মেলা ও বিবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। তিনি এই দুর্গা পূজার জন্যই সুবৃহৎ 'নাট মন্দিরটি' তৈরী করেছিলেন। এখনো প্রতি বছর এপ্রিল মাসে 'বারো দোল' উৎসবে বিরাট মেলা বসে।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও বহুমুখী কর্মশীলতায় সুবাদে বহু রাজন্যবর্গ, জমিদার ও শিক্ষিত সমাজের জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বজায় ছিল। প্রথমেই দেখা যাক বাংলার নবাবদের বিশেষ করে, **নবাব আলিবর্দীর** সঙ্গে (১৭৪০-৫৬ খ্রীঃ)।

১। সিরাজের বিরুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভের ব্যবহৃত কয়েকটি কামান অঙিনায় দেখা যাবে।

যদিও একাধিকবার রাজস্ব ও নজরয়ানা না দেওয়ার অভিযোগে আলিবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাগারে বাস করিয়েছিলেন, কিন্তু পরে দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ। নবাব নাকি সর্বক্ষণ কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গ পাওয়ার জন্য তাঁকে মুর্শিদাবাদে ধরে রাখবার সবরকম চেষ্টা করতেন। আদর করে ডাকতেন 'ধর্ম্মচন্দ্র'[১] নামে। কৃষ্ণচন্দ্র সেই সময় তাঁর জমিদারীর অবস্থা স্বচ্ছল করে নিয়েছিলেন। আলিবর্দীর দৌহিত্র নবাব **সিরাজউদ্দৌলার** (১৭৫৬ খ্রীঃ) সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুব অন্তরঙ্গ ছিল বলে কোন জীবনীকারই উল্লেখ করেননি। যুবক নবাব সিরাজের ঔদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারীতায় প্রায় সব রাজা-প্রজাই বীতশ্রদ্ধ। স্বাভাবিকভাবে, সিরাজের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রাজন্যবর্গের মধ্যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্যতম[২]। উপরন্তু, তিনি দ্বিতীয় শক্তি ইংরাজ বণিক কোম্পানীকে উৎসাহ ও সমর্থন দিয়ে নবাবের স্থলাভিষিক্ত করতে চেয়েছিলেন। জগৎশেঠের বাড়ীতে গুপ্ত-মন্ত্রনা সভায় কৃষ্ণচন্দ্র নাকি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন—'অতএব ইংরেজেরে করিয়া সহায় রাজ্যচ্যুত করি এই দুরন্ত পামরে যবনকুলের গ্লানি; মম অভিপ্রায় বসাইতে সেনাধ্যক্ষকে সিংহাসন পরে'।[৩] মির্জাফরের পরে স্বাধীনচেতা নবাব মীরকাশিম (১৭৬০ খ্রীঃ) রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ইংরাজ বণিকদের আজ্ঞাবহ বলে মনে করতেন। তাঁকে ও তাঁর পুত্র শিবচন্দ্রকে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন প্রায় দু'বছর। সৌভাগ্যক্রমে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে তাঁরা বেঁচে যান কেবল ইংরাজ বণিক সরকারের হস্তক্ষেপে।

ইংরাজ বণিক ও পরে রাজশক্তির প্রতিনিধি রবার্ট ক্লাইভ থেকে শুরু করে লর্ড ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ পর্যন্ত সকলের সঙ্গে তঁরে বেশ সুসম্পর্ক ছিল। তবে রাজস্ব বাকি থাকার দায়ে, ইংরাজ সরকারের অবগতিতেই দেওয়ানদের হাতে তাঁকে কয়েকবার অপমান ও ভৎর্সনা সহ্য করতে হয়েছিল। কৃষ্ণচন্দ্র বিশষে কোন ঝামেলায় নিজেকে জড়াতেন না। তিনি ছিলেন যুক্তি-বিশ্বাসী—জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করা নিরার্থক। তাই সরকারের অনুগ্রহ থেকে তিনি কখনও বঞ্চিত হননি।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন কয়েক জন মান্য রাজপুরুষদের সঙ্গে তাঁর কি রকম সম্পর্ক ছিল, তা নিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। এক সময় **মহারাজা নন্দকুমার**[৪] (১৭০৫-৭৫ খ্রীঃ) ছিলেন নবাব আলিবর্দীর ও পরে ক্লাইভের দেওয়ান ও

১। 'ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে'—ভরতচন্দ্র।

২। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একজন ষড়যন্ত্রী নন। তবে তিনি সব সময়ে ইংরাজদের অনুগ্রহ-প্রার্থী ছিলেন।

৩। নবীনচন্দ্র সেন—পলাশীর যুদ্ধ—১৮৬৪ খ্রীঃ।

৪। বিস্তারিত বিবরণ 'মহারাজা নন্দকুমার' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

বিশেষ বিশ্বাস-ভাজন ব্যক্তি। বয়োঃজ্যেষ্ঠ নন্দকুমার পারিবারিক সূত্রে কৃষ্ণচন্দ্রের বৈবাহিক, কিন্তু পণ্ডিত **জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে** অপমান করার প্রতিশোধার্থে কৃষ্ণচন্দ্রকে বারো লক্ষ টাকা বাকি সরকারী রাজস্ব অনাদায়ের জন্য কারারুদ্ধ করেছিলেন, অবশ্য মুক্তি পান পণ্ডিত জগন্নাথেরই অনুরোধে। দুজনেই ব্রাহ্মণ—সমাজপতির আসনে আসীন। তাঁদের মধ্যে সরকারী ক্ষমতার লড়াই ছাড়াও, সমাজে প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির লড়াই বরাবর বজায় ছিল। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসীর বিরুদ্ধে ইংরাজ সরকারের দরবারে কৃষ্ণচন্দ্র কোন আবেদন করেননি।

কৃষ্ণচন্দ্রের আমলের আর এক উল্লেখযোগ্য রাজপুরুষ ছিলেন **মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর**[১] (১৭৩২-৯৭ খ্রীঃ)। বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমাজপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কায়স্থ নবকৃষ্ণ দেব সংগত-কারণে সব সময় যথাযোগ্য মর্যাদা দিতেন। নবকৃষ্ণের বাস ভবনে তাঁর কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের সমভিব্যাহারে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধেও মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। তবে, বিশেষ করে হিন্দু সমাজে প্রভাব ও প্রতিপত্তির প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দুজনের মধ্যে সব সময় একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা ছিল। বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্য-অনুরাগী দুই রাজপুরুষ, তাঁদের বিশিষ্ট পণ্ডিত ও গুণীজন সমৃদ্ধ 'রাজ সভা' বা 'নবরত্ন সভা' আর জাঁকজমকে ভরা দুর্গাপুজোৎসব, স্বাভাবিকভাবে, পরস্পরের মধ্যে রেষারেষির সৃষ্টি করেছিল।

মহারাজা নবকৃষ্ণ ১৭৭২ খ্রীঃ গভর্নর ওয়ারেন্ হেস্টিংস্-এর বিশেষ বিশ্বাসভাজন ও ইংরাজ সরকারের কূটনীতিবিদ্ প্রতিভাশালী ব্যক্তি। কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে নবকৃষ্ণের সুসম্পর্ক সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের উপাধি ছিল 'মহারাজা বাহাদুর' আর বর্ধমানের রাজাদের ছিল 'মহারাজাধীরাজ বাহাদুর'। নবকৃষ্ণ ক্ষুন্ন কৃষ্ণচন্দ্রকে 'মহারাজা রাজেন্দ্র বাহাদুর' উপাধি পাইয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট করেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমসাময়িক আরও কয়েকটি বিশেষ পরিচিত রাজন্যদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন—ঢাকার রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভ সেন রায়-রাইয়াঁ (নবাব মীর্জাফরের অন্যতম দেওয়ান), রাজা দুর্লভরাম (নবাব মীরজাফরের 'দেওয়ান-ই-আলা'), বর্ধমানের মহারাজাধীরাজ ত্রিলোকচাঁদ, কান্দীর গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (ওয়ারেন্ হেস্টিংসের 'বিশ্বস্ত বন্ধু'), নদীপুরের মহারাজা দেবী সিংহ (অত্যাচারী জমিদার ও ওয়ারেন্ হেস্টিংসের 'বিশ্বস্ত অনুচর'), কাশিমবাজারের কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী (হেস্টিংসের 'বিশ্বস্ত বন্ধু' ও রাজনৈতিক পরামর্শদাতা), রাজা রামনারায়ণ (পাটনার শাসনকর্তা), দেওয়ান রাজা রামচন্দ্র সেন প্রমুখ।

১। বিস্তারিত বিবরণ 'শোভাবাজারের দেব রাজপরিবার' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুই পত্নী। প্রথমার গর্ভে পাঁচ পুত্র—শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র এবং এক কন্যা। দ্বিতীয়ার গর্ভে এক পুত্র শম্ভুচন্দ্র ও তিন কন্যা। শম্ভুচন্দ্র পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিবচন্দ্র যখন মুঙ্গেরে নবাবের কারারুদ্ধ, তখন বল প্রয়োগে পিতৃ সিংহাসনে বসেছিলেন (১৭৬২ খ্রীঃ)। পরে অবশ্য ক্ষমা প্রার্থনা করে নিষ্কৃতি পান। সত্তর বছর বয়স্ক কর্মযোগী ও বাংলার ইতিহাসের প্রবাদ-পুরুষ মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৭৮০ খ্রীঃ,[১] প্রায় তিপ্পান্ন বছর রাজ্যভার বহন করে।

মহারাজা শিবচন্দ্র রায়

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় ১৭৮০ খ্রীঃ বাংলা ও ফার্সী ভাষায় লেখা এক দানপত্রে জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে রাজ্যভার ও অন্যান্য পুত্রদের যথোপযুক্ত মাসোহারার বন্দোবস্ত করেছিলেন। মহারাজা শিবচন্দ্রের রাজত্বের সময়কাল মাত্র ছয় বৎসর (১৭৮২-৮৮ খ্রীঃ)। রাজকার্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় না দিলেও, হিন্দুশাস্ত্রে তাঁর বুৎপত্তি ছিল। গুণীজনকে সাহায্য ও উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর সময় নদীয়া জমিদারীর ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র **ঈশ্বরচন্দ্রকে** জমিদারীর মালিকানা-স্বত্ব দান করেন (১৭৮৮ খ্রীঃ) এবং পরের মাসেই মারা যান ষাট বছর বয়সে। ঈশ্বরচন্দ্রের আমলে (১৭৮৮—মার্চ, ১৮০৩ খ্রীঃ) জমিদারী 'দশসালা' (১৭৯০ খ্রীঃ) এবং পরে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' (১৭৯৩ খ্রীঃ) চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের বিলাসিতা ও অমিতব্যায়িতার জন্য ঋণের দায়ে জমিদারীর প্রায় অর্ধাংশ হাতছাড়া হয়ে যায়। এরপর তাঁর একমাত্র পুত্র **গিরীশচন্দ্র** (জন্ম ১৭৮৯ খ্রীঃ) নদীয়ার সিংহাসনে বসেন মাত্র ষোল বছর বয়সে। রাজকার্যে তাঁর মন বসেনি। এক তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর প্রভাবে সুরাসক্ত ও বেহিসেবী হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ও সঙ্গীতামোদী। আনন্দময়ী (কালী) মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর দুটি বিবাহ হলেও তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। গিরীশচন্দ্র মারা যান ১৮৪২ খ্রীঃ ৫৩ বছর বয়সে। কৃষ্ণনগরের আদি রায় রাজবংশের অবসান ঘটে ও দত্তক পুত্রের রায় রাজপরিবারের সূচনা হয়।

গিরীশচন্দ্রের দত্তক সন্তান **শ্রীশচন্দ্র** (মাতুল পৌত্র) জমিদারীর উত্তরাধিকারী হলেন ১৮৪২ খ্রীঃ। তখন তাঁর বয়স মাত্র বাইশ বছর। পাশ্চাত্য শিক্ষার আওতায় মানুষ শ্রীশচন্দ্র হস্তচ্যুত জমিদারীর বেশ কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সংস্কার-মুক্ত হয়ে

১। ভিন্ন মতে, ১৭৮২ খ্রীঃ—'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত', ১৮৭৬ খ্রীঃ।

তিনি ইংরাজী শিক্ষার প্রসার, বিধবা বিবাহের প্রচলন, অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন প্রভৃতি প্রগতিশীল কাজে ব্রতী ছিলেন। তাঁর দানে ১৮৪৫ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর সংস্কারমূলক কাজের জন্য ইংরাজ সরকারের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রীঃ শ্রীশচন্দ্রকে 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ মাত্র ৩৮ বছর বয়সে শ্রীশচন্দ্র মারা যান, এক পুত্র সতীশচন্দ্র ও এক কন্যা কালীকুমারীকে রেখে।

সতীশচন্দ্র পিতার ন্যায় পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করেন এবং মাত্র ২০ বছর বয়সে জমিদারীর ভার নেন। তিনিও ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে 'মহারাজা' উপাধি পান। অতিশয় আরাম-প্রিয় ও ভ্রমণপিপাসু ছিলেন। অসৎ সঙ্গদোষে সুরাসক্ত মহারাজা সতীশচন্দ্র উত্তরপ্রদেশে মোসৌরী পাহাড়ে মারা যান ২৫ অক্টোবর, ১৮৭০ খ্রীঃ, মাত্র ৩৩ বছর বয়সে। তিনি ছিলেন অপুত্রক। তাঁর কনিষ্ঠা **রানী ভুবনেশ্বরী দেবী** ১৮৭১ খ্রীঃ তাঁর জমিদারীর দায়িত্ব ছেড়ে দেন 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের' হাতে। রাণী ভুবনেশ্বরী **ক্ষিতীশচন্দ্রকে** দত্তক নেন। জন্ম হয় ১৮৬৮ খ্রীঃ। তিনি জমিদারীর মালিক ছিলেন প্রায় ২১ বছর যাবৎ। অনেক উন্নতিমূলক এবং জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিলেন। বিবাহ হয় বৌজারের মতিলাল বংশের কন্যা কৃষ্ণনলিনীর সঙ্গে। ক্ষীতিশচন্দ্রের পুত্র **ক্ষৌণীশচন্দ্রের** জন্ম হয় ২০ অক্টোবর, ১৮৯০ খ্রীঃ। বিবাহ করেন কাশিমবাজার রাজপরিবারের রাজা আশুতোষ নাথ রায়ের কন্যা জ্যোতির্ময়ী দেবীকে ৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ। মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র তাঁর পিতার ন্যায় সাহিত্যানুরাগী ও সত্যপ্রিয় মানুষ ছিলেন। জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায়, সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম। মারা যান ১৯২৮ খ্রীঃ উত্তরাধিকারী পুত্র সৌরীশচন্দ্রকে রেখে। ভারত সরকার ১৯৫২ খ্রীঃ জমিদারী অধিগ্রহণ করেন। কুমার সৌরীশচন্দ্র বর্তমানে তাঁর কলকাতার বাসভবনে (২, ব্রাইট ষ্ট্রীট) এক পুত্র সৌম্যীশচন্দ্র ও কন্যা রাজশ্রী ও স্ত্রী তুষারীকা দেবী সহ বাস করেন।

বাংলায় সাহিত্য-সংস্কৃতি, ধর্মানুষ্ঠান ও মন্দির-স্থাপত্য-শিল্পে কৃষ্ণনগরের যে অবদান রয়েছে, তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কৃষ্ণনগরের সাড়া-জাগানো **রাজরাজেশ্বরী দুর্গাপূজা** ছাড়া, ফাল্গুন মাসে 'বারোদোল' উৎসবে বারোটি বিভিন্ন বৈষ্ণব **দেব-দেউল** থেকে শোভাযাত্রা সহকারে রাধাকৃষ্ণ মূর্তিগুলি রাজবাড়ীর পূজামণ্ডপে একত্রিত করে পূজা-পার্বণ শুরু হয়। বেশ কয়েকদিন ধরে কৃষ্ণনগর ও আশপাশের অঞ্চল আনন্দমুখর হয়ে ওঠে। সভাকবি ভরতচন্দ্র রায়গুণাকর ছাড়া, সাধক কবি **রামপ্রসাদ** কৃষ্ণনগরের রাজসভায় উপস্থিত হতেন। 'সভার' লোকপ্রিয় বিদূষক, **গোপাল ভাঁড়ের** কুরুচি বা সুরুচিপূর্ণ গল্পগুলি বাঙালীর কাছে এখনও আনন্দের উৎস হয়ে আছে।

কোচবিহারের ভূপ রাজবংশ

ষোলো শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত কোচবিহার ছিল প্রাচীন কাম্‌তা (কাম্‌তাপুর) রাজ্যের (বর্তমান কোচবিহার, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর ও সংলগ্ন এলাকা) একটি অংশ। 'কোচ' ও পরে 'ভূপ' রাজবংশের পদমর্যদা 'His Highness', বাংলার অন্যান্য রাজপরিবারের তুলনায় নিশ্চয় বিশেষ মান্যতার দাবী রাখে। কারণ খ্রীষ্টীয় ষোলো শতক থেকে দীর্ঘকাল যাবৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তন সত্ত্বেও, 'দেশীয় রাজ্য' কোচবিহার উল্লেখযোগ্যভাবে স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। 'কোচ' প্রধান হাজোর বংশধর (দৌহিত্র-সন্তান) চন্দন কোচবিহারের সিংহাসন দখল করেন আনু: ১৫১০ খ্রী: এবং কোচবিহারে বৈষ্ণব কোচ রাজত্বের সূচনা হয়। রাজা চন্দন মারা যান ১৫১৫ খ্রী:। তাঁর ছোট ভাই বিশ্ব সিংহ রাজা হন (১৫১৫-৩৩ খ্রী:)। তিনি একজন রণ-কুশল ও পরাক্রান্ত নরপতি।

মহারাজা বিশ্ব সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নরনারায়ণ (মল্লনারায়ণ) সিংহ রাজা হন ১৫৩৪ খ্রী:। তিনি ত্রিপুরা, কাচার, ডিমরু প্রভৃতি ছোট ছোট কয়েকটি রাজ্য দখল করেন। গৌহাটির বিখ্যাত কামাক্ষা দেবীর মন্দির তাঁর প্রতিষ্ঠা। প্রায় পঞ্চাশ বছর গৌরবের সঙ্গে রাজ্য-ভার বহন করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৫৮৪ খ্রী:। তিনিই কোচ রাজাদের নামাঙ্কিত প্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁর পুত্র মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ [২] দুর্বল প্রকৃতির মানুষ, দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে মোগল সম্রাট আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন ১৫৯৬ খ্রী:। প্রায় ৪৩ বছর রাজত্ব করার পর তাঁর মৃত্যু হয় ১৬২৭ খ্রী:। মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র রাজা বীরনারায়ণ-এর সময়ে কোচবিহারের রাজশক্তি হ্রাস পায়। তাঁর মৃত্যু হয় ১৬৩২ খ্রী:।

১৬৩৮ খ্রী: চট্টগ্রামের সুবাদার ইসলাম্ খান এবং পরে ১৬৬১ খ্রী: বাংলার সুবাদার মীরজুমলা কোচবিহার আক্রমণ করেন। মোগল রাজ-শক্তি কোচবিহারকে মিত্র রাজ্যের মর্যদা দেন। মহারাজা বীরনারায়ণের পুত্র মহারাজা প্রাণনারায়ণ সিংহাসনে বসেন ১৬৩৩ খ্রী:। তিনি শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেননি। রাজপরিবারের অন্তঃকলহের ফলে, মহারাজা প্রাণনারায়ণকে কোচবিহার পরিত্যাগ করতে হয়েছিল,

১। 'রাজোপাখ্যান'—রাজমুন্সী জয়নাথ ঘোষ।

কোচবিহারের ইতিহাস—খাঁ চৌধুরী আমানুতল্লা আহমদ। ১৩৪২ সন।

২। ১৬১১ খ্রী: মোগল সুবাদার ইসলাম্ খানকে কামরূপ রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন।

যদিও পরে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আনুকূল্যে কোচবিহারে ফিরে আসেন ও প্রায় ৩৩ বছর রাজত্ব করার পর মারা যান ১৬৬৬ খ্রীঃ। মহারাজা প্রাণনারায়ণ একজন সুকবি ও সংস্কৃত-সাহিত্য-প্রেমী। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কোচবিহার 'পণ্ডিত সভার' প্রতিষ্ঠা ছাড়া, রাজবংশের ইতিহাস 'রাজক্ষণদম্', মহাভারতের অনুবাদ, 'দ্রৌপদী সংম্বরা' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি কোচবিহারে 'বাণেশ্বর', 'জল্পেশ্বর' মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা। কামতা রাজ্যের প্রাচীন 'গোসানমারী' মন্দিরের সংস্কার করেন। মহারাজা প্রাণনারায়ণের পর পুত্র **মোদনারায়ণ** পরবর্তী রাজা হন। তিনি মারা যান ১৬৮০ খ্রীঃ।

কোচবিহারের **নাজির দেও মহিনারায়ণ**-এর চারপুত্র। তাঁদের চক্রান্তে রাজা মোদনারায়ণকে গদীচ্যুত হতে হয় এবং কোচবিহারে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে। ফলে কোচবিহারে কিছুদিন অরাজকতার সৃষ্টি হয়, যদিও অনুগত প্রজারা মহারাজা প্রাণনারায়ণের তৃতীয় পুত্র **বাসুদেবনারায়ণ**কে অল্প সময়ের জন্য রাজ-সিংহাসনে বসান। পরে মহারাজা প্রাণনারায়ণের প্র-পৌত্র **মহীন্দ্রনারায়ণ** মাত্র পাঁচ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন ১৬৮২ খ্রীঃ। ১১ বছর রাজত্ব করার পর ১৬৯৩ খ্রীঃ মারা যান। মূল 'কোচ' রাজবংশের অবসান ঘটে।

প্রাক্তন প্রথম নাজির দেও মহিনারায়ণের বংশধর **রূপনারায়ণ** রাজা হন এবং পৃথক রাজবংশের সূচনা হয়। মহারাজা রূপনারায়ণ একজন বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি। ২১ বছর শান্তিতে রাজত্ব করে মারা যান ১৭১৪ খ্রীঃ। তাঁর পুত্র **উপেন্দ্রনারায়ণ** রাজা হন। দীর্ঘ ৪৯ বছর যাবৎ রাজ্য-ভার বহণ করে মারা যান ১৭৬৩ খ্রীঃ। রাজা উপেন্দ্র নারায়ণের শিশু পুত্র **দেবেন্দ্রনারায়ণ** ভূপ রাজা হন। কিন্তু তাঁকে হত্যা করা হয় মাত্র ২ বছরের মধ্যে ১৭৬৫ খ্রীঃ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'ছত্র নাজির' রুদ্রনারায়ণ বা তাঁর বংশধরেরা রাজক্ষমতা লাভের আশায়, বেশ কয়েকবার গৃহ-যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং রাজ্যের অপূরণীয় ক্ষতি করেন। তাছাড়া, কোচবিহারের ইতিহাসে দেখা যায় যে, ভূটান, মোগল, গৌড় সুলতান, কামরূপ, ঢাকার নবাব প্রভৃতি রাজশক্তিগুলি মাঝে মাঝে কোচবিহার আক্রমণ করতে ছাড়েননি। তা সত্ত্বেও কোচবিহার এঁদের বশ্যতা স্বীকার করেনি।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের বিশেষ পট-পরিবর্তন ঘটে ১৭৬৫ খ্রীঃ, যখন ইংরাজ বণিক কোম্পানীর হাতে মোগল সম্রাট শাহ্ আলম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সত্ত্ব তুলে দেন। ফলে কোচবিহার চাকলার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ইংরাজদের উপর বর্তায়। মহারাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর দেওয়ান খগেন্দ্রনারায়ণের পুত্র

ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ রাজা হন কিছু দিনের জন্য ১। পরে তার ভাই **রাজেন্দ্রনারায়ণ** গদীতে আসীন হন ১৭৭০ খ্রীঃ। মারা যান ১৭৭২ খ্রীঃ। **ধরেন্দ্রনারায়ণ** রাজা হন (১৭৭২-৭৫ খ্রীঃ)। ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণ পুনরায় ফিরে আসেন ও কোচবিহারের সিংহাসনে বসেন। তিনি মারা যান ১৭৮৩ খ্রীঃ। তাঁর পুত্র **হরেন্দ্রনারায়ণ** (জন্ম—১৭৮০ খ্রীঃ) রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন ১৮০১ খ্রীঃ। ইংরাজ সরকার নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা-কল্পে ২ ও রাজ্যের সুব্যবস্থাপনার জন্য একজন ইংরাজ কমিশনার হেন্‌রি ডগ্‌লাস্‌সাহেবকে নিযুক্ত করেন। তিনি রাজ্যের তদারকির কাজে প্রায় ৩৫ বছর রত ছিলেন। তাঁর পরবর্তীকালে (১৮৩৮ খ্রীঃ) ক্যাপ্টেন জেন্‌কিন্‌স্‌, কোচবিহারের 'এজেন্ট' হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর কার্যকালে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহারের পুরানো শাসন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করেন। মহারাজা বারাণসীতে মারা যান ১৮৩৬ খ্রীঃ। তিনি বারাণসী ও কোচবিহারের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য প্রচুর অর্থ দান করেছিলেন।

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র—শিবেন্দ্রনারায়ণ ও ব্রজেন্দ্রনারায়ণ। জ্যেষ্ঠ পুত্র **শিবেন্দ্রনারায়ণ** রাজা হন ২৮ আগষ্ট, ১৮৩৯ খ্রীঃ। তিনি দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য পরিচালনা করলেও, তার পিতার অমিতব্যয়ীতার জন্য তাঁকে আর্থিক সংকটের সম্মুক্ষীন হতে হয়েছিল। অপুত্রক মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ তাঁর ছোট ভাই কুমার ব্রজেন্দ্র নারায়ণের চতুর্থ পুত্র চন্দ্রনারায়ণকে দত্তক নেন, নাম রাখেন নরেন্দ্রনারায়ণ। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ বারাণসীতে মারা যান ১৮৪৭ খ্রীঃ নাবালক দত্তক পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণকে রেখে।

মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রাজ-গদীতে বসেন ২৩ আগষ্ট, ১৮৪৭ খ্রীঃ। তিনি কৃষ্ণনগর স্কুলে ১৮৫৩ খ্রীঃ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। পরে রাজা ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে 'ওয়ার্ডস্‌ ইনষ্টিটিউশন'-এ শিক্ষা লাভ করেন (১৮৫৯ খ্রীঃ)। নদীয়ার রাজ পরিবারে দুই রাজকুমার তাঁর সহপাঠি ছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণ সাবালক হয়ে কোচবিহারের শাসনভার হাতে নেন ১৮৫৯ খ্রীঃ। ইংরাজ সরকার কোচবিহার রাজাদের বংশগত 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করেন ১৮৬২ খ্রীঃ। মাত্র ২২ বছর বয়সে ৫ বছর রাজ্য শাসনের পর মারা যান ৬ আগষ্ট, ১৮৬৪ খ্রীঃ শিশু পুত্র নৃপেন্দ্র নারায়ণকে (জন্ম আগষ্ট, ১৮৬৩ খ্রীঃ) রেখে।

১। ৫ এপ্রিল, ১৭৭৩ খ্রীঃ এক চুক্তিপত্রে স্থির হয় যে, ইংরাজ কোম্পানীকে বাৎসরিক ৫০ হাজার টাকা রাজস্বাংশ দেওয়ার পরিবর্তে, কোম্পানী কোচবিহারকে বহিরাক্রমণ থেকে সব সময়ে রক্ষা করবে।

২। ইংরাজ সরকার ১৮০০ খ্রীঃ কোচবিহারের নারায়ণী মুদ্রার প্রচলন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেন।

মাত্র এক বছরের নাবালক **নৃপেন্দ্রনারায়ণ** রাজ সিংহাসনে বসেন ৪ নভেম্বর, ১৮৬৪ খ্রীঃ। সেই সময় কর্ণেল্ হ্যারিংটন কোচবিহারে কমিশনার পদে বহাল ছিলেন। রাজ্য প্রশাসন ব্যবস্থার ভার প্রকৃতপক্ষে সুদক্ষ দেওয়ান কালীকাদাস দত্তের হাতেই ন্যস্ত ছিল। মহারাজ কুমার নৃপেন্দ্রনারায়ণের পড়াশুনা আরম্ভ হয় বারাণসীতে এপ্রিল, ১৮৭২ খ্রীঃ এইচ. জন্ ক্লেরের তত্ত্বাবধানে, চলে প্রায় পাঁচ বছর। ১৮৭৭ খ্রীঃ দিল্লীতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার 'ভারতেশ্বরী' আখ্যা ঘোষণা সমারোহে তিনি উপস্থিত ছিলেন। রাজ-পদক ও একটি তরবারী উপহার পান। ১৮৭৮ খ্রীঃ ইউরোপ মহাদেশে সফরে যান, ফিরে আসেন মার্চ, ১৮৭৯ খ্রীঃ। দ্বিতীয় দফায় বিলাত যান মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালের সুবর্ণ-জয়ন্তীবর্ষে। কোচবিহার, কলকাতা ও আরো কয়েকটি জায়গায় সেবামূলক কাজে দান করেন। দার্জিলিং-এ 'জুবিলী স্যানিটোরিয়ম্', জলপাইগুড়িতে 'নৃপেন্দ্রনারায়ণ হল', কোচবিহারে আনন্দময়ী ধর্মশালা, তাঁর উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর চার পুত্র ও তিন কন্যা। ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি বাংলার ছোটলাট স্যার রিভার টমসন্ ৮ নভেম্বর, ১৮৮৩ খ্রীঃ এক বিশেষ দরবারে, মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণকে রাজ-গদিতে বসান। ৬ মার্চ, ১৮৭৮ খ্রীঃ ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁর এক কন্যা সুকৃতী সুন্দরীর বিবাহ হয় জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল (ঠাকুর বাড়ীর দৌহিত্র সন্তান) আই. সি. এস্.-এর সঙ্গে ২৯ নভেম্বর, ১৮৯৯ খ্রীঃ। তাঁর সময়ে কোচবিহারের নূতন রাজপ্রাসাদ তৈরী হয় ১৮৮৭ খ্রীঃ। তাঁরই উদ্যোগে কোচবিহার পর্যন্ত রেলপথে যোগাযোগের ব্যবস্থা হয়। মহারাজা স্যার নৃপেন্দ্রনারায়ণ জি. সি. আই. ই., সি. বি., এ. ডি. সি,—শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯১১ খ্রীঃ (চিত্ররাজি দ্রষ্টব্য)।

নৃপেন্দ্রনারায়ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজা **রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ** উত্তরাধিকারী হন। দুঃখের বিষয় অকালে তাঁর মৃত্যু হয় ১৯১৩ খ্রীঃ এবং তাঁর ছোট ভাই **জিতেন্দ্রনারায়ণ** রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণের বিবাহ হয় বরোদার গাইকোয়ার-এর মহারাজার কন্যা ইন্দিরা দেবীর সঙ্গে। মহারাজা স্যার জিতেন্দ্রনারায়ণ মারা যান ১৯২১ খ্রীঃ। তাঁর নাবালক পুত্র মহারাজা **জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ** বাহাদুর (জন্ম—১৫ ডিসেম্বর, ১৯১৫ খ্রীঃ) রাজ-গদীতে আসীন হন। তিনি কোচবিহারের শেষ **'His Highness'** উপাধিধারী মহারাজা। খেলাধুলায় তাঁর বিশেষ উৎসাহ ছিল। ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ খ্রীঃ **'Instrument of Accession'** চুক্তিপত্রে হস্তাক্ষর করেন এবং 'দেশীয় রাজ্য' কোচবিহারের রাজ্য-শাসনভার ভারত সরকারের হাতে আসে ২৮ আগষ্ট, ১৯৪৯ খ্রীঃ। তিনি চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাৎসরিক ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার

(বৃত্তিকর মুক্ত) বৃত্তিভোগী হন। তাঁর নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি, বিশেষ স্বাধিকার ও সম্মান তিনি তাঁর জীবদ্দশায় ভোগ করবেন। নিঃসন্তান মহারাজা মারা যান ১১ এপ্রিল, ১৯৭০ খ্রীঃ তাঁর বিদেশিনী স্ত্রী রানী জর্জিয়া মায়ানারায়ণকে রেখে। রানী তাঁর সব ভূ-সম্পত্তি বিক্রি করে ভারত ছেড়ে চলে যান।

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণের ছোট ভাই ইন্দ্রজিতেন্দ্রনারায়ণ ও তিন ভগিনী—ইলা দেবী, গায়িত্রী দেবী (জয়পুরের মহারানী) ও মেনকা দেবী। ইন্দ্রজিতেন্দ্র নারায়ণের পুত্র বিরাজেন্দ্রনারায়ণ। মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের তৈরী কলকাতায় আলিপুরে 'Wood Land'-এ কোচবিহারের অধুনা-লুপ্ত রাজবাড়ীর চৌহদ্দির মধ্যে দেখা যাবে একটি 'নারসিং হোম' ও কয়েকটি বহুতল বাড়ী।

কোচবিহার রাজাদের কীর্তি—সেকালের বাংলায় একমাত্র 'দেশীয় রাজ্য' (অধুনা জেলা সদর) কোচবিহারে কয়েকটি বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। **রাজবাড়ী** (বর্তমান ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিনে) তৈরী হয়েছিল মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে ১৮২৮ খ্রীঃ, পরে একাধিকবার সংযোজন ও সংস্কার করা হয়। দু'তোলা বিরাট প্রাসাদের চৌহদ্দির আয়তন ৫১,৩০৯ বর্গ ফিট; প্রাসাদটি দৈর্ঘ্যে ৩৯৩ ফিট। নিচের তলায় সু-সজ্জিত বিরাট দরবার হল, ভোজন-কক্ষ ও বেশ কয়েকটি বড় ঘর ও বারান্দা। উপরের তলায় আছে পাঁচটি শয়ন ঘর, বসবার, বিলিয়র্ড খেলা, তোষাখানা ও ১১টি স্নানাগার প্রভৃতি। পুরানো দেওয়ান কুঠী, কাছারীবাড়ী, কাউন্সিল্ হাউস্, ব্রাহ্মসমাজ উপাসনা মন্দির, টাউন হল, জুবিলী তোরণ ছাড়া—দেবীবাড়ী, লাল দিঘি, সাগর দিঘি, বৈরাগী দিঘি, উনিশ শতকের কোচবিহারী স্থাপত্যের নিদর্শন। কোচবিহার শহর থেকে পনেরো-কুড়ি কি. মি. পরিধির মধ্যে, আরও কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের বিশেষ উল্লেখ করতেই হয়। শহর থেকে নয় কি. মি. উত্তরে **বাণেশ্বর শিবমন্দির** মহারাজা প্রাণনারায়ণের ১৬৬৫ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত, যদিও মন্দিরটির কয়েকবার সংস্কার করা হয়েছে। পনেরো শতকের **গোসানমারী (কামতেশ্বরী)** মন্দিরের সংস্কার মহারাজা প্রাণনারায়ণই করেছিলেন। এখন ভগ্নাবস্থায় মন্দিরের গর্ভগৃহে কোন মূর্তি নেই। এটি বাংলার 'দো-চালা' মন্দির-স্থাপত্য-শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কোচবিহার শহর থেকে দশ কি. মি. দূরে **হরিহর মহাদেবের** মন্দির, আর উত্তরে নয় কি. মি. দূরে রয়েছে **সিদ্ধেশ্বরী** মন্দির। কোচবিহার বাজারের কাছে এই শতাব্দীতে সম্পূর্ণরূপে সংস্কার করা **মদনমোহন** (গিরিধারীলাল গোপীবল্লভ) মন্দিরটি কোচবিহারবাসীদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে—দোলযাত্রায় তিনদিন ধরে বিরাট ...স।

তাহিরপুরের রাজপরিবার

রাজসাহী

উত্তর বাংলার সবচেয়ে পুরানো জনপদ গৌড় আর তার পরেই রাজসাহী। বাংলায় হিন্দু সেন রাজাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সুলতান ইখ্‌তিয়ারুদ্দিন মহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খলজী ১২০২ খ্রীঃ থেকে শুরু করে বাংলার স্বাধীন পাঠান সুলতানরা মহম্মদ শাহী বংশ (আনুঃ ১৪৩৬—১৫০০ খ্রীঃ), দিল্লীর মোগল সম্রাটরা (১৫৭৫-১৮০৩ খ্রীঃ), মুর্শিদাবাদের স্বাধীন নবাবরা (১৭১৭—৬৫ খ্রীঃ) ও ইংরাজ রাজশক্তি (১৭৬৫-১৯৪৭ খ্রীঃ) কাল পরম্পরায় রাজসাহীর প্রকৃত শাসন-কর্তা ছিলেন। খ্রীঃ সতেরো শতকে বৃহৎ-বাংলায় রাজসাহীর ব্যাপ্তি ছিল, উত্তর-পশ্চিমে ভাগলপুর থেকে পূর্বে ঢাকা পর্যন্ত, আর মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর, বীরভূম ও বর্ধমানের অংশবিশেষ। রাজসাহী জেলায় প্রতিষ্ঠিত ও পরাক্রমশালী রাজপরিবার—তাহিরপুর [১] দুবলহাটি, পুঁটিয়া, নাটোর, দিঘাপতিয়া, বলিহার—প্রত্যেকেই তাঁদের সময়কালে প্রভুত্ব করেছেন। এঁরা অনেকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হলেও, প্রত্যেক রাজপরিবারের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এককভাবে এই অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে।

তাহিরপুর রাজপরিবারের ইতিহাস প্রায় ৫০০ বছর পূর্বেই শুরু হয়েছিল গৌড়ের পাঠান সুলতান হোসেন শাহের আমলে (১৪৯৩ খ্রীঃ)। রাজপরিবারের পূর্বতন রাজাদের নামের মধ্যে অমিল আছে, সময়কালের কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণও নেই। যাইহোক, একটি সম্ভবপর সম্বন্ধে তাঁদের নাম ও অতি সংক্ষিপ্ত কীর্তিকলাপ [২] বর্ণিত হয়েছে।

ভট্টনারায়ণের আঠারো অধস্তন-পুরুষ কামদেব ভট্ট ও তাঁর পুত্র **বিজয় ভট্ট** (সুলতানদের দেওয়া উপাধি 'লস্কর' সেনাপতি) আনুঃ ১৪২০ খ্রীঃ স্থানীয় মুসলমান জমিদারকে পরাভূত করে তাহিরপুর অধিকার করেন। বিজয় লস্করের দ্বিতীয় পুত্র হৃদয়নারায়ণের পরে তৃতীয় পুত্র হরিনারায়ণ রাজা হন। হরিনারায়ণের পুত্র [৩] **কংসনারায়ণ** ছিলেন রাজ-পরিবারের সবচেয়ে সুপরিচিত ও স্মরণীয় রাজা। আনুঃ ১৫৯০ খ্রীঃ তদানীন্তন মোগল সম্রাট আকবরের বাংলা-বিহারের শাসন-কর্তা রাজা মানসিংহের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি আরাকান রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

১। তাহিরপুর পুঁটিয়া থেকে ১৮ কি. মি. উত্তরে অবস্থিত।

২। বংশ পরিচয়, প্রথম খণ্ড—জ্ঞানেন্দ্রকুমার। বাংলার অনন্ত সামন্ত-চক্রের ইতিহাস—ধনঞ্জয় দাস মজুমদার। District Gazetteer, Rajsahi, 1916.

৩। ভিন্ন মতে অনন্তনারায়ণের পুত্র।

মোগল সৈন্যদের সাহায্য করেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, তিনি তাহিরপুর নামে গ্রামটিকে 'গৌড়' নামকরণ করে নিজে সম্মান-সূচক উপাধি 'গৌড়েশ্বর' নামে চিহ্নিত হন। প্রমাণ সাপেক্ষ ইতিবৃত্তে বলা হয়েছে যে, রামায়ণ রচয়িতা বাঙালী কবি কৃত্তিবাস (পনেরো শতক) কংসনারায়ণের সভা পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু ইতিহাস-ভিত্তিক কয়েকটি রচনায় পাওয়া যায় যে, কৃত্তিবাস তৎকালীন প্রকৃত 'গৌড়েশ্বর' মহম্মদ শাহী সুলতান রুকনুদ্দিন বরবাক শাহের (১৪৫৫—৭৬ খ্রীঃ) সভাতেই উপস্থিত হয়ে লিখেছিলেন :—'নয় দেউড়ি পার হয়ে গেলাম দরবারে।

সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসন পরে ॥
... ...
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
... ...
পাটের চান্দোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরচ পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥'

তৎকালীন কয়েকজন সভাসদদের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন—কেদার রায়, মুকুন্দ সুন্দর, শ্রীবৎস প্রমুখ। কিংবদন্তীতে জানা যায় যে, কংসনারায়ণ তাঁর কুল পুরহিত রমেশ শাস্ত্রীর বিধানানুসারে বাংলায় 'সপরিবারে মহিষমর্দিনী দশভুজা' মৃন্ময়ী দুর্গা পূজা শুরু করেন—আশ্বিন মাসে 'অকাল বোধন'—চিরানুসৃত শাস্ত্রীয় মতে চৈত্র মাসে নয়। এই পূজা-পদ্ধতিই আজ বাংলায় ও বহি-বাংলায় সর্বত্রই অনুসরণ করা হয়। তাছাড়া কংসনারায়ণ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের কল্যাণে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা ও বেশ কিছু সংস্কার করেন। তিনিই বারেন্দ্র কুলীনের মূলাধার ছিলেন।

কংসনারায়ণের পুত্র **উদয়নারায়ণ** ও পৌত্র **রাজা ইন্দ্রজিৎ**। ১ সম্রাট জাহাঙ্গীরের আনুকূল্যে ইন্দ্রজিৎ-এর সময়ে তাহিরপুর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল বাহান্নটি পরগণা। তাঁর পুত্র রাজা **সূর্যনারায়ণ** বাংলার শাসক শাহাজাদা মহম্মদ সুজার (১৬৩৯-৬০ খ্রীঃ) বিরাগভাজন ২ হওয়ায় গদীচ্যুত হন। পরে ঢাকার শাসন-কর্তা মিরজুমালার সুপারিশে

১। কথিত আছে যে রাজা ইন্দ্রজিৎ নাকি পিতামহ উদয়নারায়ণকে সম্রাটের নির্দেশে বন্দী করে দিল্লীতে নিয়ে যান। পুরস্কার-স্বরূপ বাহান্নটি পরগণার জায়গীর পান। পরে এই জায়গীরের সনন্দ 'বোর্ড অফ্ রেভিনিউ' ১৭৮৯ খ্রীঃ লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর কাছে পাঠিয়েছিল।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আনুঃ ১৭০৫ খ্রীঃ নবাব মুর্শিদকুলী খানের আদেশে নদীয়ার রাজা রঘুরা (মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা) তাহিরপুরের কোনো এক রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করে বন্দী করেন।

২। রাজা সূর্যনারায়ণ তাঁর কন্যাকে শাহজাদার হাতে না দেওয়ায়, তাঁকে বন্দী করে দিল্লীতে পাঠান হয় এবং সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

সম্রাট ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে তাহিরপুর পরগণায় গদী রাজা সূর্যনারায়ণের কনিষ্ঠ পুত্র **লক্ষ্মীনারায়ণকে** ফিরিয়ে দেওয়া হয়। খেতাবী 'রাজা' সনন্দ পান। তাঁর দুই বিবাহ। দীর্ঘায়ু হওয়ায় বহু কষ্ট স্বীকার করেও নিজের জমিদারী বজায় রেখেছিলেন। লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র **কন্দর্পনারায়ণের** অকালে মৃত্যু হওয়ায়, তাঁর জমিদারী দু-ভাগ হয়ে যায়—প্রথমা পত্নীর দ্বিতীয় সন্তানকে ছয় আনা অংশ ও বাকি দশ আনা অংশ দ্বিতীয়া পত্নীর দুই পুত্রের মধ্যে। কিন্তু দ্বিতীয়া স্ত্রীর পুত্র **রূপেন্দ্রনারায়ণ** তাঁর কূটবুদ্ধি ও দেওয়ান রঘুনন্দনের সাহায্যে, তাঁর ভাইয়ের অংশ নির্বিবাদে দখল করেন। এইভাবে রাজা রূপেন্দ্রনারায়ণ হলেন 'দশ আনী' ও বৈমাত্র ভাই **রাজা ভুপেন্দ্রনারায়ণ** হলেন 'ছয় আনী' অংশীদার। রূপেন্দ্রনারায়ণ দীর্ঘদিন জমিদারী পরিচালনা করেন ও তাহিরপুরে দীঘি, মণ্ডপ ও প্রাসাদ তৈরী করেন। তাঁর পুত্র **রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ** ও পৌত্র **রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ** বৃদ্ধ প্রপিতামহের ন্যায় বহুদিন জমিদারীর গদীতে ছিলেন। তাঁর দুই কন্যা—উমাসুন্দরী ও দুর্গাসুন্দরী এবং রাণী—শঙ্করী। দুই রাজকন্যার বিবাহ হয় হরগোবিন্দ ভাদুড়ীর দুই পুত্রের—**আনন্দরাম ও বিনোদরাম** রায় [১]-সঙ্গে। 'দশ আনী' জমিদারী. দুই ভাই ভালো ভাবেই চালাতে থাকেন, কিন্তু 'ছয় আনী' জমিদার নানা কারণে ও শেষ উত্তরাধিকারী **দেবেনারায়ণ** নিঃসন্তান হওয়ায়, তাঁর 'ছয় আনী' জমিদারীর অংশ, 'দশ-আনী' তরফের **বিশ্বেশ্বরনারায়ণ** উত্তরাধিকারী সূত্রে মালিক হন। তিনি অতি ধীর ও নম্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ মারা যান ৭১ বছর বয়সে। তাঁর দুই পুত্র—রাজা **চন্দ্রশেখরেশ্বর** এবং **মহেশ্বর** জমিদারীর মালিক হন। মহেশ্বর বড় ভাই চন্দ্রশেখরেশ্বরকে জমিদারীর ভার ছেড়ে দেন।

রাজা শশীশেখরেশ্বর রায়

রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বরের তিনটি বিবাহিতা স্ত্রী। প্রথমা দুই স্ত্রী নিঃসন্তান, তৃতীয়া স্ত্রী সৌদামিনীর পুত্র শশীশেখরেশ্বরের জন্ম হয় ১০ ডিসেম্বর, ১৮৬০ খ্রীঃ। চন্দ্রশেখরেশ্বর নাবালক পুত্রকে রেখে অকালে মারা যান ১৮৬৫ খ্রীঃ। রাজা চন্দ্রশেখরেশ্বর ছোট ভাইয়ের জমিদারীর প্রায় সব অংশই কিনে নিয়েছিলেন। নাবালক শশীশেখরেশ্বরের জমিদারী 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস'-এর হাতে যায়। শশীশেখরেশ্বরের পড়াশোনার ভার পড়ে কলকাতার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উপর।

১৮৮১ খ্রীঃ শশীশেখরেশ্বর সাবালক হলেন। জমিদারীর উন্নতির জন্য কৃষি-শিল্প আধুনিকীকরণে তৎপর হন। বিদেশ থেকে ভালো বীজ ও কৃষি যন্ত্রপাতি এনে

১। বিনোদরাম রায় তাহিরপুরের বর্তমান (দ্বিতীয়) রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা।

প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। রেশম শিল্পে তাঁর জ্ঞান ছিল। তিনি একটি বইও লিখেছিলেন। তাঁর সাহিত্যচর্চায় অনুরাগ থাকায় কবিতা ও গান রচনা করেছিলেন। তাঁর প্রজামঙ্গল কার্যক্রম ও সরকার-প্রীতির স্বীকৃতি-স্বরূপ রাজপ্রতিনিধি স্যার স্টুয়ার্ট্ কলভিন্ বেইলী তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন ১৮৮৯ খ্রীঃ। ১৮৯৩ খ্রীঃ রাজ্য গাঁজা কমিশনের ভারতীয় সদস্য থাকাকালীন গাঁজার অপকারিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে, মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ও চাষের ঘোরতর বিরোধিতা করেন। তিনি এই সুকর্মের জন্য ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছিলেন। 'রাজা বাহাদুর' উপাধি পান ১৮৯৬ খ্রীঃ। প্রায় দশ বছর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন। রাজা শশীশেখরেশ্বর সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীর লেখার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল—জে. সি. প্রাইস্-এর রিপোর্ট—

'The Tahirpur Raj family which claims to be the most ancient not only in Rajshahi but in the entire province of Bengal. ……Raja Shashisekhareswar Ray is one of the most enlightened nobleman that I have ever had the good fortune to know'. অমৃত বাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল 'He is a worthy member of a worthy family. He is a patriot, nay a philanthropist. It was he who established the Panchyet in Zamindary. He has few equals in India and scarcely any superior.'

রাজা শশীশেখরেশ্বরের বিবাহ হয় রাণী শরৎকামিনী দেবীর সঙ্গে ১৮৭৩ খ্রীঃ। তাঁর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। রাজা মারা যান বরানগরে ৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীঃ। বড় কুমার **শিবশেখরেশ্বরের** জন্ম হয় ৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৭ খ্রীঃ। ১৯০৯ খ্রীঃ বারাণসীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ থেকে স্নাতক হন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন রাজসাহী জেলার জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে। মারা যান ১১ এপ্রিল, ১৯৬১ খ্রীঃ। দ্বিতীয় কুমার **শান্তিশেখরেশ্বরের** জন্ম হয় ১৮৯১ খ্রীঃ। কাশীর হিন্দু-কলেজে পড়াশোনা করেন। এম. এ. পাশ করার পর পুরীধামে 'রত্নাকর' সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কাজে নিযুক্ত ছিলেন। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি 'ফেলো'। তিনি পুরী যক্ষ্মা নিবাসের প্রতিষ্ঠাতা। মারা যান ২৯ মে, ১৯৬১ খ্রীঃ। কনিষ্ঠ কুমার **শক্তিশেখরেশ্বরের** জন্ম হয় ১৮৯৯ খ্রীঃ। তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের স্নাতক। মারা যান মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯২৪ খ্রীঃ।

২। জ্যেষ্ঠ কুমার শিবশেখরেশ্বরের (স্ত্রী অন্নপূর্ণা দেবী) এক পুত্র সিতাংশুশেখরের দুই পুত্র—সবিতাশেখর ও সবানীশেখর। মধ্যম কুমার শান্তিশেখরেশ্বরের (স্ত্রী কুলদাসুন্দরী, সুসঙ্গ রাজপরিবারকন্যা) চার পুত্র—প্রথম পুত্র শশাঙ্কশেখরের দুই পুত্র—শুভ্রাংশুশেখর ও স্নেহাংশুশেখর। দ্বিতীয় পুত্র সতীশেখরের চার পুত্র—সুব্রত, সুপ্রিয়, সুদীপ্ত ও সুস্মিত। তৃতীয় সত্যশেখরের দুই পুত্র সুজিত ও সঞ্জীব। চতুর্থ পুত্র শচীশেখর অবিবাহিত। কনিষ্ঠ কুমার শক্তিশেখরের পুত্র (পিতার মৃত্যুর পর জাত) শুভেন্দুশেখরের পুত্র আনন্দ। এঁরা সকলেই কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বাস করেন।

ডুবলহাটি রায়চৌধুরী রাজপরিবার

রাজসাহী

রাজসাহী জেলার নওগাঁ মহকুমায় ডুবলহাটি [১] একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই অঞ্চলে বারেন্দ্র বৈশ্য রায় (সাহা) পরিবারের বাসভূমি ছিল প্রায় পঞ্চাশ পুরুষ যাবৎ। এই জেলায় রায় বংশের জমিদারী তাহিরপুরের চেয়ে পুরানো যদিও সঠিক ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যায়নি। রায় বংশের প্রতিষ্ঠাতা বনিক **জগৎরাম রায়** (জয়চন্দ্র) ছিলেন মুর্শিদাবাদের যজ্ঞেশ্বর গ্রামের অধিবাসী অবাঙালী ব্যবসায়ী। জগৎরাম ব্যবসা-সূত্রে ডুবলহাটির কাছে কসবাতে আসেন। কথিত আছে যে, এক অলৌকিক দৈব (মা রাজরাজেশ্বরী) আদেশে, তিনি জনশূন্য জঙ্গলাকীর্ণ কসবা অঞ্চলে বসতি শুরু করেন ভাগ্য-লক্ষ্মীর বরপুত্র হওয়ার আশায়। তিনি চুড়ীর ব্যবসা করতেন দেশ-বিদেশে গিয়ে। পরে তাঁর জমিদারীর বিশাল অংশ ছিল জলাভূমি। মাছের চাষ বিশেষ করে, কৈ মাছের ব্যবসায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। মোগল সম্রাট ও পরে নবাবদের পাওনা রাজস্ব দেওয়া হত কৈ মাছের পণ্য বিনিময়ে। একবার ২২ কাহন কৈ মাছ ধার্য হয়েছিল রাজস্ব হিসাবে। নবাবশাহি আমলে ডুবলহাটির জমিদাররা এক প্রকার নিষ্কর জমিদারী ভোগ করতেন। তাঁদের আর্জি ছিল যে, তাঁরা অনুর্বর ও চাষ-আযোগ্য জলা-জমি বাবদ রাজস্ব দেওয়ায় অপারক। যেহেতু তাদের জমিদারীতে মাছের চাষ ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন হয় না, অতএব রাজস্ব হিসাবে মাছ নির্দিষ্ট ছিল। বংশের চিহ্ন স্বরূপ-'তুরী ও ডঙ্কা' ব্যবহার করতে অনুমতি পান। জমিদারীর পুরানো দলিল দস্তা বেজে দেখা যায়, বাৎসরিক রাজস্ব ১৭২৮ খ্রীঃ ৬০০ এবং ১৭৬১ খ্রীঃ ৭২৭ শিক্কা টাকা। রবার্ট ক্লাইভের 'দ্বৈত শাসন'-এর বন্দোবস্তের সময় (১৭৬৬—৬৭ খ্রীঃ) এবং 'দশসালা বন্দোবস্ত'-এর পূর্বে (১৭৯১ খ্রীঃ) দেয় রাজস্ব ছিল ৩৭২২ টাকা। ১৭৯৩ খ্রীঃ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এ রাজস্ব ধার্য হয় ১৪৪৯৫ টাকা। রাজা কৃষ্ণরামের সময়। রাজা হরনাথের সময় ডুবলহাটির জমিদারী চারগুণ বৃদ্ধি পায়।

জগৎরামের অষ্টম উত্তর-পুরুষ **মুক্তারাম রায়** তাঁর জমিদারী দুই পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র **কৃষ্ণরাম রায়** নয় আনা অংশ আর কনিষ্ঠ **রঘুরাম রায়** [২] পান সাত আনা অংশ। দুটি বিভিন্ন জমিদারীর সৃষ্টি হল। রঘুরাম চলে যান ডুবলহাটি গ্রামে।

১। ডুবলহাটি নওগাঁ শহর থেকে সড়ক পথে আট কি. মি. দূরত্বে।

২। ভিন্ন মতে যথাক্রমে কৃষ্ণনাথ ও রঘুনাথ।

তৈরী করলেন নতুন রাজপ্রসাদ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণরাম থেকে গেলেন কসবায় বারোদুয়ারী রাজপ্রাসাদে। কৃষ্ণরাম অপুত্রক হওয়ায়, তাঁর স্ত্রী পরের পর চারটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করা সত্ত্বেও প্রত্যেকেরই অকাল মৃত্যু হয়। জমিদারীর অংশ বলিহার ও দামনাস জমিদারদের বিক্রী করে দেন। এই ভাবেই বড় তরফের কৃষ্ণরাম রায়ের জমিদারী শেষ হয়ে যায়।

রঘুরাম রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত দুবলহাটি রাজপরিবার-ভুক্ত আদি বংশের উত্তরপুরুষরা যথাক্রমে পরমেশ্বর, শিবনাথ, কৃষ্ণনাথ ও রাজা **আনন্দনাথ রায়চৌধুরী** জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। আনন্দনাথ অপুত্রক অবস্থায় অকালে মারা যাওয়ার পূর্বে দত্তক নেন রাজসাহীর সিরলা গ্রামের এক ভাগ্যবান শিশুকে। পরে তার নামকরণ হয় **হরনাথ রায়চৌধুরী**।[১] আনন্দনাথের দুই রাণী। তাঁরা দুজনে হরনাথ রায়চৌধুরীর উত্তরাধিকারীর দাবীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন। হাইকোর্টের রায়ে দত্তক পুত্র রাজা হরনাথের গদী বহাল থাকে ১৮৫৩ খ্রীঃ। সেই সময় জমিদারীর সুযোগ্য দেওয়ান ছিলেন কৃষ্ণকুমার বক্সী।

রাজা হরনাথ রায়চৌধুরী

রাজা হরনাথ রায়চৌধুরী ছিলেন এই রাজপরিবারের স্মরণীয় রাজা। লোকপ্রিয় জমিদার রাজা হরনাথের দানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—রামপুর বোয়ালিয়া জিলা স্কুল, রাজসাহী কলেজ, নাওগাঁয়ে দাতব্য চিকিৎসালয়, দুবলহাটি থেকে নওগাঁ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ, দার্জিলিং লুইস্ জুবিলী স্যানিটোরিয়াম্ প্রভৃতি। উত্তরবঙ্গে ১৮৭৪ খ্রীঃ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য এবং রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ইংরাজ সরকারের রাজপ্রতিনিধি স্যার রিচার্ড টেম্পেল্ ১৮৭৫ খ্রীঃ হরনাথকে 'রাজা' উপাধিতে সম্মানিত করেন। পরে স্যার এ্যাস্‌লে ইডেন তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ। রাজা বাহাদুর হরনাথ রায়চৌধুরী মারা যান ১৮৯২ খ্রীঃ। দুবলহাটিতে হরনাথ হাই স্কুল তাঁর স্মৃতি বিজড়িত।

রাজা হরনাথের চতুর্থা স্ত্রী[১] রাণী উমাসুন্দরীর গর্ভে দুই পুত্র—**ঘনদানাথ** ও **ক্রীঙ্কারীনাথ**। চিরাচরিত প্রথামত হরনাথের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র ঘনদানাথ জমিদারীর গদীতে বসেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর। উনিশ বছর জমিদারী পরিচালনা করে অকালে মারা যান মাত্র ৩৭ বছর বয়সে ১৯১১ খ্রীঃ, স্ত্রী প্রমীলাসুন্দরী ও দুই কন্যা

১। রাজা হরনাথের চার রানী—রূপমঞ্জরী (প্রথমা), রূপমঞ্জরী (দ্বিতীয়া), শ্যামাসুন্দরী ও উমাসুন্দরী।

স্নেহলতা ও শান্তিলতাকে রেখে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ক্রীশ্বারীনাথ জমিদারীর মালিক হন। দেশ বিভক্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত ক্রীশ্বারীনাথ ডুবলহাটির জমিদারীর ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় মার্চ, ১৯৪৯ খ্রীঃ স্ত্রী রণপ্রিয়াদেবী ও তিন কন্যা ও তিন পুত্র—বীরেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ ও অমরেন্দ্রনাথকে রেখে। বীরেন্দ্রনাথের ছয় কন্যা ও চারপুত্র। সমরেন্দ্রনাথের তিন পুত্র ও দুই কন্যা। অমরেন্দ্রনাথের ছয় পুত্র। অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষ চিত্রকার রমেন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃপুরুষদের ঐতিহ্য বজায় রাখতে অসমর্থ হলেও, তাঁর মূল্যবান সংগ্রহে রাজপরিবারের বেশ কয়েকটি পুরানো আলোকচিত্র ও কিছু নথি-পত্র সযত্নে রক্ষা করে রেখেছেন তাঁর পূর্ব যাদবপুর বাসভবনে।

রাজপ্রাসাদ

ডুবলহাটির রাজপ্রাসাদ উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বড় 'রাজবাটি'। আনুঃ সতেরো শতকের শেষ ভাগে তৈরী প্রাসাদটি বিলাসবহুল রাজপরিবারের জাঁকজমক ও রুচির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কালের হাওয়ায় বিধ্বস্ত হয়েও, দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদের বিরাট অংশ। দুতলা প্রসাদটিতে ছোট বড় ঘর ও দালান ছিল সর্বসাকুল্যে পাঁচশোর বেশী। চত্বরে ছিল বারোটি উঠান এবং পূজাঘাট ও স্নানঘাট বেষ্টিত জলাধারগুলি। এখন আর রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে নহবতখানার সুর দিনের সূচনা করে না ঠিকই, কিন্তু দর্শকদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে বাংলার ঐতিহ্যের গৌরবময় কাহিনী। ১২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ ভয়ঙ্কর ভূকম্পে রাজপ্রাসাদের ভীষণ ক্ষতি হয়। সব সংস্কার করা সম্ভবপর হয়নি। প্রাসাদের সামনের দিকে ছাদের কার্নিশে দাঁড়-করানো ইউরোপীয় প্রাচীন ভাস্কর্যের অনুকরণে তৈরী বিভিন্ন মূর্তি ও প্রতীক পুনঃনির্মিত হয়েছে। দৈনিক প্রত্রিকা [১] ও আলোক চিত্রে ধরে রাখা কয়েকটি অতীতের নিদর্শন উল্লেখ করা যেতে পারে—রঙ্গমঞ্চ, শ্বেত পাথরের 'হাওয়াখানা,' রামবাগের শ্বেত পাথরের বিশ্রামাগার, বিরাট দরবার হল আর হাতির দাঁতের অপরূপ কারুশিল্প মণ্ডিত দুটি রাজসিংহাসন। [২] এইসব মূল্যবান সংগ্রহগুলি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার লাহোর ও ঢাকা সংগ্রহশালায় স্থানান্তরিত করেন।

১। বাংলাদেশে একাধিক বই ও পত্রিকায় ভগ্নদশাপ্রাপ্ত প্রাসাদটির ইতিবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়েছে।

২। এই দুটি রাজসিংহাসনের আলোক চিত্র এই পুস্তকের প্রচ্ছদে দেওয়া হয়েছে।

পুঁটিয়া রায় রাজপরিবার

রাজসাহী

সতেরো শতকের শেষ ভাগে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিমকালে দেশের শাসন ব্যবস্থার অবনতি ঘটে। একাধিক সুবাদার, আমীর, ওমরাহ, এমন কি, স্থানীয় জমীদাররা সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেন। তাঁদের শায়েস্তা করতে দিল্লী থেকে মোগল সেনাপতির অধীনে সেনাবাহিনী আসে এই অঞ্চলে। পুঁটিয়ার [১] কাছে মন্দ্রকন্দ গ্রামে **বৎসরাচার্য** নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল। মোগল সেনাপতি (রাজা মান সিংহ ?) বৎসরাচার্যের সাহায্য ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। পরে বিদ্রোহ দমনে সফল হয়ে, সেনাপতি বৎসরাচার্যকে লস্করপুরের জমিদারীর মালিক করে দেন। সন্ন্যাসী বৎসরাচার্যের দুই পুত্র—**পীতাম্বর** ও **নীলাম্বর** পরে জমিদারীর পরিচালনার ভার নেন। এইভাবে পুঁটিয়া রাজপরিবারের সূত্রপাত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫—২৭ খ্রীঃ) নীলাম্বরকে 'সহর মণ্ডল' ও 'রাজা' উপাধি দেন। তাছাড়া তাহিরপুরের পুরানো জমিদারীর প্রায় আট আনা অংশ নীলাম্বর দান হিসাবে পেয়েছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র **আনন্দরাম** সম্রাটের কাছ থেকে 'রাজা' খেতাব লাভ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র **ঠাকুর রতিকান্ত** যদিও জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন, কিন্তু 'রাজা' উপাধি পাননি তাঁর নিজ কর্মদোষে। পারিবারিক সম্মানী 'ঠাকুর' পদবী অবশ্যই তাঁর ছিল। রতিকান্তের পুত্র **রামচন্দ্র** লোকহিতকর কাজ করে পিতার অপকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেন। তিনি পুঁটিয়ার 'রাধাগোবিন্দ' মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। সম্রাটের দেওয়া 'রাজা' উপাধি পান। রাজা রামচন্দ্রের তিন পুত্র—**রাজা নরনারায়ণ, রাজা দর্পনারায়ণ** ও **ঠাকুর জয়নারায়ণ**। রাজা দর্পনারায়ণ নবাব মুর্শিদকুলীর বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

অনুঃ ১৭৪৪ খ্রীঃ পুঁটিয়া জমিদারীর মালিক হলেন চার ভাই। জমিদারী চারভাগ করা হল—ভাগে বড় ভাই পান সাড়ে পাঁচ আনা অংশ আর অপর তিন ভাই প্রত্যেকে পান সাড়ে তিন আনা অংশ। এইভাবে জমিদারীর শরিকরা **'পাঁচ আনী'** ও **'চার আনী'** নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

ইংরাজ সরকারের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্ণওয়ালিস-এর শাসনকালে (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) **রাজা আনন্দনারায়ণ** সরকারের সঙ্গে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' চুক্তি করেন। জমিদারীর বাৎসরিক রাজস্ব ধার্য হয় ১,৮৭,৫৭২ টাকা ও ৪ আনা। আনন্দনারায়ণের

১। পুঁটিয়া গ্রামটি রাজসাহী জেলায় নাটোর শহর থেকে প্রায় ১৫ কি.মি. দূরে অবস্থিত।

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে **রাজেন্দ্রনারায়ণ** ছিলেন সরকারী উপাধিধারী 'রাজা বাহাদুর'। অপর এক উত্তরাধিকারী রাজা ভুবনেন্দ্র নারায়ণের পুত্র **রাজা জগৎনারায়ণের** সময়ে পুঁটিয়া জমিদারীর আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। রাজসাহী ছাড়া ময়মনসিংহ ও নদীয়ার কয়েকটি পরগণা পুঁটিয়া জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজা জগৎনারায়ণ বারাণসীতে গঙ্গায় স্নানঘাট ও অতিথিশালা তৈরী করে দিয়েছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁকে বংশগত 'রাজা' উপাধি-ধারণে অনুমতি দেন ১৮০৯ খ্রীঃ। প্রজাদের মঙ্গল ও স্বধর্ম প্রসারের জন্য বহু জমি দান করেন। মারা যান ১৮১৬ খ্রীঃ। বিধবা রানী ভুবনময়ী দেবী পুঁটিয়ায় ভুবনেশ্বর মন্দির (পঞ্চরত্ন-শৈলী) তৈরী করেছিলেন ১৮২৩ খ্রীঃ।

পূর্বোক্ত **'পাঁচ আনী'** [১] জমিদার পরিবারের রাজারা বিশেষ করে, তাঁদের রানীরা, সৎকার্যের মাধ্যমে বাংলার মানুষের কাছে স্মরণীয়া হয়ে আছেন। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় লোকপ্রিয় **রাজা যোগেন্দ্রনারায়ণ** (১৮৪০-৬২ খ্রীঃ) ও তাঁর বিধবা স্ত্রী **মহারানী শরৎসুন্দরীর** নাম। মহারানীর দানে তৈরী হয়েছিল রাজসাহী কলেজের ছাত্র-নিবাস, রামপুর বোয়ালিয়ায় সংস্কৃত কলেজ ও আরো কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও মন্দির। ইংরাজ সরকার শরৎসুন্দরী দেবীকে ব্যক্তিগত 'রানী' উপাধি দেন ১২ মার্চ, ১৮৭৫ খ্রীঃ এবং পরে 'মহারানী' উপাধিতে ভূষিত করেন ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ। তিনি নাকি গ্রহণ করেননি। মারা যান ১৮৮৬ খ্রীঃ।

মহারানীর দত্তক পুত্র **রাজা যতীন্দ্রনারায়ণ**-এর বিধবা **রানী হেমন্তকুমারীর** সময় গোবিন্দসাগর জলাশয় পুনঃসংস্কার করা হয় ১৮৯৩ খ্রীঃ। পুঁটিয়ার বিরাট দোলমণ্ডপের সামনে 'পাঁচ আনী' রাজাদের রাজবাড়ী তৈরী হয়েছিল রানী হেমন্তকুমারীর নির্দেশে। রাজবাড়ীটি ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর অনুকরণে তৈরী হয়েছিল ১৮৯৫ খ্রীঃ রাজা যতীন্দ্রনারায়ণ রায়ের স্মরণে। হেমন্তকুমারীর ঠাকুর সেবায় ও জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য দানের পরিমান অনন্ত। মারা যান ১২ জুন, ১৯৪২ খ্রীঃ বারাণসীতে ৭৮ বছর বয়সে। তাঁর তিন দৌহিত্র—এ. এন্. সান্যাল, এস্. এন্. সান্যাল (এম্. এল্. সি.) ও এন্. এন্. সান্যাল। উত্তর কলকাতায় হেমন্তকুমারী স্ট্রীট তাঁর স্মরণিক।

'চার আনী' জমিদার **রাজা পরেশনারায়ণ রায়**-এর স্ত্রী **রানী মনমোহিনী দেবী** পরেশনারায়ণ হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৭১ খ্রীঃ। তার পূর্বে পরেশনারায়ণ চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৬৬ খ্রীঃ। তাঁর পুত্র **নরেশনারায়ণ রায়,** নাটোরের ছোট তরফের কুমার বীরেন্দ্রনাথের ভগ্নীকে বিবাহ করেছিলেন।

'এক আনী' আংশীদার জমিদারদের মধ্যে দুই ভাই **নৃপেন্দ্রনারায়ণ** ও **খগেন্দ্র নারায়ণ** ১৯১২ খ্রীঃ 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডসের' হাত থেকে জমিদারীর দায়িত্ব ফিরে পান।

১। 'পাঁচ আনী' জমিদারী ১৮৯০ খ্রীঃ দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ কিনে নিয়েছিলেন দিঘাপতিয়ার কুমার হেমেন্দ্রকুমার রায়।

নাটোরের রায় রাজপরিবার

রাজসাহী

উত্তর বাংলার প্রাচীন জনপদগুলির মধ্যে গৌড় ছাড়া রাজসাহী জেলার নাটোর[১] বোধহয় সবচেয়ে লোক পরিচিতি ও গুরুত্ব লাভ করেছিল। নাটোর রাজপরিবারের ইতিবৃত্ত শুরু হয়েছিল রাজসাহীর লস্করপুরের জমিদার পুঁটিয়ার রাজা নরনারায়ণের আমলে (আনুঃ আঠারো শতকের মধ্যভাগে)। কামদেব মৈত্র (রায়) ছিলেন বারুইহাটির তহশিলদার। কামদেবের পুত্র রঘুনন্দন রায় সহজাত দক্ষতার ও প্রতিভার অধিকারী। পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের প্রতিনিধি হিসেবে রঘুনন্দন ঢাকায় নবাবের দরবারে আসেন। কিছুদিনের মধ্যেই রঘুনন্দন দরবারের কূটকৌশল ও স্থানীয় রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা লাভ করে প্রধান কানুনগোর সহকারী পদে আসীন হন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও দুর্লভগুণের জন্য নবাব মুর্শিদকুলী খান তাঁকে তাঁর বিশেষ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। ১৭০৪ খ্রীঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্যে মারাঠা যুদ্ধের প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা, নবাব মুর্শিদকুলী মেটাতে পেরেছিলেন কেবল নাকি রঘুনন্দনের সাহায্যে। তার প্রতিদানে নবাব রঘুনন্দনকে 'রায় রায়ান' উপাধি, দেওয়ান পদে নিযুক্ত, ও বিশাল জমিদারীর মালিক করে দেন।[২]

রঘুনন্দনের প্রভাব ও সুপারিশে নবাব রঘুনন্দনের বড় ভাই রামজীবনকে বেশ কয়েকটি পরগণা (বঙ্গাছি, ভাতুড়িয়া ও রাজা সীতারাম[৩] রায়ের ভূষণার একটি অংশ) বন্দোবস্ত করে দেন ১৭১২ খ্রীঃ। যদিও এই জমিদারীর প্রকৃত স্রষ্টা রঘুনন্দন রায়, কিন্তু জমিদারীর গদিতে বসলেন বড় ভাই রামজীবন রায়। সূত্রপাত হল নাটোর রাজপরিবারের। রামজীবন তাঁর দেওয়ান দয়ারামের[৪] সাহায্যে বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করেন। প্রচুর নজরানার বিনিময়ে সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২ খ্রীঃ) রামজীবনকে 'রাজা' উপাধি ও বাইশটি খেলাত দিয়েছিলেন ১৭০৮ খ্রীঃ। রঘুনন্দন মারা যান ১৭২৪ খ্রীঃ।[৫]

১। নাটোর শহর নাটোর রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে ৫ কি.মি.।

২। অল্প সময়ের মধ্যে এই অতি বৃদ্ধি 'রঘুনন্দনী বাড়' প্রবচনের সৃষ্টি হয়।

৩। 'সাঁতৈল রাজপরিবার' এবং 'রাজা সীতারাম রায়' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৪। 'দীঘাপতিয়া রায় রাজপরিবার' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫। নাটোরের কথা ও কাহিনী—নাটোর মহকুমা সম্মিলনী, ১৯৮১।

রাজা রামজীবন পুত্র **কালিকাপ্রসাদের** অকালমৃত্যুতে, ১৭২৫ খ্রীঃ **রামকান্তকে** দত্তক নেন। রামজীবন ১৭৩০ খ্রীঃ মারা যান এবং তাঁর বিশাল নাটোর-জমিদারীর পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে রাজা রামকান্ত ও তাঁর রানী প্রাতঃস্মরণীয়া **রানী ভবানীর** উপর। কর্তব্যপরায়ণ দক্ষ দেওয়ান দয়ারাম রায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় বিশাল নাটোর জমিদারী (৭০ লক্ষ টাকা দেয়-রাজস্ব) চলতে থাকে। নবাব সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রীঃ) **রামকান্তকে** 'মহারাজা' উপাধি ও সমগ্র রাজসাহী জমিদারী বন্দোবস্ত করে দেন। তাছাড়া ১৭৩৭ খ্রীঃ নবাব, নলডাঙ্গার (যশোহর) রাজা রঘুদেবকে অপদার্থ ও কুচক্রী সাব্যস্ত করে, তাঁর জমিদারী মহারাজা রামকান্তকে দেখাশোনার ভার দেন তিন বছরের জন্য। ইতিমধ্যে রাজপরিবারে গৃহবিবাদ শুরু হয়েছিল। রামকান্তের ভ্রাতুষ্পুত্র **দেবীপ্রসাদ** নবাব আলিবর্দী খান-এর আদেশে রামকান্তকে গদীচ্যুত করে রাজসাহীর জমিদারী দখল করেন। অবশ্য কিছুকালের মধ্যেই জগৎশেঠ-এর সাহায্যে রামকান্ত নিজের জমিদারী পুনরুদ্ধার করেন। রাজা রামকান্ত ১৭৪৮ খ্রীঃ মারা যান স্ত্রী রানী ভবানী ও কন্যা তারাসুন্দরীকে রেখে। দেওয়ান ছিলেন বৃদ্ধ দয়ারাম।

মহারানী ভবানী

বাংলার বীরাঙ্গনা রানী ভবানী রাজসাহীর বিশাল জমিদারীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন! এই মহীয়সী নারী ছিলেন বগুড়া জেলার ছাতিন গ্রাম নিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর একমাত্র কন্যা 'উমা'—জন্ম ১৭২৪-২৫ খ্রীঃ। আট বছর বয়সে বিবাহ হয় রাজা রামকান্তের সঙ্গে। মাত্র ২৪ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। এই বিশাল জমিদারীর পরিচালনায় তাঁকে বহু বাধা-বিপত্তি, এমনকি, সাময়িকভাবে হস্তচ্যুত জমিদারীর সম্মুখীন হতে হয়েছিল—তাঁর প্রায় পঞ্চাশ বছরের কর্মজীবনে। নিরাশার মধ্য দিয়েও তিনি দেখেছিলেন, পলাশী, উধুয়ানালা ও বক্সারের যুদ্ধ আর পরে ইংরাজদের দ্বৈতশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা ও উৎপীড়ন। বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪২-৫১ খ্রী.) ও ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ) তাঁর সময়ে ঘটেছিল। 'আপনার বিপুল রাজকোষ শূন্য করিয়া লক্ষ লক্ষ প্রজাদের অন্নকষ্ট নিবারণে মুক্ত হস্ত হইয়াছিলেন'।

নবাবদের সঙ্গে তাঁর তেমন কোন বিবাদ [১] ছিল না। কিন্তু ইংরাজ বণিকদের কুনজরে পড়লেন রানী ভবানী, কারণ তাঁর জমিদারীর দেয় বার্ষিক সরকারী রাজস্ব প্রায়

১। (ক) ১৭৫৯ খ্রীঃ দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদের আবেদনে ও নবাব আলিবর্দীর হুকুমে রানীকে প্রায় চার মাসের জন্য সম্পত্তিচ্যুত হতে হয়।

(খ) রানী ভবানী তাঁর বিধবা দুহিতা তারাকে, সিরাজ-উদ্-দৌলার কুদৃষ্টি থেকে বাঁচাতে নাগা সাধুদের সাহায্যে বারাণসীতে পাঠিয়ে আত্মাহুতিতে 'সতী' করেন।

৭০ লক্ষ সিক্কা মুদ্রা, অথচ কর বাবদ জমিদারীর আয় ছিল প্রায় দেড় কোটি টাকা। শুরু হল চক্রান্ত—ঈর্ষার বশীভূত হয়ে। এ বিষয়ে ১৭৫২ খ্রীঃ ইংরাজ পর্যটক হল্‌ওয়েল্‌ সাহেব ও ওয়ারেন্‌ হেস্টিংসের, দুটি বিবৃতিই তার সাক্ষ্য বহন করে।

হল্‌ওয়েল্‌ সাহেবের মতে—'Raja Ramkanta of the race of Brahmin who died in 1748 was succeded by his wife, a princes named Bhawani Rani whoes dewan or minister was Dayaram of the tili caste or tribe, they possess a tract of country about 35 days travel and under a settled Government that stipulated annual rent to Crown was 70 Lakhs of sicca rupees, the real revenue about one Crore and a half.' ১

১৭৫৭ খ্রীঃ ওয়ারেন্‌ হেস্টিংসের লেখায় "The zamindary in Rajsahi··· has risen to its present magnitude···by accumulating the properties of a great number of dispossessed zamindars, although the ancestor of the present possessor had not, by inheritence a right to the property of a single village within the whole zamindary". এই ধারণার বশবর্তী হয়ে হেস্টিংস্‌ সাহেব ১৭৭২-৭৩ খ্রীঃ নাটোর জমিদারী থেকে রংপুর, বাহারবন্দ পরগণা কেড়ে নিয়ে কাশিমবাজারের কান্ত নন্দীকে দিয়ে দেন। পরে কিছু কুচক্রীদের পরামর্শে রাজস্ব বাকি পড়ার অজুহাতে নীলামে একের পর এক বেশ কয়েকটি পরগণা হাতছাড়া করিয়ে দেন।

মহারানী ভবানী যে কেবল বিশাল ভূসম্পত্তির অধিকারিণী ছিলেন তা নয়, তিনি যে আজ ঘরে ঘরে বন্দিতা হয়েছেন তাঁর বুদ্ধিমত্তা, মাতৃহৃদয়, প্রগাঢ় ধর্মানুরাগ প্রভৃতি উদার গুণাবলীর জন্য। বারাণসী, বড়নগর, ভবানীপুর ও নাটোরে প্রতিষ্ঠিত প্রায় শতাধিক মন্দির, দেবালয় ছাড়া, দীন-প্রতিপালন, দেব ও ব্রাহ্মণ সেবায় ও অন্যান্য জনহিতকর কর্মের অবদান, তাঁকে চিরস্মরণীয়া করে রেখেছে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত অন্নসত্র কয়েক হাজার অসহায় মানুষকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, এক মহীয়সী নারী যার সম্পত্তির আয় ছিল দেড় কোটি টাকা, তাঁকে কিনা বার্ধক্যে ভরণ-পোষণের জন্য এক হাজার টাকার সরকারী মাসোহারার উপর নির্ভরশীল হতে হয়েছিল।

১। Holwell's Interesting Historical Events—P. 92। নাটোর জমিদারীর দেয় বাৎসরিক রাজস্ব ছিল ১৮,৫৩৩২৫ টাকা। রানী ভবানী, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

রানী ভবানীর দত্তক পুত্র রামকৃষ্ণের, মাতৃ ছত্র-ছাওয়ায় মানুষ হয়েও, কূট-রাজকার্যে বিশেষ উৎসাহ ছিলনা। ফলে জমিদারীর বেশ ক্ষতি হয়। এমনকি, কয়েকবার হাত ছাড়াও হয়েছিল। রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন অধ্যাত্মমনা ও মহাপ্রাণ—লোকে বলত 'রাজযোগী'। পিতৃপুরুষের অনুসৃত বৈষ্ণববাদকে ত্যাগ করে তিনি শাক্তবাদে বিশ্বাসী হন। এই কারণে রানী ভবানীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ বেঁধেছিল। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম্ রামকৃষ্ণকে 'মহারাজাধিরাজ পৃথিবী-পতি বাহাদুর' উপাধি দেন। রাজস্ব পরিশোধে অপারগ হয়ে নিজগৃহে নজর-বন্দী ছিলেন। ওয়ারেন্ হেস্টিংস্-চক্রের সদস্য কৃষ্ণকান্ত নন্দী, শান্তিরাম, ভবানীচরণ মিত্র, রাজা রাজবল্লভ, এমনকি, রানীর জমিদারীর ব্যবস্থাপকদ্বয়—দুলাল রায় ও পরাণ বসু, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য মহারাজা রামকৃষ্ণের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন।[১] মহামনা রাজপুরুষ তাঁর ব্যর্থতার অবসাদে মারা যান ১৭৯৬ (ভিন্নমতে, ১৮০২) খ্রীঃ। রানী ভবানী স্বেচ্ছায় নাটোর পরিত্যাগ করে মুর্শিদাবাদে তাঁর দ্বিতীয় আবাসস্থল বড়নগরে বাস করছিলেন। কিন্তু তাঁকে আবার নাটোরে ফিরে আসতে হয় পৌত্রদ্বয়ের (বিশ্বনাথ ও শিবনাথ) জমিদারী দেখাশোনা করার তাগিদে।

বাংলার বারাণসী—একদা রাজসাহী জমিদারীর মুখ্য কেন্দ্র– **বড়নগরে** রানী ভবানী প্রতিষ্ঠিত 'ভবানীশ্বর' (১৭৫৩ খ্রীঃ), 'গোপাল' (১৭৭৮ খ্রীঃ), চার বাংলা শিবমন্দির, রাজ-রাজেশ্বরী (দশভূজা দুর্গা সিংহবাহিনী), মদনগোপাল প্রভৃতি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত মন্দিরগুলি এখনও দেখতে পাওয়া যাবে। ১২ সেপ্টেম্বর, ১৮০২ খ্রীঃ ৭৮ বছর বয়সে নিদারুণ শোকগ্রস্থ হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁর অতি প্রিয় স্থান বড়নগরেই।

মহারাজা রামকৃষ্ণের তিনটি স্ত্রী—রানী বিশ্বেশ্বরী, সুবর্ণা ও রুদ্রেশ্বরী এবং দুই পুত্র—**বিশ্বনাথ ও শিবনাথ** ও তিন কন্যা। জমিদারী দুই ভাগ হল—বড় তরফ বিশ্বনাথ আর ছোট তরফ শিবনাথ। বড় তরফের মালিক বিশ্বনাথের সময় নাটোরের জমিদারীর অবস্থা খুব শোচনীয়—জমিদার হিসাবে তাঁর নাম কেটে দেওয়া হয়। বিশ্বনাথের তিনটি স্ত্রী—কৃষ্ণমণি, জয়মণি ও গোবিন্দমণি। বিশ্বনাথ অপরিণত বয়সে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান ১৮১৪ খ্রীঃ। স্ত্রী কৃষ্ণমণির দত্তক পুত্র **গোবিন্দচন্দ্র** বড় তরফের মালিক হন। তাঁরও অকালমৃত্যুতে (১৮৩৬ খ্রীঃ) স্ত্রী **গোবিন্দনাথকে** দত্তক নেন। অপুত্রক রাজা গোবিন্দনাথ জগদীন্দ্রনাথকে দত্তক নেন (জন্ম ২১ অক্টোবর, ১৮৬৮ খ্রীঃ)।

১। অনেকে মনে করেন যে, মহারাজা নন্দকুমারও একদিন মহারাজা রামকৃষ্ণের শত্রুপক্ষের লোক ছিলেন, যদিও নন্দকুমারের ফাঁসীর বিরুদ্ধে রামকৃষ্ণ এক আবেদন পত্রে দস্তখত করেছিলেন।

মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ

জগদীন্দ্রনাথ দক্ষ জমিদার, জননেতা, বাগ্মীও ক্রীড়ামোদী। জগদীন্দ্রনাথ জনকল্যাণে নাটোরে একটি উচ্চ বিদ্যালয় এবং কলকাতায় 'রানী-ভবানী বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রীড়ামোদী জগদীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি প্রীতি-ক্রিকেট খেলার আয়োজন করে অংশগ্রহণ করেন, নাটোরে এবং কলকাতায়। ইংরাজ সরকারের ছত্রছায়ার মানুষ হলেও মনঃপ্রাণে স্বদেশ প্রেমিক। 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' সঙ্গে বরাবর যোগাযোগ রেখেছিলেন। বহরমপুরে 'কংগ্রেস' অধিবেশনে সভাপতি হন ১৯০১ খ্রীঃ। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১১ খ্রীঃ) তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সহযোগী। কলকাতায় জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে, মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় হল তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, বিদ্যানুরাগী ও সুসাহিত্যিক। বাংলার ছোটলাট স্যার জর্জ ক্যাম্পেল ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ জগদীন্দ্রনাথকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।[১] 'সন্ধ্যাতারা', 'নূরজাহান' 'দারার দুরদৃষ্টি' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা এবং 'মানসী' ও 'মর্মবাণী' পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীঃ মুন্সীগঞ্জে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন'-এর সভাপতি। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' ও 'এশিয়াটিক সোসাইটির' আজীবন সদস্য ও বঙ্গীয় আইন সভার সভ্য ছিলেন।

১০ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ নাটোরে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির' সভা শুরু হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের উদ্বোধনী সঙ্গীতে। সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছাড়া, উপস্থিত ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দেবীপ্রসাদ সর্বাধিকারী, আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ বাংলার গুণীসমাজের ব্যক্তিরা। রাজা জগদীন্দ্রনাথ ছিলেন ঐ অধিবেশনের প্রধান উদ্যোক্তা ও অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।[২] ১২ জুন অধিবেশন চলার সময় হঠাৎ ভয়াবহ ভূমিকম্পে সারা নাটোর শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আমন্ত্রিতরা বাধ্য হয়ে চালার ঘরে রাত কাটান। কলকাতায় ল্যান্সডাউন রোডে তাঁর বাসভবনে অবস্থানকালে এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় জগদীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় ৫ জানুয়ারী, ১৯২৬ খ্রীঃ মাত্র ৫৮ বছর বয়সে।

মহারাজা জগদীন্দ্রনাথের পুত্র **যোগীন্দ্রনাথ** উত্তরাধিকারী হলেন। তিনি পিতার

১। নাটোরের পুরানো রাজপ্রাসাদ 'বঙ্গোজ্জল' নামে পরিচিত। তা নাকি তাহিরপুরের রাজা উদয়নারায়ণের প্রতিষ্ঠিত। রানী ভবানী প্রাসাদটির যথাযথ সংস্কার করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্থ প্রাসাদ, রাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়ের তৎপরতায় পুনরায় তৈরী হয়।

২। ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৭ খ্রীঃ কলকাতায় 'চিকাগো' প্রত্যাগত স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নাগরিক সম্বর্ধনা সভায় মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন।

ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যানুরাগী ছিলেন। কাব্যগ্রন্থ 'রজনীগন্ধা' তাঁর লেখনী-প্রসূত। ১৯২৬ খ্রীঃ 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। মারা যান ২, ডিসেম্বর, ১৯৬৮ খ্রীঃ দুই পুত্র জয়ন্তনাথ (অবিবাহিত) ও ইন্দ্রজিৎ (অপুত্রক) ও দুই কন্যা শুভশ্রী (ভূপালপ্রসাদ বাগচীর স্ত্রী) ও জয়শ্রীকে (অমর সান্যালের স্ত্রী) রেখে। কেবল কন্যাদ্বয় এখন পিতৃ বাসভবনে থাকেন।

এবার আসা যাক **ছোট তরফের** মালিক **রাজা শিবনাথের** কথায়। তিনি ছিলেন বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন ও কর্মঠ মানুষ। মারা যান ১৮১৭ খ্রীঃ। শিবনাথের দশটি স্ত্রী—বিশ্বেশ্বরী, রাজ্যেশ্বরী, হরিপ্রিয়া, জগদম্বা, সোনামণি, রত্নমণি, করুণাময়ী, গৌরীমণি, কাশীশ্বরী ও অন্নপূর্ণা। স্ত্রী জগদম্বা দেবী **আনন্দনাথকে** দত্তক নেন। 'রাজা' উপাধি পান ১৮৫৭ খ্রীঃ। আনন্দনাথের চার পুত্র—চন্দ্রনাথ, কুমুদনাথ, নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ। ১৮৬৬ খ্রীঃ আনন্দনাথের মৃত্যুতে জ্যেষ্ঠ পুত্র **চন্দ্রনাথ** তাঁর উত্তরাধিকারী হন। চন্দ্রনাথের অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য ভারত সরকার তাকে বিদেশ দপ্তরে ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিযুক্ত করেন। তিনি 'রাজা' উপাধি পান ১৮৬৬ খ্রীঃ। সি. এস. আই. উপাধি আগেই দেওয়া হয়েছিল। পরে ১৮৬৯ খ্রীঃ 'রাজা বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন। ভাই কুমুদনাথ ও নগেন্দ্রনাথের অকাল মৃত্যু ঘটে। ১৮৭৫ খ্রীঃ রাজা চন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির অধিকারী হন ছোট ভাই **যোগেন্দ্রনাথ**। তিনি বহু জনহিতকর কাজে দান করেন। বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য ছিলেন। জীবদ্দশায় একমাত্র পুত্র **জিতেন্দ্রনাথ** মারা যান। শোকাহত যোগেন্দ্রনাথ মারা গেলেন ১৯০১ খ্রীঃ তাঁর একমাত্র পৌত্র **বীরেন্দ্রনাথকে** রেখে। অভিভাবিকা নিযুক্ত করে যান পুত্রবধূ হেমাঙ্গিনী দেবীকে। দেওয়ান ভবানীপ্রসাদ রায়ের অক্লান্ত সহায়তায় জমিদারীর বহু সংকট কেটে যায়।

নাবালক বীরেন্দ্রনাথের জন্ম হয় জানুয়ারী, ১৮৯৭ খ্রীঃ। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক হন। বীরেন্দ্রনাথ তাঁর বিধবা স্ত্রী তারাসুন্দরী দেবী ও চার কন্যাকে রেখে মারা যান ১১ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ খ্রীঃ। বিবাহিতা কন্যারা—লীলা মজুমদার, কোহিনূর লাহিড়ী, দীপ্তি বাগ্‌চি ও শিপ্রা মজুমদার। সকলেই বর্তমান। কলকাতায় বীরেন্দ্রনাথের বাসভবন, ভবানীপুর পদ্মপুকুর অঞ্চলে।

বাংলার ইতিহাসে **নাটোর মাহাত্ম্য** আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। রানী ভবানীর রাজসিক জনহিতকর কর্মকাণ্ড ছাড়া, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নাটোরের রাজাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। রাজা রামকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে কবি, সাধক ও সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর লেখা এবং সুর দেওয়া শ্যামা-সঙ্গীত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরম প্রিয় ছিল। মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়ভাজন ছিলেন তাঁর সাহিত্য কীর্তির সুবাদে। মহারাজা যোগীন্দ্রনাথ লিখিত 'রজনীগন্ধা' তাঁর কবি প্রতিভার পরিচায়ক।

দিঘাপতিয়ার রায় রাজপরিবার

রাজসাহী

রাজসাহী জেলায় নাটোর মহকুমায় দিঘাপতিয়া জমিদারীর অবস্থিতি ছিল। যেমন নাটোরের রাজবংশের ইতিহাস, পুঁটিয়া রাজবংশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তেমনি একই যোগসূত্র ছিল দিঘাপতিয়া রাজপরিবার ও নাটোর রাজবংশের মধ্যে। দিঘাপতিয়ার জমিদারী প্রকৃতপক্ষে নাটোর রাজবংশেরই প্রতিষ্ঠা. মহারাজা রামজীবন রায়ের দান। কেবল দান বললেই যথাযথ বলা হল না। রাজা রামজীবনই তাঁর বিশ্বস্ত **দেওয়ান দয়ারামকে** তাঁর ন্যায়-নিষ্ঠ কর্তব্য-পরায়ণতার জন্য কিছু ভূ-সম্পত্তি পুরস্কার স্বরূপ লিখে দেন। তেলী সম্প্রদায়-ভুক্ত দেওয়ান দয়ারামের জীবন-ইতিবৃত্তের বিশেষ কিছু জানা যায় না, কিন্তু ধারণা করা যায় যে, মাতৃ-পিতৃহীন দয়ারাম (জন্ম, আনু: ১৬৭০ খ্রী:) নাটোরের মহারাজা রামজীবনের আশ্রয় গ্রহণ করেন অনু: ১৬৯০ খ্রী:। কিছুকাল পরে বাংলার সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলী খানের [১] নির্দেশে, রাজা রামজীবন তাঁর বিশ্বস্ত নায়েব দয়ারামকে ভূষণার (যশোহর) **রাজা সীতারাম**-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নবাবের সৈন্যকে সাহায্য করতে বলেন। সীতারাম রায় পরাজিত হন এবং ভূষণা লুণ্ঠিত হয়।

নাটোরের রাজা রামজীবনের ১৭৩০ খ্রী: মৃত্যু হলে, তাঁর দত্তক পুত্র **রামকান্ত** বিশাল জমিদারীর মালিক হন। যদিও রামকান্তের পূর্বে রামজীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ কিছুকাল জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন। বিশ্বস্ত দেওয়ান দয়ারাম রাজা রামকান্তের দেওয়ান হন। তিনি রামকান্তের অকাল মৃত্যুতে তাঁর বিধবা-স্ত্রী প্রাতঃস্মরনীয়া **রানী ভবানীরও** দেওয়ান ছিলেন [২]। বৃদ্ধ দয়ারাম মারা যান ১৭৬০ খ্রী: তাঁর পাঁচ কন্যা ও একমাত্র পুত্র **জগন্নাথকে** রেখে। রাজা জগন্নাথ রায়ের আমলে দিঘাপতিয়া রাজপরিবারের নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে। ছিয়াত্তরের ভয়াবহ মন্বন্তরের ফলে রাজস্ব বাকি পড়ে। তিনি নিজের ও স্ত্রীর (রানী নন্দরাণী) অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এমনকি, জনশ্রুতিতে জানা যায় যে, তাঁদের ষোলটি সন্তানের মধ্যে কেবল

১। সুবাদার নবাব মুর্শিদকুলী খান দয়ারামকে 'রায়-রায়ণ' উপাধি দেন।

২। দয়ারামের সুকৃতি আজও রয়েছে দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ীর শ্রীকৃষ্ণজীর মন্দির। তিনিই ছিলেন রানী ভবানীর দানযজ্ঞের প্রধান উপদেষ্টা ও সহযোগী। দয়ারাম সম্বন্ধে প্রচলিত গ্রাম্য গাঁথা—

'রায়ায়ণলাযী দয়ারাম
সেই হবে ভাণ্ডার কাম।'

প্রাণনাথ ছাড়া সকলেই মারা যায় অল্পকষ্টে। রাজা জগন্নাথ তাঁর একমাত্র জীবিত নাবালক পুত্র প্রাণনাথকে রেখে মারা যান ১৭৯০ খ্রীঃ।

প্রাণনাথ রায়ের জন্ম ১৭৮৬ খ্রীঃ। ১৮০৪ খ্রীঃ সাবালকত্ব পেয়ে 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্'-এর রক্ষণাধীন জমিদারী নিজের হাতে নেন। তিনি অত্যন্ত শৌখিন মানুষ—হাতী, ঘোড়া, কুকুর পুষতে ভালোবাসতেন। শিকারের সঙ্গীরা তাঁকে 'বাবু' আখ্যা দিয়েছিল। অপুত্রক রাজা প্রাণনাথ মারা যান ১৮২৭ খ্রীঃ। দত্তক পুত্র **রাজা প্রসন্ননাথ** (জন্ম-১৮২৬ খ্রীঃ) জমিদারীর মালিক হন। জনদরদী ও স্বাধীনচেতা প্রসন্ননাথ সৎকার্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। দিঘাপতিয়ায় 'প্রসন্ননাথ অ্যাকাডেমী,' নাটোর ও রামপুর বোয়ালিয়ায় দাতব্য চিকিৎসালয়, গরীব প্রজাদের যথোপযুক্ত সাহায্য ইত্যাদি, তাঁর সৎকার্যের মধ্যে অন্যতম। তাঁর দানশীলতা ও সরকারের সাহায্য-তহবিলে যথাযোগ্য দানের স্বীকৃতি হিসাবে রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডালহৌসী ২০ এপ্রিল, ১৮৫৪ খ্রীঃ বেলভেডিয়ার প্রাসাদে এক দরবারে তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন। তিনি সিপাই বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরাজ সরকারকে সম্ভাব্যপর সাহায্য করেন। রাজা প্রসন্ননাথ তাঁর পূর্বপুরুষ দেওয়ান দয়ারামের এক কন্যার বংশধর **প্রমথনাথকে** দত্তক নিয়েছিলেন। দিঘাপতিয়ায় 'প্রসন্ন কালী মন্দির ও বর্তমান দিঘাপতিয়ার রাজবাড়ী রাজা প্রসন্ননাথের তৈরী। রাজা প্রসন্ননাথ রায় মারা যান ১৮৬২ খ্রীঃ অপুত্রক অবস্থায়। তাঁর রানী ভবসুন্দরী স্বামীর মৃত্যুর পর নাবালক দত্তক সন্তান প্রমথনাথের অভিভাবিকা-রূপে দিঘাপতিয়ার রাজবংশের মান-মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখেছিলেন।

রাজা প্রমথনাথ

সাবালক হয়ে প্রমথনাথ (জন্ম-১৮৪৯ খ্রীঃ) ১৮৬৭ খ্রীঃ জমিদারীর ভার নেন। কলকাতা 'ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনের' ছাত্র। বংশ-রীতি অনুযায়ী—তিনি অকাতরে অর্থ সাহায্য করে গেছেন জনদরদী কাজে। তার মধ্যে রামপুর বোয়ালিয়া দাতব্য চিকিৎসালয়, বলিকা বিদ্যালয় (১৮৬৮ খ্রীঃ) ও নাটোর-বোয়ালিয়া রাজপথের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগের রাস্তা সংস্কার প্রভৃতি উল্লেখ করা যায়। তাঁর সুকৃতির স্বকৃতি-স্বরূপ ১৮৬৯ খ্রীঃ রাজ-প্রতিনিধি বাংলার ছোট লার্ট স্যার উইলিয়ম্ গ্রে তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন। তিনি ছিলেন 'রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৮ খ্রীঃ রাজা প্রমথনাথ রাজসাহী কলেজের সর্বোচ্চ দাতা (প্রায় দেড় লক্ষ টাকা)। ১৮৭৭ খ্রীঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ 'প্রজাস্বত্ব' আইনের বেশ কয়েকটি

ধারা তাঁর প্রস্তাবিত। তাঁর চার পুত্র—প্রমদানাথ, বসন্ত কুমার, শরৎকুমার, হেমেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ খ্রীঃ মাত্র ৩৪ বছর বয়সে রাজা প্রমথনাথের অকাল মৃত্যু ঘটে। তাঁর 'উইল' অনুযায়ী জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমদানাথ পূর্ব-পুরুষের অর্জিত সব জমিদারী সম্পত্তির মালিক হন, আর অপর তিন পুত্র পান প্রমথনাথের স্ব-উপার্জিত সমস্ত স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি।

রাজা প্রমদানাথ

নাবালক প্রমদানাথ (জন্ম ১৮৭৩ খ্রীঃ) সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয়ে 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস'-এর কাছ থেকে ২৯ জানুয়ারী, ১৮৯৪ খ্রীঃ জমিদারী পরিচালনার ভার নেন। তাঁর দানের খতিয়ান থেকে উল্লেখ করা হল—রামপুর বোয়ালিয়ায় দাতব্য চিকিৎসালয় (পঁচিশ হাজার টাকা), রাজসাহী কলেজের ছাত্রাবাস, প্রাণনাথ হাইস্কুল (পনের হাজার টাকা) ও 'লেডী ডাফ্‌রিন ফাণ্ড' (কুড়ি হাজার টাকা)। তাছাড়া তিনি রেশম তৈরী শিক্ষার জন্য রাজসাহী 'সেরি-কালচার স্কুল', আদর্শ কৃষিক্ষেত্র প্রতিষ্ঠানের জন্য ৪০ বিঘা জমি ও রাজসাহী কলেজের জন্য ৩৪ বিঘা জমি দান করেন। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলী উপলক্ষে ১৮৯৭ খ্রীঃ স্যার অ্যালাক্‌জাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী প্রমদানাথকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। তিনি শৌখিন ও রুচি-সম্পন্ন মানুষ। কলকাতায় ১৬৩, লোয়ার সারকুলার রোডে (এ. জে. সি. বসু রোড) দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী তৈরী করেন। ১২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ ভূকম্পন ক্ষতিগ্রস্ত দিঘাপতিয়ায় রাজবাড়ী ও ঠাকুরবাড়ীকে তিনি প্রায় নতুন করে তৈরী করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ১৯০৫-১ খ্রীঃ ও রাজসাহী জেলার রাজ-বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরাজ সরকারকে, বিশ্বস্ত একজন রাজভক্ত জমিদার হিসাবে, সাহায্য করেন। অন্যতম কর্ণধার 'রাজসাহী অ্যাসোসিয়েশন' ও 'বঙ্গীয় জমিদার সভা'। পূর্ব-বঙ্গ ও আসামের জমিদারদের প্রতিনিধি হিসাবে আইন-সভায় ১৯০৯, ১৯২০, ১৯২৬ খ্রীঃ সভ্য ছিলেন। তিনি ভাইসরয়ের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলেরও সভ্য ছিলেন। জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে রাজা প্রমদানাথ নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম। ১৭ জুন, ১৯২৫ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যু হয়।

রাজা প্রমদানাথের ভাই কুমার **বসন্ত কুমার** কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। তাঁর দানের সাড়ে চার লাখ টাকার মধ্যে—আড়াই লাখ রাজসাহী কলেজ, এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা বালিকা বিদ্যালয়ে। অল্প বয়সে বিপত্নীক ও অপুত্রক বসন্তকুমারের মৃত্যু হয় ১৯২০ খ্রীঃ ৪৬ বছর বয়সে। কুমার **শরৎকুমার** বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও সাহিত্য অনুরাগী, সুলেখক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ। ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি ও স্থাপত্য সংগ্রহের কাজে অর্থব্যয় করেছিলেন। তিনি বিখ্যাত রাজসাহী 'বারেন্দ্র রীসার্চ ইনস্টিটিউশনের' প্রতিষ্ঠাতা।

ইউরোপের বহু সংগ্রহশালা ও স্থাপত্য-ভাস্কর্যের জ্ঞান সঞ্চয়ের অদম্য উৎসাহ তাঁর ছিল। তাঁর বাস-ভবন ছিল দয়ারামপুরে। তাঁর পাঁচ পুত্র—অমিতাভ, মিহির, বিজয়, অরুণপ্রকাশ ও বিভূতিনাথ। সংস্কৃতিবান শরৎকুমার বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য ছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ কুমার **হেমেন্দ্রকুমার** চিত্রকলায় অনুরাগী। তাঁর একমাত্র পুত্র **হিমাদ্রিনাথ** রাজসাহীতে বাস করতেন।

রাজা প্রমদানাথের ছয় পুত্রের মধ্যে সম্পত্তির মালিক হন জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার **প্রতিভানাথ**। অন্য পুত্ররা বিজনেন্দ্রনাথ, শৈলেশনাথ, চঞ্চলকুমার, তুষারকুমার ও শুভেন্দুপ্রকাশ। কন্যারা উষাপ্রভা, নলিনীপ্রভা ও নীহারপ্রভা। প্রতিভানাথের দুই পুত্র **প্রভাতনাথ** (অবিবাহিত) ও বিমলেন্দুনাথের এক পুত্র বিশ্বনাথ। বর্তমানে এঁরা কলকাতায় ১৫, গিরীশ চন্দ্র বসু রোডে বাস করেন। কুমার প্রতিভানাথ মারা যান ৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ খ্রীঃ।

সাঁতৈলের রাজপরিবার, রাজসাহী

রাজসাহী জেলায় যে কয়েকটি (খুব বড় না হলেও) পুরানো জমিদার, 'রাজা' খেতাব-ধারী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে সাঁতৈল অন্যতম। আত্রেয়ী ও করতোয়া নদীর সঙ্গম স্থলে সাঁতৈল বা সাতুল রাজাদের স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তি ও কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধানে জানা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের পৌত্র ও বাংলার সুবাদার শাহজাদা আজিমুস্‌শানের (১৬৯৭—১৭১২ খ্রীঃ) শাসনকালে সাঁতৈলের রাজা ছিলেন **সন্তানাথ রায়**। তিনি বৃদ্ধ হওয়ায় তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামেশ্বরের হাতে জমিদারীর ভার দেন। কিন্তু রামেশ্বর অনৈতিক চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তাঁর অপকর্মের জন্য জমিদারীর অপূরণীয় ক্ষতি হয়। রামেশ্বরের পুত্র **রাজা রামকৃষ্ণ**। বিদ্যোৎসাহিতা ও পুণ্য কীর্তির জন্য তাঁর নাম এখনও স্মরণীয়। তাঁর স্ত্রী প্রাতঃস্মরণীয়া রানী সর্বাণীর রাজসাহীর নানা স্থানে পুণ্য কীর্তির নিদর্শনগুলির ভগ্নাবশেষ এখনও সাক্ষ বহন করে। রানীর মৃত্যু হয় আনুঃ ১৭১০ খ্রীঃ।

রাজা রামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র **বলরাম** রাজা হন।[১] সেই সময় নবাব মুর্শিদকুলী খানের বিশেষ বিশ্বাস-ভাজন দেওয়ান ও প্রভাবশালী নাটোর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা রায়রায়ান রঘুনন্দন, তাঁর সুচতুর ও মিথ্যা অভিযোগের আর্জি নবাবের কাছে পেশ করে, ঘোষণা করেন যে, "রাজা বলরাম জন্মান্ধ ও জমিদারী পরিচালনায় অসমর্থ"। নবাব রঘুনন্দকে সম্পূর্ণ ভাতুড়িয়া পরগণা তাঁর নামে বন্দোবস্ত করে দেন।[২] সাঁতৈল জমিদারীর অবসান ঘটে। নাটোরের রানী ভবানী সাঁতৈলের পুরানো কীর্তির সংস্কার করেন।

১। নাটোরে প্রাপ্ত সম্রাট ঔরঙ্গজেবের এক সনদে (১৭০৪ খ্রীঃ) রাজা বলরামকে ২৫৩২৪৬ টাকা রাজস্ব প্রদানের অঙ্গীকারে, ভাতুড়িয়া জমিদারীর মালিক করে দেন।

২। ১৭১১ খ্রীঃ বাদশা শাহ আলম্‌ বাহাদুর শাহ্‌-এর দস্তখৎ ও মোহরযুক্ত সনদে এই বন্দোবস্তের আদেশনামা আছে।

বলিহারের রায় রাজপরিবার

রাজসাহী

রাজসাহী জেলায় নওগাঁ মহকুমার অন্তর্গত বলিহার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। নওগাঁ শহর থেকে সড়ক পথে বলিহারের দূরত্ব ১৬ কি. মি.। বলিহার রাজপরিবারের পূর্ব-পুরুষ দামোদর ওঝার পুত্র অনন্তনাথের তৃতীয় পপৌত্র **নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী** বলিহারের তদানিন্তন খান (ভাদুড়ী) জমিদারদের জামাই হয়ে, যৌতুক হিসেবে কুড়মৈল গ্রামের এক অংশ লাভ করেন। নিজের বাস্তুভিটা বিক্রমপুরের (ঢাকা) শিবালা গ্রাম ছেড়ে বলিহারে বাস করতে থাকেন। **নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী** নবাবের দেওয়া 'সান্যাল' উপাধি পান। নৃসিংহ-এর চতুর্থ পুত্র **গোপালের** দ্বিতীয় পুত্র **প্রাণকৃষ্ণ** পৈতৃক জমিদারীর অন্তগত বলিহারের সাত আনা অংশের মালিক হন। তাঁর পুত্র **রামচন্দ্র সান্যাল** নবাব সরকারের কাছ থেকে 'রায়' বা 'রাজা' উপাধি পান। এই বাদশাহী 'পাঞ্জা' এখনো বলিহার রাজগৃহে রক্ষিত আছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বাহারবন্দ, ভিতরবন্দ ও স্বরূপপুর পরগণার জমিদার রঘুনাথ রায়ের স্ত্রী ও চাঁদ রায়ের পুত্রবধূ রানী সত্যবতী অপুত্রক ছিলেন। তিনি ১৭৩৫ খ্রীঃ ও তার পরেও প্রাণকৃষ্ণকে তাঁর জমিদারীর বৃহৎ অংশ দান করেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রাণকৃষ্ণই বলিহার জমিদার বংশের প্রাণপুরুষ। রামচন্দ্রের পুত্র **নীলকণ্ঠ** ও পৌত্র রাজেন্দ্র। **রাজেন্দ্রই** রাজপরিবারের সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর পুত্র মহারাজা রামকৃষ্ণের একমাত্র কন্যা কাশীশ্বরী দেবীকে বিবাহ করেন। যৌতুক হিসাবে বগুড়া, রাজসাহী ও নলডাঙার অন্তর্গত বেশ কয়েকটি গ্রামের স্বত্ব পান। রাজেন্দ্রের এক পুত্র শৈশবেই মারা যায় এবং এক কন্যা শিবেশ্বরীর খাজুরা-নিবাসী কাশীপ্রসাদ লাহিড়ীর সঙ্গে বিবাহ হয়। রাজেন্দ্র পরে আর দুটি বিবাহ করেন—উমাময়ী ও আনন্দময়ীকে। দুজনেই নিঃসন্তান ছিলেন। রাজেন্দ্র প্রজারঞ্জন ও ধর্মপ্রাণ জমিদার। তিনি বলিহারের বিখ্যাত দুর্গা মন্দিরে দশভুজা 'রাজরাজেশ্বরীর' অপরূপা পিতলের মূর্তি স্থাপন করেন। গোপালদেবের পিতলের রথ বলিহারের একটি বিশিষ্ট কীর্তি। তাঁর ছোট রানী আনন্দময়ী ধর্মপ্রাণা। লক্ষাধিক টাকা খরচ করে বছরের পর বছর ধরে মহাভারত পাঠ করাতেন। রাজেন্দ্র দীর্ঘায়ু—প্রায় একশ বছর বেঁচে ছিলেন। মারা যান ১৮২৩ খ্রীঃ। তাঁর দত্তক পুত্র **শিবপ্রসাদ রায়ের** বিবাহ হয় হরসুন্দরী দেবীর সঙ্গে। অপুত্রক শিবপ্রসাদ অকালে মারা যান। তাঁর স্ত্রী হরসুন্দরী দেবী ভাবী রাজা কৃষ্ণেন্দু রায়কে দত্তক নেন ১৮৪৫ খ্রীঃ।

রাজা কৃষ্ণেন্দু রায়

রাজা কৃষ্ণেন্দু রায়ের জন্ম হয় রাজসাহী জেলার খাজুরা গ্রামে ১৮৩৪ খ্রীঃ। জন্মদাতা পিতার নাম শিবচন্দ্র লাহিড়ী। কৃষ্ণেন্দু গৃহশিক্ষকের কাছে সংস্কৃত ও ফার্সী ভাষায় বুৎপত্তি লাভ করেন। বিদ্যাচর্চায় ছিল বিশেষ আগ্রহ। তাঁর লেখা 'সুখভ্রম,' 'এখন আমি' (গদ্য গ্রন্থ) ও 'সীতা রচিত' (পদ্য গ্রন্থ) সেই সময় বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল। সঙ্গীতেও তাঁর অনুরাগ ছিল। বহু জনহিতকর কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপ তদানীন্তন ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি স্যার স্টুয়ার্ট বেইলি ১৮৮৭ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে কৃষ্ণেন্দু রায়কে 'রাজা' উপাধি দেন। পরে ১৮৯১ খ্রীঃ তিনি 'রাজা বাহাদুর' খেতাব পান। কলকাতায় কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর আর্থিক সহায়তায় জুলজিক্যাল্ গার্ডেনের সংগ্রহ ও কলেবর বৃদ্ধি-পায়। নিঃসন্তান রাজা কৃষ্ণেন্দুর মৃত্যু হয় ২০ বৈশাখ, ১৩০৫ সন (২ মে, ১৮৯৮ খ্রীঃ) ৬৪ বছর বয়সে। তাঁর দুটি রানী—শিবসুন্দরী ও গণেশ জননী, দুজনেই নিঃসন্তান। রাজা কৃষ্ণেন্দুর সময়ে বলিহারের জমিদারীর অন্তর্গত ছিল রাজসাহীর কয়েকটি পরগণা ছাড়া দাড়িগাছা, টেপিনগর, বগুড়া, ধুবিল, খিদিরপুর (পাবনা) প্রভৃতি [১]। রাজা কৃষ্ণেন্দু কুমার **শরদেন্দু রায়কে** দত্তক নেন ২০ শ্রাবন, ১২৯৩ সন (১৮৮৬ খ্রীঃ)। শরদেন্দুর জন্মদাতা পিতা রংপুরের ভিতরবন্দ পরগণার জমিদার যোগেন্দ্রচন্দ্র রায়। শরদেন্দুর জন্ম হয় ৬ আশ্বীন, ১২৮৪ সন (১৮৭৭ খ্রীঃ)। বিবাহ করেন নাটোরের হারশপুর নিবাসী যাদব মজুমদারের কন্যা কুসুমকামিনী দেবীকে। কুমার শরদেন্দু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন না। তাই ভারতের বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর জায়গায় তাঁকে নিয়ে যেতে হয়েছে। তাঁর মৃত্যু হয় মার্চ, ১৯৩৮ খ্রীঃ।

কুমার শরদেন্দুর একমাত্র পুত্র **বিমলেন্দু রায়ের** জন্ম হয় ৩১ আশ্বিন, ১৩০৫ সন (১৬ অক্টোবর, ১৮৯৮ খ্রীঃ)। হেয়ার স্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়াশোনা করে স্নাতক হন। তিনি বিবাহ করেন রাজসাহীর অন্তর্গত চৌগ্রামের জমিদার রমনীকান্ত রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ইন্দুপ্রভা দেবীকে (বৈশাখ, ১৩২৫ সন)। বিমলেন্দু রায়ের তিন পুত্র—নির্মলেন্দু, পূর্ণেন্দু ও অমলেন্দু। নির্মলেন্দুর এক কন্যা জয়শ্রী রায়। পূর্ণেন্দু অবিবাহিত। অমলেন্দুর এক পুত্র অমৃতেন্দু। আইনজীবী নির্মলেন্দু ও অমলেন্দু কলকাতার পৈতৃক বাসভবন ২৩, থিয়েটার রোডে বাস করেন। পূর্ণেন্দু থাকেন ৭৭, ল্যান্স ডাউন রোডে।

১। বলিহারের রাজবাড়ী ও রাজরাজেশ্বরী মন্দির ছাড়া, নওগাঁ শহরেও একটি প্রাসাদ আছে চিত্ররাজি দ্রষ্টব্য)। ইংরাজ রাজপুরুষদের মধ্যে বাংলার গভর্নর স্যার অ্যাণ্ডারসন্ ১৯৩০ খ্রীঃ ও স্যার দন্ হারবার্ট ১৯৪১ খ্রীঃ বলিহার রাজবাড়ীতে অতিথি হয়েছিলেন।

সুসঙ্গের সিংহ রাজপরিবার

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলায় গারো পাহাড়ের অসমতল উপত্যকায় ও সোমেশ্বরী নদীর উপকূলে সুসঙ্গ[১] প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। আনুঃ ১২৮০ খ্রীঃ সুসঙ্গ রাজপরিবারের আদি পুরুষ ছিলেন কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ সোমেশ্বর পাঠক (ঠাকুর)। কিন্তু বাস্তবে রাজপরিবারের বর্তমানকালীন ইতিহাস শুরু হয়েছিল বাংলার মহম্মদ শাহী বংশের সুলতান রুকনুদ্দীন বরাবক্-এর সময়েই (১৪৫৫-৭৬ খ্রীঃ), যখন সুসঙ্গের জননায়ক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশজ গুণাকর বা বুদ্ধিমন্ত খানের[২] বিশেষ পরিচয় ছিল। সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সেনাপতি রাজা মান সিংহকে (১৫৮৯-১৬০৮ খ্রীঃ) সুসঙ্গের স্বাধীন জমিদারীর উত্তরাধিকারী রঘুনাথ, 'বারোভূঞাদের' (চাঁদ রায়) বিরুদ্ধে, যুদ্ধে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তাঁর শৌর্য ও মোগল সাম্রাজ্যের প্রতি বন্ধুত্বের স্বীকৃতি হিসাবে, সম্রাট তাঁকে 'রাজা', 'পঞ্চহাজারী মনসবদার', 'গারোতন্ত্রী' প্রভৃতি খেতাবে ভূষিত করেন। রাজা রঘুনাথ ও রানী কমলরানীর গৌরবগাঁথা এখনো বহু কবিগান ও গ্রামীণ উপকথায় পরিবেশিত হয়ে থাকে। সুসঙ্গের কাঠকয়লা ভারতের বহু স্থানে পাঠান হত। এমন কি, রাজস্ব করের বিনিময়ে কাঠকয়লা অনুরূপ মূল্য হিসাবে ধরা হত।

রঘুনাথের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রামনাথ ও ভ্রাতুষ্পুত্র রামজীবন (দত্তক) সুসঙ্গের জমিদারীর অধিকারী হন। পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা যথাক্রমে রাজা রামকৃষ্ণ, রাজা রাম সিংহ[৩] (মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে নাম হল আবদুল রহমান) ও তাঁর হিন্দুরানীর পুত্র রাজা রণসিংহ (১৭৩৫ খ্রীঃ)। রণ সিংহের পুত্র রাজা কিশোর সিংহ, অপুত্রক ও স্বল্লায়ু, মারা যান ১৭৮৪ খ্রীঃ। রাজা কিশোর সিংহ ভ্রাতা রাজা

১। সুসঙ্গ ময়মনসিংহ শহর (পুরাতন নাম নসিরাবাদ) থেকে প্রায় ৪৫ কিলো মিটার।

২। সুলতানী উপাধি-ধারী বুদ্ধিমন্ত খানের পরবর্তী উত্তরাধিকারীরা যথাক্রমে কমল হাজরা, বাসুদেব (বামুন খান) ও জগদানন্দ খান। জগদানন্দ খানের ষষ্ঠ অধস্তন-পুরুষ মল্লিক জানকীনাথ, তাঁর পৌত্রের বিবাহ দেন রাজসাহীর তাহিরপুরের বারেন্দ্রব্রাহ্মণ রাজবংশের কন্যার সঙ্গে। তাঁর পুত্র বিখ্যাত রাজা রঘুনাথ সিংহ। রাজপরিবারের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় আকর গ্রন্থ Changing Times, by Maharaja Bhupendra Chandra Sinha.—বাংলা অনুবাদ 'কালপ্রবাহ'।

৩। রাজা রাম সিংহ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক ছিলেন।

রাজ সিংহের হাতে জমিদারীর ভার দেন। রাজা রাজ সিংহ ছিলেন উদার ও নিষ্ঠাবান মানুষ। সুসঙ্গে বহু জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিলেন। সাহিত্যপ্রেমী ও কবি রাজা রাজ সিংহের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের বা রচনার উল্লেখ করা হল। 'ভারতমঙ্গলকাব্য', 'রামায়ণ', 'মনসা পাঁচালী', 'ঢাকা বর্ণনা' প্রভৃতি। রাজ সিংহের সময় ইংরাজ সরকারের সঙ্গে সুসঙ্গের 'ষোল আনা জমিদারী' ২৮৭০ টাকায় 'দশসালা বন্দোবস্ত' করা হয়। লর্ড হেস্টিংস্, আনুঃ ১৭৮৪ খ্রীঃ সুসঙ্গের জমিদারীর উত্তরাধিকারীদের বংশগত 'মহারাজা' উপাধি অনুমোদন দিয়েছিলেন। সুসঙ্গের জমিদারীর অবস্থার উন্নতি ছাড়া, সুসঙ্গের গারো পাহাড়ের বনভূমির স্বত্বাধিকারী হওয়ায়, কাঠ ও 'খেদায়' ধরা বন্য হাতি বিক্রি করে যথেষ্ট অর্থ সমাগম হয়েছিল। কোনো কোনো সময়ে 'পিলখানায়' (হাতির আস্তানা) পোষা হাতির সংখ্যা প্রায় ৫০ হতো।

রাজা রাজ সিংহকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিশোর সিংহের অমিতব্যয়িতা ও পরে 'খেদার' ব্যবসায় হাজং পরিবারদের খেসারত দেওয়ার জন্য, আর্থিক দুরবস্থায় পড়তে হয়। বকেয়া রাজস্ব মেটানো সম্ভবপর হয়নি। ১৭৫৭ খ্রীঃ রাজ কিশোর সিংহ ও তাঁর সহোদর ভাই রাজা রাজ সিংহকে বন্দী করে ঢাকায় আনা হয়। তাঁদের সাতদিন যাবৎ প্রত্যহ বেত মারা হয়েছিল—জীবননাশের হুমকিত ছিলই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ পলাশীর যুদ্ধের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপে তাঁরা মুক্তি পান। 'দশসালা বন্দোবস্তের' ফলে রাজা রাজ সিংহের সময় 'করদ-রাজ্য' সুসঙ্গ প্রকৃতপক্ষে সাধারণ জমিদারীতে পরিণত হল। **রাজা রাজ সিংহের** পাঁচ পুত্র। প্রথম ও চতুর্থ পুত্র—বৈদ্যনাথ ও কৃষ্ণনাথ মারা যান পিতার জীবদ্দশায়। রাজা রাজ সিংহের মৃত্যুর পর মধ্যম পুত্র **রাজা বিশ্বনাথ** (১৭৮৭-১৮৫৩ খ্রীঃ) জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন। কিন্তু তাঁর অপর দুই ভাই গোপীনাথ ও জগন্নাথ জমিদারীর স্বত্বাংশ দাবী করায়, সর্বনাশা মামলা দীর্ঘদিন, 'প্রিভি-কাউন্সিল' পর্যন্ত চলার পর, জমিদারীর এক তৃতীয়াংশের মালিক হন গোপীনাথের দুই কন্যা—প্রমোদা ও বরোদা ১৮৬৮ খ্রীঃ।

জগন্নাথ ও তার দত্তক পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য হওয়ায় রাজা বিশ্বনাথের পুত্র **প্রাণকৃষ্ণ** (১৮০৮-৬৭ খ্রীঃ) সুসঙ্গের দুই তৃতীয়াংশ জমিদারীর মালিক হন। রাজা প্রাণকৃষ্ণের জীবনের সব সময়টাই কেটেছিল আর্থিক ও মানসিক অশান্তির মধ্য দিয়ে। কিন্তু তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার জন্যই সুসঙ্গ জমিদারীর স্থিতি বজায় থাকে।

৩০ জুন, ১৭৬৭ খ্রীঃ এক আদেশ বলে, ইংরাজ সরকার সুসঙ্গ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত 'গারো মোহল' তাঁদের নিজেদের এক্তিয়ারভুক্ত করে নেন। মামলার পর ১৮৬৯ খ্রীঃ 'গারো হিলস্ একট্' অনুসারে সম্পূর্ণ গারো পাহাড় এলাকা ইংরাজ কোম্পানীর খাস্

হয়ে যায়, আর ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ এককালীন ১৫০০০০ টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এর ফলে সুসঙ্গের জমিদারীর স্থায়ী আর্থিক সংকটের সৃষ্টি হয়। এই অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ লেখা আছে, **'Justice in Excelsis by William Taylor, a retd. civil servant of Bengal'**, একজন ইংরাজ রাজকর্মচারীর পুস্তিকায়।

মহারাজা রাজকৃষ্ণ সিংহ

রাজা প্রাণকৃষ্ণের চার পুত্র—রাজকৃষ্ণ (জন্ম ১ জুলাই, ১৮২৬ খ্রীঃ) কমলকৃষ্ণ,[১] জগৎকৃষ্ণ ও শিবকৃষ্ণ। প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত ও সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ। বেশ কয়েকটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধের রচয়িতা। জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকৃষ্ণ উত্তরাধিকারী হলেন ১৮৮৪ খ্রীঃ। তিনি ছিলেন সুযোগ্য শাসক। বিভিন্ন জনহিতকর কর্মের মধ্যে—সুসঙ্গে ইংরাজী বিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, সড়ক নির্মাণ ও জেলা বোর্ডের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজ-প্রতিনিধি লর্ড রিপন ১৮৮৪ খ্রীঃ তাঁকে বংশগত 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহারাজা রাজকৃষ্ণের চার পুত্র—কুমুদচন্দ্র, নীরদচন্দ্র, নগেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র। মহারাজা রাজকৃষ্ণ তাঁর পৈত্রিক মামলায় জড়িত হয়ে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। বিপদ বিপদের অনুধাবন করে। সুসঙ্গের প্রথম রাজা রঘুনাথ সিংহ প্রতিষ্ঠিত সৌভাগ্য-প্রতীক দশভূজা সিংহবাহিনী মা দুর্গার বিগ্রহ[২] মন্দির থেকে চুরির ঘটনাকে ও সংলগ্ন অশোক-তরুর 'অবক্ষয়', সুসঙ্গবাসীরা অশনি-সংকেত বলে মনে করেন। আর এক ভয়াবহ বিপদ এল বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। 'রংমহল' রাজবাড়ীর সম্পূর্ণ এলাকা সমেত মূল্যবান সামগ্রী (পুরানো দিনের দুর্লভ সঞ্চয় ও দলিল-দস্তাবেজ) ভস্মীভূত হল। এই সব আকস্মিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েও, রাজা রাজকৃষ্ণ তাঁর ভ্রাতাদের সঙ্গে নিয়ে (প্রত্যেকেই জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন), জমিদারীর আয় বাড়াবার জন্য চা বাগান, কমলালেবুর চাষ, কৃষিকার্য, এমনকি, কুসীদবৃত্তির আশ্রয় নেন। স্বদেশপ্রেমী[৩] মহারাজা রাজকৃষ্ণের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১৮৮৮ খ্রীঃ ৬২ বৎসর বয়সে।

১। রাজা কমলকৃষ্ণের রচিত 'সঙ্গিত শতক', 'তুর্যতরঙ্গিনী', 'অশ্বতত্ত্ব', 'গোপালন', 'আম্র' প্রভৃতি গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের লব্ধ সংযোজন।

২। নিত্যপূজা ছাড়া, শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় রাজকীয় জাঁকজমকের আয়োজন হত।

৩। ২২ নভেম্বর, ১৯৮৭ খ্রীঃ স্টেটস্‌ম্যান্ পত্রিকায় প্রকাশিত—"Hundred Years Ago". ২২ নভেম্বর, ১৮৮৭ খ্রীঃ—শিরোনামায় সুসঙ্গের মহারাজা রাজকৃষ্ণ ও তৎকালীন বেশ কয়েকজন স্বদেশ প্রেমিকদের নামের তালিকাটি ১০৫ বছর পরেও আমাদের মনে আবেগ সঞ্চার করবে। '*The National Congress*—At a meeting of the Bengal National League,

contd. next page

মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ

কুমুদচন্দ্রের জন্ম হয় সুসঙ্গে দুর্গাপুর রাজবাটীতে ১৮ আষাঢ়, ১২৭৩ সন (১ জুলাই, ১৮৬৬ খ্রীঃ)। ১৮৮৮ খ্রীঃ মহারাজ রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর পর কুমুদচন্দ্র (প্রেসিডেন্সী, ল কলেজের ছাত্র অবস্থায়) 'মহারাজা' খেতাবের অধিকারী হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন ১৮৮৯ খ্রীঃ। জমিদারীর মালিকানা অপর ভায়েদের অবশ্যই ছিল। মহারাজা কুমুদচন্দ্রের উদ্যোগে একজন ম্যানেজারের হাতে জমিদারীর ভার দেওয়া হয় এবং এই পদ্ধতি ১৯৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। পরের বছর মহারাজার জমিদারীর অংশ 'কোর্ট অফ্-ওয়ার্ডস্'-এর অধীনে চলে যায়। মহারাজা কুমুদচন্দ্রের বৈষয়িক অশান্তির মধ্যেই ঘটেছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়—১২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ ভয়ঙ্কর ভূকম্পন। সুসঙ্গের রাজবাড়ী 'রংমহল' ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় ও কিছু লোক মারা যায়। পরে কুমুদচন্দ্রের ভায়েরা আপন আপন বাসগৃহ সুসঙ্গেই তৈরী করেন।

সুসঙ্গ রাজবংশের তিলক মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ অতি সৎ চরিত্র ও উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর সাহিত্যানুরাগ ও বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ, পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে সুবিদিত। তিনি ময়মনসিংহে বহু সাহিত্য সভা ও আলোচনা-চক্রের (বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন—১৯১১ খ্রীঃ) আয়োজন করেন। অংশগ্রহণ করে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা-লব্ধ বক্তব্য রাখতেন। তাঁর লেখনী-প্রসূত রচনা ও প্রবন্ধ—'বান্ধব', 'সৌরভ', 'সাহিত্য-সংহিতা' প্রভৃতি তৎকালীন বহু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পূর্ববঙ্গের ও কলকাতার বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবী সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পশুপালন ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটি বই—'দুগ্ধ', 'হস্তী প্রসঙ্গ', 'প্রাচীন ভারতে পশুচিকিৎসা'—তাঁর গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। দিল্লীর আইন পরিষদের সভ্য ছিলেন। জীবনের শেষ সাত বছর (১৯০৮-১৫ খ্রীঃ), তিনি কলকাতাতে বেশী সময় কাটিয়েছেন। ১৯১১ খ্রীঃ কালীঘাটে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মণ সমাজের মহতী সভায় তিনি

Calcutta Branch, held on sunday last, at the residence of Late Maharaja Kamal Krishna Bahadoor, under the Presidency of Maharaja Rajkrishna Sing Bahadoor of Susang, the following gentlemen were elected delegates to the forthcoming National Congress at Madras :—

Mr. W. C. Banerjee, Maharaja Rajsingh, and Kamal Krishna Singh of Susang, Kumar Neelkrishna, Benoykrishna, Baboos Jotendra nath Tagore, M. N. Ghose, Kalicharan Banerjee, Joygovinda shome, Gopal Chandra Mukherjee, Moteelal Ghose, J. Ghosal, Ramchand Settiah, Sitanath Roy, Satyadhan Banerjee, Bhupendranath Bose, Kanailal Khan,......'

সভাপতিত্ব করেন। বাংলার ছোটলাট লর্ড কারমাইকেল্ মহারাজা কুমুদচন্দ্রকে গভর্ণমেণ্ট প্রাসাদে "Right of Private Entry" সম্মানিত অধিকার দেন। মৃত্যুর পূর্বে জন্মভূমির টানে ১৯১৫ খ্রীঃ ময়মনসিংহ রাজবাড়ীতে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুসঙ্গে অবস্থানকালে ১৬ অক্টোবর, ১৯১৬ খ্রীঃ (দুর্গা পূজার ষষ্ঠীতে) মারা যান মাত্র ৫০ বছর বয়সে।

মহারাজা কুমুদচন্দ্রের [১] এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্র মহারাজা **ভূপেন্দ্রচন্দ্র** এই বংশের শেষ 'মহারাজা' উপাধিধারী পুরুষ। সুসঙ্গে তাঁর জন্ম হয় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৮ খ্রীঃ। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ১৯১৯ খ্রীঃ। ১৯২০ খ্রীঃ বিবাহ করেন যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা ও উত্তরপাড়ার রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর দৌহিত্রীকে। ইংরাজ সরকারের একজন হিতৈষী বন্ধু হওয়ার সুবাদে, মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে কখনও সক্রিয় অংশগ্রহণ না করলেও, সুসঙ্গ—ময়মনসিংহের জনবিক্ষোভে নিছক দর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পূর্ববঙ্গের জমিদার নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন বঙ্গীয় বিধান পরিষদে। শরীকী বিবাদ ও জমিদারীর অব্যবস্থার কথা চিন্তা করে অক্টোবর, ১৯৩৫ খ্রীঃ জমিদারীর ভার তুলে দেন 'কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডস্'-এর হাতে। সুসঙ্গ পরিত্যাগ করে মহারাজা কলকাতায় বাস করতে শুরু করেন ১৯৩৩ খ্রীঃ। দেশ ভাগের পরে, সময়ের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে, লেখাপড়া আর সংসারের মধ্যে শেষদিন (১৫ এপ্রিল, ১৯৮৫ খ্রীঃ) পর্যন্ত তাঁর কর্তব্যপালনে কোন বিঘ্ন ঘটেনি।

মহারাজা ভূপেন্দ্র সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডঃ সুরজিৎ সিংহের জন্ম হয় ১৯২৬ খ্রীঃ। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ও যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নরবিদ্যা' বা অ্যানথ্রোপোলজি' পি. এইচ. ডি.। পূর্বতন উপাচার্য, বিশ্বভারতী। স্ত্রী ডঃ পূর্ণিমা সিংহ। তাঁদের দুই কন্যা—সুকন্যা চক্রবর্তী ও সুপর্ণা। সুরজিৎ সিংহ শান্তিনিকেতন, বোলপুরে থাকেন।

মহারাজা ভূপেন্দ্রচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র ডঃ দেবব্রত সিংহ, প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ; স্ত্রী জয়ন্তীদেবী। তৃতীয় পুত্র প্রদোষ সিংহ—বেসরকারী কোম্পানীর উচ্চপদস্থ-কর্মচারী ; স্ত্রী রত্না সিন্হা। চতুর্থ পুত্র ধূর্জটি সিংহ—সরকারী উচ্চপদস্থ-কর্মচারী। মহারাজের দুই কন্যা—প্রভা ও রুমা দেবী। অন্য শরিকদের কৃতি সন্তানদের মধ্যে ডঃ তরুণচন্দ্র সিংহ (মনস্তত্ত্ববিদ্), ডঃ সুহৃদ সিংহ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক, রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহ, হাওড়ার প্রাক্তন ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্রমুখ। এই বংশ সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ্য যে, দেশের সব রাজপরিবারের বংশ তালিকায় দত্তক চিহ্নিত উত্তরাধিকারী রয়েছেন, কিন্তু সুসঙ্গ রাজবংশে কেউই দত্তক হিসাবে উত্তরাধিকারী হননি।

১। মহারাজা কুমুদচন্দ্রের বিশেষ পরিচিত গুণীজনের মধ্যে—স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, রাজা বিজয়চাঁদ মহতব, রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, স্যার জগদীশচন্দ্র বোস।

ময়মনসিংহের আচার্য চৌধুরী রাজপরিবার

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তেরো শতকের দার্শনিক ও ন্যায়শাস্ত্রের পণ্ডিত-প্রবর কাশ্যপ গোত্রীয় **উদয়ন আচার্য (ভাদুড়ী)** ময়মনসিংহের সুবিখ্যাত আচার্য রাজপরিবারের আদি পুরুষ। উদয়ন আচার্যের নবম অধস্তন-পুরুষ বীরভূমে দেবগঙ্গার আদি নিবাসী সুশিক্ষিত ও প্রতিভাবান **শ্রীকৃষ্ণ আচার্যই** প্রকৃতপক্ষে **মুক্তাগাছার** [১] আচার্য-পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথমে বগুড়ায় ঢাকোস্তা গ্রামে ও পরে ময়মনসিংহে আলাপসিংহ পরগণার বাসিন্দা, শ্রীকৃষ্ণ আচার্য আনু: ১৭০৪ খ্রী: আপনার ভাগ্য নির্ধারণ করার তাগিদে মুর্শিদাবাদের সুবাদার নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী খানের দরবারে হাজির হন এবং দায়িত্বপূর্ণ 'খাসমুন্সী' পদে আসীন হন। বেশ কিছু দিন শ্রীকৃষ্ণকে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতেই হয়। ১৭২৭ খ্রী: মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুর পর, বাংলার নবাবী গদীর লড়াই হয়। নবাব নাজিম সুজাউদ্দীন ও মীর্জা মহম্মদ আলির (পরে নবাব আলিবর্দী খান) মধ্যে গিরিয়ার যুদ্ধে (১৭৪০ খ্রী:), শ্রীকৃষ্ণ মীর্জা মহম্মদকে সাহায্য করেছিলেন। সেই উপকারের প্রতিদানে নবাব আলিবর্দী খান ১৭৪০ খ্রী: আলাপসিংহ পরগণার জমিদারী শ্রীকৃষ্ণের নামে বন্দোবস্ত করে দেন।

আনু: ১৭৪০ খ্রী: শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে প্রথমে বগুড়ায় তপে ঝাঁকড়, তারপরে কুমারসিংহ এবং শেষে মুক্তাগাছায় (বিনোদবাড়া) স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। তাঁর চার পুত্রের [২] মধ্যে জমিদারী ভাগ করে দেন। কনিষ্ঠ পুত্র **শিবরামের** একমাত্র পুত্র **রঘুনন্দন** [৩] জমিদারীর চার আনা অংশের—'দরি (নূতন) চারি আনী'—মালিক হন। তাঁর দত্তকপুত্র গৌরীকান্ত অকালে মারা যাওয়ায়, তাঁর বিধবা পত্নী **বিমলা দেবী** জমিদারীর দায়িত্ব নেন। বিমলা দেবী একজন ধর্মপ্রাণা ও দানশীলা মহিলা। কাশীধামে 'বিমলেশ্বর' শিবমন্দির ও এবং মুক্তাগাছায় 'আনন্দময়ী' কালী ও 'গৌরীকান্তেশ্বর' শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। তিনি **কাশীকান্ত আচার্যকে** দত্তক

১। মুক্তাগাছা (পূর্ব নাম বিনোদবাড়ী) ময়মনসিংহ (মমিনসাহী) শহর থেকে ১৫ কি. মি.।

২। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরাম, দ্বিতীয় পুত্র হররাম, তৃতীয় পুত্র বিষ্ণুরাম ও কনিষ্ঠ শিবরাম। হররামের প্রপৌত্র রামকিশোরের পুত্র রাজা জগৎকিশোর 'আট আনী' জমিদারীর মালিক ছিলেন। পরের পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। উত্তরবঙ্গে ১৭৮২-৮৭ খ্রী: সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দাবানল থেকে ময়মনসিংহ বাঁচেনি। আচার্য পরিবার জড়িয়ে পড়েছিল। রঘুনন্দন নাকি বিদ্রোহীদের সাহায্য করেন। তিনি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় ত্রাণকার্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন।

নেন। দৃঢ়চিত্ত ও স্বাধীনচেতা কাশীকান্ত ছিলেন জনদরদী জমিদার। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বহুদিন ধরে অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। বারাণসী যাত্রাকালে নৌকায় দেহত্যাগ করেন ১৮৪৯ খ্রীঃ। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী দেবী চন্দ্রকান্তকে দত্তক নেন। চন্দ্রকান্ত অকালে মারা গেলে (১৮৫৮ খ্রীঃ), ফরিদপুরের বাজিৎপুর গ্রামের ঈশ্বরচন্দ্র মজুমদারের কনিষ্ঠ পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে (জন্ম—১৮৫১ খ্রীঃ) দত্তক নেন। দত্তক পুত্রের নামকরণ হয় সূর্যকান্ত। ১৮৬৩ খ্রীঃ লক্ষ্মীদেবী মারা যান।

মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী

মুক্তাগাছার 'দরি চারি আনী'-র নাবালক জমিদার সূর্যকান্তের [১] পক্ষে 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্' জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন। মাত্র বার বছর বয়সে সূর্যকান্ত 'ওয়ার্ডস্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে' প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ্ ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধানে তিন বছর পড়াশোনা করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ সাবালক হয়ে জমিদারীর [২] ভার গ্রহণ করেন। বিবাহ করেন রাজসাহী জেলার কমল গ্রাম নিবাসী ভবেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজরাজেশ্বরী দেবীকে। অপুত্রক রাজরাজেশ্বরী দেবী নভেম্বর, ১৮৮০ খ্রীঃ অকালে মারা যান। সূর্যকান্ত জমিদারীর কাজে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, সাহিত্য-চর্চা ও বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী ও রচনা পাঠে বিশেষ মনঃসংযোগ করেন। শিকার ও বন্যপশুতত্ত্বে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। বই লিখেছেন 'শিকার কাহিনী'। 'নির্মাল্য' মাসিক পত্রিকার তিনি সম্পাদক। দেশের মানুষের জ্ঞানোন্নতির জন্য সাহিত্যসেবক ও ছাত্রদের মধ্যে বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন।

সূর্যকান্তের দানে তৈরী হয়েছিল সুতিয়া নদীর উপর সেতু, ময়মনসিংহ শহরে টাউন হল (১৮৮৪ খ্রীঃ), কলকাতায় সিটি কলেজ, মূক-বধির বিদ্যালয় ও কটন ইনষ্টিটিউশন্ প্রভৃতি। ১৮৭৫ খ্রীঃ মুক্তাগাছা মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠাকল্পে, দশ হাজার টাকা বাৎসরিক আয়ের সম্পত্তি, কলকাতায় চিড়িয়াখানা ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল তহবিলে ৪৫,০০০ টাকা দান করেন। তাঁর দানশীলতা ও রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ লর্ড লিটন তাঁকে 'রাজা' খেতাব দেন। 'রাজা বাহাদুর' হন ১৮৮৭ খ্রীঃ।

১। Glympises of Bengal—A. C. Campbell. 1907. 'মহারাজা সূর্য্যকান্ত' যোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত, ১৩১৬ সন। 'চিত্ররাজি' দ্রষ্টব্য।

২। মুক্তাগাছা জমিদারীর মুক্তাগাছা ছাড়া, শেরপুর, সুসঙ্গ, ঢাকা, মালদা, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, বগুড়া ও পাবনা জেলায় বেশ কয়েকটি পরগণা অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরাকীর্তি গৌড় (মালদা), আচার্য চৌধুরীদের জমিদারীর অংশ ছিল।

১৮৯০ খ্রীঃ রানী রাজরাজেশ্বরী দেবীর স্মৃতিরক্ষায় প্রায় ১,৪২,২৭৮ টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির 'ওয়াটার ওয়ার্কস্' তৈরী করে দেন। তাঁর জন্মভূমি বাজিৎপুরে 'ত্রিপুরাসুন্দরী দাতব্য চিকিৎসালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ 'জাতীয় শিক্ষা সমিতির' (পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) তহবিলে আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ 'ন্যাশন্যাল্ কাউন্সিলের' অধ্যক্ষ ছিলেন। রাসবিহারী বসু, রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ মনীষীদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক ছিল। ভারত সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষ্যে ২২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ, রাজা সূর্যকান্তকে 'মহারাজা' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বড়লাট লর্ড কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে (১৯০৫-১১ খ্রীঃ) সূর্য্যকান্ত সক্রিয় ভূমিকা নেন।

সুদক্ষ শিকারী 'বাঘুয়া রাজা' সূর্য্যকান্ত ইউরোপীয় শিকারী ও রাজ-প্রতিনিধিদের কাছে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান লাভ করেন। শিকারে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন লর্ড কার্জন (২৪-২৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯০১ খ্রীঃ), প্রধান সেনাপতি স্যার জর্জ হোয়াইট, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার ক্রোমার পেথরাম, রাশিয়ার তদানীন্তন রাজকুমার গ্রাণ্ড ডিউক্ বরিস্ এবং প্রখ্যাত শিকারী স্যার স্যামুয়েল্ বেকার। সূর্যকান্ত 'খেদায়' বুনো হাতি ধরার কাজে বিশেষ উৎসাহী। কলকাতায় মোটর গাড়ী তৈরীর প্রথম কারখানা স্থাপন করেন।

কর্মবীর ও দানবীর মহারাজা সূর্যকান্ত ছিলেন বাংলার আদর্শ জমিদারদের অন্যতম। চল্লিশ বছরেরও বেশী সময়কাল প্রজাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা, তাঁর দৈনন্দিন কাজে অগ্রাধিকার পেত। অপুত্রক মহারাজা সূর্যকান্ত ১৮৮৭ খ্রীঃ নিজের জ্ঞাতি-ভাই **রাজা জগৎকিশোরের** (আট আনীর জমিদার) দ্বিতীয় পুত্র বীরেন্দ্রকিশোরকে (**শশীকান্ত**) দত্তক নেন। মহারাজা সূর্যকান্ত বৈদ্যনাথধামের বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ২০ অক্টোবর, ১৯০৮ খ্রীঃ ৫৭ বৎসর বয়সে। কলকাতা টাউন হলে দ্বারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিংহের সভাপতিত্বে, প্রয়াত মহারাজা সূর্যকান্তের প্রতি মর্মস্পর্শী ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়—৩১ আগস্ট, ১৯০৯ খ্রীঃ—**'The great and irreparable loss to the Zamindars of Bengal and the Indian Community at large'**।

মহারাজা শশীকান্ত আচার্য চৌধুরী

মহারাজা সূর্যকান্তের দত্তক পুত্র শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর (পিতা রাজা জগৎ কিশোর ও মাতা রাজবালা দেবী) জন্ম হয় ১৮৮৫ খ্রীঃ মুক্তাগাছায়। পালক পিতার আন্তরিক প্রচেষ্টায় শশীকান্ত নিজগৃহে স্বদেশীয় ও বিদেশী শিক্ষাবিদদের কাছে সুশিক্ষা পেয়েছিলেন। বিখ্যাত ক্রীড়ামোদী ও শিকারী হিসাবে, পালক পিতা পুত্রকে ব্যায়াম ও

পুরুষোচিত খেলাধূলার (ক্রিকেট-ফুটবল) মাধ্যমে শরীর গঠনে উৎসাহ দেন। পশু শিকারের কার্যকরী কৌশলের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁর সান্নিধ্যে। দার্জিলিং-এ সেণ্ট্ পলস্ স্কুল থেকে ১৯০৪ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে, প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হন। ছাত্র অবস্থায় বিবাহ হয় দেশ বরেণ্য ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর কন্যা লীলাদেবীর সঙ্গে ১৯০৪ খ্রীঃ। পিতার ইচ্ছানুসারে ১৯০৫ খ্রীঃ ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজে পড়াশোনা আরম্ভ করেন। পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু-সংবাদে ১৯০৮ খ্রীঃ, তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয় পড়াশোনা অসম্পূর্ণ রেখে। বহুবার তিনি বাংলার বিধান সভা, 'কাউন্সিল অফ্ স্টেটস্ এবং ময়মনসিংহ মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য ছিলেন। শশীকান্ত জমিদারীর দায়িত্ব ভার গ্রহণ করে পিতার ন্যায় যাবতীয় সুকর্ম, দান-ধ্যান যথারীতি বজায় রাখা ছাড়াও, তাঁর নিজস্ব দানের খতিয়ানে দেখা যায়—ময়মনসিংহে সূর্যকান্ত চিকিৎসালয়ে—১,২০,০০০ টাকা, আনন্দ মোহন কলেজে ৪৫,০০০ টাকা, কলকাতায় সেণ্ট্ জন্ অ্যাম্বুলেন্স্ ৬০,০০০ টাকা, মিটফোর্ড চিকিৎসালয়ে—১,০০,০০০ টাকা প্রভৃতি। তাঁর গুণগত চরিত্র ও দানশীলতার সরকারী স্বীকৃতি-স্বরূপ, তাঁকে 'রাজা' (১৯১৩ খ্রীঃ) এবং পরের বছর 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হয়। ১ জানুয়ারী, ১৯২০ খ্রীঃ 'মহারাজা' উপাধি দানের ঘোষণা করা হলেও, ৪ আগষ্ট, ১৯২০ খ্রীঃ ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক বিশেষ দরবারে, বাংলার ছোটলাট লর্ড রোণাল্ডসে রাজা শশীকান্তকে 'মহারাজা' খেতাব দেন।

সুদক্ষ শিকারী মহারাজা শশীকান্ত অ্যায়ারল্যাণ্ডের ভূতপূর্ব লর্ড এবং লেডি উইম্বোর্ণ, স্পেন-এর ডিউক্ অফ্ পেনেরান্দা এবং ইজিপ্টের সুলতান-পুত্র ইউসুফ কামাল পাশা প্রমুখ মাননীয় ব্যক্তিরা একাধিকবার মহারাজার শিকার অভিযানে সম্মানিত অতিথি হয়েছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। নিজ প্রাসাদ 'শশী লজে' মূল্যবান গ্রন্থ-সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। 'গজায়ুর্বেদ সংহিতা'র বাংলা অনুবাদ তাঁর আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। স্বদেশ-প্রেমী মহারাজা শশীকান্ত ১৯৪৪ খ্রীঃ মুক্তাগাছায় ৫৯ বছর বয়সে মারা যান। তাঁর তিন পুত্র কুমার শীতাংশুকান্ত, কুমার সুধাংশুকান্ত ও কুমার স্নেহাংশুকান্ত ও তিন কন্যা—কোহিনুর, গায়ত্রী ও আরতি দেবী।

শীতাংশুর (১৯০৬-৫২ খ্রীঃ) দুই পুত্র—সহস্রাংশু (অপুত্রক) ও শত্রুঘ্নাংশু এবং দুই কন্যা—তপতী ভট্টাচার্য ও কুমকুম মুখোপাধ্যায়। শত্রুঘ্নাংশুর এক পুত্র সৌম্যকান্ত। ৩৮ যতীন দাস রোডে বাস করেন। **সুধাংশুর** (১৯১২-৯১ খ্রীঃ) দুই কন্যা—ঝরণা লাহিড়ী ও সুস্মিতা চাটার্জী এবং এক পুত্র শুভ্রাংশুর দুই পুত্র—স্বনাংশু ও প্রেমাংশু। বালিগঞ্জে ডঃ শরৎ ব্যানার্জী রোডে থাকেন। **স্নেহাংশু** (১৯১৩-৮৬) ছিলেন খ্যাতিমান ব্যারিষ্টার। তাঁর এক পুত্র সৌরাংশু (ইংলণ্ডে বসবাস করেন) এবং একমাত্র কন্যা বিজয়া গোস্বামী, আলিপুরে বেকার রোডে থাকেন। তাঁর এক পুত্র অরিন্দম।

রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী

মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার বিখ্যাত জমিদার ও প্রভাবশালী আচার্য চৌধুরী রাজপরিবারের বংশ পরিচয় পূর্ব পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে। বংশের প্রাণ-পুরুষ **শ্রীকৃষ্ণ আচার্যের** দ্বিতীয় পুত্র **হররাম** তপে ঝাঁকড় (বগুড়া) থেকে চলে এসে মুক্তাগাছায় বাস করতেন। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও, তাঁর নামে একটি শিব (হররামেশ্বর) মন্দির রয়েছে। হররামের দুই পুত্র—**রামকান্ত** ও **কৃষ্ণকান্ত**। কৃষ্ণকান্তের দত্তক পুত্র **গৌরকিশোর** এবং তস্য দত্তক পুত্র **রামকিশোর**, (জন্ম ১৮৩০ খ্রীঃ), জন্মদাতার নাম গোকুলকিশোর। বিবাহ হয় কুলগাছির বিশ্বনাথ সান্যালের কন্যা বিদ্যাময়ী দেবীর সঙ্গে ১৮৬০ খ্রীঃ। রামকিশোর একজন তেজীয়ান পুরুষ। মারা যান ১৮৫৭ খ্রীঃ। তাঁর স্ত্রী ধর্মপরায়ণা ও দানশীলা বিদ্যাময়ী দেবী মুক্তাগাছা ও বারাণসীতে দেব মন্দির ও ছাত্রনিবাস প্রতিষ্ঠা করেছেন। বারাণসীতে মারা যান ১৯০৮ খ্রীঃ।

মুক্তাগাছার 'আট-আনী' অংশীদার রামকিশোর আচার্যের একমাত্র পুত্র **জগৎ-কিশোরের** জন্ম হয় ২৮ মার্চ, ১৮৬৪ খ্রীঃ (১৮ ফাল্গুন, ১২৭০ সন) মুক্তাগাছায়। পিতার মৃত্যুতে শরিকী মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত অসচ্ছল জমিদারী, নাবালক জগৎকিশোরের হাত থেকে 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসে' চলে যায়। ইংরাজ সরকারের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী, জগৎকিশোর কলকাতায় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের তত্ত্বাবধনে 'ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনে' পড়াশোনা শুরু করেন। সেই সময়ে 'ইনস্টিটিউশনে' পড়তেন লনডাঙ্গার রাজা প্রমথ ভূষণ দেবরায়, তাহিরপুরের রাজা শশিশেখরেশ্বর, মহিষাদলের রাজা ঈশ্বরীপ্রসাদ গর্গ প্রমুখ যুবকরা। রাজা জগৎকিশোর এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আজীবন যোগাযোগ রেখেছিলেন। কলকাতায় হিন্দু স্কুল ও ময়মনসিংহ সরকারী স্কুলেরও ছাত্র ছিলেন।

যৌবনে তাঁর সবচেয়ে বেশী শখ ছিল ঘোড়ায় চড়া। একজন দক্ষ ঘোড় সোয়ার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। কলকাতায় রেসের মাঠে তিনি একজন নিয়মিত দর্শনার্থী। কিন্তু 'বাজী' কখনও ধরেননি—বলতেন 'শিক্ষাগুরু রাজেন্দ্রবাবুর নিষেধ আছে'। এছাড়া শিকার, কুস্তি ও শারীরিক ব্যায়াম তাঁর প্রৌঢ়ত্বেও বন্ধ হয়নি। যৌবনের পান দোষ থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন না। পাঠরত অবস্থায় পানসীপড়ার বিখ্যাত উকিল মোহিনী-মোহন রায়ের কন্যা রাজাবালা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় ১৮৮০ খ্রীঃ। প্রকৃতপক্ষে মাতা বিদ্যাময়ী দেবীর মৃত্যুর পরই (১৯০৮ খ্রীঃ), জগৎকিশোর জমিদারীর কাজকর্ম স্বয়ং দেখা শোনা করেন। 'রাজা' উপাধি পান ১৯১০ খ্রীঃ।

আর্থিক অসচ্ছলতার মধ্যে থেকেও তাঁর দান-ভার কমেনি। লোকে বলে, তিনি কোনো লোককে বিমুখ করেননি। তাছাড়া, মুক্তাগাছায় 'রামকিশোর উচ্চ বিদ্যালয়' ময়মনসিংহে বালিকা বিদ্যালয়, 'সূর্যকান্ত হাসপাতাল', কাশীতে 'রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম' ও জিয়াগঞ্জ হাসপাতালে তাঁর দান ছিল। নিয়মানুবর্তিতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার মৃত্যু হয় ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ খ্রীঃ ৭৪ বছর বয়সে। শিকার করা তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বনের জঙ্গলি হাতি 'খেদায়' ধরা ও পোষমানানর ব্যাপারে খুঁটিনাটি সরজমিনে দেখা ও জ্ঞান সঞ্চয় করা, পরে পেশায় ১ পরিণত হয়েছিল। অতএব তাঁকে ময়মনসিংহের বাহিরে—ত্রিপুরা, আসাম ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বহুবার যেতে হয়েছিল। হাতি ধরার প্রচলিত রীতি—ফাঁদ, পরতালা, চোরা গর্তের ফাঁদ ও 'খেদা'। হাতি ধরার পর জঙ্গলের মালিককে হাতির মূল্য দিয়ে, তবেই কয়েকটি পোষা 'কুনকি' স্ত্রী হাতির সাহায্যে জঙ্গলি হাতিকে জমিদারীর পিলখানায় (হাতির আস্তানা) এনে বেঁধে রাখা হয়। তিন-চার মাস শিক্ষার পর, তাঁকে র'য়ে-ব'সে কাজে লাগন হয়। 'দাইদারদের' (হাতি ধরার বিশেষ কর্মী) ও মাহুতদের কৌশল, দক্ষতা ও অসীম সাহসের কথা স্মরণ করলে, আমাদের মনে এখনও উৎকণ্ঠা, বিস্ময়, আনন্দ ও করুণার উদ্রেক হয়।

রাজা জগৎকিশোরের দশাধিক সন্তান, তাঁদের মধ্যে চার পুত্র ও দুই কন্যা ২ ছাড়া সকলেরই অকাল মৃত্যু হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার **জীতেন্দ্রকিশোরের** (১৮৮৪-১৯৪১ খ্রীঃ) দুটি স্ত্রী—জ্যোতির্ময়ী দেবী ও সুধাশুংবালা দেবী ও দুই কন্যা। প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে এক পুত্র জীবেন্দ্রকিশোরের (জন্ম ১২ অক্টোবর, ১৯০৩ খ্রীঃ) স্ত্রী অনিলাদেবী। ৯০ বছরের বৃদ্ধ জীবেন্দ্রকিশোর থাকেন কালীতলাদিয়ার গ্রামের (বহরমপুরের কাছে) বাসভবনে। তাঁর দুই পুত্র জ্যোতি ও দ্যুতি ও তিন কন্যা—শান্তি চক্রবর্তী, নিয়তি সান্যাল ও অদিতি সান্যাল। দ্বিতীয় পুত্র কুমার **বীরেন্দ্রকিশোর**. মহারাজা সূর্যকান্তের দত্তক পুত্র **মহারাজা শশীকান্ত** (পূর্ব পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় পুত্র কুমার **নৃসিংহকিশোরের** (১৯০০—৪১ খ্রীঃ) স্ত্রী কমলা দেবী ও পুত্র নবযুগ (১৯২৬—৬৮ খ্রীঃ)। চতুর্থ পুত্র কুমার **ভূপেন্দ্রকিশোর** (১৯০৩ খ্রীঃ), স্ত্রী রমাদেবী, একমাত্র পুত্র নয়ন (১৯২৮ খ্রীঃ)।

১ প্রসঙ্গের রাজারাও হাতির 'খেদা' ও ব্যবসায় মনোযোগ দিতেন। আচার্য বংশের কুলদেবী শ্রী 'রাজরাজেশ্বরী'—অষ্টধাতুর তৈরী সপরিবারে মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তি এবং চালিতে লক্ষ্মীর পরে বিষ্ণু, দুর্গার উপরে শিব আর সরস্বতীর উপরে ব্রহ্মা। দেশ বিভাগের আগে পর্যন্ত 'আট আনা' শরিকদের তত্ত্বাবধান দেবীর পূজা পরিচালিত হত, যদিও আচার্য বংশের সব শরিকের পূজায় অংশ নেওয়ার অধিকার ছিল। মূর্তিটি কাশীতে পাঠানো হয়। পরে বহরমপুরে আনা হয়।

২ প্রথমা কন্যা নগেন্দ্রবালা দেবী কৃষ্ণপুরের নরেনকান্তি লাহিড়ীর স্ত্রী। দ্বিতীয়া কন্যা সরযুবালা দেবী কৃষ্ণপুরের সুরেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী চৌধুরীর স্ত্রী।

রাজা যোগেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রামগোপালপুর, ময়মনসিংহ

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকে বাংলার সুবাদার নবাব **মুর্শিদকুলী খানের** আনুকূল্যে ময়মনসিংহ পরগণার বেশ কিছু অংশের জমিদারীর মালিক হন **শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী**। সন্ন্যাসীগঞ্জের (অধুনা জমালপুর) ডাকাত-সন্ন্যাসীরা আনুঃ ১৭৮৭ খ্রীঃ শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীকে গৌরীপুরে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিল। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর দুই স্ত্রী—রত্নমালা ও **নারায়ণী দেবী**। তাঁদের দুই দত্তক পুত্র—নন্দকিশোর ও **রামকিশোর**। শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী নারায়ণী দেবীর [১] পুত্র রামকিশোর ময়মনসিংহ ও জফরসাহী পরগণার জমিদারীর মালিক হন ১৮০৭ খ্রীঃ। রামকিশোরের অকাল মৃত্যুতে, ২২ জুলাই, ১৮১১ খ্রীঃ ইংরাজ সরকারের এক সনন্দ বলে, তাঁর স্ত্রী জগদীশ্বরী দেবী স্বামীর সম্পত্তির মালিক হন। তাঁর দত্তক পুত্র **কালীকিশোর** (কেশবচন্দ্র)। তিনি তাঁর পালিতা মা ও ঠাকুমার সব সম্পত্তির অধিকারী হলেন ফেব্রুয়ারী, ১৮১৩ খ্রীঃ এক দানপত্রের বলে। কালীকিশোরের জমিদারী ঋণ-জালে জড়িয়ে পড়ে। তিনি মারা যান ১৮৩৫ খ্রীঃ। কালীকিশোরের স্ত্রী কমলমণি দেবীর এক পুত্র কাশীকিশোর ও দুই কন্যা। [২]

কাশীকিশোরের জন্ম হয় ১৮২৮ খ্রীঃ। পিতার তত্ত্বাবধানে গৃহশিক্ষক, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল ও পরে ডঃ এল্টন্ সাহেবের কাছে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নিজ দক্ষতা ও সঠিক কর্মধারার মাধ্যমে ঋণ-গ্রস্থ পৈতৃক জমিদারীকে কেবল যে দায়মুক্ত করেছিলেন তা নয়, নূতন কয়েকটি জমিদারীও কিনে ছিলেন। প্রজারঞ্জক কাশীকিশোর ইংরাজ সরকারের সুনজরে পড়েন। জেলার প্রথম ভারতীয় অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট্ পদে আসীন হন। ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়া 'ভারত সম্রাজ্ঞী' ঘোষণা উপলক্ষে, ছোটলাট স্যার রিচার্ড্ টেম্পল্ তাঁকে 'প্রশংসা পত্র' দেন। তিনি নাকি 'রাজা' উপাধি গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কাশীকিশোর দেহত্যাগ করেন অক্টোবর, ১৮৮৭ খ্রীঃ (১৫ আশ্বিন, ১২৯৪ সন), তাঁর স্ত্রী হরসুন্দরী দেবী, এক পুত্র যোগেন্দ্রকিশোর ও এক কন্যা রামরঙ্গিনী দেবীকে রেখে।

পৌষ, ১২৬৪ সন (জানুয়ারী, ১৮৫৮ খ্রীঃ) কাশীকিশোরের এক মাত্র পুত্র **যোগেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর** জন্ম হয়। যোগেন্দ্রকিশোরের বিবাহ হয় রাজসাহী

১। তিনি গৌরীপুরের সুবৃহৎ অট্টালিকা ও একাধিক মন্দিরের প্রতিষ্ঠাত্রী। তিনি গৌরীপুর থেকে রামগোপালপুরে চলে আসেন। ময়মনসিংহ শহর থেকে রামগোপালপুরের দূরত্ব প্রায় ১৬ কি. মি.।

২। প্রসন্নময়ী ও জয়দুর্গা দেবী।

জেলার হরিশপুর গ্রামের গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের কন্যা রাধারঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে ১৮৭৩ খ্রীঃ। পিতার ন্যায় তিনিও দানশীল ও প্রজা কল্যাণে তৎপর ছিলেন। রাজভক্তি তো ছিলই। সংস্কৃত শিক্ষা প্রসারকল্পে তিনি পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদদের যথাযোগ্য বৃত্তি দিয়ে উৎসাহিত করেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ অনুরাগী। দেশ-প্রসিদ্ধ সেতারী হোসেন খাঁ, সরদ বাদক এনায়েৎ খাঁ প্রমুখ বহু গুণীজন [১] তাঁর বাড়ীতে গানের আসরে এসেছেন। রামগোপালপুরে অতিথিশালা, ময়মনসিংহে 'কালীকিশোর টেকনিকাল্ স্কুল', আনন্দমোহন কলেজ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও ময়মনসিংহ সিটি কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, রাজা যোগেন্দ্রকিশোরের প্রচুর দান আছে। বিগত ১৩০৪ সনের (১৮৯৭ খ্রীঃ) ভীষণ ভূমিকম্পে রাজবাড়ী সহ বহু ভূসম্পত্তির ক্ষতি হয়। তিনি সর্বতোভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। ইংরাজ সরকার তাঁর সুকর্মের স্বীকৃতি-স্বরূপ ১৮৯৫ খ্রীঃ 'রায় বাহাদুর' ও ২২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে সম্মান-সূচক 'প্রশংসাপত্র' ও পরে জানুয়ারী ১৯০৯ খ্রীঃ তাঁকে 'রাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁর দেহাবসান হয় ১৯১৫ খ্রীঃ।

রাজা যোগেন্দ্রকিশোরের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। দ্বিতীয় পুত্র ও কন্যা অকালে মারা যান। প্রথম পুত্র কুমার **নগেন্দ্রকিশোর**-এর স্ত্রী শরৎকুমারী দেবী, পুত্র বীরেন্দ্র, গিরীন্দ্র ও নৃপেন্দ্র। বীরেন্দ্র-এর (স্ত্রী প্রতিমা) পুত্র রথীন্দ্র (স্ত্রী সুলেখা) ও তপনেন্দ্র এবং কন্যা সুদীপ্তা। গিরীন্দ্রের (স্ত্রী সুরমা) পুত্র দিব্যেন্দ্র ও গীতিন্দ্র ও কন্যা সুতপা ও সুনন্দা, ভোভার রোডে থাকেন। নৃপেন্দ্রের দুই পুত্র দেবাশিষ ও শুভাশিষ। এদের অনেকেই জয়শ্রী পার্ক, বেহালায় থাকেন। তৃতীয় পুত্র কুমার **যতীন্দ্রকিশোর**-এর (স্ত্রী হেমলতা দেবী ও হৈমবালা দেবী) এক কন্যা স্নেহলতা। চতুর্থ পুত্র কুমার **শৌরীন্দ্রকিশোর**-[২] এর (স্ত্রী বিভাবতী দেবী) পুত্র রণেন্দ্র ও নীরেন্দ্র। রণেন্দ্রের (স্ত্রী বাসন্তী দেবী) তিন পুত্র সৌমেন্দ্র, শিবেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র ও দুই কন্যা অর্চিতা [৩] ও অর্পিতা রায়চৌধুরী, দুজনেই অবিবাহিতা। এঁরা সকলেই ১৯২।১ রাসবিহারী এভিনিউ বাসভবনে থাকেন। পঞ্চম পুত্র কুমার **হরেন্দ্রকিশোর**-এর (স্ত্রী প্রতিভাময়ী দেবী) এক পুত্র অরুনেন্দ্র ও কন্যা জ্যোতিরাণী। অরুনেন্দ্রের পুত্র অরূপেন্দ্র ও কন্যা অজপা ও অজয়া। অরুনেন্দ্র পার্ক রোড, ব্যারাকপুরে থাকেন।

১। কালোয়াত পীর খাঁ ও লক্ষণ কালোয়াত এসেছেন। রাজা যোগেন্দ্রকিশোর সেতার ও হারমোনিয়ম বাদ্যে পারদর্শী। বারো মাসে তেরো পার্বণে, পূজা-অর্চনার সঙ্গে, যাত্রায় নাচ, গান ও ভূরি-ভোজনের মাধ্যমে প্রজাদের মনোরঞ্জন করতেন।

২। লেখক 'ময়মনসিংহের ব্রাহ্মণ সমাজ' (প্রথম খণ্ড), রামগোপালপুর।

৩। এই নিবন্ধ সাহিত্য-প্রেমী অর্চিতা রায়চৌধুরী প্রদত্ত তথ্য-বদ্ধ।

মহারাজা মন্মথনাথ রায়চৌধুরী

সন্তোষ, ময়মনসিংহ

খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকের শেষভাগে বাংলার 'বারো ভূঞাদের' অন্যতম যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও রাজা বসন্ত রায়ের বংশধর বলে দাবী করেন সন্তোষের রায়চৌধুরীরা। তাঁরা যশোহর থেকে সন্তোষে আসেন সতেরো শতকে। ময়মনসিংহ জেলায় (অধুনা টাঙ্গাইল) কাগ্‌মারী পরগণা জমিদারীর একের তৃতীয়াংশ অংশীদার ছিলেন **রামচন্দ্র রায়**। তাঁর প্রপৌত্রের দত্তক সন্তান **দ্বারকানাথ রায়** শিক্ষিত ও পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত সামাজিক পুরুষ। দক্ষ জমিদার দ্বারকানাথের বিবাহ হয়েছিল বাখরগঞ্জ জেলায় গাভা নিবাসী ঈশানচন্দ্র ঘোষের কন্যা বিন্ধ্যবাসিনীর সঙ্গে। দ্বারকানাথ সন্তোষে দাতব্য চিকিৎসালয়, স্কুল ও জনকল্যাণ-মূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। দ্বারকানাথ মারা যান দুই নাবালক পুত্র—প্রমথনাথ ও মন্মথনাথকে রেখে। মাতৃসান্নিধ্যে ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্রগঠন ও প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয় ময়মনসিংহে ও পরে কলকাতায়।

দ্বারকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র **মন্মথনাথের** জন্ম হয় ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮০ খ্রীঃ। কলকাতায় সেণ্ট্ জেভিয়ার স্কুল, হেয়ার স্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষালাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ., বি. এল.। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাংলার অন্যতম সাহিত্যরথী, নাট্যকার ও কবি **প্রমথনাথের** প্রভাবে ও উৎসাহে অল্প বয়সেই সাহিত্য-প্রেম ও প্রতিভার পরিচয় দেন। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর'-এর ইংরাজী অনুবাদ মন্মথনাথের লেখনী-প্রসূত। ১৯০৫-০৬ খ্রীঃ যুবরাজ পঞ্চম জর্জের কলকাতা ভ্রমণ ('Memoir of the Royal Visit to Calcutta') ছাড়া, তাঁর লেখা প্রবন্ধ ও প্রদত্ত ভাষণের সঙ্কলন-গ্রন্থ 'Essays & Speeches' দেশ-বিদেশের মানুষের প্রশংসা লাভ করেছে। বাগ্মী ও সুবক্তা হিসাবে তৎকালীন বঙ্গসমাজে ও অভিজাত ইংরাজ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সুখ্যাতি ও স্বীকৃতি পেয়েছেন। সাহিত্যচর্চা ও গবেষণার উদ্দেশ্যে, নিজ বাসভবনের দেশীয় ও বিদেশী গ্রন্থ-সমৃদ্ধ পাঠাগারে, তিনি শিক্ষাবিদদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন এবং সাহিত্য-বাসরেরও আয়োজন হত।

তিনি যে কেবল সাহিত্য-প্রেমী তা নয়, সন্তোষ ও টাঙ্গাইলে একাধিক স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা।[১] দেশের শিক্ষানীতি নির্দ্ধারণ-বিষয়ক আলোচনায়, তিনি যুক্তি-তর্কে তাঁর

১। ১৯০১ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষে সরকারী ত্রাণ ভাণ্ডারে পঞ্চাশ হাজার টাকা ছাড়া, ঢাকা জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড হাসপাতাল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ফাণ্ড ও কলকাতার চিড়িয়াখানাতে তাঁর দান আছে। বিন্ধ্যবাসিনী গার্লস্ হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা। 'চিত্ররাজি পরিচয়' দ্রষ্টব্য।

নিজস্ব অভিমত সরকার ও জনসাধারণের কাছে প্রকাশ করেছেন। লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫ খ্রীঃ) ও পরে স্যার অ্যাণ্ড্রু হ্যাণ্ডারসন্ ফ্রেসার (১৯০৩-০৫ খ্রীঃ) প্রমুখ রাজপুরুষ ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে তাঁর মত বিনিময় হত।

মহারাজা মন্মথনাথ বঙ্গীয় আইন সভার প্রথম ভারতীয় 'স্পিকার'। তাঁর একান্ত ও সক্রীয় কর্ম-প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় আইন সভার বর্তমান মনোরম অট্টালিকাটি তৈরী হয়েছিল। তিনি একবার বাংলার মন্ত্রী হয়ে ছিলেন। রাজ-প্রতিনিধি লর্ড কার্জন ছাড়া, লর্ড মিন্টো, লর্ড চেমসফোর্ড, লর্ড রোনাল্ডসে, তাঁর সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করে গেছেন। 'বঙ্গীয় জমিদার সভার' একজন সক্রিয় কর্মকর্তা—বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের বিরুদ্ধে জোরাল বক্তব্য রাখেন। বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হিসাবে ভারত সরকারের 'শাসন সংস্কার বিল' সম্বন্ধে, ভারতে আগত লর্ড সাউথবোর্ণ, রাজা মন্মথনাথের অভিমত নথিভুক্ত করেন।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে দেশ-সেবায় ব্রতী হন। ১৮৯৮ খ্রীঃ মাদ্রাজে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের' চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশনে, মন্মথনাথ তাঁর একটি অরাজনৈতিক 'মাদক দ্রব্য নিবারণ' প্রস্তাব জোরালো বক্তব্য ও পুস্তিকার মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নেন। সরকার মন্মথনাথের দানশীলতা ও সমাজ-সেবামূলক কাজের স্বীকৃতি-স্বরূপ তাঁকে ক্রমান্বয়ে 'রাজা' (১ জানুয়ারী, ১৯১০ খ্রীঃ), 'কে, টি,' (১৯৩০ খ্রীঃ) ও 'মহারাজা' (১৯৩৫ খ্রীঃ) উপাধি দেন।

ক্রীড়াজগতে, বিশেষ করে ফুটবল খেলায়, তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। দেশের ফুটবল সংস্থার সাংগঠনিক কাজে ও খেলার মনোন্নয়নে, মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার 'সন্তোষ ট্রফি' তাঁর স্মরণিক। কলকাতায় আলিপুরে সন্তোষ রোডের প্রাসাদোপম বাসভবনে ১ এপ্রিল, ১৯৩৯ খ্রীঃ মহারাজা মন্মথনাথের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। তাঁর তিন পুত্র, বিনয়েন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ও প্রীতিন্দ্রনাথ এবং চারকন্যা শোভা, আভা, নিভা ও প্রতিভা (অকাল মৃত্যু), তিন পৌত্র—প্রতাপাদিত্য, পৃথ্বীরাজ ও ইন্দ্রজিৎ। এঁদের পুত্র-সন্তান নেই, আছেন দুই কন্যা।

কলকাতায় আলিপুরে রাজা সন্তোষ রোডের রাজবাড়ীর মালিকানা হস্তান্তর হওয়ায়, মন্মথনাথের বংশধররা শহরে অন্যত্র বসবাস করেন। মহারাজা মন্মথনাথের দৌহিত্র সন্তান—প্রথমা কন্যা শোভা দত্তের এক পুত্র রমেন দত্ত ও এক কন্যা ইন্দিরা বসু; দ্বিতীয়া কন্যা আভা বোসের তিন পুত্র—কমল, রঞ্জিৎ ও বীরেন এবং দুই কন্যা—প্রতিমা বসু ও পূর্ণিমা বসু; তৃতীয়া কন্যা নিভারানীর এক কন্যা—অরুণা মজুমদার ও একমাত্র পুত্র, কলকাতার পূর্বতন শেরিফ্ **দিলীপ রায় চৌধুরী**। তাঁর এক পুত্র দিগ্বিজয়, এক কন্যা দেবযানী মুখার্জী, দুই পৌত্র ধ্রুবেন্দ্র ও ধ্রুবজ্যোতি ও পৌত্রী দেবিকারানী। বাস করেন বালিগঞ্জে পি ৪৬৪ কেয়াতলা রোডে।

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী

ধনবাড়ী, ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল মহকুমায় ধনবাড়ী গ্রামের সৈয়দ বংশের জনাব আলি চৌধুরীর পুত্র নবাব নওয়াব আলি চৌধুরীর জন্ম হয় ১৮৬৩ খ্রীঃ তাঁর মাতুলালয়ে নাটোরে। গ্রামের পাঠশালায় ও গৃহশিক্ষক নীলকান্ত রায়ের কাছে পড়াশোনার সূচনা হয়। পরে কলকাতায় সেণ্ট্ জেভিয়ার্স স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। কর্ম-জীবনের প্রথম পর্যায় তিনি দেশ ও সমাজের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হন। ডিসেম্বর, ১৮৯৯ খ্রীঃ জনাব আমীর আলির সভাপতিত্বে কলকাতায় 'আলিগড় শিক্ষা সমিতির' বার্ষিক সভায়, নবাব আলি স্বরচিত প্রবন্ধ 'মুসলমান শিক্ষার অবনতি' পাঠে, শ্রোতাদের যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন এবং তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট স্যার জন্ উডবর্ণ-এর সুনজরে আসেন। নবাব আলি সাহেব 'মুসলমান সাহিত্য সেবক সমিতির' সভাপতি মনোনীত হন। তিনি ১৯০৫-১১ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড কার্জন-এর 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাবকে, মুসলমানদের স্বার্থে সমর্থন করেন।

বাংলার 'শাসন পরিষদের' মনোনীত সদস্য পদে আসীন হন ও পরে ১৯০৭ খ্রীঃ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের নূতন 'ব্যবস্থা পরিষদের' মনোনীত সদস্য হন। ইংরাজ সরকার তাঁর মুসলমান সমাজের কল্যাণ-সাধনে আন্তরীক তৎপরতা ও তাঁর রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ তাঁকে 'নবাব বাহাদুর' উপাধি দেন ১৯১১ খ্রীঃ। প্রাদেশিক শাসন দু'ভাগে বিভক্ত হয়—Reserved Subjects (রক্ষিত বিষয়) ও Transferred Subjects (স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়) ১৯১৯ খ্রীঃ। নবাব আলি Transferred Subjects বিভাগে মন্ত্রী পদে সমাসীন হয়ে প্রায় দু'বছর দেশের জনহিতকর কাজে মনোযোগ দেন, প্রশংসা অর্জন করেন। মার্চ, ১৯২৫ খ্রীঃ 'একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলারের' সদস্য পদে আসীন হন। সাহিত্য-প্রেমী নবাব সাহেবের দুটি বই—'মৌলিদ্ শরীফ্' ও 'ঈদ-উল্-আজ্হা (১৯০০-০৩ খ্রীঃ), মুসলীম্ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। কলকাতার 'মিহির', 'সুধাকর' ও 'প্রচারক' পত্রিকার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বলতেন যে, রাজনীতি তাঁর সাহিত্য সাধনায় ভাটা পড়িয়েছে। সদ্-গুণী সৈয়দ নবাব আলি ইন্তেকাল করেন ১৭ এপ্রিল, ১৯২৭ খ্রীঃ দার্জিলিং-এ।

১। 'আস্রাফ্' নবাব আলি সাহেব মুসলমান ছাত্রদের উচ্চ-শিক্ষার জন্য কলকাতার মাদ্রাসাকে ইউনিভার্সিটি পর্যায় উন্নত করার পক্ষে সওয়াল করলেও, কোন বিশেষ কারণে, তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয় আলিগড়ে 'Mahamedan Anglo Oriental College' (১৮৭৫ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত)-কে উন্নত করার পক্ষে সুপারিশ করায়, বাংলার মুসলমান শিক্ষাবিদরা বিরোধিতা করেন। আলিগড়েই বিশ্ববিদ্যালয় হয়। তিনি ১৯০৬ খ্রীঃ 'ভারতীয় মুসলিম্ লীগে' যোগ দেন।

রাজধানী ঢাকা

(১৬১২—১৯৪৭ খ্রীঃ)

খ্রীষ্টীয় তেরো শতকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম্ আধিপত্যের সূচনা হয়েছিল ১২০৪ খ্রীঃ ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর সময় থেকে। একের পর এক বিভিন্ন বংশের সুলতানদের পৃথক পৃথক অঞ্চলের প্রভুত্ব বজায় ছিল—মোট প্রায় ৩৭২ বছর যাবৎ (১৫৭৬ খ্রীঃ)। পরে মুসলিম্ প্রভুত্বের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয় দিল্লী কেন্দ্রীক শক্তি মোগল সাম্রাজ্যের ছত্রছায়ায়—সম্রাট আকবরের সময়ে। মোগল সম্রাটের প্রতিভূ হোসেন কুলী বেগ (১৫৭৬-৭৮ খ্রীঃ), রাজা মান সিংহ (১৫৮৯, ৯৫-১৬০৬ খ্রীঃ) এবং পরে ইসলাম্ খান চিস্তি (১৬০৮-১৩ খ্রীঃ) সুবে বাংলায় প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন রাজমহল (আকবর নগর) থেকে। বাংলার পাঠান সুলতানদের আমলে ঢাকার বিশেষ গুরুত্ব ছিল বলে মনে হয় না।

ঢাকায় মোগল সুবাদারী

মোগল সুবাদার **ইসলাম্ খান**, মোগল আমলের বাংলার প্রথম রাজধানী রাজমহল (আকবর নগর) থেকে ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগর) স্থানান্তরিত করেন ১৬১২ খ্রীঃ। মোগল সাম্রাজ্যের উত্তরোত্তর বিস্তারের ফলে, উত্তর-পূর্ব বাংলা, সমুদ্র উপকূলবর্তী চট্টগ্রাম ও আরাকানের প্রশাসন এবং পর্তুগীজ উপনিবিষ্ট জলদস্যু দমন প্রভৃতি সামরিক প্রয়োজনে, নৌবাহিনীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই, রাজনৈতিক কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ইসলাম্ খান ছিলেন মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের পালিত ভ্রাতা এবং ঢাকায় বাংলার প্রথম মোগল সুবাদার। তিনি স্বাধীন ও রাজকীয় ঢঙে শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও রণকুশলতার জন্যই, সারা উত্তর ও পূর্ব-বাংলার বিস্তৃত অঞ্চল মোগল সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়েছিল [১]। তিনি ঢাকা শহরের আদি দুর্গ ও ব্যবহার উপযোগী বেশ কয়েকটি ইমারত তৈরী করেন ইসলামপুর ও নবাবপুরে। মারা যান ২১ আগষ্ট, ১৬১৩ খ্রীঃ।

ইসলাম্ খানের পরবর্তী সুবাদাররা—কাশিম খান (১৬১৪—১৭ খ্রীঃ), মহব্‌ত খান (১৬১৭-২৪ খ্রীঃ), মুক্রম খান (১৬২৬ খ্রীঃ), ফিদাই খান (১৬২৭ খ্রীঃ), কাশিম খান

১। 'বারো ভুঞাদের' অন্যতম প্রতাপশালী জমিদার (রাজা)—বিক্রমপুরের চাঁদ রায় ও কেদার রায়, চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র রায় ও বিনোদ রায় এবং ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী ও কজল গাজী সমেত ইসলাম খানের সৈন্যদের প্রবল বাধা দেওয়ার পরই বশ্যতা স্বীকার করেন।

(২) (১৬২৮-৩২ খ্রীঃ), আজম্ খান (১৬৩২-১৬৩৫ খ্রীঃ), ইসমালম্ খান মাস্থদী (১৬৩৫-৩৯ খ্রীঃ)—প্রত্যেকেরই ঢাকায় রাষ্ট্র-শাসনের কেন্দ্রীয় দফতর ছিল।

১৬৩৯ খ্রীঃ শাহজাহান পুত্র শাহজাদা **মহম্মদ সুজা** বাংলার সুবাদার। তিনি পুনরায় বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে রাজমহলে (আকবর নগর) স্থানান্তরিত করেন।[১] প্রায় ২১ বছর পরে (১৬৬০ খ্রীঃ) সুবাদার **মীরজুমলা খান** রাজধানীর কাজ-কর্ম পুনরায় ঢাকাতেই শুরু করেন। তাঁর দরবারে জাহাজ নির্মান-কুশলী মিঃ থমাস্ পাট্, ওলন্দাজ বণিক-গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ইতিহাস স্বীকৃত সুবে বাংলার সুদক্ষ সুবাদার **শায়েস্তা খান**-এর (১৬৬৪-৮৮ খ্রীঃ) শাসন আমলে ঢাকায় তথা সারা বাংলায় মোগল অধিকারের দৃঢ় প্রতিষ্টা ও সর্বাঙ্গীন শান্তি স্থাপিত হয়েছিল। তাঁর দরবারে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসক মিঃ **উইলিয়াম্ হেজেস্** হাজির হয়ে ঢাকায় ইংরাজ বাণিজ্য কুঠীর[২] প্রসারণে সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছিলেন। যদিও সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে শায়েস্তা খান ঢাকাস্থিত ইংরাজ বণিকদের কিছুদিনের জন্য কারারুদ্ধ করেছিলেন। শায়েস্তা খানের পরবর্ত্তী সুবাদাররা যথাক্রমে—বাহাদুর খান, ইব্রাহিম খান ও শাহজাদা আজিমুস্খান (১৬৯৭-১৭১২ খ্রীঃ)। আজিমুস্খান-এর সময় বাংলার দেওয়ান ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও চরিত্রবান পুরুষ **মুর্শিদকুলী খাঁন**। ঢাকায় সুবাদারের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায়, সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অনুমোদনে ১৭০৪ খ্রীঃ মুর্শিদকুলী খান ঢাকা পরিত্যাগ করে মুখসুদাবাদে (পরে মুর্শিদাবাদ), তাঁর দেওয়ানী কাজ-কর্মের সদর স্থানান্তরিত করেন, যদিও সরকারীভাবে মুর্শিদাবাদ বাংলার রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল ১৭১৭ খ্রীঃ। ফলে ঢাকার রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস পেলেও, বাণিজ্যিক কাজকর্ম অটুট ছিল। প্রকৃতপক্ষে নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী খানের সময় থেকে নবাব নাজিম নজম-উদ্-দৌলার সময় (১৭৬৬ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ বছর, ঢাকা প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে মুর্শিদাবাদ দরবারের নিয়ন্ত্রাধীন ছিল।

সিরাজ-উদ্-দৌলার নবাব গদীতে বসার আগে ঢাকায় ডেপুটি নায়েব নাজিম ছিলেন আলিবর্দীর বড় জামাই, (ঘসেটি বেগমের স্বামী) নওয়াজিস্ মহম্মদ। হোসেনকুলী খান তাঁকে সাহায্য করতেন। সিরাজের উদ্যোগে তাঁদের দুজনকেই হত্যা করা হয় নবাবী গদীর দাবীদার হওয়ায়।

১। (ক) History of Muslims of Bengal Vol. 1A, 1B, by Dr. Mahammad Mohar Ali—Saudi Islamic University. (খ) Rahaman Ali—Tarikh-i-Dhaka.

২। ফরাসীদের বাণিজ্য কুঠী ছিল তেজগাঁও-এ, ইসলামপুরে পর্তুগীজদের এবং সঙ্গত:তোলায় ইংরাজদের কুঠী ছিল বর্ত্তমান ঢাকা কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যে। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে সুবাদার কাসিম খান ঢাকা ও হুগলী থেকে পর্তুগীজ বণিকদের বিতাড়িত করেন ১৬৩২ খ্রীঃ।

বিদেশীদের লেখায় ঢাকা

পূর্ব ভারতে বাণিজ্যের মূল-কেন্দ্র ঢাকার গৌরবময় ইতিহাস বিদেশী পর্যটকদের লেখাতেই পাওয়া যায়। ঢাকায় বাণিজ্য কুঠী স্থাপনে অগ্রণীর ভূমিকা ছিল ওলন্দাজ বণিকদের। ১৬৭৬ খ্রীঃ পর্যটক **ট্রেভেনিয়ার বলেছেন**। 'Dacca is a great town extends itself only in length, every one coveting to have a house by the Ganges side, the length of this town is above two leagues……there is but one continuing row of houses built up with bamboo and earth inhabited by carpenters that build galleys and other small vssels……The Hollanders and English have reasonably handsome houses. The Church of the Austin Friars is all of brick'.

ইটালি থেকে আগত পর্যটক **মান্নুচি** ঢাকায় এসেছিলেন আনুঃ ১৬৬০-৬১ খ্রীঃ। তাঁর বিবরণীতে রয়েছে—'The city at Dacca without being strong or large has many habitants, most of it's houses made of straw. There are two factories 'one English and the other Dutch there are many Christians, white and black Portugeese.'

১৬৭৮ খ্রীঃ **ক্যাপ্টেন বোরে**-এর লেখায় আছে—'The city of Dacca is a very large spacious one, but standeth upon low swampy ground. An admirable city for its greatness, for its magnificent buildings and multitude of inhabitants, many elephants, both ware and states are kept continuously by several rich men' ১.

১৭১৩ খ্রীঃ **জেসুইটস্ পাদ্রীরা** ঢাকার সম্বন্ধে প্রায় একই রকম তথ্য পরিবেশন করেছেন। যদিও পর্তুগীজ পর্যটক **র‍্যালফ্ ফিচ্** তাঁর ঢাকার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বলেছেন—'From Bacola I went to Serrepore (Sirpur) which standeth upon the river Ganges: the king is called Choudery (i.e., Chaudhuri). They are all hereabouts rebels against their king 'Zebaldin Echebar (i.e, Jalaluddin Akbar): for here are so many rivers and islands that they flee from one to another, whereby his horsemen cannot prevail against them: Great store of cotton

১। Dacca Gazetters—B. C. Allen, 1912. ঢাকার ইতিহাস—সৈয়দ মুহম্মদ আইয়ুব।

cloth is made here. Sinnergon (i.e., Sonargaon) is a town six leagues forom Serrepore, where there is the best and finest cloth made of cotton in all India. The houses here, as they be in the most parts at India, very little and covered with straw and have a few mats round about the wall, and the door to keep out the tigers and foxes.'

ইংরাজ পর্যটক **মিঃ মনসেরেট্** ঢাকার নদী তীরবর্তী অঞ্চলে বড় বড় নৌকা তৈরীর কারখানা ও শহরে স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পের প্রসার দেখে ছিলেন।

ঢাকায় ইংরাজ প্রভুত্ব

শেষ পর্যন্ত ঢাকা তথা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তৃতি এবং স্থায়িত্ব হয় ইংরাজ বণিকদের আনুকূল্যে।[১] ১৮২৪ খ্রীঃ একটি চুক্তি অনুযায়ী ওলন্দাজরা ইংরাজ বণিকদের কাছে তাঁদের শেষ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি হস্তান্তর করে দেন। মুর্শিদাবাদের নবাবদের সঙ্গে ইংরাজ বণিকদের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় কারণে ছোট বড় সংঘর্ষ ঘটেছিল। এমনকি, কোন এক সময় ঢাকার ও কাশিমবাজারের বাণিজ্য কুঠীগুলি নবাবদের সৈন্য-বাহিনী ধ্বংস করে দেয়। অবশ্য পরে মিটমাট হয়ে গেলে পুনরায় কুঠীগুলি গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ ঢাকায় ১৭৬৩-৬৫ খ্রীঃ **সন্ন্যাসী-ফকিরদের** আক্রমণে ইংরাজদের বাণিজ্য কুঠীগুলি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। সেই সময় ঢাকা কুঠীরের অধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ লেসেস্টার। তিনি নিজের আত্মরক্ষার তাগিদে কুঠী পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। পরে এ-বিষয়ে গভর্নর **রবার্ট ক্লাইভ** ২৯ জানুয়ারী, ১৭৬৬ খ্রীঃ কোন এক সভার কার্য বিবরণীতে কঠোর সমালোচনা করে লিখেছেন—

'The gentleman's (i.e., Mr. Lecester) behaviour at Dacca when abandoned the Factory which commanded a very considerable portion of the company's treasure and merchandise would in all probablity have lost him the service if General Carnac had not prevailed upon Mr. Vansittart to let him soften the penagraph'.

ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হওয়ায় ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর আদিয়াতী যুদ্ধে বিজয় এবং ১২ আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রীঃ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে,

---

১। ঢাকায় ফরাসীদের বাণিজ্য কুঠী ইংরাজদের হাতে আসে ১৭৭৮ খ্রীঃ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ব্যবসায় মন্দা পড়ায় খোদ ইংরাজরা তাঁদের ঢাকায় বাণিজ্য কুঠীগুলিও বন্ধ করে দেন ১৮১৭ খ্রীঃ।

কেবল যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ইংরাজ বণিকদের অপ্রতিহত আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশেষ করে, ব্যবসা জগতে [১] তাঁদের একচেটিয়া সুবিধা-ভোগের সুযোগ এনে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই ঢাকায় ইংরাজ শক্তির বিকাশ ঘটে। [২] সেই সময় ঢাকার **উপ-নবাব নাজিম** ছিলেন **নওয়াজিস্ মহম্মদ**। তাঁর মৃত্যুর পর **জেসরৎ খান**। দীর্ঘ ২২ বছর নাজিমের কর্তব্য সুষ্টভাবেই পালন করে মারা যান ১৭৮৯ খ্রীঃ। ইংরাজ কোম্পানীর প্রতিনিধি (এজেন্ট্) মিঃ সুইংটন্, ঢাকার উপ-নবাব নাজিমের সব ক্ষমতা অধিগ্রহণ করেন। এর পরেও নাম-সর্বস্ব নবাব নাজিম ছিলেন জেসরৎ-এর নাতি হসমৎ জঙ্। মারা যান ১৭৯৬ খ্রীঃ। পরের নবাব—পুত্র নসরৎ জঙ্। মারা যান ১৮২২ খ্রীঃ। এ ছাড়া, ঢাকার বৃত্তিভোগী নবাবদের অন্যতম নবাব ছিলেন সামসদ-দৌলা (১৭৮৫-১৮৩১ খ্রীঃ), পুত্র নবাব জালালুদ্দীন মহম্মদ করিম-উদ্-দৌলা (মৃত্যু ১৮৩৪ খ্রীঃ) এবং তস্য পুত্র নবাব গাজিউদ্দীন হায়দার (অপুত্রক পাগলা নবাব)। তাঁর মৃত্যু হয় ১৮৪৩ খ্রীঃ এবং ঢাকায় মুর্শিদাবাদ জমানার নবাব পদের অবসান হয়। এক খেতাবী নবাব বংশের সূচনা নয়।

রাজধানী ঢাকার ইতিহাসের উপসংহারে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৮২৭-৩১ খ্রীঃ তিতুমীরের কৃষক আন্দোলন, ১৮৫৭ খ্রীঃ **সিপাহী বিদ্রোহের** আগুন, ১৮৬৩-৭০ খ্রীঃ ওহাবী আন্দোলন, ১৯০৫-১১ খ্রীঃ **বঙ্গভঙ্গ** প্রতিরোধে **আন্দোলন**, ১৯০৫-০৯ খ্রীঃ বেআইনী **অনুশীলন সমিতির** [৩] পরাধীনতার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম, ১৯৪২ খ্রীঃ **'ভারত ছাড়' জোরদার** অহিংস **আন্দোলন**, ১৯৪৬ খ্রীঃ হিন্দু-মুসলমান **সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা**, ১৯৪৭ খ্রীঃ দেশ বিভাগ ও **পূর্ব-পাকিস্থানের জন্ম**, আর তাঁর সঙ্গে ঢাকার হৃত-গৌরব 'রাজধানী'র পূর্ণ-মর্যাদা ফিরে পাওয়া এবং ১৯৭১ খ্রীঃ বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ ও বাঙালীর **'বাংলাদেশ'** প্রতিষ্ঠা। এই সব গর্বোজ্জ্বল ঘটনা ঢাকার ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

১। ঢাকা মসলীন ও কার্পাস ইউরোপীয় ভূখণ্ডে বিশেষ সমাদৃত ছিল। আঠারো শতকের শেষভাগে ঢাকা থেকে বছরে মসলীন্ রপ্তানী হত ৮০ লক্ষ টাকার মত।

২। রবার্ট ক্লাইভের ইচ্ছায় পলাশী যুদ্ধের পরে মীরজাফরের নবাবী আমলে (১৭৫৭-৬০ খ্রীঃ), মহারাজা রাজবল্লভ সুবে বাংলার দেওয়ান হন ও তাঁর পুত্র রাজা কৃষ্ণদাস ঢাকার শাসন কার্যালয়ে উচ্চপদে আসীন হন। পরে কুখ্যাত মহম্মদ রেজা খান দেওয়ান হন ১৭৬৫-৭২ খ্রীঃ। দেওয়ানী লাভের পর 'হুজারী' ও 'নিজামত' ঢাকায় থেকে যায় এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রতিযোগিতা ঢাকায় সম্পন্ন হতে থাকে। ১৭৭৮ খ্রীঃ ম্যাজিস্ট্রেট্, কলেক্টর ও জজ্ ঢাকা প্রশাসনের অধীনে নিযুক্ত হন।

৩। 'অনুশীলন সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতায় ১৯০১-২ খ্রীঃ।

ঢাকায় পুরাকীর্তি

ঢাকা নামের উৎপত্তির বিষয়ে অনেক মত আছে। সবচেয়ে স্বীকৃত—বিক্রমপুরের রাজা বল্লাল সেন প্রতিষ্ঠিত ঢাকেশ্বরী দেবীর (লুকায়িত দেবী) নামানুসারে। ১৬১২ খ্রীঃ ঢাকা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বৃহৎ বাংলার রাজধানী হওয়ায়, স্থাপত্যের প্রসার ঘটে। বর্তমান সেণ্ট্রাল জেলই ছিল মোগল আমলে শহরের কেন্দ্রস্থল। গত প্রায় চারশো বছরের মধ্যে তৈরী স্থাপত্য কীর্তির পুরাবৃত্তি অতি সংক্ষেপে বলা হল—

প্রথমেই ঢাকার সুবৃহৎ **'বড় কাটরা'র** কথায় আসা যাক। বহিরাগত সওদাগর, পর্যটক ও দেশীয় ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী আবাসের জন্য, সম্রাট শাহজাহানের পুত্র বাংলার সুবাদার নাজিম শাহজাদা মহম্মদ সুজা ১৬৪৫ খ্রীঃ এই পান্থাবাসটির তৈরীর কাজ শুরু করেন, যদিও সেই সময় তাঁর রাজধানী ছিল রাজমহলে (আকবরনগর)। ইমারতটি কখনো সম্পূর্ণ করা যায়নি, যদিও ১৬৬৪ খ্রীঃ মীর আবদুল কাশিম 'কাটরার' উল্লেখযোগ্য সংযোজন করেছিলেন। এই একই কারণে **'ছোট কাটরা'** তৈরী করেন দক্ষ সুবাদার নাজিম সায়েস্তা খান ১৬৭৮ খ্রীঃ। কিন্তু তাঁর দু'দফায় প্রায় ২৪ বছর (১৬৬৪-৮৮ খ্রীঃ) সুবাদরীতে থাকা সত্ত্বেও, কেন যে এই ইমারতটি সম্পূর্ণ করা হয়নি, তা জানা যায় না।

লালবাগ দুর্গ-প্রাসাদ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছিল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা মহম্মদ আজম্-এর সময়ে ১৬৭৮ খ্রীঃ, কিন্তু অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। সম্রাট ঔরঙ্গজেব এই কেল্লাটিকে নবাব সায়েস্তা খানকে দান করেছিলেন। ইংরাজ সরকার একবার এটির সংস্কার করেছিলেন। শাহজাদার অপর একটি কীর্তি হল ঢাকার **ইমামবাড়া**। ১২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে এটির যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল। কাল বিলম্ব না করে ঢাকার নবাব স্যার আহসান্ উল্লহ বাহাদুর এটির যথাযথ সংস্কার করেন। কেল্লার অভ্যন্তরে সুবাদার নাজিম সায়েস্তা খানের কন্যা **বিবি পেরীর সুদৃশ্য সমাধিটি** ছাড়া, শাহজাদা আজম্-এর তৈরী (১৭০৭ খ্রীঃ) তিন গম্বুজ বিশিষ্ট **মসজিদটিতে** এখনও নৈমিত্তিক আজান দেওয়া ও নামাজ আদায় করা হয়। সুবৃহৎ দু'তলা ইমারত **'হোসেন দালান'** তৈরী করেন মীর মুরাদ। এখানে এখনও পবিত্র 'মোহরম' সমারোহে মেলা বসে। ঢাকা 'চকের' পশ্চিম-প্রান্তে অবস্থিত প্রাচীন সাত গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি সুবাদার সায়েস্তা খানের সময়কালে তৈরী। ঢাকার শহরতলি 'টঙ্গি' উপবনে ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্য কুটীরের ভগ্নাবশেষ এখন দেখা যায়।

ঢাকার শেষ নবাব বংশের সুবৃহৎ প্রাসাদ **'আহসান্ মঞ্জিল'** তৈরী হয়েছিল ফরাসগঞ্জে ফরাসী কারখানার জমির উপর। নবাব আবদুল গনির পিতা খাজা আলিম উল্লাহ জমি খরিদ করেন ১৮৩৫ খ্রীঃ। নবাব আবদুল গনি প্রাসাদ তৈরী করেন ১৮৭২ খ্রীঃ। নিজ পুত্রের নামানুসারে নাম হয় 'আহসান্ মঞ্জিল'।

ঢাকার শেষ নবাব বংশ

নবাব স্যার খাজা আবদুল গনি মিয়া

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শুরুতে মোগল সাম্রাজ্যের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বহু ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী মানুষ, দিল্লী ছেড়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত-রাজ্যে চলে আসেন ধনোপার্জনের তাগিদে। **খাজা আবদুল হাকিম**-এর সঙ্গে কাশ্মিরী **মৌলবী আবদুল্লা**, এসেছিলেন সিলেটে নবাব আলিবর্দীর শাসনকালে ১৭৪১ খ্রীঃ। ব্যবসায় উন্নতির ফলে বিত্তশালী জমিদার হয়েছিলেন আবদুল হাকিম্। তাঁর মৃত্যুর পর (আনুঃ ১৭৯৬.খ্রীঃ), পুত্র **খাজা আলিম উল্লাহ্** তাঁদের ব্যবসা (চামড়া ও সোন) বড় শহর ঢাকায় বেগমবাজার অঞ্চলে সরিয়ে আনেন। অল্প সময়ের মধ্যে দক্ষ ব্যবসায়ী আলিম উল্লাহ্ মিয়া ঢাকায় প্রতিপত্তি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে নিজের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। ঢাকায় পুরানো নবাব বংশধরদের [১] সমাজে মান-মর্যাদা কিছুটা বজায় থাকলেও, আর্থিক দুরাবস্থার দায়ে তাঁদের গুরুত্ব লোপ পায়। খাজা আলিম উল্লাহ্ সাহেব বিখ্যাত 'দরিয়া-ই-নূর' হীরকখণ্ডটি কিনেছিলেন ৬০,০০০ টাকায়। কলকাতায় ইউরোপীয় সমাজে ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায়, পূর্ব বঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতির জন্য যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি মারা যান ১৮৪৮ খ্রীঃ তাঁর আঠারো বছরের সুযোগ্য পুত্র ভাবী নবাব আব্দুল গনিকে রেখে। ঢাকায় এক **নূতন খেতাবী নবাব বংশের** [২] সূচনা হয়।

নবাব স্যার খাজা **আবদুল গনি মিয়ার** [৩] জন্ম হয় ১৮৩০ খ্রীঃ (ভিন্নমতে, ১৮১৩)। ধনী জমিদারের উত্তরাধিকারী আবদুল গনি কৈশরেই দায়িত্বের সঙ্গে ব্যবসা ও বিষয়-সম্পত্তির সামাল দেন। একাধিক ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় সহায়ক বা উপদেষ্টা, তাঁকে

১। 'রাজধানী ঢাকা' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। 'The city of Dacca is so intimately associated with its Nowabs that no account is complete without some reference to the history of the family of the Nowab of Dacca. This family has no connection with old Muhammadan rulers of the province, but is descendant from Kaja Abdul Hakim who was governor of Kashmir during the reign of Mugal emperor Muhammad Shah (1719-48 A. D.). He moved to Delhi, but had to leave Delhi when Nadir Saha (1739 A.D.) sacked Delhi, he fled to Bengal—' 'Dacca Manual'. এই উক্তিটি সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

৩। 'চিত্ররাজি পরিচয়' দ্রষ্টব্য।

সব সময়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর রাজভক্তির পরিচয় পাওয়া যায় ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় তাঁর সক্রিয় ভূমিকায়। তিনি বিদ্রোহী সিপাহীদের নিরস্ত্রীকরণে ও দল ভাঙ্গানোর কাজে ইংরাজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন।

সুদর্শন, বলিষ্ঠদেহী ও বিত্তশালী নবাবের অনাড়ম্বর জীবন সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে শ্রদ্ধার্জন করেছিল। এমনকি, নিজে গোঁড়া 'সুন্নী' মুসলমান হয়েও, 'সিয়া' সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রভাব (১৮৬৯ খ্রীঃ সিয়া-সুন্নী দাঙ্গায় মধ্যস্থ) ছিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থে ১, তাঁর একান্ত দান ও সম্পূরক সরকারী অনুদানের সাহায্যে, ঢাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছিল ১৮৭৮ খ্রীঃ। 'ওয়াটার ওয়ার্কস্'-এর ভিত্তি-স্থাপন করেছিলেন ভারতের ভাইসরয় লর্ড নর্থব্রুক্ ৫ এপ্রিল, ১৮৭৪ খ্রীঃ, বাংলার ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পেলের উপস্থিতিতে। তা ছাড়া, রাস্তাঘাট, পুরানো মসজিদ সংস্কার ও ছাত্র-বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, বঙ্গীয় রাজ্য সভার (১৮৬৬ খ্রীঃ) ও পরের বছর ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য। তিনি বিশ্বাস করতেন, মহল্লা বা গ্রাম্য-প্রধানদের মধ্যস্থতায় সমাজের সব রকম অপরাধের বিচার সম্ভব। তাঁরই প্রচেষ্টায় ও উদ্যমে ঢাকা শহরে মহল্লায় মহল্লায় **পঞ্চায়েতী প্রথা**-র প্রবর্তন হয়েছিল। অবশ্যই সর্বোচ্চ আদালত ছিল, তাঁর 'আহসন্ মঞ্জিলের' দরবার-কক্ষ। ঢাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের তৎকালীন মুখ্যমঞ্চ (প্ল্যাট্‌ফরম্) 'ঢাকা মহামেডান ফ্রেণ্ডস্ অ্যাসোসিয়েশন'-এর জন্ম হয় ১৮৮২ খ্রীঃ নবাব গনি খানের পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁর বিভিন্ন সৎকার্য, মুক্তহস্তে দান ও রাজভক্তির পুরস্কার-স্বরূপ, ইংরাজ সরকার তাঁকে 'কম্পানিয়ন্-অফ্-দি-অর্ডার-অফ্-দি-স্টার-অফ্-ইণ্ডিয়া' (১৮ ডিসেম্বর, ১৮৭১ খ্রীঃ), ১৮৭৫ খ্রীঃ 'নবাব বাহাদুর' এবং ১৮৮৮ খ্রীঃ ঢাকায় এক দরবারে বড়লাট লর্ড ডাফ্‌রিন্ তাঁকে 'কে. সি. এস. আই' খেতাব দেন। প্রচুর যশ, খ্যাতি ও সম্মান নিয়ে ১৮৯৬ খ্রীঃ ইন্তকাল করেন একমাত্র পুত্র নবাব স্যার খাজা আহসান্-উল্লাহকে উত্তরাধিকারী করে। 'আহসান্ মঞ্জিল' ছাড়া নবাবদের প্রমোদ কানন 'দিলখুসা' ও 'শাহবাগ' তাঁর সময়ের দর্শনযোগ্য স্থান হিসাবে গণ্য করা হত।

১। রফিউদ্দিন আহম্মদ 'Bengal Muslims'-এ লিখেছেন 'In 1872 Nawab Abdul Ghani wanted a seperate school, college, even university for Muslims against undesirable Hindu influence as majorities of the teachers and pupils were Hindus. But Mr. J. Sutcliff, the principal of the Calcutta Madrassa questioned the practibility of establishing Denominational institution...... He had very little direct contact with local population until the assendancy of Khawaja Sir Salimullah'. Madrassa was founded by Hastings in 1781.

নবাব স্যার খাজা আহসান্ উল্লাহ বাহাদুর

নবাব আবদুল গনি মিয়ার একমাত্র পুত্র নবাবজাদা আহসান্ উল্লাহ-এর [১] জন্ম হয় ২২ আগস্ট, ১৮৪৬ খ্রীঃ। গৃহ-শিক্ষকের কাছে প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করে, পৈতৃক সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন ১৮৬৮ খ্রীঃ। তাঁর দানশীলতার জন্য ঢাকার মানুষ তাঁকে এখনও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে থাকেন। নবাবের আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি উর্দু কাব্য-জগতে 'শাহীন' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর বহু দানের মধ্যে —ঢাকায় মিটফোর্ড হাসপাতাল, ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলের জন্য ২ লক্ষ টাকা ও ঢাকায় বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থার জন্য ৪ লক্ষ টাকা—বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে।

১২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ঢাকার প্রাচীন ইমাম্‌বাড়ার যথেষ্ট ক্ষতি হয়। নবাব আহসান্ উল্লাহ স্বপ্রবৃত্ত হয়ে নিজ ব্যয়ে ইমাম্‌বাড়ার যথোচিত সংস্কার করেন। ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার হিসাবে বহুদিন যুক্ত থাকায়, ঢাকা শহরের বেশ কিছু উন্নতি-মূলক কাজের সূচনা সম্ভবপর হয়েছিল। বংশগত 'নবাব' হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর জনহিতকর কাজ ও সরকারের প্রতি আনুগত্য ও সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসাবে, ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ তাঁকে ব্যক্তিগত 'সি-আই-ই' ১৮৯১ খ্রীঃ, 'কে. সি. আই. ই.' ও ১৮৯৮ খ্রীঃ 'নবাব' উপাধি দেওয়া হয়। তিনি ছিলেন ঢাকার অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট্ এবং একাধিকবার কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য। সুদক্ষ অশ্বারোহী ও ক্রীড়ামোদী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। তাঁর কর্ম-জীবনের অবসান হয় ১৫ ডিসেম্বর, ১৯০১ খ্রীঃ। তাঁর দুই পুত্র নবাব সলিম উল্লাহ ও খাজা আতিক উল্লাহ।

নবাব স্যার খাজা সলিম উল্লাহ বাহাদুর

নবাবজাদা সলিম উল্লাহ-এর জন্ম হয় ১৮৭২ খ্রীঃ। তিনি ছোট-বেলা থেকেই নবাবী আভিজাত্য ছেড়ে, জনসাধারণের সঙ্গে আন্তরিকতার সঙ্গে মেলামেশা করতেন। স্বাভাবিক কারণে মুসলমান ভায়েদের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়েছিলেন। শিক্ষালাভের পর সরকারী পদে (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্) যোগ দেন। চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর আহ্বানে ১৯০৬ খ্রীঃ ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ 'নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা কন্‌ফারেন্স'-এ মিলিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল **'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'** নামে একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তাঁর শাহবাগ বাগান-বাড়ীতে ৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬ খ্রীঃ। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভাজন শুরু হয়। পরে ১৯৪৬ খ্রীঃ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার ফলশ্রুতি-স্বরূপ ১৯৪৭ খ্রীঃ

১। 'চিত্ররাজি পরিচয়' দ্রষ্টব্য। ঢাকায় আহসান্ উল্লাহ রোড তাঁর স্মরণিক।

পাকিস্তান এবং ভারত (ইণ্ডিয়া)—দুটি পৃথক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। 'মুসলিম্ লীগের' জন্মের উদ্দেশ্য ও কামনা সম্পূর্ণ হয়।

নবাব সলিম উল্লাহ [১] ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু ও বিদ্যোৎসাহী। শিক্ষা দীক্ষায় পশ্চাদ্‌পদ মুসলিমদের উন্নতির জন্য তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁর অক্ষয়-কীর্তি বহন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম ছাত্র-নিবাস, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, মুসলিম্ এতিমখানা ও 'ব্যক্‌ল্যাণ্ড বাঁধ'। ১৯০৫-১১ খ্রীঃ 'বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন'-এ সরকারের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বার্থ-সিদ্ধি হয়নি। তাঁর স্বপ্ন 'মুসলিম রাজ্য' ধূলিস্মাৎ হওয়ায়, ক্ষোভে দুঃখে মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯১৬ খ্রীঃ মাত্র ৪৪ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। বংশগত খেতাবী নবাব স্যার সলিম উল্লাহ ১৯০৮ খ্রীঃ 'কে. সি. এস. আই.' ও ১৯১১ খ্রীঃ 'জি. সি. আই. ই.' খেতাব পান। কলকাতায় ১৯১১ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর রাজ্যাভিষেক দরবারে উপস্থিত ছিলেন।

নবাব অতিক্ উল্লাহ বাহাদুর

নবাব আহসান্ উল্লাহের দ্বিতীয় পুত্র ও নবাব সলিম উল্লাহের ছোট ভাই নবাব অতিক্ উল্লাহ জানদরদী ও পরোপকারী মানুষ ছিলেন। জন্ম হয় ঢাকায় ১৮৮১ খ্রীঃ। তিনি খেলাধূলার উন্নয়নের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। দরাজ দিলের অধিকারী নবাব অতিক্ উল্লাহ দান-খয়রাতে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি 'দিল্‌খুসাবাগ'-এ বাস করতেন। তাই তাকে 'দিল্‌খুসাবাগের নবাব' বলা হত। ১৯০৬ খ্রীঃ জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনের সময়ে, (দাদাভাই নারোজীর সভাপতিত্বে) নবাব অতিক্ উল্লাহ কংগ্রেসীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন।

নবাব হাবীব উল্লাহ বাহাদুর

নবাব স্যার সলিম উল্লাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হাবীব উল্লাহ ঢাকার নবাব হন। তিনি পূর্ব-পুরুষদের মত বিচক্ষণ ও সুচতুর রাজনীতিবিদ্ ছিলেন না। ঢাকাবাসী তথা পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা তাঁর প্রতি অকারণে বিরূপ ভাবাপন্ন হয়েছিলেন—'মুসলিম্ লীগ' পরিত্যাগ করে তিনি 'শেরে বাংলা' এ. কে. ফজলুল হকের 'কৃষক-প্রজা পার্টিতে' যোগদান করায়। তিনি প্রায় ২৪ জন মহিলাকে বিবাহ করেন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধা হারান। নবাব পরিবারের আর কারো মধ্যে এমন ঘটনা শোনা যায়নি।

১। 'চিত্ররাজি পরিচয়' দ্রষ্টব্য। ঢাকায় সলিম উল্লাহ রোড তাঁর স্মরণিক।

নবাব হাবীব উল্লাহ ১৯১৪ খ্রীঃ প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীঃ তিনি বাংলায় ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে নবাব সাহেব অতি অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ছিলেন। তিনি ঢাকার বাইশ পঞ্চায়েতের সভাপতি ছিলেন। বিচার কার্যে তাঁর নিরপেক্ষতার জন্য প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। তাঁর আমল থেকেই 'আহসান্ মঞ্জিল' দরবার কক্ষের শান্-শ-ওকতে ভাটা পড়তে শুরু করে। 'মঞ্জিল' ছেড়ে শাহবাগে বাস করতেন। হাবীব উল্লাহ রোড তাঁর স্মরণিক।

নবাব হাসান্ আশ্‌কারী বাহাদুর

নবাব হাবীব উল্লাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসান্ আশ্‌কারী সৈন্য বিভাগের 'মেজর' পদে ইস্তফা দিয়ে ঢাকার নবাব গদীতে বসেন। তিনি বাস করতেন শাহবাগে 'টুইন্ হাউস' নামে এক বাড়ীতে। তিনি আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সৎচরিত্রের অধিকারী নবাব আশ্‌কারী 'মুসলিম্ লীগের' একনিষ্ঠ কর্মী। **জেনারেল আইয়ুবের** আমলে তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি দেশ ত্যাগ করে পাকিস্থানে 'হিজরত' করেছেন। ১৯৭২ খ্রীঃ ঢাকার নবাব বাড়ীর চিরকালীন অবসান হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বংশের সন্তান স্যার খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও পরে ১৯৫১ খ্রীঃ প্রধান মন্ত্রী হয়ে ছিলেন। ঐতিহাসিকদের অভিমত যে, ঢাকার নবাবরা বাংলা তথা অবিভক্ত ভারতের মুসলিম্ জাগরণের গৌরবময় অধ্যায় সৃষ্টি করে গেছেন। তৎকালীন হীনবল মুসলিম্ সমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়ণ ও চেতনা-বোধ জাগাতে ঢাকার নবাব পরিবারের অবদান স্বীকার করতেই হয়।

নবাব খাজা ইউসুফ্ জান্ বাহাদুর

ঢাকার নবাব স্যার খাজা আবদুল গনি মিয়ার বংশজাত না হলেও, নিকট আত্মীয়। নবাব ইউসুফ্ জানের পিতৃপুরুষ খাজা খয়রুল্লাহ কাশ্মীর থেকে প্রথমে পাটনা ও পরে ঢাকায় এসেছিলেন। খাজা ইউসুফের পিতা, নবাব খাজা অহসান্ উল্লার বোনকে বিবাহ করেন। খাজা ইউসুফ্ ঢাকা জেলা বোর্ডের নির্বাচিত ভাইস্ চেয়ারম্যান্ ছিলেন ১৮৯৭ খ্রীঃ। পৌর সভার চেয়ারম্যান্ হন ১৮৯৯ খ্রীঃ ৬ বছরের জন্য। তাঁর উদ্যোগে ১৯১২ খ্রীঃ ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম 'সুয়্যারেজ' লাইন স্থাপনের প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেন। তা ছাড়া, তিনি দীর্ঘ আঠাশ বছর অনারারী মেজিস্ট্রেট পদে বহাল ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ 'খান বাহাদুর' ও ১৯১০ খ্রীঃ 'নবাব' উপাধি পান। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে একজন দক্ষ শিকারী ছিলেন। ১৯২৩ খ্রীঃ সম্মান ও যশ নিয়ে ইন্তেকাল করেন। ঢাকায় ইউসুফ্ রোড ও ইউসুফ্ বাজার তাঁর স্মরণিক।

মহারাজা রাজবল্লভ সেন রায়-রাইয়াঁ

রাজনগর, ঢাকা

আঠারো শতকের **প্রথম দশকে** ইংরাজ বণিকদের প্রতিষ্ঠা ও নবাবশাহি আমলের পতনের সন্ধিক্ষণে, পূর্ব-বঙ্গের রাজনৈতিক পটভূমিতে উজ্জ্বল নাম মহারাজা **রাজবল্লভ** রায় রাইয়াঁ। কীর্তিনাশা (পদ্মা) নদীর দক্ষিণে ঢাকা জেলায় বলদরেনীয়া (পরে রাজনগর) গ্রামের **কৃষ্ণজীবন সেন** নবাবের অধীনে কর্মরত থাকায় 'মজুমদার' খেতাব পেয়েছিলেন। তার **তৃতীয় পুত্র রাজবল্লভ** ১ আনু: ১৭০৭ খ্রী: (ভিন্নমতে ১৬৯৮ খ্রী:) ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। রাজবল্লভের ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি থাকায়, ঢাকায় নবাব সুজাউদ্দীন খানের (১৭২৭-৩৯ খ্রী:) নৌ-সেনাপতির দপ্তরে তিনি কেরানী হিসাবে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন ১৭২৯ খ্রী:। সেই সময় রাজবল্লভ ঢাকায় ও কাশিমবাজারে ওলন্দাজ বণিকদের **উকিল** হিসাবে, তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়ে বিশেষ সুযোগ সুবিধা নবাব দরবার থেকে পাইয়ে দেন, নিজেও যথেষ্ট লাভবান হন।

আপন দক্ষতায় প্রধান কেরানী বা 'পেশ্‌কার' পদে উন্নীত হন, পরে নওয়ারা নৌবহর বিভাগের অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। ঢাকায় তাঁর জমিদারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল রাজনগর। নবাব আলিবর্দীর (১৭৪০-৫৬ খ্রী:) সময়ে মুর্শিদাবাদে চলে আসেন এবং নবাব দরবারে 'বকশী' পদে বহাল হন। রাজা রাজবল্লভ নবাব আলিবর্দীর প্রথমা কন্যা **ঘসেটি বেগম** (ঢাকার নায়েব সুবাদার নওয়াজিস্ মহম্মদ-এর বিধবা বেগম) ও হুসেন কুলী খনের বিশেষ অনুগত ব্যক্তি হয়ে নিজের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পান। ১৭৫৬ খ্রী: নবাব **সিরাজ-উদ্‌দৌলার** অধীনে কিছুদিনের জন্য 'খালসার' ক্ষুদ্রাধিকারী পদে আসীন ছিলেন। রাজবল্লভকে নবাব সিরাজ তার নবাবী গদীর লড়াইয়ে, তাঁর মাসী ঘসেটি বেগম-এর পক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের অন্যতম বলে গণ্য করতেন। নবাব সিরাজ সরকারী রাজস্ব আত্মসাৎ করার অভিযোগে, তাঁকে মুর্শিদাবাদে আটক করে রেখেছিলেন। মার্চ, ১৭৫৬ খ্রী: তাঁর বাসভূমি রাজনগরে (ঢাকায়) সৈন্য পাঠিয়ে ছিলেন সব ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনের অভিপ্রায়ে। কিন্তু রাজবল্লভের পুত্র **কৃষ্ণদাস** আগেই খবর পেয়ে, 'ধনরাশি' সঙ্গে নিয়ে কাশী যাত্রার নাম করে নৌকা যোগে কলকাতায় পৌঁছে, ইংরাজ কোম্পানীর গভর্নর ড্রেক্ সাহেবকে ঘুষ দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গে আশ্রয় নেন। অতিশয় রাগান্বিত হয়ে সিরাজ ইংরাজ কোম্পানীকে কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে ফেরৎ পাঠাবার এবং দুর্গ নির্মাণ

১। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার—মহারাজা রাজবল্লভ। রসিকলাল গুপ্ত—মহারাজা রাজবল্লভ সেন।

ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ বন্ধ করার আদেশ দেন। কিন্তু হুকুম অমান্য করায়, সিরাজ ২০ জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ কলকাতা শহর ও দুর্গ অবরোধ করেন। তাঁর সৈন্যরা কলকাতায় হত্যা ও লুণ্ঠন চালায়। অবশ্য ইংরাজরা ছলে-বলে এর প্রতিশোধ নিয়েছিল পলাশী যুদ্ধে।

সিরাজ-উদ্-দৌলার ক্রমবর্ধমান উদ্ধত্য, দাম্ভিকতা ও যাবতীয় কু-প্রবৃত্তি কেবল যে রাজা রাজবল্লভকে তাঁর বিরুদ্ধে ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিল তা নয়, কেবল মোহনলাল ও মীরমদন ছাড়া, প্রায় সব আমত্য ও জমিদাররা সিরাজকে গদীচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। পরিণতিতে পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীন বাংলার যুগ শেষ হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ লর্ড ক্লাইভ সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে বৃত্তি-ভোগী করে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকার আদায় করে নেন। এই সময় সঙ্গত কারণে মহারাজা রাজবল্লভ লর্ড ক্লাইভের রাজস্ব ব্যবস্থা 'দ্বৈত-শাসন' কার্যকরী করার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। লর্ড ক্লাইভের আনুকূল্যে নবাব মীরজাফর (১৭৫৭—৬০ খ্রীঃ) রাজা রাজবল্লভকে সুবে বাংলার দেওয়ানের পদে ২৯ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ ও তাঁর পুত্র **রাজা কৃষ্ণদাসকে** ঢাকার শাসন কার্যে নিযুক্ত করেন।

১৭৬০ খ্রীঃ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম্ বাংলা আক্রমন করলে, নবাব মীরজাফর ইংরাজদের সাহায্যে সম্রাটের সৈন্যদের বিতাড়িত করেন। এই যুদ্ধে রাজবল্লভ সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং কূট-নৈতিক-চালে সম্রাটকে রাজস্ব দিয়ে দেবার জন্য মীরজাফরকে উপদেশ দেন। সম্রাট শাহ্ আলম্ রাজবল্লভের বন্ধুভাবাপন্ন কাজের স্বীকৃতি হিসাবে একটি কলম, তলোয়ার উপহার দিয়ে মহারাজা রাজবল্লভকে 'রায় রাইয়াঁ' 'সর্দার-জঙ্গ বাহাদুর' উপাধি দেন। মুঙ্গেরের সুবাদারীর পদও তিনি প্রাপ্ত হন। নবাব মীরজাফর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা রামদাসকে ঢাকার দেওয়ান, **কৃষ্ণদাসকে** 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দিয়ে মুর্শিদাবাদে তাঁর উপদেষ্টার পদে আর তৃতীয় পুত্র **গঙ্গাদাসকে** 'রাজা' উপাধি দিয়ে পাটনার শাসন-কর্তা নিযুক্ত করেন।

মহারাজা রাজবল্লভ ইংরাজ কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের খুব ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, নবাব মীরকাশিম সঙ্গত কারণে তাঁকে শত্রু-পক্ষের চর হিসাবে গণ্য করতেন। ১৭৬৩ খ্রীঃ নবাব মীরকাশিম মহারাজা রাজবল্লভ ও তাঁর পুত্র রাজা কৃষ্ণদাসকে মুঙ্গেরে বন্দী করেন। পরে (সেপ্টেম্বর, ১৭৬৩ খ্রীঃ) দু'জনকেই ভাগীরথীতে নিক্ষেপ করে হত্যার দ্বারা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করেন।

মহারাজা রাজবল্লভ বাংলার বৈদ্য-সমাজের একজন প্রতিষ্ঠিত সমাজপতি। সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়ে সমাজ-ভুক্ত বৈদ্যদের (বঙ্গজ, বারেন্দ্র, পূর্বকুল) উপবীত

ধারণের অধিকার [১] ও হিন্দু বিধবার পুর্নবিবাহের প্রথা চালু করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁকে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, বিশেষ করে নদীয়ার **মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের** ঘরোতর আপত্তির জন্য। তা সত্ত্বেও মহারাজা রাজবল্লভের সঙ্গে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, তার পরিচয় পাই—মুর্শিদাবাদে মহারাজা রাজবল্লভ আহুত এক রাজ-সভায় দুই রাজপুরুষের উপস্থিতিতে, রাজ-সভায় পঠিত একটি শ্লোকে—

'নদীয়ার কৃষ্ণচন্দ্র ভূপতি প্রধান
পেয়েছিল হস্তচালে শ্লোকের প্রমাণ
পুর্ব্বে রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভ:।'

মহারাজা রাজবল্লভ সেন [২] নবাব ও ইংরাজ রাজকর্মচারীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হওয়ায়, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দাম্ভিক্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর ব্যবহারে। তিনি যোগ্য ব্যক্তিদের উপযুক্ত সম্মান দিতেন না। রাজস্ব ঠিক সময় সরকারী কোষাগারে জমা না দেওয়ার জন্য, তিনি বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাটোর এবং আরও কয়েকটি বড় জমিদারদের বন্দী করার হুমকি দিয়েছিলেন।

ঢাকায় তাঁর কর্মক্ষেত্র রাজনগরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিশাল প্রাসাদ ও বহু দেবালয়—সবই পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। মুর্শিদাবাদে ভাগীরথীর এক প্রান্তে 'ডাহাপাড়া' গ্রামে ভগ্নদশা-প্রাপ্ত বিখ্যাত কিরীটেশ্বরী মন্দিরের উত্তরাংশে রাজা রাজবল্লভের তৈরী "রাজবল্লভেশ্বর" শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-দিবসে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজা রাজবল্লভের চার রানী—জেষ্ঠ্যা রানী শশিমুখীর গর্ভে সাত সন্তান ও এক কন্যা জন্মায়। সাত পুত্র যথাক্রমে—রাজা রামদাস (ঢাকার দেওয়ান), রাজা কৃষ্ণদাস, রাজা গঙ্গাদাস, কুমার রায় রতনকৃষ্ণ, কুমার রায় গোপালকৃষ্ণ, কুমার রায় রাধামোহন, ও কুমার রায় কেবলরাম।

রাজা কৃষ্ণদাসের চার পুত্র—রাজকৃষ্ণ, প্রাণকৃষ্ণ, হৃদয়কৃষ্ণ ও রমনকৃষ্ণ। ইংরাজ সরকার প্রত্যেককেই সামান্য বৃত্তি দিয়েছিলেন। পরে ১৮৩২ খ্রীঃ থেকে ১৯১০ খ্রীঃ পর্যন্ত এঁদের সব পৌত্রেরা মাসোহারা পেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত বংশজ রাজকুমার সেন মাসিক ১২ টাঃ ৫০ পঃ বৃত্তি পেয়েছেন।

১। এ বিষয়ে সভা ও সমিতিতে পণ্ডিত-প্রবর জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন একাধিকবার উপস্থিত হ'য়ে বিরোধিতা করেছিলেন।

২। নবাবশাহি আমলে একটি বিরল দৃষ্টান্ত—একই নামে দুই রাজপুরুষ—মহারাজা রাজবল্লভ সেন ও রাজা রাজবল্লভ সোম। একজন জাতিতে বৈদ্য ও অপরজন কায়স্থ। একজন ঢাকার অপরজন কলকাতার। দুজনেরই কর্মক্ষেত্র ছিল মুর্শিদাবাদে। দুটি পৃথক পরিচ্ছেদে দু'জনেরই ইতিবৃত্ত দেওয়া হয়েছে।

ভাওয়ালের রায় রাজপরিবার

ঢাকা

মোগল সম্রাট আকবর—জাহাঙ্গীরের সৈন্যদের সঙ্গে বাংলার 'বারোভুঞা'দের [১] সংঘর্ষের ইতিহাসে (১৬০৬-১৩ খ্রীঃ) ভাওয়ালের মুসলমান জমিদার বাহাদুর গাজী ও রাজা ফজল গাজীর নাম অবিস্মরণীয়। গাজী বংশের উত্তরাধিকারীদের অব্যবস্থাপনার জন্য জমিদারীর ভার দেওয়া হয় তাঁদের দেওয়ান—বলরাম ও কৃষ্ণরাম চৌধুরীর উপর আনুঃ ১৬৪৫ খ্রীঃ [২]। পরে শ্রীকৃষ্ণ চৌধুরী জমিদারীর আংশিক মালিক হন ১৬৮৩ খ্রীঃ। যদিও গাজীদের বংশধরা কিছু অংশের মালিক ছিলেন।

সুবাদার সায়েস্তা খাঁনের আমলে (১৬৬৪-৮৮ খ্রীঃ) ভাওয়ালের জমিদার ব্রাহ্মণ পরিবারের **কুশধ্বজ (কেশব) চক্রবর্তী** [৩] (রায়), নিজের শিক্ষার যোগ্যতায় ঢাকায় নবাব নাজিমের সরকারী উকিল ছিলেন। 'রায়' উপাধি লাভ করেন। পরে 'বারোভুঞা'দের অন্যতম ফজল গাজীর উত্তরাধিকারী দৌলত গাজীর জমিদারীতে দেওয়ান হন। নবাবের দাক্ষিণ্যে ভাওয়াল পরগণার জমিদারীর দেখাশোনার ভার কুশধ্বজ (কেশব) চক্রবর্তীর উপর ন্যস্ত হয়। তাঁর পুত্র **জানকীনাথ রায়** দেওয়ান পদে বহাল থকেন। জানকীনাথের অধস্তন-পুরুষ **লক্ষ্মীনারায়ণের** (১৭৬৩ খ্রীঃ) পুত্র **গোলোক-নারায়ণ** বুদ্ধিমান ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। তিনি ভাওয়াল পরগণার ইংরাজ জমিদার ওয়াইজ্ সাহেবের অংশ, চার লাখ ছেচল্লিশ হাজার টাকায় কিনে নেন ১৮৫১ খ্রীঃ এবং ভাওয়ালের জমিদারীর সম্পূর্ণ মালিকানার অধিকারী হন। নবাবের দরবার থেকে

১। 'বাংলার বারোভুঞা' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। 'The first chief of Bhowal was Fazl Ghazi, one of the followers of Isa khan (বারোভুঞা'দের বীরশ্রেষ্ঠ), whose descendant Bahadur received a jaigir of 22 Parganas in Eastern Bengal from the emperor Akbar. The state remained in the family of the Ghazis, who settled at Kaliganj, till the time of one Daulat Ghazi (1645 A. D.) who failed to exercise proper supervision..... the Mughal authorities settled it with his Hindu servants, Balaram and Krishnaram. Balaram was succeeded by his son Srikrishna confirming him in the zamindari (1683 A.D.).'

৩। The present Jaydevpur family traces its descent to Kesab, a learned Pandit of Bajrajogini in Munshigang. Descendant Lakshminarayan held the zamindary in 1763 and succeded by his son Golaknarayan.' —Eastern Bengal District Gazetteers—Dacca by B. C. Allen i. c. s., 1912.

'রায় চৌধুরী' খেতাব লাভ করেন। গোলোকনারায়ণ মারা যান ১৮৫৬ খ্রীঃ। ঢাকা থেকে প্রায় ৩৫ কি. মি. দূরে **জয়দেবপুরে**[১] একটি মনোরম অট্টালিকা তৈরী করা ছাড়া, গ্রামের উন্নতিকল্পে ও প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্য সব রকম সম্ভাব্য ব্যবস্থা নেন।

রাজা কালীনারায়ণ রায়চৌধুরী

গোলোকনারায়ণের পুত্র কালীনারায়ণ নাবালক অবস্থায় মাতৃহীন হলে, পিতামহী সিদ্ধেশ্বরী দেবী চৌধুরানীর কাছে প্রতিপালিত হন। সুপুরুষ যুবক কালীনারায়ণ ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ ওয়াল্টার-এর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাহেব তাঁকে ফার্সী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। কালীনারায়ণ ঘোড়ায় চড়া ও শিকারে কৃতিত্ব লাভ করায় সাহেবী মহলে তার বিশেষ আদর ও পরিচয় ঘটে।[২]

কালীনারায়ণের তিনটি বিবাহ। কনিষ্ঠা পত্নী সত্যভামার গর্ভে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় ১৮৫৮ খ্রীঃ। পিতার জীবিতকালে রাজা কালীনারায়ণ জমিদারী সংক্রান্ত নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার সুবাদে, পরে জমিদারী পরিচালনায় যথেষ্ট সাফল্যলাভ করেছিলেন। জমিদারীর আয়তন[৩] বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জয়দেবপুরের (পীর বাড়ী) শ্রীবৃদ্ধির জন্য—নতুন তৈরী প্রাসাদ ও দেশ-বিদেশের মান্যবর অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য সুসজ্জিত 'রঙমহলের' শোভাবর্ধনের জন্য সব ব্যবস্থা করেছিলেন। বিদ্যোৎসাহী ও সঙ্গীত-প্রিয় রাজা কালীনারায়ণ, ঢাকা ও জয়দেবপুরে সঙ্গীতচর্চার উন্নতিকল্পে গুণী শিল্পীদের অর্থ সাহায্য দিতেন। তাঁর সময়ে জয়দেবপুরে ভাল ঘোড়া, হাতী, কুকুর প্রভৃতি জন্তুরা, তাঁর সব সময়ের প্রিয় সাথী ছিল। জয়দেবপুর, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার রাস্তার সংস্কার, বুড়ীগঙ্গার উপর বাঁধ তৈরী, স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁর সৎকার্যের নমুনা। 'প্রজাহিতৈষিণী সভার' মাধ্যমে তিনি গ্রামোন্নয়নের কাজে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কালীনারায়ণের সৎকার্যে দান ও শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহযোগীতার স্বীকৃতি-স্বরূপ প্রথমে 'রায় বাহাদুর' খেতাব ও পরে ২০ আগষ্ট, ১৮৭৫ খ্রীঃ তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাব দেওয়া হয়। রাজা কালীনারায়ণ ভাওয়ালের জমিদারীর ম্যানেজার মিঃ বেড্‌ফোর্ড ও পরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী কবি রায়বাহাদুর কালীপ্রসন্ন ঘোষের উপর জমিদারীর সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ কর্মযোগী রাজার জীবনাবসান ঘটে।

১। জয়দেবপুরে ভাওয়াল জমিদারীর সদর ও মনোরম রাজ-প্রসাদ।

২। The cyclopedia of India Vol. III, 1909.

৩। ভাওয়ালের জমিদারী—ভাওয়াল পরগণা ছাড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাখরগঞ্জ এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী

রাজা কালীনারায়ণের পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী বেড্‌ফোর্ড সাহেবের তত্ত্বাবধানে ও গৃহ-শিক্ষকের কাছে প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করেন। পিতার ন্যায় দক্ষ শিকারী, উদারচেতা ও তেজস্বী প্রকৃতির মানুষ। সুসাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের প্রভাব ও পরামর্শে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্য-সেবায় মনোনিয়োগ করেন। তাঁর আনুকূল্যে জয়দেবপুরে 'সাহিত্য সমালোচনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্ ও গ্রন্থকার এই সভার অনুপ্রেরণা ও আর্থিক সাহায্য লাভ করেছিলেন।

পূর্ব বঙ্গের সংস্কৃত ভাষা-চর্চার নামী প্রতিষ্ঠান 'সারস্বত সভা'-র তিনি একজন সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক। তাঁর অনুদানে ঢাকা কলেজের ছাত্র-বৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাঁর দানের অর্থে ঢাকা, ময়মনসিংহ, করিমগঞ্জ, প্রভৃতি জেলা ও মহকুমায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (কালীনারায়ণ বিদ্যালয়) ছাড়া, বেশ কয়েকটি চিকিৎসাকেন্দ্র, ছাত্রাবাস, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরিবারের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী রাজনারায়ণ সরকারের কাছে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা ও দানশীলতার পরিচয় দেন। সরকার তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' খেতাবে সম্মানিত করেন। ২৬ এপ্রিল, ১৯০১ খ্রীঃ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হয়।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের রানী বিলাসমণি দেবীর গর্ভে তিন কন্যা—ইন্দুময়ী, জ্যোতির্ময়ী, তড়িন্ময়ী এবং তিন পুত্র—বড় কুমার **রনেন্দ্রনারায়ণ**, মেজ কুমার **রমেন্দ্রনারায়ণ** ও ছোট কুমার **রবীন্দ্রনারায়ণ**। রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের তিন পুত্রই স্বল্পায়ু ছিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনারায়ণ অপুত্রক, মারা যান ১৯১২ খ্রীঃ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র রনেন্দ্রনারায়ণের জন্ম হয় ১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ খ্রীঃ। বিবাহ হয় কলকাতায় বহুবাজারের বনেদী পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ মতিলালের [১] কন্যা সরযুবালা দেবীর (রাজামুখী) সঙ্গে। তাঁদের একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যু হয়। উদারচেতা ও মৃগয়া-প্রিয় কুমার রনেন্দ্রনারায়ণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১০ খ্রীঃ মারা যান জয়দেবপুরে। স্বামীর মৃত্যুর পর বধুরানী সরযুবালা বাস করতেন কলকাতায় ইংরাজী-টোলায় রিপন ষ্ট্রীটের বাসভবনে (বর্তমান পুলিশ হেড্‌কোয়ার্টার)। মারা যান ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৬ খ্রীঃ।

১। আইনজীবী বাবু সুরেন্দ্রনাথ মতিলাল (১৮৪৭-১৯২১ খ্রীঃ) ভাওয়াল জমিদারীর পরিচালনার কাজে কর্তৃত্ব দেন। পরে দুই বিধবা বধূরানীদের মতিলাল পরিবারের সন্তানরাই দেখাশোনা করেছেন। এঁদের মৃত্যুতে রাজপরিবারের অস্তিত্ব লোপ পেল।

ভাওয়াল সন্ন্যাসী কুমারের ইতিকথা

মেজ কুমার অর্থাৎ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের মেজ ছেলে **রমেন্দ্রনারায়ণই** (জন্ম ১৮৮৪ খ্রীঃ) ভায়েদের মধ্যে কিছু লেখাপড়া শিখে ছিলেন। তাঁর বিবাহ হয় ১৯০২ খ্রীঃ উত্তরপাড়ার মুখার্জী বংশের দৌহিত্রী **বিভাবতী দেবীর** সঙ্গে। রমেন্দ্রনারায়ণ ছিলেন বিতর্কিত চরিত্রের মানুষ। শিকার ও গান বাজনায় দিন কাটিয়েছেন। সঙ্গতকারণে রোগ-গ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্ত্তনের তাগিদে, তাঁর স্ত্রী বিভাবতী দেবী, কয়েকজন আত্মীয় ও কর্মচারীকে সঙ্গে নিয়ে দার্জিলিং-এ পৌছান ১৮ এপ্রিল, ১৯০৯ খ্রীঃ। চিকিৎসাকালীন কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ মারা যান ৯ মে, ১৯০৯ খ্রীঃ। কিন্তু একটি গুজব ওঠে যে, তাঁর মৃতদেহ সৎকার করা হয়নি কারণ তখন নাকি বৃষ্টি পড়ছিল। এই গুজব পরে সরব হয়ে ওঠে ও আলোড়নের সৃষ্টি হয় যে, মেজ কুমার জীবিত আছেন। বহুদিন পরে হঠাৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যখন এক সন্ন্যাসী হাজির হন ভাদ্র মাসে, ১৩২৭ সন (১৯২০ খ্রীঃ) জয়দেবপুরের রাজবাড়ীতে এবং নিজেকে মেজ কুমার রূপে পরিচয় দেন এবং পরে জমিদারীর এক তৃতীয়াংশের মালিকানার দাবী জানান। রাজপরিবারের বেশ কয়েকজন, বিশেষ করে, বড় বধুরানী এবং প্রাচীন রাজ-কর্মচারীদের অধিকাংশ, আগন্তুক সন্ন্যাসীকেই মেজ কুমার হিসাবে সনাক্ত করেন।

সন্ন্যাসীকে গৃহী করার জন্য পরিবারের বড় বধুরানী সরযূবালা দেবী, মেজ কুমারের দ্বিতীয় বিবাহের ব্যবস্থা করেন। বিবাহ হয় ২৯ শ্রাবণ, ১৩৪৯ সন (আগস্ট, ১৯৪২ খ্রীঃ) বারাণসীতে, কলকাতায় শ্যামবাজারের বৃন্দাবন পাল লেনের বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ধারা দেবীর সঙ্গে। অপুত্রক ধারা দেবী মারা যান ৮ অক্টোবর, ১৯৯১ খ্রীঃ কলকাতায়।

২০ এপ্রিল, ১৯৩০ খ্রীঃ প্রথমে ঢাকা আদালতে ও পরে কলকাতা হাইকোর্টে (৫ অক্টোবর, ১৯৩৬ খ্রীঃ) মোকদ্দমা হয় সন্ন্যাসীর আবেদনে। ঢাকায় প্রায় ছয় বছর ও কলকাতায় প্রায় চার বছর চলার পর দুই আদালতই আগন্তুক সন্ন্যাসীকে মেজ কুমার বলে সাব্যস্ত করেন। বিভাবতী দেবী বিলাতে 'প্রি. ভি. কাউন্সিলে' আপীল করেন এবং ৩০ জুলাই, ১৯৪৬ খ্রীঃ 'প্রি. ভি. কাউন্সিলের' রায়ে হাইকোর্টের রায়ই বহাল থাকে। ফলে আগন্তুক সন্ন্যাসী, মেজ কুমার রমেন্দ্রনারায়ণ হিসাবে সাব্যস্ত হন। আদলতের রায় বেরোবার ঠিক চার দিনে পরে, ৪ আগস্ট, ১৯৪৬ খ্রীঃ কলকাতায় সন্ন্যাসী কুমার মারা যান। বধুরানী বিভাবতী দেবী ১৯ ল্যান্সডাউন রোডে, তাঁর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে বাস করতেন। মারা যান সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬ খ্রীঃ প্রায় ৭৬ বছর বয়সে। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি 'সন্ন্যাসী কুমারকে' তাঁর স্বামী বলে কখনই স্বীকার করেননি।

ভাগ্যকুলের রায় রাজপরিবার

বিক্রমপুর, ঢাকা

আদিশূর, বল্লাল সেন, চাঁদ রায়, কেদার রায় এবং রাজা রাজবল্লভের কীর্তিভূমি বিক্রমপুর। আঠারো শতকের শেষভাগে—ঢাকায় নবাবী আবহাওয়ার শেষ পর্যায়ে, হিন্দু ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিলি গোষ্ঠী-ভুক্ত ব্যবসায়ী পরম বৈষ্ণব **কৃষ্ণজীবন কুণ্ডু** ভাগ্যকুলের রায় রাজপরিবারের প্রাণ-পুরুষ। তাঁর পুত্র **রামকৃষ্ণ** (রামচন্দ্র) কুণ্ডু (নবাবের উপাধি বলে 'রায়') বিক্রমপুর পরগণার মুরপুর গ্রামের বাসিন্দা। পদ্মা-গর্ভে বাসস্থান বিলীন হয়ে যাওয়ার পর, আউয়াল গ্রামে, কুলদেবতা শ্রী শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ[১] ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন। পদ্মা আউয়াল গ্রামকেও গ্রাস করতে ছাড়েনি। ফলে রায়-পরিবার ভাগারকুল (ভাগ্যকুল) গ্রামে তাঁদের নূতন বসতি স্থাপন করেন।

রামকৃষ্ণের একমাত্র পুত্র **গঙ্গাপ্রসাদ** নিজস্ব ব্যবসা শুরু করেন এবং বহু অর্থ উপার্জনে সক্ষম হন। মারা যান ১৮২০ খ্রীঃ বৃন্দাবন-ধামে। তাঁর চার পুত্র—গুরুপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, চৈতন্যদাস ও **প্রেমচাঁদ**। কনিষ্ঠ পুত্র প্রেমচাঁদের তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে **শ্রীনাথ, জানকীনাথ** এবং **সীতানাথ**। প্রেমচাঁদের ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। লবন ও চালের ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে ঢাকা, বরিশাল ও ত্রিপুরার কয়েকটি অঞ্চলে ভূসম্পত্তির মালিক হন। কলকাতায় লাউডন্ ষ্ট্রীট, পার্ক ষ্ট্রীট, চাঁদনি, গার্ডেন রীচ প্রভৃতি অভিজাত পল্লীতে ভূসম্পত্তির অধিকারী হন।

রাজা শ্রীনাথ রায়

রাজা শ্রীনাথ রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪১ খ্রীঃ। ১১ বছর বয়সে বিবাহ হয় বিক্রমপুর নিবাসী প্রসাদচন্দ্র দের কন্যা তীর্থময়ী দেবীর সঙ্গে। রাজা শ্রীনাথ রায় 'এ্যানট্রেন্স' পাশ করেন ১৮৩৬ খ্রীঃ। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন বন্ধ হয়েছিল স্বাস্থ্য ভঙ্গের কারণে। জীবনের বেশীর ভাগ সময় কাটিয়েছেন ভাগ্যকুলে। কুল দেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের সেবায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। জনহিতকর কার্য্যে তাঁর উৎসাহ ও

১। ঢাকায় নবাবী আমলের শেষ পর্যায় রাজনৈতিক আকাশে এক উজ্জ্বল নাম রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ (১৭০৭-৬৩ খ্রীঃ)। তাঁর কীর্তি—লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির ও স্বর্ণ-দোলমঞ্চ কীর্তিনাশা পদ্মা ধ্বংশ করেছে। অনেকে মনে করেন এই মন্দিরের বিগ্রহ শ্রীশ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ (জ্যোতির্ময় চক্র), পরে এই রায় রাজপরিবারের কুল দেবতা হিসাবে পূজিত হতে থাকেন।

দানের জন্য তিনি স্মরণীয় ১ হয়ে আছেন। তিনি ঢাকায় 'ইকোনমিক্যাল্ মিউজিয়াম্' প্রতিষ্ঠা করেন। দর্শনীয় ছিল দেশজাত বিবিধ দ্রব্য ও বহু রকমের ধানের নমুনা। ঢাকার বিখ্যাত 'সারস্বত সমাজ'-এর তিনি ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বহু প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করে পাদ্রী লং সাহেবকে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন 'এডুকেশ্‌ন্ কমিশন', 'মিউনিসিপ্যাল কমিটি', 'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড কমিটি' প্রভৃতির সভ্য ও একজন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট্। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজের উন্নতীকল্পে ও সংস্কৃত-সাহিত্য প্রসারার্থে বহু অর্থব্যয় করেছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদের সংস্পর্শে ও গবেষণার মাধ্যমে, এই বিদ্যায় পারদর্শী হন। সঙ্গীত-চর্চায় তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

ইংরাজ সরকার তাঁর সুকর্মের স্বীকৃতি-স্বরূপ, শ্রীনাথ রায়কে 'রাজা' উপাধি দেন ১৮৯১ খ্রীঃ। তাঁর সমসাময়িক বিশেষ পরিচিত গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন—ভুবনমোহন দাস (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পিতা), অশ্বিনী কুমার দত্ত ২, কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রমুখ। মারা যান ১৯২৪ খ্রীঃ ৮৪ বছর বয়সে তাঁর একমাত্র পুত্র **কুমার প্রমথনাথ** ও দুই কন্যাকে রেখে। রাজা শ্রীনাথের বিরাট ব্যক্তিত্ব, দেশ সেবা ও দানশীলতা ছাড়া, তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল যে তাঁর অগাধ ধন-সম্পত্তি তাঁকে গর্বোস্ফীত করতে পারেনি।

কুমার প্রমথনাথের জন্ম হয় ১৮৭৯ খ্রীঃ পৈতৃক বাসস্থান হাতারপাড়ায় (ভাগ্যকুলের কাছে)। কলকাতায় শোভাবাজারের পৈতৃক বাড়ীতেই পড়াশোনা আরম্ভ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর নিঃস্বার্থ দান, দেশপ্রেম, ধর্মবিশ্বাস ও কর্তব্য পরায়ণতার জন্য প্রমথনাথ চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। দেশ-মাতৃকার সেবায় ১৯২৩-১৯২৫ খ্রীঃ 'স্বরাজ্য পার্টিকে' (দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মারফৎ) লক্ষাধিক টাকা, বাগ্মীবীর বিপিনচন্দ্র পাল, সংগ্রামী সাংবাদিক শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী প্রমুখ ব্যক্তিদের এবং সেবামূলক কাজে 'ভারত সেবাশ্রম সংঘ', 'রামকৃষ্ণ মিশন' এবং আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অকাতরে দান করেন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন ২২ আগষ্ট, ১৯৫৮। কুমার প্রমথনাথের চার কন্যা এবং দুই পুত্র—জগন্নাথ রায় ও বলরাম রায়। জগন্নাথ রায়ের দুই পুত্র—নীলমাধব ও বেণীমাধব। ২০, ইউ. এন. ব্রহ্মচারী রোড, কলকাতায় তাঁদের বাস ভবনে থাকেন। বলরাম রায়ের দুই কন্যা—কল্যানী পাল ও অনুপমা কুণ্ডু। বর্তমানে বলরামবাবু কলকাতায় গোলপার্কের বাসভবনে থাকেন।

১। ঢাকা শহরে আমলীগোলা অঞ্চলে রাজা শ্রীনাথ রোড তাঁর স্মরণিক।

২। ঢাকায় অনুশীলন সমিতির (প্রতিষ্ঠা ১৯০৫ খ্রীঃ) সাহায্যের জন্য অশ্বিনীকুমার রাজা শ্রীনাথের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করেছিলেন। Encyclopedia of India. Vol. II 1908.

রাজা জানকীনাথ রায়

প্রেমচাঁদ রায়ের দ্বিতীয় পুত্র জানকীনাথ রায় (রাজা) জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৪৮ খ্রী: ঢাকায় পৈতৃক বাসভবনে। রাজা শ্রীনাথ রায়ের থেকে সাত বছরের ছোট জানকীনাথ রায় কলকাতার হেয়ার স্কুলে ইংরাজী পাঠ শুরু করেন রিক্ সাহেবের (পরে স্টেট্সম্যান্ সম্পাদক) তত্ত্বাবধানে। অগ্রজ রাজা শ্রীনাথের বেশী সময়ে ভাগ্যকুলে থাকার জন্য, জানকীনাথকে কলকাতার ব্যবসা ও বিষয়-সম্পত্তি দেখাশোনা করতে হত।

রাজা জানকীনাথ বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মেট্রোপলিটন্ ইনষ্টিটিউশন্, বিদ্যাসাগর কলেজ, ময়মনসিংহ সিটি কলেজ, আনন্দমোহন বোস কলেজ, কারমাইকেল্ মেডিকেল্ কলেজ, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি তাঁর আর্থিক সাহায্য-পুষ্ট। তাছাড়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সাময়িক আর্থিক সংকটে, রাজা জানকীনাথের সাহায্য পেয়েছেন। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী একাধিকবার কলকাতায় রায় বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন 'কংগ্রেস' তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য। নেপথ্যে স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন ছাড়া, লর্ড কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গ বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

১৯১৫ খ্রী: 'বিক্রমপুর সম্মিলনীতে' স্যার জগদীশ বোসের সভাপতিত্বে যে বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছিল, রাজা জানকীনাথ ছিলেন তাঁর প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি ছিলেন অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, 'সুবারবর্ণ মিউলিসিপ্যাল্ কর্পোরেশনের' সভ্য। ১৮৭৫ খ্রী: 'কলকাতা মিউলিসিপ্যাল্ বিল' সংক্রান্ত আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নেন। বাঙালীর সর্বপ্রথম পাটকল 'প্রেমচাঁদ জুট মিলস' তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল্ চেম্বার অফ্ কমার্স'-এর প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি ছিলেন অন্যতম। ইংরাজ সরকার তাঁর সুকর্মের জন্য ১৯১১ খ্রী: 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেন। ১লা জানুয়ারী, ১৯২৪ খ্রী: 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হন। মৃত্যু হয় ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪১ খ্রী: তিরানব্বই বছর বয়সে।

জানকীনাথের তিন পুত্র—কুমার যোগেন্দ্রনাথ রায়, কুমার নরেন্দ্রনাথ রায় ও রমেন্দ্রনাথ রায়। যোগেন্দ্রনাথের তিন পুত্র। নরেন্দ্রনাথের দুই পুত্র—জীবনকৃষ্ণ ও বটকৃষ্ণ। বটকৃষ্ণের তিন পুত্র—শ্যামসুন্দর, মদনমোহন ও শংকরনাথ। জীবনকৃষ্ণের দুই পুত্র—গুরুপ্রসাদ ও অজিতকুমার। বর্তমানে থাকেন ২ এ, লী রোড, কলকাতা।

প্রেমচাঁদ রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রায় বাহাদুর সীতানাথ রায়ের জন্ম ১৮৫৩ খ্রী:। আইন স্নাতক সীতানাথ ক্যালকাটা কর্পোরেশনের কমিশনার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাস্ট প্রভৃতির সভ্য। মারা যান ১৯২০ খ্রী:, যদুনাথ ও প্রিয়নাথ—দুই পুত্রকে রেখে। যদুনাথের দুই পুত্র—কৃষ্ণদাস ও প্রহ্লাদচন্দ্র—পৌত্র অমরনাথ। প্রিয়নাথের দুই পুত্র—শরৎচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র। সতীশচন্দ্রের দুই পুত্র গঙ্গাপ্রসাদ ও অশোক কুমার। বর্তমানে ১০১ শোভাবাজার ষ্ট্রীটে সুরম্য প্রাসাদে বাস করেন।

রাজা শ্যামাশঙ্কর রায়

তেওতা, ঢাকা

ঢাকার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় তেওতা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। জলপথেই ছিল যোগাযোগের ব্যবস্থা, যদিও মাণিকগঞ্জ শহর থেকে সড়ক পথে দূরত্ব মাত্র ১০ কিঃ মিঃ। খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের শেষভাগে বৈদ্যবংশজ পঞ্চানন (দাস-শর্মণ) সরকার, ঢাকার নবাব-নাজিম-এর সেরেস্তায় পেস্কারের কাজ করতেন। জমি-জমার মালিক হ'য়ে নবাবী খেতাব 'রায়চৌধুরী' পদবী লাভ করেন। পঞ্চানন রায়চৌধুরীর পুত্র **কালীশঙ্কর**, তস্য পুত্রদ্বয় **জয়শঙ্কর** ও **তারিণীশঙ্কর**।

জয়শঙ্করের দুই পুত্র **পার্বতীশঙ্কর**[১] ও **হরশঙ্কর**। তারিণীশঙ্করের স্ত্রী গঙ্গামণি দেবীর গর্ভে দুই পুত্র **শ্যামাশঙ্কর** (রাজা) ও **প্রাণশঙ্কর**। শ্যামাশঙ্করের জন্ম হয় ১৮৩৬ খ্রীঃ। লেখাপড়া শুরু হয় তেওতায়' পোগসে স্কুলে'। পরে ঢাকা শহরের স্কুলে বিদ্যালাভ করেন। তাঁর কৈশোর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠতাত জয়শঙ্করের ইচ্ছানুক্রমে তেওতা জমিদারীর গদীতে বসেন সৎচরিত্র ও কর্মদক্ষতার বিচারে। প্রজাবৎসল জমিদার রাজা শ্যামাশঙ্কর[২] তেওতায় ও দিনাজপুরে জয়গঞ্জে জনহিতকর কাজে ব্রতী ছিলেন। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ্য—তাঁর প্রবর্তিত শস্য সঞ্চয় প্রকল্প 'ধর্মগোলা' বা 'Grocery Bank'। এই প্রকল্পে চাষীরা তাদের উদ্বৃত্ত উৎপন্ন ধান বা চাল জমা দিয়ে সুদ হিসাবে মণপিছু মাসিক এক সের পেতো। যারা ধান বা চাল ধার (অসময়ে) নিতো, তাদের সুদ দিতে হতো আগাম আড়াই সের।

এই 'ধর্মগোলার' শস্য ১৮৭৪ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষ-কবলিত উত্তর-পূর্ব বাংলায় বহু মানুষের জীবন রক্ষা করেছিল। এই তথ্য তৎকালীন সরকারী প্রশাসনিক কাগজপত্রে নথিভুক্ত

১। পার্বতীশঙ্কর রায়ের দুই পুত্র—কুমারশঙ্কর রায় (দিল্লীতে ভাইস্‌রয় কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন) ও ডঃ কুমুদশঙ্কর রায় (কলকাতার যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা)। হরশঙ্কর রায়ের তিন পুত্রের মধ্যে কিরণশঙ্কর রায় ছিলেন বাংলার ডঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভার সদস্য ১৯৪৯ খ্রীঃ।

২। এই প্রসঙ্গে Statesman-এ ১৩ আগষ্ট, ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রকাশিত একটি সংবাদের অনুবাদ দেওয়া হল—'বাংলার ছোটলাট (স্যার এ্যাসলে ইডেন্) কাল বিকালে ১৪ তারিখে ভারতের ভাইস্‌রয়ের প্রদত্ত বিভিন্ন উপাধির সনদ-পত্র প্রদান করবেন পশ্চাদ্‌ লিখিত ভদ্রমহোদয়দের—মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, রাজা কমলকৃষ্ণ দেব, রাজা দিগম্বর মিত্র, রাজা হরনাথ চৌধুরী, নবাব মীর মহম্মদ আলি, রাজা শ্যামাশঙ্কর রায়'। প্রসঙ্গত খেতাবাদি প্রদানের ঘোষনা করা হয়েছিল—১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ। সংবাদপত্রের তালিকায় বোধহয় অসাবধানবশতঃ রাজা রমানাথ ঠাকুরের নাম বাদ গেছে।

করা আছে। তা ছাড়া দুর্ভিক্ষের ত্রাণ-কার্যে শ্যামাশঙ্করের প্রশংসনীয় উদ্যোগ ও সচেষ্টতা, ইংরাজ সরকার বিশেষভাবে উপলব্ধি করেই, তাঁকে ১ জানুয়ারী, ১৮৭৭ খ্রীঃ 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। এ ছাড়া এই পরিবারকে অতিরিক্ত সম্মান দেওয়া হয়, 'আর্মস্ অ্যাক্টের' আওতা থেকে তাঁদের অব্যাহতি দিয়ে। অর্থাৎ পরিবারের লোকেরা বিনা লাইসেন্সে আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্গে রাখতে পারতেন। রাজা শ্যামাশঙ্কর দেশের বহু সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, বিশেষ করে—'বেঙ্গল থিওসফিক্যাল্ সোসাইটি', 'জমিদার সভা' ও 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশন্'।

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের মাঝামাঝিতে ইংরাজী শিক্ষা ও হিন্দু সংস্কার-মুক্ত 'ব্রাহ্ম সমাজ' বা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি রাজা শ্যামাশঙ্কর আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্ম না হ'য়েও নিজের পরিবারের [1] ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য তিনি ব্রাহ্ম সমাজের আলোক-প্রাপ্ত পরিবেশের মধ্যে বসবাসের তাগিদে, জোড়াসাঁকোর কাছে পাথুরিয়াঘাটার দর্মাহাটায় জমি কিনে বাসগৃহ তৈরী করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ, নৃপেন্দ্রনাথ এবং পরে দ্বিজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের' প্রতিষ্ঠাতা (১৫ মে, ১৮৭৮ খ্রীঃ) কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ীতে ও 'সমাজে' তিনি গিয়েছেন। এই সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা [2] বজায় ছিল রাজা শ্যামাশঙ্করের জেঠতুতো ছোট ভাই পার্বতীশঙ্কর ও হরশঙ্কর রায়ের সময়েও।

কলকাতায় তৎকালীন সাহেব মহল্লায় (অধুনা বেনেপুকুর অঞ্চল) ইউরোপীয়ান্ অ্যাসাইলাম্ লেনে প্রায় তিন বিঘার বেশী জমি খরিদ করে বর্তমান বসত-বাড়ীটি তৈরীর কাজ আরম্ভ হয় ১৮৮০ খ্রীঃ। দুঃখের বিষয় তাঁর জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ করা যায়নি। রাজা শ্যামাশঙ্করের কর্মময় জীবনের অবসান হয় ৪ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীঃ মাত্র ৪৯ বছর বয়সে। তাঁর মৃত্যুর পর জমিদারী ও পরিবারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন পার্বতীশঙ্কর রায়। তাঁর মৃত্যুর পর বিষয়-সম্পত্তি ভাগাভাগি হয় এবং ৪৬ ইউরোপীয়ান্ অ্যাসাইলাম্ লেনের জমিতে বেশ কয়েকটি শরিকি বাড়ী তৈরী হয়। উত্তরাধিকারীরাই বসবাস করেন।

১। রাজা শ্যামাশঙ্করের দুটি স্ত্রী—প্রথমা রানী বরদাসুন্দরীর গর্ভে এক পুত্র কুমার প্রিয়শঙ্কর (মৃত্যু ১৯১০ খ্রীঃ) ও এক কন্যা তিলোত্তমা (স্বামী হরিচরণ সেন)। দ্বিতীয়া রানী শশীময়ীর গর্ভে পাঁচ পুত্র—বিজয়শঙ্কর, অভয়শঙ্কর, নর্মোদাশঙ্কর, মানশঙ্কর ও ধ্যানশঙ্কর (শিশু মৃত্যু)। কুমার প্রিয়শঙ্করের তিনটি স্ত্রী—চারটি পুত্র সন্তান—যতীন্দ্র, সতীন্দ্র, অমিয় ও রবীন্দ্র ও পৌত্র—প্রণব, প্রবীর ও প্রীতি। রাজা শ্যামাশঙ্করের প্রপৌত্র প্রদীপ, ত্রিদীপ, পার্থ, আনন্দ ও দীপ্ত।

২। এই প্রসঙ্গে রায় রাজপরিবারের দৌহিত্র-সন্তান প্রতুল গুপ্ত, তাঁর স্মৃতিকথায় ('দিনগুলি মোর') লিখেছেন—'১৯১৭ সালের বর্ষণসিক্ত এক সকাল বেলায় রবীন্দ্রনাথ এলেন ইউরোপীয়ান্ অ্যাসাইলাম্ লেনের বাড়িতে। বাড়ির মেয়েরা কবির গল্প, আবৃত্তি শুনতে চাইলেন। কবি তাঁর 'ডাকঘর' পড়ে শুনিয়েছিলেন। গেয়েছিলেন—'নিয়ে চল তব বিজন মন্দিরে'।

বাংলার বারোভুঞা

বাংলায় খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকে মোগল সাম্রাজ্যের বিস্তারের জোরদার প্রস্তুতির সময় সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর-এর শাসনকর্তা ও সেনাপতি মান সিংহ ও তাঁর পুত্র সংগ্রাম সিংহ (১৫৮৯-১৬০১ খ্রী:) ও পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বাংলার সুবাদার ইসলাম্ খান চিস্তির (১৬০৮-১৩ খ্রী:) শাসনকালে বাংলায় 'বারোভুঞা' ১ নামে প্রসিদ্ধ, স্বাধীন (স্বেচ্ছাচারী) জমিদাররা (স্বঘোষিত রাজারা) নিজস্ব এলাকায় প্রভুত্ব করতেন। এঁদের অবস্থান ছিল পদ্মার উত্তর-তীরে—দিনাজপুরে গনেশ রায়, পুঁটিয়ায় রামচন্দ্র ঠাকুর ও তাহিরপুরে রাজা কংসনারায়ণ ও পদ্মার দক্ষিণ-তীরে যশোহরে রাজা প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপে কায়স্থ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়, রাজা রামচন্দ্র রায় ও বিনোদ রায়, বিক্রমপুরে (শ্রীপুর) চাঁদ রায় ও কেদার রায়, ভুলুয়ায় লক্ষ্মণ মাণিক্য ও অনন্ত মাণিক্য, ভূষণায় রাজা মুকুন্দ রায় ও সত্রাজিৎ রায়, সাতেরে রামকৃষ্ণ রায়, চাঁদ প্রতাপে চাঁদ গাজি, সরাইলে সোনা গাজি, ভাওয়ালে বাহাদুর গাজি ও ফজল্ গাজি, চাট্‌মোহরে মীর্জা মুমিন, খিজিরে ইশা খান (মারা যান ১৫৯৯ খ্রী:) ও পুত্র মুসা খান মসনদী। শেষোক্ত জমিদাররাই সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ায় শেষ পর্যন্ত মোগল সম্রাটদের বিরুদ্ধে তুমুল লড়াই করেছিলেন। এছাড়া বিষ্ণুপুরের বাগদী রাজা হাম্বীর মল্লের নাম পাওয়া যায়। এই সব জমিদার বা রাজাদের 'বারোভুঞা' নামে 'আইন-ই-অকবরী'-তে উল্লিখিত না থাকলেও বিভিন্ন উৎস থেকে উক্ত 'বারো' জনেরও বেশী নাম পাওয়া যায়।

প্রায় টানা পাঁচ বছর (১৬০৮-১৩ খ্রী:) সংঘর্ষ বা যুদ্ধরত ছিলেন দক্ষ সমরকুশলী সুবাদার ইসলাম্ খান। একের পর এক বাংলার 'বারোভুঞা'দের হয় বিনা বিবাদে, না হয় যুদ্ধে পরাজিত করে, তাঁদের জমিদারী মোগল সাম্রাজ্যের খাস করে নেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য ও তাঁর পুত্র উদয়াদিত্য, চাঁকলার রাজা রামচন্দ্র রায়, ভূষণার সত্রাজিৎ রায়, ভুলুয়ার লক্ষণ মাণিক্য ও আরও কয়েকটি জমিদার, ইসলাম্ খানের কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেও, স্বাধীনচেতা পরাক্রান্ত মুসা খান, সুবাদার ইসলাম্ খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন ১৬১২ খ্রী:। 'বারোভুঞা'দের আধিপত্যের অবসান ঘটে। বাংলায় মোগল রাজশক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে, শৃঙ্খলা ও সুশাসনের অধ্যায় শুরু হয়। ইসলাম্ খান মারা যান ২১ আগষ্ট, ১৬১৩ খ্রী:।

১। এই পুস্তকের আলোচ্য বিষয়-বস্তুর সীমারেখা কমবেশী গত ৩০০ বছরের অতীত বাংলার খেতাবী রাজ-রাজড়া ও নবাবরা। তা সত্ত্বেও যেহেতু 'বারোভুঞারা' আলোচ্য কিছু রাজ-রাজড়াদেরই পূর্ব-পুরুষ, সেজন্য 'বারোভুঞা'দের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।

'বারোভূঞা' প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (দ্বিতীয় খণ্ড) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল—'ইহারা কোন প্রাচীন বংশের প্রতিনিধি নহেন এবং নিজের সম্পত্তি রক্ষার জন্যই মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু বাঙালীর কল্পনায় যাঁহারা বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই ইহার যোগ্য নহেন। প্রতাপাদিত্য ১ অতুলনীয় বীর ও দেশপ্রেমিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি কোন যুদ্ধেই বীরত্ব দেখাইতে পারেন নাই এবং বাঙালী জমিদারদের বিরুদ্ধে তিনি মোগল সুবাদারকে ২ সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। যাঁহারা বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন—ইশা খান, তাঁর পুত্র মুসা খান, ও উসমান প্রভৃতি তাঁহাদের অধিকাংশই মুসলমান পাঠান'। বীর পাঠান জমিদারদের মধ্যে ছিলেন সোনা গাজি, পুত্র বাহাদুর গাজি, মসুম্ খান (পবনা), পালয়োন্ (ত্রিপুরা), উতমন্ খান (ময়মনসিংহ), আন্ওয়ার খান, বায়জিদ্ করিম (শ্রীহট্ট), মজ্‌লিস্ খুব (ফতেবাদ, ফরিদপুর)। ৩

'বারোভূঞা' ও অপর কয়েকটি রাজারা (বড় জমিদার) নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার তাগিদে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বা যুদ্ধ শুরু করেছিলেন (১৫৮৯ খ্রীঃ), সম্রাট আকবরের সেনাপতি (বাংলার-বিহারের শাসনকর্তা) রাজা মানসিংহের বিরুদ্ধে, পরে তার তীব্রতা যথেষ্ট কমে যায় বীর মুসা খানের সোনারগাঁও যুদ্ধের পরাজয়ে এপ্রিল, ১৬১১ খ্রীঃ। প্রায় ২২ বছরের পরে আসাম, আরাকান্ ও পর্তুগীজরা মোগল বশ্যতা স্বীকার করে।

১। রাজা প্রতাপাদিত্য স্মরণে কলকাতায় কালীঘাট ও টালিগঞ্জ অঞ্চলে দুটি রাস্তা রয়েছে—'প্রতাপাদিত্য রোড' ও 'প্রতাপাদিত্য প্লেস'। প্রতাপাদিত্যের কাকা রাজা বসন্ত রায়ের নামেও বালিগঞ্জে 'রাজা বসন্ত রায় রোড' আছে।

২। সফল ও সিদ্ধ-মনোরথ সুবাদার ইস্‌লাম্ খান ১৬১২ খ্রীঃ তৎকালীন বাংলার রাজধানী, রাজমহল (আকবর নগর) থেকে ঢাকায় (জাহাঙ্গীর নগর) স্থানান্তরিত করেন—উত্তর পূর্ব বাংলা ও আসামের বিস্তীর্ণ এলাকা মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায়—প্রশাসনিক কাজ-কর্মের সুবিধার্থে। ইসলাম্ খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে মর্যাদার শীর্ষাসনে বসেন।

৩। 'বারোভূঞা' ও অপর রাজাদের সঙ্গে মোগল রাজশক্তির লড়াইয়ের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ফার্সী গ্রন্থে—'বাহারিস্তান-ই-ঘইবী'—মির্জা নাথান (নিজে নৌবহর সেনা নায়ক ছিলেন) এবং মোগল রাজকর্মচারী মহম্মদ সাদিক লিখিত (১৬২৮-৩৮ খ্রীঃ) 'সুব-ই-সাদিক', চার খণ্ড।

৩ক। A Report on the district of Jessore, its Antiquitis, its History and Commerce. Jessore Gazetteers—L.S.S. O'Mailley, 1912. History of Muslims of Bengal—Dr. Md. Mohar Ali—Saudi Islamic University.

ভূষণার রাজা সীতারাম রায়

যশোহর

পূর্বকালের 'বারোভূঞা'-দের আদর্শে অনুপ্রাণিত উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ (বিশ্বাস) জমিদার রাজা সীতারাম রায়[১] (আনুঃ ১৬৫৮-১৭১৩ খ্রীঃ) ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীনচেতা হিন্দু জমিদার। সীতারাম রায়ের পিতা উদয়নারায়ণ রায় প্রথমে রাজমহলে ও পরে ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের কাছে এক সাধারণ রাজস্ব আদায়কারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। সীতারামের প্রপিতামহ রামরাম দাস রাজমহলে নবাব সরকারের খাস্ সেরেস্তায় বিচক্ষণ কাজের জন্য 'বিশ্বাস খাস্' উপাধি পান। তাঁর পুত্র হরিশচন্দ্র 'রায় রাইয়াঁ' ও পরে তাঁর পুত্র উদয়নারায়ণও এই সম্মান-সূচক উপাধি লাভ করেন। ঢাকার সুবাদার **ইব্রাহিম খানের** (১৬৮৯-৯৭ খ্রীঃ) আদেশে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজস্ব সংক্রান্ত 'সাঁজোয়ালের' পদে আসীন হন। অতএব ভূষণার রায়েরা চার-পুরুষে কেবল যে নবাব কর্মচারী তা নয়, 'বারোভূঞাদের' অন্যতম মুকুন্দ রায়ের উত্তর-পুরুষও বটে।

উদয়নারায়ণের দুই পুত্র—সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ। আনুঃ ১৬৮৯ খ্রীঃ সুবাদার ইব্রাহিম খান সীতারামকে নলদী (বর্তমান নড়াইল) পরগণার রাজস্ব আদায়ের ভার দেন এবং বিদ্রোহী আফগান করিম খান ও স্থানীয় পর্তুগীজ দস্যুদের মোকাবিলা করার আহ্বান জানান। সীতারামের সামরিক সাহায্যে সন্তুষ্ট হয়ে, সুবাদার তাঁকে আরও কয়েকটি সংলগ্ন পরগণার দায়িত্ব দেন। সঙ্গত কারণে তিনি স্থানীয় জনগণের সক্রিয় যোগদানের সাহায্যে একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন। প্রবাদ আছে যে, তিনি তাঁর জীবনের শুরু থেকে উত্থান ও পতনের শেষ দিন পর্যন্ত, তাঁর পরম হিতৈষী গুরু মুসলমান ফকির **'মহম্মদ আলির'** পরামর্শ ও আশীর্বাদ নির্ভরশীল ছিলেন। রাজা সীতারাম রায়ের দক্ষ সামরিক ও প্রশাসনিক কাজে সন্তুষ্ট হয়ে, মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন। আনুঃ ১৭০৪ খ্রীঃ তিনি তাঁর শক্তি সংগ্রহের কাজে বহু বাঙালী যুবকের সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। মধুমতী নদীর তীরে সুরক্ষিত নূতন রাজধানী **মহম্মদপুরে** (গুরুর নাম অনুসারে) দুর্গ তৈরী করেন। অর্থ সংগ্রহ ও নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বেশ কয়েকটি জমিদারীর ওপর হামলা করেন। নিজের এলাকা ও সমুদ্রতটে পর্তুগীজ জল-দস্যুদের লুঠ-তরাজ বন্ধ করতে সক্রিয় ভূমিকা নেন।

রাজা সীতারামের সঙ্গে মোগল শক্তির সংঘর্ষ বাঁধে সুবাদার মুর্শিদকুলী খানের

১। রাজা সীতারাম রায়—যদুনাথ ভট্টাচার্য। সীতারাম বিষয়ক প্রবন্ধ—বরদাকান্ত মিত্র।

হুগলীর ফৌজদার মীর আবুতোরাপকে হত্যা করার জন্য ১৭১৩ খ্রীঃ। রাজা সীতারামকে শাস্তি দেবার উদ্দেশ্যে বকস্ আলি খানের নেতৃত্বে নবাবের সৈন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

সুবাদার নাজিম মুর্শিদকুলী খানের অনুরোধে পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণ ও নাটোরের রাজা রামজীবনের দেওয়ান দয়ারাম, রাজা সীতারামের বিরুদ্ধে নবাব সৈন্যদের সক্রিয় সাহায্য করেন। দয়ারাম নিজে তাঁর সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন। রাজা সীতারাম যৌথ সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করেন। নবাব সৈন্য ও দয়ারামের সৈন্যরা সীতারামের রাজধানী 'মহম্মদপুর' লুঠ করে। এমনকি, গৃহ দেবতা 'রামচন্দ্র' বিগ্রহকে মহম্মদপুর থেকে নাটোরে নিয়ে যাওয়া হয় ও পরে দিঘাপতিয়ায় রাজবাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বন্দী অবস্থায় রাজা সীতারামকে মুর্শিদাবাদে নবাবের কাছে হাজির করা হয়। অনেকেই মনে করেন বন্দী অবস্থায় মুর্শিদাবাদে তাঁর মৃত্যু হয় আনুঃ ১৭১৪ খ্রীঃ।[১] রাজা সীতারামের অধিকৃত জমিদারীর অধিকাংশ নাটোর জমিদারী ও কিয়দ অংশ নলডাঙ্গার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অধিকাংশ জীবনীকারদের মতে[২] রাজা সীতারামের মৃত্যুর পর, তাঁর ভাই লক্ষ্মীনারায়ণ মহম্মদপুরেই বাস করতে থাকেন। রাজা সীতারামের তিনটি বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী কমলার গর্ভে কোন সন্তান হয়নি। মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র—শ্যামসুন্দর ও সুরনারায়ণ এবং তৃতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বাসুদেব ও জয়দেব। সুরনারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত ও পৌত্র নবকুমার। সীতারামের বংশের কেউ আছেন বলে জানা যায় না। লক্ষ্মীনারায়ণের বংশধরদের মধ্যে কেউ হয়তো থাকতে পারেন যশোহর বা পশ্চিমবঙ্গে।

রাজা সীতারাম কেবল যে বীর যোদ্ধা ছিলেন তা নয়, তাঁর জীবন-চরিতে বহু জনহিতকর কাজ ও অত্যাচারিত মানুষের সাহায্যে নিজস্ব ভূমিকার কথা জানতে পারা যায়, তবে কিংবদন্তী বা 'লোকে বলে' উপর লেখকরা কিছুটা নির্ভরশীল। জীবনের সব সময় মুসলমান গুরু মহম্মদ আলির প্রভাবে, তিনি প্রথম থেকেই নিজের শক্তি সঞ্চয় করে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সশস্ত্র দস্যু দমনে সক্রিয় হন। হিন্দু মুসলমান জাতি নির্বিশেষে তাঁর রাজত্বে ছিল মুসলমান সেনাপতি মেনাহাতী, আমিন বেগ, বক্তার খান, রূপচাঁদ ঢালী) প্রভৃতি। রাজা সীতারামের রাজকর্মচারীদের মধ্যে দেওয়ান গোবিন্দ রায় ও বৈদ্যনাথ মজুমদার, পেশকার ভবানী প্রসাদ চক্রবর্তী, মুন্সী বলরাম দাস প্রমুখ নামগুলি, রাজা সীতারামের দেওয়া অতি পুরানো জমির পাট্টা, সনন্দ ও দলিল-দস্তাবেজে পাওয়া যায়।

১। রাজা সীতারামের পরিবারবর্গ নবাবকে তিন লক্ষ টাকা নজরানা দিয়ে কলকাতায় এসে নিরাপদ আশ্রয় নেয়। ২। যশোহর ও খুলনা জেলার ইতিহাস—সতীশ চন্দ্র মিত্র।

রাজা সীতারাম তাঁর দরবারে সংস্কৃত ও ফার্সী কবি ও মৌলবীদের বিশেষ মর্যাদা দিতেন। তাঁর কুল-পুরোহিত কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামী, ভাস্করানন্দ আগম-বাগীশ, কবিরাজ অভিরাম সেন কবীন্দ্রশেখর প্রমুখ ব্যক্তিরা তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিলেন। সীতারামের সুনিয়ম ও সুপালনের ফলে, তাঁর সুবিস্তৃত জমিদারীর (২৯টি পরগণা)[১] সব জায়গায় জনবসতি অনেক বেড়ে যায়। তাঁর প্রজারা তাঁকে পৌরাণিক সাগর বংশীয় 'রাজা ভগীরথের' সঙ্গে তুলনা করত। লোকমুখে 'সীতারাম সুখী' প্রবাদ বাক্যে সীতারামের 'রামরাজত্ব'-এর সুখ ও শান্তির অভিব্যক্তি মেলে।

রাজা সীতারাম তাঁর রাজধানী মহম্মদপুরে কয়েকটি প্রাসাদ ও একটি দুর্গ তৈরী করা ছাড়া, বহু পল্লী দেবালয়[২], এমনকি, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বড় জলাধার, খাল (রাম সাগর) এখনও মহম্মদপুরে দেখা গেলেও, স্থাপত্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না, জঙ্গলে ঢাকা ভগ্নস্তূপের মধ্যেও। বাংলার গৌরবময় ইতিহাসে রাজা সীতারামকে[৩] বাংলার 'শিবাজী' বা 'রাণা প্রতাপ' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

রাজা সীতারামের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ যশোগাথায় আছে—

'ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গলা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর॥
এখন বাঘে মানুষে একহ্ ঘাটে সুখে জল খাবে।
এখন রামী-শ্যামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গাস্নানে যাবে॥'

১। কয়েকটি পরগণার নাম—নলদী, সাঁতৈল, তেলীহাটি, ফরিদপুর, খড়েক, ইসপুর, (খুলনা), চিরুলিয়া (বরিশাল), মকজাইগীর, হিলী (নদীয়া)। জমিদারীর দেয় রাজস্ব ছিল ৭৮ লক্ষ টাকা।

২। (ক) লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির (আনুঃ ১৭০৪ খ্রীঃ), (খ) দশভুজালয় মন্দির (১৬৯৯ খ্রীঃ), (গ) কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির (১৬৯৯ খ্রীঃ)। মন্দির গাত্রের লিপি—

ক। 'লক্ষ্মীনারায়ণস্থিত্যৈ তর্কাক্ষিরস ভূশকে
নির্ম্মিতং পিতৃপুণ্যার্থং সীতারামেণ মন্দিরং।'

খ। 'মহীভুজারস ক্ষৌণীশাকে দশভুজালয়ং
আকারি শ্রীসীতারামরায়েণ মন্দিরং।'

গ। 'বাণদ্বন্দ্বাঙ্গচন্দ্রে পরিগণিতশকে কৃষ্ণতোষাভিলাষী
শ্রীমদ্বিশ্বাসভাষোদ্ভবকুলকমলে ভাসকো ভানুতুল্যঃ।
অজস্রং সৌধযুক্তে রুচিররুচিহরে কৃষ্ণগেহং বিচিত্রং
শ্রীসীতারামরায়ো যদুপতিনগরে ভক্তিমামুৎসসর্জ্জ।'

৩। কলকাতার রাজা সীতারাম রায়ের পুণ্যঃ স্মৃতি রক্ষা করছে কালীঘাট—টালিগঞ্জ অঞ্চলে তাঁর নামে একটি রাস্তা—রাজা সীতারাম রোড।

নলডাঙ্গার দেবরায় রাজপরিবার

যশোহর

ষোলো শতকের পর থেকে যশোহরের ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে 'বারোভুঞা' তথা রাজা প্রতাপাদিত্যের [১] নাম অবিসংবাদিতভাবে এসে যায়। ভূষণার রাজা সত্রাজিৎ রায় ও পরে রাজা সীতারাম রায় [২] 'বারোভুঞাদের' অন্যতম। জমিদার রাজা প্রতাপাদিত্য মোগল সেনাপতি ইসলাম্ খানের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন ও বন্দী অবস্থায় মারা যান বারাণসীতে ১৬১১-১২ খ্রীঃ। মোগল সম্রাটের বাংলার সুবাদার ইসলাম্ খান (১৬০৮-১৩ খ্রীঃ), প্রায় সব স্থানীয় রাজা বা জমিদারদের একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত করে, মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেন।

রাজা প্রতাপাদিত্যের শাসনকালের প্রায় ৪৫ বছর পর যশোহর জেলায় নলডাঙ্গার জমিদারীর সূত্রপাত হয়। কালীগঞ্জ থানার কাছে **নলডাঙ্গা** [৩] মঠবাড়ী, কাজীপুর, গুঞ্জনগর গ্রামগুলির মধ্যে নলডাঙ্গায় রাজবংশের মন্দির ও স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ এখন দেখা যায়। প্রসিদ্ধ গুঞ্জনগরে বিখ্যাত চণ্ডীমণ্ডপ ও রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পর্যটকদের এখনও আকর্ষণ করে।

নলডাঙ্গা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা [৪] রাঢ়ী ব্রাহ্মণ গোপীনাথ ভট্টাচার্যের পৌত্র **চণ্ডীচরণ** (দেবরায়)। সম্রাট শাহ্‌জাহানের দ্বিতীয় পুত্র বাংলার সুবাদার শাহ্‌সুজার (১৬৩৯-৫৯ খ্রীঃ) রাজধানী রাজমহলে অবস্থান-কালে, স্থানীয় জমিদার চণ্ডীচরণ যথাযোগ্য নজরানা দিয়ে শাহ্ সুজার কাছে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। খুশী হয়ে শাহ্ সুজা চণ্ডীচরণকে 'রাজা' উপাধি ও খিলাত দেন ১৬৪৩ খ্রীঃ। সম্পূর্ণ মহম্মদশাহী পরগণার মালিক রাজা চণ্ডীচরণের চার পুত্র—**ইন্দ্রনারায়ণ,**

১। যমুনা ও ইছামতী সঙ্গমে ধুমঘাটে রাজা প্রতাপাদিত্যের ছিল রাজ-দরবার। রাজা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যে—'শক্তি, বীরত্ব ও দেশভক্তির উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশেরই কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।'—রমেশচন্দ্র মজুমদার, 'বাংলাদেশের ইতিহাস'।

২। বিস্তারিত আলোচনা 'রাজা সীতারাম রায়' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য—আনুঃ ১৭১৪ খ্রীঃ রাজা সীতারামের নবাব সৈন্যের হাতে বন্দী অবস্থায় মৃত্যুর পর, ভূষণার জমিদারীর কিয়দংশ নলডাঙ্গার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত হয়।

৩। নলডাঙ্গা যশোহর শহর থেকে ৩০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত।

৪। প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক ভিত্তিতে বিষ্ণুদাস হাজরাকেই নলডাঙ্গার দেবরায় পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়।

জানকীনারায়ণ, কালীচরণ ও বিশ্বেশ্বর। জ্যেষ্ঠ পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ ধর্মনিষ্ঠ মানুষ। মঠবাড়ী অঞ্চলে 'ইন্দ্রেশ্বরী' (কালিকা মূর্তি) প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে দেবী 'সিদ্ধেশ্বরী' নামে অভিহিতা। স্বল্পায়ু রাজা ইন্দ্রনারায়ণের চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা **সূর্যনারায়ণ** পিতার আসনে অধিষ্ঠিত হন। রাজা সূর্যনারায়ণের ছয় পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ **উদয়নারায়ণ** উত্তরাধিকারী হন (১৬৮৫-৯৮ খ্রীঃ)। কিন্তু ছোট ভাই রামদেবের ষড়যন্ত্র ও সুবাদার শাহজাদা আজিমুস্‌শান্‌ (১৬৯৭-১৭১২ খ্রীঃ)-এর পরোক্ষ নির্দেশে, উদয়নারায়ণের ঘাতকের হাতে মৃত্যু হয় ১৬৯৮ খ্রীঃ। ভ্রাতৃহন্তা **রামদেব** গদীতে বসেন। সুবাদারের আনুকুল্যে 'রাজা' খেতাব পেয়ে যান দিল্লীর দরবার থেকে ১৬৯৮ খ্রীঃ।

দানশীল রাজা রামদেবের সমসাময়িক ভূষণার রাজা সীতারাম রায়, নাটোরের রাজা রামকান্ত (রানী ভবানীর স্বামী), দিনাজপুরের রাজা রামনাথ ও নদীয়ার রাজা রঘুরাম—প্রত্যেকেই বিশাল জমিদারীর মালিক। নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী খানের (১৭০৩-২৭ খ্রীঃ) আদেশে তাঁরা আপনাপন এলাকার রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত দেওয়ান। ১৭২৭ খ্রীঃ রাজা রামদেব মারা যান। তাঁর দুই পুত্র—রঘুদেব ও কৃষ্ণদেব। জ্যেষ্ঠ পুত্র **রঘু দেবরায়ই**[১] উত্তরাধিকারী হন। সেই সময় বাংলার নবাব নাজিম সুজাউদ্দিন মহম্মদ খান (১৭২৭-৩৯ খ্রীঃ)। বাংলায় সুখ সমৃদ্ধি ফিরে এসেছিল। টাকায় নাকি দশ মন চাল পাওয়া যেত। ১৭৪২-৪৩ খ্রীঃ বর্গীর হাঙ্গামার ফলে বর্ধমানের রাজা চিত্র সেন সপরিবারে রাজা রঘুদেব রায়ের আশ্রয় নেন। নিঃসন্তান রাজা রঘুদেব রায় মারা যান ১৭৪৮ খ্রীঃ। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা **রাজা কৃষ্ণ দেবরায়** গদীতে বসেন। তাঁর সময়ে পলাশীর যুদ্ধ ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-এর মতো দুটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটে। রাজা কৃষ্ণদেব মারা যান ১৭৭৩ খ্রীঃ। তাঁর দুই রানী—লক্ষ্মীপ্রিয়া ও রাজরাজেশ্বরী দেবী।

রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের তিন পুত্র—রাজরাজেশ্বরীর গর্ভে **মহেন্দ্র, রামশঙ্কর** এবং **গোবিন্দচন্দ্র দেব** (দত্তক)। তিন পুত্রের মধ্যে জমিদারী ভাগ হয়ে যায়[২] ১৭৭৭ খ্রীঃ। রাজা গোবিন্দচন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি (তিন আনা) বিক্রী হয়ে যায় ও তাঁর 'রাজা' উপাধি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। একই অবস্থায় রাজা মহেন্দ্র দেবরায়ের জমিদারীর

১। ১৭৭৩ খ্রীঃ নবাব নলডাঙ্গার (যশোহর) রাজা রঘুদেবকে অপদার্থ ও কুচক্রী সাব্যস্ত করে, তার জমিদারী নাটোরের মহারাজা রামকান্তকে দেখাশোনার ভার দেন তিন বছরের জন্য।

২। বড় মহেন্দ্র দেবরায় পান ২/৫ অংশে (গরদ পশ্চিম, বড় রাজা), রামশঙ্কর দেবরায় ২/৫ অংশ (গরদ পূর্ব, ছোট রাজা); এঁরা যুক্তভাবে জমিদারী পরিচালনা করতেন ১৭৯৬ খ্রীঃ পর্যন্ত। গোবিন্দচন্দ্র দেবরায় পান ১/৫ অংশে (তিন আনী রাজা)। তিনজনই 'রাজা' উপাধি পেয়েছিলেন।

ছয় আনা অংশ হস্তান্তর হয়ে যায়। রাজা রামশঙ্কর (১৭৭৩-১৮১২ খ্রীঃ) ছয় আনা অংশের মালিক হলেও নলডাঙ্গার রাজা হিসাবে স্বীকৃতি পান। তাঁর রানী রাধারানী সহমরণে সতী হয়েছিলেন ৯ নভেম্বর, ১৮১২ খ্রীঃ।

রাজা রামশঙ্করের নাবালক পুত্র **শশীভূষণ দেবরায়**-এর জন্ম ১৮১২ খ্রীঃ। ১৮৩০ খ্রীঃ সাবালক হয়ে জমিদারীর গদীতে বসেন। তাঁর সময়ে জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি পায়। খ্যাতিমান রাজা শশীভূষণ মারা যান ১৮৩৪ খ্রীঃ মাত্র চার বছর রাজত্ব করে। তাঁর দত্তক পুত্র রাজা **ইন্দুভূষণ দেবরায়**-এর জন্ম ১৮৩৫ খ্রীঃ। নাবালক থাকায় 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্' জমিদারীর ভার নেয়। সেই সময় পিতামহী রানী তারামণি দেবী নলডাঙ্গা থেকে জমিদারীর ব্যবস্থাপনার যাবতীয় কাজকর্ম স্থানান্তরিত করেন জগন্নাথপুরে—নামকরণ হয় **'গজনগর'**।

রাজা ইন্দুভূষণ

রাজা ইন্দুভূষণ যশোহর জেলা স্কুলে পড়াশোনা করেন। তাঁর দুটি রানী—মধুমতি ও সুখদাময়ী। সাবালক হলেন ১৮৫৩ খ্রীঃ। জনহিতকর কাজে সরকার মারফৎ বহু অর্থ দান করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ সরকারকে কয়েকটি হাতী দিয়ে সাহায্য করেন। সেই সময় নলডাঙ্গার ম্যাজিস্ট্রেট, রাজা ইন্দুভূষণকে ইংরাজ কুঠিয়াল মিঃ অর্লেটকে শারীরিক নিগ্রহের দায়ে অভিযুক্ত করেন। আদালতের রায়ে রাজা ইন্দুভূষণ মুক্তি পান। নবাবদের দেওয়া তাঁর বংশানুক্রমিক 'রাজা' উপাধি প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। কিন্তু বংশের প্রথম রাজা চণ্ডীচরণ দেবরায় প্রাপ্ত পুরুষ-পরম্পরাগত 'রাজা' উপাধি ব্যবহার করার অধিকারের মূল সনন্দটি পেশ করায়, ইংরাজ সরকার ইন্দুভূষণকে 'রাজা' উপাধি ব্যবহার করার অনুমতি দেন ১৮৬০ খ্রীঃ, প্রায় তিন বছর পরে। রাজা ইন্দুভূষণ ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ। সঙ্গীতে তাঁর বিশেষ অনুরাগ। উৎসাহ ও অর্থ সাহায্য দিতেন বিখ্যাত কালোয়াৎ ও গায়কদের ভারতীয় সঙ্গীতের প্রসারের জন্য। অবসর জীবনের শেষ তিন বছর তিনি সপরিবারে ত্রিবেণীতে থাকতেন। ১৮৭০ খ্রীঃ তাঁর দেহাবসান ঘটে নাবালক দত্তক পুত্র প্রমথভূষণকে রেখে।

রাজা প্রমথভূষণ দেবরায়

নলডাঙ্গা রাজবংশের শেষ রাজা প্রমথভূষণ দেবরায় জন্মলাভ করেন ২২ ডিসেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীঃ। কলকাতার মানিকতলায় 'ওয়ার্ড ইনষ্টিটিউশনে' শিক্ষালাভ করেন। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর অভিভাবক ছিলেন। নাবালক অবস্থায়

উত্তর চব্বিশ পরগণার গোবরডাঙ্গার জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারের কন্যা পতিতপাবনী দেবীর সঙ্গে (প্রায় পনেরো বছর বয়সে) প্রমথভূষণের বিবাহ হয় ১৮৭৩ খ্রীঃ। ১৮৭৯ খ্রীঃ সাবালক হয়ে জমিদারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দেশপ্রেমিক রাজা প্রমথভূষণ[১] প্রজাদের স্বার্থে বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকার্য চালু করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। পশুপালনে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। বারাণসীতে সংস্কৃত শিক্ষানবীস ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সময়ে নলডাঙ্গার জমিদারী মধ্যে যশোহর, নদীয়া ও কালীপুর প্রভৃতি অঞ্চল ছিল। বাৎসরিক আয় ২,৬০৪৮১ টাকা ও রাজস্ব বাবদ দেয় ১,৬২২০০ টাকা। নলডাঙ্গায় 'ভূষণ হাই স্কুল' তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পুরীতে সমুদ্রতীরে মনোরম অট্টালিকা 'নলডাঙ্গা হাউস' তাঁর তৈরী। তাঁর 'রাজা' উপাধি সরকারের স্বীকৃতি পায় ১৮৮৫ খ্রীঃ। বারাণসীতে তাঁর মৃত্যু হয় দোলপূর্ণিমায়—মার্চ, ১৯৪১ খ্রীঃ। তাঁর চার কন্যা ও দুই পুত্র—কুমার পন্নগভূষণ ও কুমার মৃগাঙ্কভূষণ। জ্যেষ্ঠ পুত্র পন্নগভূষণের বিবাহ হয় হেতমপুরের জমিদার রাজা রামরঞ্জনের কন্যা অমিলবালা দেবীর সঙ্গে।

জ্যেষ্ঠ কুমার পন্নগভূষণের জন্ম হয় আনুঃ ১৮৯২ খ্রীঃ। মারা যান নভেম্বর, ১৯৫৮ খ্রীঃ ৬৬ বছর বয়সে টালিগঞ্জের বাড়ীতে। তাঁর এক পুত্র পিনাকভূষণ (জন্ম ১৯১৮ খ্রীঃ)-এর দুই কন্যা ও একমাত্র পুত্র প্রবীরভূষণ (জন্ম ১৯৪৩ খ্রীঃ) অপুত্রক। বর্তমানে ১০/১ সুলতান আলম রোড, টালিগঞ্জে বাস করেন।

কনিষ্ঠ কুমার মৃগাঙ্কভূষণের মৃত্যু হয় ১৯৪১ খ্রীঃ। তাঁর দুই পুত্র—মণিভূষণ (মৃত্যু ১৯৭২ খ্রীঃ) ও ফণিভূষণ (জন্ম ১৯১৭ খ্রীঃ)। ফণিভূষণ বর্তমানে পুরীতে 'নলডাঙ্গা হাউসেই' থাকেন। তাঁর আট কন্যা ও দুই পুত্র—শশাঙ্কভূষণ ও জয়ন্তভূষণ। শশাঙ্কভূষণের কর্মস্থল কলকাতায় আর জয়ন্তভূষণ কটক আদালতের আইনজীবী। মণিভূষণের এক কন্যা ও দুই পুত্র—মাণিক্যভূষণ ও প্রণবভূষণ কলকাতায় টালা অঞ্চলে থাকেন।

১। দেশ-মাতৃকাবোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে রাজা প্রথমভূষণ তাঁর জমিদারীতে বন্দবিলা গ্রামে চরকা ও তাঁত বসিয়ে, খাদীবস্ত্র উন্নয়নের কাজে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ায়, ইংরাজ সরকার তাঁকে সুনজরে দেখতেন না।

ক। Report on the district of Jessore by J. Westland (Chapter VIII).
Jessore Gazetteer—L.S.S.O. Mailley. 1912.

খ। যশোহর ও খুলনা জেলার ইতিহাস—সতীশচন্দ্র মিত্র।

চাঁচ্ড়ার সিংহরায় রাজপরিবার

যশোহর

খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকে বাংলার 'বারোভুঞা', রাজা প্রতাপাদিত্য ও অন্যান্য স্বাধীনচেতা জমিদারদের অন্যতম চাঁচ্ড়ার [১] **মুকুব রায়** মোগল শাসনকর্তা ইসলাম্ খানের সাহায্যার্থে প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ১৬১১ খ্রীঃ। রাজা মুকুব রায়ের পূর্ব-পুরুষ **ভবেশ্বর রায়** একজন দক্ষ সৈনিক। মোগল সুবাদার ও সেনাপতি আজিম খান, ১৫৮২ খ্রীঃ বাংলার পাঠান বিদ্রোহ দমনে ভবেশ্বর সাহায্য করায়, তাঁকে সৈয়দপুর, মুড়াগাছা ও মল্লিকপুর পরগণার জমিদারী প্রদান করেন ও 'রাজা' উপাধি দেন। মারা যান ১৫৮৮ খ্রীঃ। মুকুব রায়ের পর রাজা হন **কন্দর্প রায়** (১৬১৯-১৬৪৯ খ্রীঃ)। তারপর রাজা **মনোহর রায়** (১৬৪৯-১৭০৫ খ্রীঃ) ভূষণার রাজা সীতারাম রায়ের সমসাময়িক। দু'জনেই স্বীয় জমিদারী ও প্রভাব বিস্তারে প্রমত্ত ছিলেন। কাজেই মোগল সৈন্যদের বিরুদ্ধে মিলিতভাবে বাধা দান করা সম্ভব হয়নি।

রাজা মনোহর সিংহ রায়ের পুত্র **কৃষ্ণরাম রায়** নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-৮০ খ্রীঃ) কাছ থেকে বাজিতপুর পরগণার কিয়দংশ কেনেন ১৭১৯ খ্রীঃ। কৃষ্ণরামের দুই পুত্র—শুকদেব ও শ্যামসুন্দর[২]। **শুকদেব** ও পরে তাঁর পুত্র **নীলকণ্ঠ** (১৭৪৫ খ্রীঃ) জমিদারীর গদীতে আসীন হন। তাঁর উত্তরাধিকারী **শ্রীকণ্ঠ**। ১৭৬৪ খ্রীঃ জমিদারীর বারো আনা অংশ ইংরাজ সরকারের হাতে চলে যায় এবং তিনি বৃত্তি-ভোগী হন। মারা যান ১৮০২ খ্রীঃ। শ্রীকণ্ঠের উত্তরাধিকারী **বাণীকণ্ঠ** সুপ্রীম কোর্টের আদেশে (১৮০৮ খ্রীঃ) স্বীয় জমিদারী ফিরে পান। মারা যান ১৮১৭ খ্রীঃ। বাণীকণ্ঠের নাবালক পুত্র **বরদাকণ্ঠ** সম্পত্তির অধিকারী হলেও নাবালক হওয়ায়, 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্' জমিদারী দেখাশোনা করে। পরে অবশ্য সাবালক হলে, 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্' জমিদারীর ভার বরদাকণ্ঠের হাতে তুলে দেয় ১৮২৩ খ্রীঃ। তার সময়ে জমিদারীর অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়। সাহস পরগণা কেনেন। বরদাকণ্ঠ সিপাহী বিদ্রোহের

১। 'চাঁচড়া'—যশোহর শহর থেকে প্রায় দেড় কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত। রাজাদের তৈরী মন্দির ও রাজবাড়ী (ভগ্নদশাপ্রাপ্ত) এখনও দেখা যায়।

২। কৃষ্ণরামের মৃত্যুর পর তাঁর জমিদারী দুভাগ হয়। শুকদেবের অংশ ইউসুফ্‌পুর ও শ্যামসুন্দরের সৈয়দপুর। সৈয়দপুরের জমিদারী হাজী মহম্মদ মহসীনের হাতে চলে যায়। তিনি এই জমিদারী দান করেন হুগলী ইমামবাড়া তৈরীর জন্য (১৮১৩ খ্রীঃ) এবং 'মহসীন কলেজ ও (মুসলমান ছাত্রদের জন্য) ব্যয়-ভার বহনের উদ্দেশ্যে।

সময় (১৮৫৭ খ্রীঃ) তাঁর রাজভক্তির বিশেষ পরিচয় দেন সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করে। স্বীকৃতি হিসাবে ইংরাজ রাজ প্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬—৬২ খ্রীঃ) তাঁকে 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীঃ। রাজা বরদাকণ্ঠ পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বাড়ীর বিত্তশালী জমিদার বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের (১৭৬১-১৮১৮ খ্রীঃ) বিশেষ বন্ধু ছিলেন। রাজা বরদাকণ্ঠের তিনটি রাণী—মনোমহিনী, দুর্গাসুন্দরী ও চন্দ্রমুখী, পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা। মনোমহিনীর গর্ভে একপুত্র কুমার গিরিজা-কণ্ঠ (অকাল মৃত্যু), দুর্গাসুন্দরীর গর্ভে দুই পুত্র—কুমার জ্ঞানদাকণ্ঠ ও কুমার মানদাকণ্ঠ। চন্দ্রমুখীর গর্ভে দুই পুত্র—কুমার হেমদাকণ্ঠ ও কুমার স্মৃতিকণ্ঠ (অকাল মৃত্যু) ও এক কন্যা। রাজা বরদাকণ্ঠের মৃত্যু হয় ১৮৮০ খ্রীঃ।

রাজা বরদাকণ্ঠের দ্বিতীয় পুত্র **জ্ঞানদাকণ্ঠ** উত্তরাধিকারী হয়ে রাজা উপাধি পান ১৮৮৮ খ্রীঃ ছোটলাট স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন্ বেইলীর আমলে। তাঁর দুই কন্যা নীলোজবরণী ও নিরোদবরণী। অপুত্রক রাজা জ্ঞানদাকণ্ঠ দত্তক নেন তাঁর তৃতীয় ভ্রাতা মানদাকণ্ঠের তৃতীয় পুত্র ক্ষিতীশকণ্ঠকে, এবং নাম রাখেন ক্ষীরোদাকণ্ঠ। কুমার ক্ষীরোদা কণ্ঠের স্ত্রী কনকপ্রভা দেবীর গর্ভে একমাত্র পুত্র বেদকণ্ঠের জন্ম হয় ১৯১৭ খ্রীঃ। ক্ষীরোদা কণ্ঠ মারা যান ১৯৬০ খ্রীঃ। বেদকণ্ঠের বিবাহ হয় দিনাজপুরের জমিদার রাজা জগদীশনাথের দ্বিতীয়া কন্যা স্মৃতিলতার সঙ্গে। এঁদের একমাত্র পুত্র দীপকণ্ঠ ও পৌত্র উদয়কণ্ঠ। এঁরা সকলেই ৫০ এইচ্ ইলিয়ট রোডে বাস করেন।

রাজা বরদাকণ্ঠের তৃতীয় পুত্র **কুমার মানদাকণ্ঠের** চার পুত্র—সতীশকণ্ঠ, জ্যোতিষ কণ্ঠ, ক্ষিতীশকণ্ঠ ও নৃপতিকণ্ঠ (অপুত্রক)। সতীশকণ্ঠের দুই পুত্র—উমাকণ্ঠ (স্বল্পায়ু) ও শ্যামাকণ্ঠের তিন পুত্র—শিবকণ্ঠ (পুত্র শচীকণ্ঠ), শক্তিকণ্ঠ ও সুধাকণ্ঠ (দুজনেই অবিবাহিত)। এঁরা ৪ বি ও সি, পার্কসাইড রোডের বাড়ীতে বাস করেন। জ্যোতিষকণ্ঠের এক পুত্র নির্মলকণ্ঠের চার পুত্র—দেবকণ্ঠ, পীযূষকণ্ঠ, প্রিতীশকণ্ঠ ও সুভাষকণ্ঠ। এঁরা ভবানীপুরে ২৩।৬, রায় স্ট্রীট, বসবাস করেন।

১। ২০ আগষ্ট, ১৮৩৮ খ্রীঃ 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার সংবাদে জানা যায় যে, চাঁচড়ার জমিদার রাজা শ্রীকণ্ঠ 'মালাই পরগণা' ৫২ হাজার টাকায় কলকাতার বিত্তশালী দেওয়ান দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের কাছে বন্ধক রাখেন। দুর্গাচরণ ছেলের নামে বেনামীতে পরগণাটি বিক্রি করে দেন সাতক্ষীরার জমিদারকে আড়াই লক্ষ টাকায়। পরে পৌত্র রাজা বরদাকণ্ঠ কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে প্রতারণামূলক লেনদেনের নালিশ করলে, সর্বসাকুল্যে সাড়ে ৪০ লক্ষ টাকার ডিক্রি পান। 'প্রিভি কাউন্সিল' ২৬ মে, ১৮৩৮ খ্রীঃ রায়ে হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন। সত্যের জয় হলেও রাজা বরদাকণ্ঠের ভাগ্যবল নিশ্চয় ছিল।

দিনাজপুরের রায় রাজপরিবার

সতেরো শতকের প্রথমভাগে সম্রাট শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে বাংলার সুবাদার ছিলেন শাহ্‌জাদা মহম্মদ সুজা (১৬৩৯-৬০ খ্রীঃ)। সেই সময় দিনাজপুরের উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ জমিদার শ্রীমন্ত চৌধুরীর পুত্রের অকাল মৃত্যু হওয়ায়, ভাগিনেয় শুকদেব ঘোষ জমিদারীর মালিক হন। শুকদেবের কর্মদক্ষতা ও অসাধারণ নেতৃত্বে সন্তুষ্ট হয়ে, বাদশা তাঁকে 'চৌধুরী', 'তালুকদার' ও পরে (১৬৫৬ খ্রীঃ) 'রাজা' খেতাব দেন ও নব্বইটি পরগণার তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন।

মহারাজা প্রাণনাথ রায়

রাজা শুকদেবের দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্র প্রাণনাথ জমিদারীর উত্তরাধিকারী হন ১৬৮২ খ্রীঃ। বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খান (১৬৮৯-৯৭ খ্রীঃ) স্থানীয় জমিদার রাঘবেন্দ্রের বিদ্রোহ দমনে ও পরে বর্ধমানের জমিদার রাজা শোভাসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, রাজা প্রাণনাথের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলেন। ১৬৯৭ খ্রীঃ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দরবারে প্রাণনাথ আহূত হন। সম্রাট তাঁকে প্রশংসনীয় বীরত্বের জন্য 'মহারাজা বাহাদুর' ও বাদশাহের 'উকিল' খেতাব দেন। কালক্রমে প্রাণনাথ রায় ১১২টি পরগণার মালিক হয়ে, দেশের ও দশের জন্য বহু জনহিতকর কাজ করেছেন। আড়ম্বরের মধ্যে দিয়ে জীবন-যাপন করলেও, বিশাল দিঘি 'সুখসাগর'-এর সংস্কার করা ছাড়া, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'প্রাণসাগর', 'মাতাসাগর' প্রভৃতি বড় বড় দিঘি। কাঁঠাল নগরের (কান্তনগর) বিখ্যাত 'শ্রীকান্ত জীউর' মন্দির প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন এলাকায় দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর ও পীরোত্তর ভূদান, তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে। মহারাজা প্রাণনাথের মৃত্যু হয়, মার্চ, ১৭২৩ খ্রীঃ। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর সমৃদ্ধ জমিদারীর গদীতে আসীন ছিলেন।

মহারাজা রামনাথ রায়

মহারাজা প্রাণনাথের দত্তক পুত্র রামনাথ নবাব সুবাদার মুর্শিদকুলী খানকে ৪,২১,৪৫০ টাকা নজরানা দিয়ে দিনাজপুর জমিদারীর গদীতে [1] বসেন। তিনি একজন কৃত্তি-পুরুষ ও রাজনীতিজ্ঞ মানুষ। একাধিকবার স্বয়ং যুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। নবাবকে সাহায্য করায় তাঁর অনুগ্রহ লাভ করেন ও জমিদারীর স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হন। ধর্মপ্রাণ রাজা রামনাথ ১৭৪৫ খ্রীঃ উত্তর ভারতের প্রায় সব তীর্থস্থান ভ্রমণ করে

১। সেই সময় দিনাজপুর জমিদারীর আয়তন ছিল—১০৩টি মহল, ৬৭টি পরগণা ও ৪২টি কিসমৎ।

দিল্লী দরবারে সম্রাট মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সম্রাট তাঁকে ছাতা, চামর প্রভৃতি রাজকীয় সম্মান উপহার ও বংশগত 'মহারাজা বাহাদুর' খেতাব দেন। পিতার ন্যায় বহু মন্দির ও দিঘি (রামসাগর) প্রতিষ্ঠা করেছেন। বর্গীর হাঙ্গামা (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) থেকে দিনাজপুরকে পরিখা দিয়ে সুরক্ষিত করেছিলেন। রাজা রামনাথের সময় শস্য-সম্পত্তিতে দিনাজপুর জমিদারী ছিল লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ভূমি। রাজা বিপুল অর্থের মালিক হন। নবাবরা তাঁর কাছে টাকা ধার করতেন। নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময় রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল ৪,৬২৯৬৪ টাকা আর পরে মীরকাশিমের সময় চারগুণ বেড়ে হয়েছিল ১৮,২০৭৮০ টাকা। মহারাজা রামনাথের চার পুত্র— কৃষ্ণনাথ, রূপনাথ, বৈদ্যনাথ ও কান্তনাথ। মহারাজা রামনাথ মারা যান ১৭৬৩ খ্রীঃ।

মহারাজা রামনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র **কৃষ্ণনাথ** রাজা হন। দুর্ভাগ্যবশতঃ দিল্লী থেকে দেশে ফিরে আসার পথে মারা যান। রাজা রামনাথের তৃতীয় পুত্র **বৈদ্যনাথ** রাজ-গদীতে বসেন। তখন বাংলার নবাব মীরকাশিম (১৭৬০-৬৩ খ্রীঃ)। নবাবের সঙ্গে তাঁর সাময়িক বিবাদের ফলে, তাঁকে একবার গদীচ্যুত করা হয়েছিল— ইংরাজ কোম্পানীর হস্তক্ষেপে আবার গদী ফিরে পান। মহারাজা বৈদ্যনাথ বাংলার ভয়াবহ ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ত্রাণকার্যে ১৭৬৯-৭০ খ্রীঃ মুক্তহস্তে দান করেছিলেন।

মহারাজা রাধানাথ রায়

১৭৮০ খ্রীঃ মহারাজা বৈদ্যনাথের মৃত্যুর পর নাবালক দত্তক পুত্র রাধানাথ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের (১৭৫৯-১৮০৬ খ্রীঃ) ফরমানে রাজ-গদীতে বসেন। সেই সনন্দে ইংরাজ কোম্পানীর গভর্নর ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ ৭৩০ স্বর্ণমুদ্রা নজরানা নিয়ে তবে প্রতি-দস্তখত করেন।

দুর্ভিক্ষ-কবলিত বাংলার জমিদারদের দেয়-রাজস্ব নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জমা না দেওয়ায়, ইংরাজ সরকারের প্ররোচনায়, তৎকালীন কুখ্যাত অত্যাচারী নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খান, নদীপুরের জমিদার **রাজা দেবী সিংহ** ও গুডল্যাড্ সাহেব, দিনাজপুর সহ বহু জমিদারদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। এই অত্যাচারের নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায় মহামতী **বার্ক সাহেবের** পার্লামেন্ট বক্তৃতায় [১]। নাবালক রাজা রাধানাথ এই অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাননি। তাঁর অভিভাবক মাতুল রাজা

১। Impeachment of 'Warren Hastings'—এই প্রসঙ্গে ১৭৮২ খ্রীঃ চার্লস্ গ্রাণ্ট্ সাহেবের প্রতিবেদনে—দেবী সিংহের রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলের জমিদার ও প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচারের বর্ণনা পাওয়া যায়।

জানকীরাম সিংহ ও পরে (১৭৮৭ খ্রীঃ) নিকট আত্মীয় রাজা রামকান্ত রায় জমিদারীর তত্ত্বাবধান করেছিলেন। মহারাজা রাধানাথ ১৭৯২ খ্রীঃ সাবালক হয়ে জমিদারীর ভার গ্রহণ করেন, তখন দিনাজপুর জমিদারীর অতি শোচনীয় অবস্থা—রাজস্ব কর বাকি পড়ায় একটির পর একটি পরগণা নিলাম হয়ে যায়। তার উপর দেশে ১৭৯৪ খ্রীঃ আবার দুর্ভিক্ষ। প্রজাদের হাহাকার। অসহায় মহারাজা রাধানাথ অপমানে ১ ও ঋণে জর্জরিত হয়ে দুঃখে ও ভগ্নহৃদয়ে অপুত্রক অবস্থায় মারা যান ২ জানুয়ারী, ১৮০১ খ্রীঃ মাত্র সাতাশ বছর বয়সে। স্ত্রী মহারানী ত্রিপুরাসুন্দরী **গোবিন্দনাথ** দত্তকে দত্তক নেন। জমিদারী 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডসের' হাতে চলে যায়। ১৮১৭ খ্রীঃ রাজা রাধানাথের পাওয়া বংশগত 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি ইংরাজ সরকার তাঁর বংশধরদের ব্যবহারের জন্য অনুমোদন করেছিলেন। রাজা গোবিন্দনাথের মৃত্যু হয় ১৮৪১ খ্রীঃ।

মহারাজা গোবিন্দনাথের দুই পুত্র—**ত্রৈলোক্যনাথ** ও **তারকনাথ**। ত্রৈলোক্যনাথের অকাল মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় পুত্র তারকনাথ জমিদারীর গদীতে বসেন। মহারাজা তারকনাথ একজন রাজভক্ত জমিদার। তাঁর সময় সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭ খ্রীঃ), সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রীঃ) ও পরে ভূটান যুদ্ধ (১৮৬৫ খ্রীঃ) ঘটে। প্রত্যেকটি সংকটের সময় ইংরাজ সরকারকে যানবাহন, আশ্রয় ও লোকজন দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। তিনি ব্রতী ছিলেন দিনাজপুর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনমঙ্গল কাজে—রাস্তা নির্মাণ, চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। তার মৃত্যু হয় ১৮৬৫ খ্রীঃ। স্ত্রী মহারানী শ্যামমোহিনী দত্তক নেন গিরিজানাথ দত্তকে ১৮৬৭ খ্রীঃ। জমিদারীর কাজকর্মে মহারানীকে সাহায্য করেন তাঁর ভাই রায়বাহাদুর ক্ষেত্রমোহন সিংহ। পরে লর্ড লিটন ক্ষেত্রমোহনকে 'রাজা' উপাধি দেন।

১ ক। নবাব মুর্শিদকুলী খানের দৌহিত্র-জমাতা ও বাংলার নায়েব-দেওয়ান পরাক্রমশালী কুখ্যাত সৈদয় মহম্মদ রেজা খানের হিন্দু জমিদার নির্যাতনের (রাজস্ব বাকী পড়লে) পৈশাচিক ব্যবস্থা —'বৈকুণ্ঠ' বাস—অর্থাৎ পূতিগন্ধময় আবর্জনাপূর্ণ একটি বড় গর্তে অনাহারে বাস করা। এই সম্বন্ধে মিঃ জে. সি. মার্সম্যান্ লিখেছেন—'Reza Khan exceeds all others in cruelty. To enforce the collections, he caused a pond to be dug, which was filled with ordure and intolerable filth. The zamindars who withheld their rents, were dragged with a rope through this place, which the inventor called, by way of mockery, 'Baikunt' or Paradise'.

খ। 'দুঃখের বিষয় এই রাধানাথই অত্যাচারী হেষ্টিংস-এর প্রশংসা করিয়া লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এরূপ এই দেশেই সম্ভব।' জনৈক ঐতিহাসিকের মন্তব্য।

মহারাজা গিরিজানাথ রায়

মহারানী শ্যামমোহিনীর দত্তক গিরিজানাথের [১] জন্মহয় ২৮ জুলাই, ১৮৬২ খ্রীঃ। দিনাজপুরে কালিয়াগঞ্জে ছয় মাইল লম্বা খাল ও দাতব্য চিকিৎসালয় নির্মাণ করা ছাড়া। ১৮৭৪ খ্রীঃ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে তিনি অকাতরে অন্নদান করেন। তার সৎকর্মের স্বীকৃতি-স্বরূপ ইংরাজ সরকার রানী শ্যামমোহিনীকে 'সি. আই'. ও 'মহারানী' উপাধি ও পঞ্চাশজন সশস্ত্র অনুচর রাখার অধিকার দেন ২৬ জুলাই, ১৮৭৫ খ্রীঃ। গিরিজানাথ লেখাপড়া শুরু করেন স্বগৃহে। পরে পাঁচ বছর যাবৎ (১৮৭১-৭৫ খ্রীঃ) 'বেনারস্ কুইন্স্ কলেজে' উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। দিনাজপুরে ডঃ যোগেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যশোদানন্দ প্রামাণিক ও পণ্ডিত বৃন্দাবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর শিক্ষক ছিলেন। মহারাজা গিরিজানাথ জমিদারীর কার্যভার গ্রহণ করেন ১৮৮২ খ্রীঃ। গণিত ও ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ। পণ্ডিত-প্রবরদের সাহায্যে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করেন। তিনি ছিলেন প্রেমিক বৈষ্ণব। পৌর প্রতিষ্ঠান ও জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যসভার সভ্য এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও 'কিং এডওয়ার্ড তহবিলে' দান, খোমসোন্ ক্যানাল ও গঙ্গা-ক্যানাল্ খনন, 'দিনাজপুর জুবিলী স্কুল', ছাত্র নিবাস ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি তাঁর সৎকর্মের নিদর্শন। বড়লাট লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনে (১৯০৫-১১ খ্রীঃ) সক্রিয় ভূমিকা নেন। তিনি ছিলেন 'বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের' বিশেষ দরদী মানুষ। ১৯১৪ খ্রীঃ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তার আগে ১৯১২ খ্রীঃ কলকাতায় সর্বভারতীয় সম্মেলনে তিনি অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন। প্রথম ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ খ্রীঃ) ইংরাজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য

---

১ ক। ইংরাজ জীবনীকার মিঃ এ. ক্লাউড্ ক্যাম্বেল্ তাঁর 'Glimpses of Bengal'—1907 গ্রন্থে মহারাজা গিরিজানাথ সম্বন্ধে লিখেছেন—'The Dinajpur Raj is the oldest in Bengal, and its succession is controlled by the law of primogeniture. The Maharaja although young, is a stunch Hindu and is free from the vices that most wealthy youths are heir to. His tastes are of a high character ; he is fond of the fine arts, particularly of music. His charities are quite unostentatious....... He gives away large sums of money to associations, schools, libraries, sporting clubs etc., in addition almost all the Pandits of the lower and some of the United Provinces share in his gifts'.

খ। বংশ পরিচয়, তৃতীয় খণ্ড—জ্ঞানেন্দ্র কুমার।

গ। 'চিত্ররাজি পরিচয়' দ্রষ্টব্য।

করেছিলেন। তাঁর সৎকার্য ও রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি স্যার অগস্টাস্ রিভার্স টমসন্ গিরিজানাথকে ১৮৮৫ খ্রীঃ 'মহারাজা' খেতাব দেন। ১৯০০ খ্রীঃ 'মহারাজা-বাহাদুর' ও ১৯১৪ খ্রীঃ 'কে. সি. আই. ই.' খেতাবে ভূষিত হন। জানুয়ারী, ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক দরবারে মহারাজা গিরিজানাথ নিমন্ত্রিত অতিথিদের অন্যতম। অপুত্রক মহারাজা গিরিজানাথ দত্তক নেন জগদীশনাথকে ১৯০০ খ্রীঃ। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ডিসেম্বর, ১৯১৯ খ্রীঃ (৫ পৌষ, ১৩২৬ সন)।

মহারাজা জগদীশনাথ রায়

মহারাজা গিরিজানাথের দত্তক পুত্র জগদীশনাথ জমিদারীর গদীতে বসেন। গৃহশিক্ষকের কাছে ইংরাজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিদ্যালাভ করেন [১]। কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীঃ বিবাহ হয় রানী শতরূপাদেবীর সঙ্গে। তাঁর ছয় কন্যা সন্তান। বংশের ঐতিহ্য রক্ষায় তিনি বিশেষ যত্নবান ছিলেন। প্রজাদের উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য অর্থব্যয় করেছেন। দিনাজপুরের প্রায় সব জন-প্রতিষ্ঠান, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও 'বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার অ্যাসোসিয়েশন্'-এর কর্মকর্তা এবং দিল্লীতে 'ভাইসরয়ের একসিকিউটিভ কাউন্সিলের' সভ্য ছিলেন। কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৭ জুলাই, ১৯৬১ খ্রীঃ।

মহারাজা জগদীশনাথের প্রথমা কন্যা প্রীতিলতার বিবাহ হয় পঞ্চথুপীর জমিদার অজিতমোহন ঘোষের সঙ্গে। এঁদের ছয় পুত্র—সুজিৎ (বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী), সুহৃদ, সুশীত, সুনীত, সুচিত ও সচ্চিদানন্দ। বসবাস করেন ৩৮এ, কালীঘাট রোডে। দ্বিতীয়া কন্যা স্মৃতিলতার বিবাহ হয় যশোহরের চাঁচড়া রাজপরিবারের বেদকণ্ঠ সিংহ রায়ের সঙ্গে। এঁদের এক পুত্র দীপকণ্ঠ। বাসভবন ৫০ এইচ্ ইলিয়ট্ রোড। তৃতীয়া কন্যা—শ্রুতিলতার অকাল মৃত্যু হয়। চতুর্থা কন্যা—ধৃতিলতার স্বামী দীলিপ সিংহ, সেসন্ জাজ্, পাটনা। পুত্র অভিজিৎ। পঞ্চমা কন্যা উর্মিলতার বিবাহ হয় সোমনাথ সিংহের সঙ্গে। তাঁদের পুত্র সরজিৎ সিংহ। বর্তমানে থাকেন ১১এ, বোর্ণফিল্ড রোড, আলিপুর। ষষ্ঠ কন্যা—অশ্রুলতা (অবিবাহিতা)

১। তাঁর জীবন কাহিনীতে বিদেশী শিক্ষাবিদদের উল্লেখ রয়েছে—'A tutor was also provided in the persons of Mr. E. Candler B. A., Mr. Mackenjee and Mr. A. Cormack, M. A., Bar-at-law, I. E. S. He was given a practical education in zamindary practice and management'

ডিমলার সেন রাজপরিবার

রংপুর

রংপুর জেলায় নীলফমারী মহকুমার অন্তর্গত ডিমলার দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ সেন রাজপরিবারের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সমাজের এক মধ্যবিত্ত ব্যক্তিও আপন প্রতিভাবলে ও প্রচেষ্টায় কিভাবে প্রভূত ধনরাশি ও 'রাজার' মর্যাদার আসনের অধিকারী হতে পারে। এর দৃষ্টান্ত রয়েছে রাজা জগৎবল্লভ সেনের কর্মজীবনে।

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথমার্ধে বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন নবাব নাজিম মুর্শিদকুলী খানের জামাতা নবাব নাজিম সুজাউদ্দীন খান (১৭২৭-৩৯ খ্রীঃ)। নবাব সুজাউদ্দীনের অনেক গুণ থাকলেও, তিনি বিলাসী ও রাজকার্য পরিচালনায় অনিচ্ছুক ছিলেন। সেই সময় জগৎবল্লভ উড়িষ্যায় একজন সাধারণ রাজকর্মচারী ছিলেন। নবাব আলিবর্দীর শাসনকালে বর্গীর হাঙ্গামায় বাংলা, বিশেষ করে উড়িষ্যাকে, কয়েক বছর ধরে (১৭৪২-৫১ খ্রীঃ) চরম অরাজকতার শিকার হতে হয়েছিল। স্বয়ং আলিবর্দী বর্গী আক্রমণের বিরুদ্ধে নবাব সৈন্যদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জগৎবল্লভ সর্বতোভাবে নবাবকে সাহায্য করেছিলেন। স্বীকৃতি হিসাবে নবাব জগৎবল্লভকে দিল্লী-দরবারের অনুমতি ক্রমে যথেষ্টধনরাশি ও ভূ-সম্পত্তির মালিক করে দেন। পরে 'রাজা' উপাধি পান।

জগৎবল্লভের কুল-পরিচয় জানা না গেলেও, কিছু দলিল-দস্তাবেজ থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর কুল-পুরোহিতদের চল্লিশ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন এবং দাতারা ছিলেন কায়স্থ বংশীয়। পরে পিতাম্বর সেন তাঁর পিতা জগৎবল্লভের বিশাল সম্পত্তির অধিকারী হন। তাঁর পুত্র হররাম সেন [১] প্রকৃতপক্ষে ডিমলা রাজপরিবারের প্রাণ-পুরুষ। আঠারো শতকের শেষার্ধে হররাম দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, শীঘ্রই বিদেশী ইংরাজ শক্তির উত্থানের ফলে মুসলমান রাজশক্তির অবসান হবে। অতঃপর তিনি নিজের ভাগ্যের উন্নতির আশায় উড়িষ্যা থেকে বাংলায় রংপুর শহরে মহীগঞ্জ এলাকায় সাময়িকভাবে চলে আসেন, আনুঃ ১৭৫৫ খ্রীঃ (ভিন্নমতে ১৭৭০ খ্রীঃ)।

নবাব মীরজাফর মুর্শিদাবাদ মসনদে বসার পর, ক্লাইভের নির্দেশে কুখ্যাত রেজা খান নবাবের দেওয়ান ও অত্যাচারী রাজা দেবী সিংহ রংপুরের দেওয়ান [১] হন। সেই সময় হররাম সেন ছিলেন দেবী সিংহের উগ্র প্রতিনিধি। 'বাবু' (নবাবী খেতাব)

১। Rangpur Gazetteers—J. A. Vas—1911 A,D. বংশ পরিচয়—৩য় খণ্ড—জ্ঞানেন্দ্রকুমার

হররাম সেন রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ মানুষ। ভয়াবহ ১১৭৬ সনের (১৭৬৯ খ্রীঃ) মন্বন্তর কবলিত বাংলার জমিদার ও প্রজারা সকলেই রাজস্ব জমা দিতে অপারক। হররাম—দেওয়ান রেজা খান ও দেবী সিংহের নির্দেশে, অকল্পনীয় অত্যাচারের মাধ্যমে[১] তাঁদের কর দিতে বাধ্য করেছিলেন। রংপুরের তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ গুড্‌ল্যাণ্ড, ইংরাজ সরকারকে দেওয়া রিপোর্টে এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। রংপুর, দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে বহু ছোট বড় জমিদারী নিলাম হয়ে যায়। রাজা দেবী সিংহ ও হররাম নিজেদের নামে বা উত্তরাধিকারীদের নামে কিনে নেন। হররাম সেন মারা যান আনুঃ ১৭৯০ খ্রীঃ পুত্র রামজীবনকে রেখে। ১৭ বছর জমিদারী ভোগ করার পর রামজীবন মারা যান ১৮০৭ খ্রীঃ। ডিমলা জমিদারী ১৭৯৩ খ্রীঃ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' নথীভুক্ত করা হয়। তাঁর পুত্র জয়রাম নিষ্ঠাবান ও দক্ষ জমিদার। তিনি মহীগঞ্জ থেকে ডিমলায় তাঁদের বাস্তু স্থানান্তরিত করেন। অপুত্রক জয়রাম নীলকমল দত্তকে দত্তক নেন। নীলকমলের অকাল মৃত্যুতে স্ত্রী শ্যামাসুন্দরী চৌধুরানী জানকীবল্লভকে দত্তক নেন। জমিদারী 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্'-এর হাতে চলে যায়।

১৮৫২ খ্রীঃ শ্যামাসুন্দরীর মৃত্যু হয়। দত্তক পুত্র জানকীবল্লভ সাবালক হয়ে 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্' থেকে স্বহস্তে জমিদারীর ভার নিয়ে, প্রথম কয়েক বছর মামলা-মোকদ্দমায় বহু টাকা ব্যয়ের ফলে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। হাইকোর্টের রায়ে জানকীবল্লভ জমিদারীর অধিকারী হয়ে নিজেকে ঋণমুক্ত করেন। কিছুদিনের মধ্যে তিনি আরও ভূসম্পত্তি কেনেন—রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, এমনকি বারাণসীতেও। রাজা জানকীবল্লভ চিরস্মরণীয় হয়েছেন, তাঁর নিঃস্বার্থভাবে কমপক্ষে পঁচিশ জন দুঃস্থ জমিদারদের আর্থিক সাহায্য ও সুপরামর্শ দেওয়ায়। বহু জনহিতকর কার্যে তাঁর যথেষ্ট দান ছিল। ১২৮০ সনের (১৮৭৩ খ্রীঃ) দুর্ভিক্ষে তিনি ৭৫,০০০ টাকা সাহায্য করেছিলেন। রংপুরে 'শ্যামাসুন্দরী খাল' তাঁর অনুদানে কাটা হয়। দার্জিলিং-এ স্যানিটোরিয়ামের সাহার্যার্থে তাঁর দান ছিল। ম্যালেরিয়া নিবারণ প্রকল্পে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান্ ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁর সৎকর্মের ও রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ ইংরাজ সরকার তাঁকে 'রাজা' উপাধি দেন ১ জানুয়ারী, ১৮৯১ খ্রীঃ (মরনোত্তর)। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এই সম্মান ভোগ করতে পারেনি। রাজা জানকীবল্লভের দেহাবসান ঘটে ১৪ অক্টোবর, ১৮৯০ খ্রীঃ। তাঁর উত্তরাধিকারী পুত্র যামিনীবল্লভ। তাঁর উত্তরপুরুষদের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না।

১। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে ২২ ফেব্রুয়ারী, ১৭৮৩ খ্রীঃ রংপুরে কৃষক বিদ্রোহের (ফকির বিদ্রোহ) নেতা ছিলেন দয়াশীল ও নুরুল-উদ্দীন। ১৭৮৭ খ্রীঃ মজনুশাহ, ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী প্রমুখ জনসেবী বিদ্রোহীদের দমনের জন্য ব্রেনানকে ইংরাজ সরকার নিযুক্ত করেছিলেন।

রায় রাজপরিবার

তাজহাট, রংপুর

খ্রীষ্টীয় আঠারো শতকের প্রথম ভাগে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ার-এর রাজত্বকালে (১৭১৩-১৯ খ্রীঃ) পাঞ্জাবের অধিবাসী ক্ষত্রিয়-বংশজাত **মান্নালাল রায়** রংপুরে মহিগঞ্জে (তাজহাট [১] অঞ্চলে) বসতি শুরু করেন। তিনি ছিলেন জহুরী, সোনা রূপার ব্যবসায়ী। তাঁর পৌত্র **ধনপৎ রায়** বিবাহসূত্রে কুড়ুমকার জমিদার রতনলাল রায়ের ভূসম্পত্তির অধিকারী হন। ধনপৎ রায়ের পৌত্র **উপেন্দ্রলাল রায়** নাবালক অবস্থায় মারা যাওয়ায় উত্তরাধিকারী হন তাঁর কাকা **গিরিধারীলাল রায়**। তেজারতি ও জহুরী ব্যবসায়ে কালক্রমে প্রচুর ধনরাশির অধিকারী হয়ে, মহিগঞ্জের সংলগ্ন কয়েকটি জমিদারী কেনেন। নবাব ও পরে ইংরাজ সরকারের আনুকুল্যে গিরিধারী লালের দত্তক পুত্র গোবিন্দলাল রায় [২] একজন প্রতিষ্ঠিত জমিদার হিসাবে গণ্য হন। বিশেষ করে তিনি ছিলেন ইংরাজ রাজকর্মচারীদের একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি।

মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর

গোবিন্দলালের জন্ম হয় কলকাতায় ১৮৫৪ খ্রীঃ। গোবিন্দলাল তাঁর জমিদারীর এলাকাভুক্ত অঞ্চলের উন্নতিকল্পে ও সরকারের জনহিতকর ও ত্রাণকার্যে মুক্তহস্তে দান করেছেন। গুণগ্রাহী ইংরাজ সরকারের প্রতিনিধি স্যার রিভার্স টমসন্ তাজহাটে এক দরবারে গোবিন্দলালকে 'রাজা' উপাধি দেন ১৮৮৮ খ্রীঃ। পরে কলকাতার 'বেলভেডেয়ারে' স্যার চার্লস্ ইলিয়ট্ দেন 'রাজা বাহাদুর' ১৮৯২ খ্রীঃ এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ তিনিই রাজা গোবিন্দলালকে 'মহারাজা' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। গোবিন্দলাল রাজকীয় সম্মান বেশী দিন ভোগ করতে পারেননি। ৩০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ সন (১২ জুন, ১৮৯৭ খ্রীঃ), রংপুরে ভয়াবহ ভূকম্পে আকস্মিক দুর্ঘটনায় গুরুতররূপে আহত হয়ে, ১২ দিন বাদে ২৪ জুন, মারা যান ৪৩ বছর বয়সে। তাজহাটের রাজভবন, 'গ্রন্থজীর মন্দির' 'মঙ্গৎ প্রাসাদ' প্রভৃতি তাঁর সময়ে তৈরী হয়েছিল। তাঁর দানের খতিয়ানের পাতায়—রংপুরে রাস্তা নির্মাণ, স্কুল, কলেজ, চিকিৎসালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য ছাড়া, কলকাতায় 'মার্কাস্ স্কোয়ার রিক্রিয়েশান্ ক্লাব গ্রাউণ্ড

১। 'তাজ', অর্থাৎ 'মুকুট' বা শিরোপা ; হাট অর্থাৎ বাজার।

২। মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুরের জীবনচরিত—চন্দ্রকিশোর রায় গুণাকর, ১৩০৪ সন। বংশ পরিচয়, ৩য় খণ্ড—জ্ঞানেন্দ্রকুমার। The Cyclopedia of India Vol. III. 1909.

ফাণ্ডে, ১৫,০০০ টাকা ও দার্জিলিং-এ লুইস স্যানিটোরিয়ামে ৯০০০০ টাকা দানের বিশেষ উল্লেখ আছে। মহারাজা গোবিন্দলাল মুর্শিদাবাদের জমিদার রায় লছমীপৎ সিংকে এক লক্ষ টাকা ধার দিয়েছিলেন তাঁকে বিপদমুক্ত করার জন্য। তাছাড়া রংপুরের জমিদারীর আট আনা অংশীদার জগদীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর (মন্থনা পরগণা) ঋণের দেড় টাকা গোবিন্দলাল মুকুব করে দেন। কিন্তু জগদীন্দ্রনাথ পরে গোবিন্দলালের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এই হল উপকারের প্রতিদান।

রাজা গোপাললাল রায় বাহাদুর

মহারাজা গোবিন্দলালের দুটি বিবাহ। প্রথমা স্ত্রী সরস্বতী দেবীর একটি কন্যা হেমাঙ্গিনী দেবী। বিবাহ হয় কলকাতার ভবানীপুরে উমাপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সঙ্গে। দ্বিতীয়া স্ত্রী **মহারানী শরৎকুমারী** দেবী তাঁর নাবালক পুত্র উত্তরাধিকারী গোপাললালের অভিভাবিকা হন। গোপাললালের জন্ম হয় ১ আগস্ট, ১৮৮৭ খ্রীঃ কলকাতায়। নাবালক হওয়ায় 'কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডস্'-এর অধীনে জমিদারী চলে যায়। গোপাললাল কলকাতায় কয়েক বছর হেয়ার স্কুলে ও পরে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে 'প্রিন্সেস্ কলেজে' অধ্যয়ন করেন। তাঁর মেধা ও অধ্যবসায়ে সন্তুষ্ট হয়ে, কলেজের প্রিন্সিপাল মিঃ জে. ডি. অস্‌ওয়েল্ প্রশংসাপত্র লিখে গেছেন। ১৯০৫ খ্রীঃ মা মহারানী শরৎকুমারীর মৃত্যুতে তাঁকে কলেজ ছেড়ে কলকাতায় ফিরে আসতে হয়। গৃহ-শিক্ষক মিঃ ই. ক্যাণ্ডলার, মিঃ ম্যাকেঞ্জি, মিঃ এ. কোর্ণাক্ প্রমুখ ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের কাছে পাঠাভ্যাস করেন। গোপাললাল খেলাধূলায়—টেনিস, ক্রিকেট, বিলিয়ার্ড্ ও সাঁতারে অংশ গ্রহণ করেন। শিকারী হিসাবে তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন। ফটোগ্রাফীতে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল।

সাবালক হয়ে ১ আগস্ট, ১৯০৮ খ্রীঃ তাজহাট জমিদারীর ভার নেন। পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে দান করেন—রংপুর গোবিন্দলাল টেক্‌নিকেল্ স্কুল ও দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে। তাছাড়া প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮ খ্রীঃ) তহবিলে লক্ষাধিক টাকা দান করেন। ১৯১২ খ্রীঃ তাঁর রাজভক্তি, বদান্যতা, দেশ সেবার পুরস্কার হিসাবে ইংরাজ সরকার তাঁকে প্রথমে 'রাজা' ও পরে ১৯১৮ খ্রীঃ 'রাজা বাহাদুর' উপাধি দেন। রাজা গোপাললালের বিবাহ হয় পাটনা বাকীপুরের কুঞ্জবিহারী বর্মনের কন্যা রাধারানী দেবীর সঙ্গে ১৯০৬ খ্রীঃ। তাঁদের তিনটি সন্তান—কন্যা সুধারানী দেবী, পুত্র দ্বয়—কুমার গিরীন্দ্রলাল (জন্ম ৩০ আগস্ট, ১৯১৪ খ্রীঃ) ও কুমার ভৈরবলাল (জন্ম ৩ জুন, ১৯১৮ খ্রীঃ)। রাজা বাহাদুর গোপাললাল রায়ের বংশধররা পশ্চিম দিনাজপুর ও কলকাতাতে বসবাস করেন।

রায়চৌধুরী রাজপরিবার

কাকিনা, রংপুর

রংপুর জেলায় গাইবান্দা মহকুমায় কাকিনা, কুচওয়ারার অন্তর্গত ছটি চাকলার অন্যতম। এই অঞ্চল মুসলমান সুলতানদের হাতে চলে যায় কোচ রাজাদের রাজত্বের পর। ষোলো শতকের শেষভাগে সুলতানরাই এই চাকলাগুলি সংগঠিত করে বন্দোবস্ত করে দেন চৌধুরী পরিবারদের। কাকিনা জমিদারী ১৭৯৩ খ্রীঃ ইংরাজ ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-এর আওতায় আসে। সমকালীন দলিল-দস্তাবেজে দেখা যায় যে, ১৭৮১ খ্রীঃ জনৈকা চৌধুরানী (মহিলা জমিদার) কাকিনা চাকলার রাজস্ব জমা দিতে অপারগ হ'য়ে কলকাতায় চলে যান এবং জমিদারীর কিছু অংশ নিলামে ওঠে। কাকিনা জমিদারীর অন্তর্গত ছিল কালীগঞ্জ, লালমণির হাট, ও সংলগ্ন সদর ও গোবিন্দগঞ্জ থানাগুলি। জমিদারীর দেয়-রাজস্ব ছিল ৫৮,৮১৯ টাকা এবং আয় ছিল মোট ৪,০০,০০০ টাকা। ১৮০৯ খ্রীঃ ডঃ বুকানন্ লিখেছেন যে কাকিনার জমিদাররা বিশেষ করে, **রামরুদ্র রায়চৌধুরী** অতিশয় বিনয়ী, ভদ্র ও অতিথি-পরায়ণ মানুষ। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পৃষ্টপোষক। বুকানন্ সাহেবের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তাঁর মনোরম প্রাসাদ—'That his residence including garden, roads and avenues is neat.'

রাজা মহিমানারায়ণ রায়চৌধুরী

ডঃ হ্যামিলটন্ এই জমিদারদের দান-ধ্যান সম্বন্ধে উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে রামরুদ্র রায়চৌধুরীর উত্তরাধিকারী রাজা মহিমানারায়ণ রায়চৌধুরীর সম্পর্কে। মহিমানারায়ণ রংপুর শহরে ও কাকিনায় দাতব্য চিকিৎসালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, জলাশয় প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। ইংরাজ সরকার মহিমানারায়ণের দানশীলতা ও রাজভক্তির স্বীকৃতি-স্বরূপ তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। মহিমানারায়ণের উত্তরাধিকারী **রাজা মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর** সময়েও কাকিনার জমিদারীর স্থায়িত্ব ছিল। মহেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরীর ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর রাজ্যাভিষেক দরবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের অন্যতম। মারা যান ১৯৩৮ খ্রীঃ কারসিয়াং-এ। তাঁর দুই কন্যা জ্যোৎস্না ঘোষ ও সুনীতি ঘোষ ও নাতনী রমলা ঘোষ। কলকাতায় থাকেন।

১। Rangpur Gazetteers, J. A. Vas. I.C.S. 1911.

চাক্‌মা রায় রাজপরিবার

পার্বত্য চট্টগ্রাম

খ্রীষ্টীয় ষোলো শতকের শেষভাগে বাংলার সুদূর পূর্ব-প্রান্তে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় স্থানীয় চাক্‌মা উপজাতি প্রধান বা রাজাদের স্বাধীন রাজ্যের অবস্থান ছিল। কর্ণফুলি নদীর উপর পুরান রাজধানী রাঙ্গামাটি [১] এখনো ভ্রমণ-পিপাসুদের আকর্ষণ করে। ঐ অঞ্চলের কথ্য 'বাংলাভাষা'। চাক্‌মা উপজাতির উল্লেখ পাওয়া যায় 'আরাকান্ ইতিবৃত্তে', ১৭১১ খ্রীঃ আরাকান্ ও চাক্‌মাদের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনায়। এর পরে আরও কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটেছিল। অনেকে মনে করেন যে, চাক্‌মা উপজাতির উদ্ভব হয়েছিল বাঙালী ও নেপালী জাতির সংমিশ্রণের ফলে। [২]

ভিন্নমতে চাক্‌মারা বিহার অঞ্চল থেকে আরাকান্ রাজাদের আমলে চট্টগ্রামে এসেছিল। চাক্‌মারা যাযাবর জাতির অন্যতম। মোঘল শাসনকালের পূর্বে এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না। তারা যে আরাকান্‌-জাত সে বিষয়ে আজকাল কোন দ্বিমত নেই। চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলের বাংলা-ভাষীদের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায়, চাক্‌মা জাতির বহুলাংশের মাতৃভাষা বাংলা। এরা প্রায় সকলেই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত।

খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের মধ্যভাগে সুবাদার শায়েস্তা খানের নেতৃত্বে মোঘল সাম্রাজ্য-বাদের অভিযানের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকান্‌দের স্বাধীনতা রক্ষায় সংগ্রাম, ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়। প্রায় ১০০ বছর পরে ইংরাজ বণিক কোম্পানী নিজেদের বাণিজ্য প্রসারের প্রয়োজনে, পর্তুগীজ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ও উপনিবেশগুলিকে উচ্ছেদ করা ছাড়া, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আরাকান্ ও চট্টগ্রাম শেষবার আক্রমণ করেছিল ১৭৬০ খ্রীঃ। এর পরেই ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৬০ খ্রীঃ নবাব মীরকাশিম ইংরাজ বণিক কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারীর ইজারা দেন। অবশেষে ১২ আগস্ট, ১৭৬৫ খ্রীঃ সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী স্বত্ব লাভ করে ইংরাজ বণিকরা তাঁদের 'মানদণ্ড' রাজদণ্ডে পরিণত করেন।

১। চট্টগ্রাম জেলায় অসমতল উপত্যকায় ও কর্ণফুলি নদীর উপকূলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পরিশোভিত রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম শহর থেকে সড়কপথে প্রায় ৭০ কি.মি.।

২ক। Chittagong Gazetteers. L.S.S. O' Malley—1908.

খ। চাকমা জাতির ইতিহাস—সতীশচন্দ্র ঘোষ। Chittagong Hill Tracts—R. H. Sneyd. Hutchinson—1909.

খ্রীষ্টীয় সতেরো শতকের শেষ দশকে চাক্‌মা উপজাতির প্রধানদের (রাজাদের) নামের তালিকায় প্রথমে **রাজা বিজয়গিরির** নাম পাওয়া যায়। তাঁর উত্তরাধিকারীরা যথাক্রমে চারমন্ খান্, তব্বর খান্, জব্বর খান্, জল্লাল্ খান্ (১৭০৬ খ্রীঃ), সেরমস্ত খান্ (১৭৩১ খ্রীঃ), সের দাস্তাল্ খান্ (১৭৫৮ খ্রীঃ), জানবক্স্ খান্ (১৭৮২ খ্রীঃ), ধরম্‌বক্স্ খান্ (১৮১৮ খ্রীঃ)। এঁরা সকলে স্বাধীন নৃপতিদের পদমর্যাদার সম্পূর্ণ অধিকারী না হলেও, স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা ও কর সংগ্রহের ক্ষমতা তাঁদের হতেই ছিল।

১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধের ছয় বছর পর (১৭৬৩ খ্রীঃ), চট্টগ্রামের শাসন-কর্তা ছিলেন মিঃ হেনরী ভেরেলেস্ট্। তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ বাংলার গভর্নর হয়ে ছিলেন। ইংরাজ সরকার চাক্‌মা রাজ্যকে সামন্ত বা করদ রাজ্য হিসাবে গণ্য করতেন। কর বা রাজস্ব অবশ্যই ইংরাজ সরকারের প্রাপ্য ছিল। ১৮৫৫ খ্রীঃ চাক্‌মা রাজ্যের **রানী কালিন্দী** আরাকান্ ও লুসাই যুদ্ধে ইংরাজ সরকারকে সমর্থন করেন। তাছাড়া ১৮৫৭ খ্রীঃ তিনি সিপাহী বিদ্রোহ দমনে সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। রানী কালিন্দীর নাম, 'মহামুনির মন্দির' ও সংলগ্ন বার্ষিক মেলার প্রতিষ্ঠাত্রী হিসাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

রানী কালিন্দীর মৃত্যুর পর **রাজা ধরম্‌বক্স্ খান্** ও পরে রানীর দৌহিত্র **হরিশচন্দ্র রায়** ২৩ জানুয়ারী, ১৮৫৫ খ্রীঃ চাক্‌মা রাজগদীতে বসেন। ইংরাজ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মাদের সহযোগীতা পাওয়া ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে, বন্ধুভাবাপন্ন হরিশ্চন্দ্রকে 'রাজা' উপাধিতে সম্মানিত করেন ২৪ মার্চ, ১৮৭৪ খ্রীঃ (ভিন্নমতে ১ জুলাই, ১৮৭৭ খ্রীঃ)। মাত্র ৪২ বছর বয়সে মারা যান ১৮৮৫ খ্রীঃ। তাঁর দুটি বিবাহ। প্রথমা রানীর গর্ভজাত পুত্র ভুবনমোহন রায় ও দ্বিতীয়া রানীর গর্ভে রমনীমোহন রায়। পিতার মৃত্যুর সময় দুজনেই ছিলেন নাবালক।

স্বাভাবিকভাবে 'কোর্ট-অফ্-ওয়ার্ডস্'-এর হাতে রাজ্যভার চলে যায়। **রাজা ভুবনমোহন রায়ের** জন্ম হয় রাঙ্গামাটির রাজবাড়ীতে ৬ মে, ১৮৭৬ খ্রীঃ। স্থানীয় স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন এবং পরে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হন। ৭ মে, ১৮৯৭ খ্রীঃ সাবালক হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। 'রাজা' উপাধি পান ১৯০৬ খ্রীঃ। রাজা ভুবনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার **নলিনাক্ষ রায়ের** জন্ম হয় ৬ জুন, ১৯০২ খ্রীঃ। তাঁর সময়ে রাজ্যের দেওয়ান প্রকৃতপক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রায় বংশের উত্তরপুরুষদের কয়েকটি পরিবার রাঙ্গামাটির সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করেন।[১]

১। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশের-পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা উপজাতির মানুষরা উৎপীড়িত হ'য়ে, পূর্ব-ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলিতে বস্তুহারা হিসাবে 'রিফিউজি ক্যাম্প'-এ আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক

কলকাতা

ঘটনা ৯ নভেম্বর, ১৯০৫ খ্রীঃ [১] কলকাতায় পান্তীর মাঠে [২] 'জাতীয় বিশ্ববিত্যালয়' গঠনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক বিশাল জনসভা [৩]। সভায় উপস্থিত বাংলার মনীষীগণ— আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল, হীরেন দত্ত আর বার হাজারেরও বেশী কলকাতার নাগরিক। সভাপতি সুবোধচন্দ্র তাঁর ভাষনে বলেন 'জাতীয় বিশ্ববিত্যালয়ের জন্য আমি আপাততঃ এক লক্ষ টাকা দান করিব'। 'এই কথায় সেই বিপুল শ্রোতামণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ এবং আনন্দের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল তা বর্ণনার অতীত। উক্ত সভায় মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় সুবোধচন্দ্রকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁহাকে তাঁহাদের 'রাজা' বলিয়া দেশবাসীর পক্ষ হইতে উপস্থিত মনীষীগণ অভিনন্দন করেন। সভাভঙ্গ হইলে অন্যূন দশ সহস্র যুবক মিলিত হইয়া সুবোধচন্দ্রের গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরা টানিয়া 'রাজা সুবোধচন্দ্র' বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে তাঁহার বাটীতে রাখিয়া আসেন'। পরে বহু সভা-সমিতির দেওয়া মানপত্রে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অভিনন্দন-বার্তায় এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সুবোধচন্দ্রকে তাঁর 'রাজা' উপাধির যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে সরকারী ডকিউমেণ্টে কাগজ-কলমে সুবোধচন্দ্রকে 'রাজা' উপাধিতে কখনও সম্বোধন করা হয়নি যেহেতু তিনি সরকারের দেওয়া খেতাবী 'রাজা' নন।

কলকাতার সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বনেদি পরিবারদের অন্যতম পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক বংশের

১। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই বাংলায় খ্রীষ্টীয় আট শতকে দেশকে অরাজকতার হাত থেকে মুক্ত করার তাগিদে, প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় নেতা গোপালকে (পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) সাম্মিলিতভাবে নির্বাচিত 'রাজা' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল আনুঃ ৭৫০ খ্রীঃ। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছে ১১৫৫ বছর পরে, যদিও পার্থক্য রয়েছে রাজনৈতিক শক্তি ও পদমর্যাদায়।

২। রাণাঘাটের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র পান্তীর জমিদারীর অন্তর্গত এই মাঠটি ছিল বর্তমান বিধান সরণীতে—ঠনঠনে কালীবাড়ীর কাছে। এখন এখানে হয়েছে বিত্যাসাগর হোস্টেল।

৩। At the commencement, a national song was sung by Dr. Sundari Mohun Das assisted by the chorus of students, "which aptly voiced the growing demand of the students for a National University.' Subodh Chandra delivered a speech 'which was warmly received but more elequent than words was his deed which it is believed, has given birth to the National University'.

কৃতী-পুরুষ রাধানাথ বসুমল্লিক (১৭৯৮-১৮৪৪ খ্রীঃ)। জাহাজের কারখানা, সোরারখনি, নীলকুঠী ও ব্যাঙ্ক ব্যবসার সুবাদে, তিনি বিত্তশালী ও সমাজপতি। রাধানাথের পৌত্র প্রবোধচন্দ্রের স্ত্রী কুমোদিনী দেবীর গর্ভে একমাত্র পুত্র সুবোধচন্দ্রের জন্ম হয় ৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৭৯ খ্রীঃ কলকাতায় তাঁর পৈতৃক বাসভবনে, ১৮ রাধানাথ মল্লিক লেনে। পড়াশোনা করেন সেণ্ট্ জেভিয়ার্স স্কুলে ও পরে হিন্দু কলেজে (প্রেসিডেন্সী কলেজ)। ১৯০০ খ্রীঃ এফ. এ. পাশ করে আইন পড়বার জন্য কেমব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পারিবারিক কারণে পড়া বন্ধ করে দেশে ফিরে আসেন ১৯০১ খ্রীঃ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুবক সুবোধচন্দ্র পুর্ণোদ্দমে স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেন। বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের সংসর্গ লাভ করেন ১৯০৫ খ্রীঃ। দীর্ঘদিন নিজ বাড়ীতে শ্রীঅরবিন্দকে রেখে ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে (১৯০৫-১১ খ্রীঃ) সক্রিয় ভূমিকা নেন। স্বদেশী আন্দোলনের মুখপত্র **'বন্দেমাতরম্'** ইংরাজী দৈনিক পত্রিকার (অক্টোবর, ১৯০৬ খ্রীঃ) প্রকাশক ও সম্পাদক বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালকে সর্বোতভাবে সাহায্য করেছেন। 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস'-এর সুরাট অধিবেশনে যোগদানের জন্য বাংলার সব 'ডেলিগেইটদের' যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করেন।

১৯০৮ খ্রীঃ ইংরাজ সরকার সুবোধচন্দ্রকে বিনা বিচারে (৩নং রেগুলেশন্ অ্যাক্ট, ১৮১৮ খ্রীঃ ধারায়) ১৪ মাস আটক-বন্দী রেখে, মুক্তি দেন ১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯১০ খ্রীঃ। ১৯০৬ খ্রীঃ থেকে আজীবন 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদের' ট্রাস্টি। এই পরিষদই পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নেয়। তিনি 'এশিয়া ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর' প্রতিষ্ঠাতা। মধ্য কলকাতায় ওয়েলিংটন্ স্কোয়ার-এর (অধুনা রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার) পূর্ব দিকে তাঁদের পৈতৃক প্রাসাদোপম অট্টালিকা, তাঁর খুড়াতত ভাই নিরোদ বসুমল্লিক দান করে গেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় শিক্ষার প্রসার ও উন্নতিকল্পে। সুবোধচন্দ্রের দেশপ্রেম এবং দানের কথা স্মরণে বাঙালীর স্মৃতিতে তিনি প্রকৃতপক্ষে 'রাজা' সুবোধচন্দ্র। তাঁর দেহাবসান হয় ১৪ অক্টোবর, ১৯২০ খ্রীঃ মাত্র ৪১ বছর বয়সে দার্জিলিং-এ।[১]

১। রাজা সুবোধচন্দ্রের দুটি বিবাহ—প্রথমা প্রকাশিনী দেবীর গর্ভে চার কন্যা—সুপ্রভা ঘোষ, সুষমা দে, সুরমা ঘোষ ও সুচন্দ্রা মিত্র। দ্বিতীয়া স্ত্রী কমলপ্রভা দেবীর দুই কন্যা ও তিন পুত্র—প্রবীর, সমীর ও মিহির। প্রবীরের পুত্র দীপাঙ্কর, সমীরের কন্যা সংযুক্তা সরকার আর মিহিরের পুত্র কুণাল ও কন্যা চন্দ্রিকা মজুমদার। রাজা সুবোধচন্দ্রের মধ্যম পুত্র সমীর বসুমল্লিক (জন্ম ১৯১৪) তাঁর পৈতৃক বাসভবন৪/১এ, গঙ্গারাম পালিত লেনে থাকেন। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার প্রথম অফিস এই বাড়ীতে ছিল। তখন বাড়ীর প্রবেশ পথ ছিল ক্রীক্ রো দিয়ে।

বাংলার আরো দশজন নবাব

নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন কলকাতা

বিহারের সৈয়দ বংশের নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন বাহাদুরের[১] জন্ম হয় ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩ খ্রীঃ। সৈয়দ আমীর হোসেনের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকেই মোগল ও পরে ইংরাজ শাসনকালে সরকারী আমলা হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে আমীর হোসেন ইংরাজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে যোগ দেন ১৮৬৪ খ্রীঃ। তিনি বাংলার বিভিন্ন শহরে ১৯০১ খ্রীঃ পর্যন্ত সরকারী পদে বহাল ছিলেন। প্রথমে ১৮৭৩ খ্রীঃ ও পরে তিনবার (১৮৭৮, ১৮৯৫, ১৮৯৭ খ্রীঃ) তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য হন। ১৮৮৩ খ্রীঃ তিনি ছিলেন কলকাতার উত্তর বিভাগের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট। ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনিই প্রথম চিফ্-প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হন ১৮৯৫ খ্রীঃ। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই তিনি নিরপেক্ষতা ও ন্যায় বিচারের জন্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। ১৮৮৬ ও ৮৮ খ্রীঃ তিনি 'ভাইসরয় কাউন্সিলের' সদস্য ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ তিন বছরের জন্য তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেল্ অফ্ রেজিষ্ট্রেশন্ পদে উন্নীত হন। তাঁর কর্মদক্ষতা ও কর্তব্য-নিষ্ঠার স্বীকৃতি-স্বরূপ ইংরাজ সরকার ১৮৯২ খ্রীঃ সৈয়দ আমীর হোসেন সাহেবকে 'সি. আই. ই.' ও পরে ১৮৯৮ খ্রীঃ 'নবাব বাহাদুর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন।

১১ মার্চ, ১৯০২ খ্রীঃ চাকুরী-জীবনের অবসানের পর গুণমুগ্ধ সহকর্মী ও শুভানুধ্যায়ীগণ তাঁর একটি তৈলচিত্র কলকাতা পুলিশ কোর্টে স্থাপন করেন। তৎকালীন বাংলার ছোট লাট স্যার জন্ উডবান্' চিত্রটির আবরণ উন্মোচন করেন। আমীর হোসেন কলকাতার নবাব সৈয়দ আমীর আলি খানের খুবই ঘনিষ্ট সহকর্মী ছিলেন। নবাব আমীর আলি সাহেবের প্রতিষ্ঠিত (১৮৭৮ খ্রীঃ) 'ন্যাশনল্ মোহামেডান্ অ্যাসোসিয়েশন্'-এর সক্রিয় সভ্য ছিলেন।

নবাব সৈয়দ আস্‌গার আলি খান কলকাতা

নবাব সৈয়দ আস্‌গার আলি খান উত্তর কলকাতার শহরতলি **'চিৎপুরের নবাব'** নামেই পরিচিত। মুর্শিদাবাদের নবাবশাহি আমলের কুখ্যাত অত্যাচারী নায়েব নাজিম (দেওয়ান) (১৭৬০-৭২ খ্রীঃ) ও নবাব মুর্শিদকুলী খানের দৌহিত্র-জামাতা সৈয়দ মহম্মদ রেজা খানের বংশধর নবাব জিয়া-উদ্-দৌলা, মোবারিজ্-উল্-মুল্‌ক্ সৈয়দ

১। Glympises of Bengal by A. Claude Campbell, Vol. I—1907.

মহম্মদ হাসান খান বাহাদুর তাওয়ার জঙ্-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ আস্‌গর আলি খানের জন্ম হয় ১৮৩৮ খ্রীঃ মুর্শিদাবাদে। লেখাপড়া শুরু করেন মুর্শিদাবাদে নিজমত্ কলেজে। পিতার সুযোগ্য পুত্র ও নবাব বংশের ঐতিহ্য বজায় রাখায়, ইংরাজ সরকার আসগার আলি সাহেবকে 'নবাব বাহাদুর' উপাধি দেন ৪ জুলাই, ১৮৬২ খ্রীঃ। তিনি বাংলার প্রথম মুসলিম্ খেতাবী নবাব ও 'সি. এস্. আই.' সম্মানের অধিকারী। প্রথম শ্রেণীর অনারারী মেজিস্ট্রেট (১৮৬৬ খ্রীঃ), বঙ্গীয় আইন পরিষদের সভ্য (১৮৭৫ খ্রীঃ), কলকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার (১৮৭৬ খ্রীঃ), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৮৩ খ্রীঃ) এবং বাংলার মুসলিম্ সম্প্রদায়-ভুক্ত কলকাতার প্রথম শেরিফ্। ১৮৬৬ খ্রীঃ বিলাত যান ও ব্যারিষ্টারী পাশ করে দেশে ফিরে আসেন ১৮৭২ খ্রীঃ। নবাব আসগার তাঁর বিলাত সফর-কালে মহারানী ভিক্টোরিয়া কর্তৃক বাকিংহ্যাম্ রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রিত হন এবং একটি হীরক-খোচিত সোনার আংটি উপহার-স্বরূপ লাভ করেন। কলকাতার হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের শ্রদ্ধালাভ করেছেন। তিনি ছিলেন ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীরও বিশেষ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদের অন্যতম।

তাঁর চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাবজাদা সৈয়দ হোসেন আলি নাদির জঙ্ কলকাতার অধিবাসী ছিলেন। মারা যান ২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৬ খ্রীঃ কলকাতায়।

চিৎপুরের **'নবাব প্রাসাদ'** ১ নায়েব দেওয়ান সৈয়দ মহম্মদ রেজা খানের সময়েই তৈরী হয়েছিল। দেওয়ান তাঁর শেষ জীবনের বেশ কিছুকাল এখানে বাস করেছিলেন। ভাগীরথী-গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত মনোরম প্রাসাদ ও সংযুক্ত সুসজ্জিত বিরাট উদ্যানটি ছিল, উনিশ শতকের উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারীদের প্রমোদ-উদ্যান তথা বিশ্রামালয়। গঙ্গার পূর্বতীরস্থ-উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলী, চন্দননগর, চুঁচুঁড়া প্রভৃতি অঞ্চল থেকে নদী পার হ'য়ে তাঁরা কলকাতা সফরে এলে, এই চিৎপুর প্রাসাদে অবস্থান করতেন। রেভারেণ্ড জেমস্ লং 'কলকাতা রিভিউ', ডিসেম্বর, ১৮৫২ খ্রীঃ সংখ্যায় লিখেছেন ১ 'চিৎপুর প্রাসাদের প্রতিষ্ঠাতা নায়েব দেওয়ান রেজা খানের সময় প্রাসাদের অতিথিদের (ইংরাজ গভর্নর ও রাজকর্মচারীদের) হাতির হাওদায় বসিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে কলকাতার লাট-প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হ'ত'।

১। 'The Buildings and Gardens were magnificient and the Nawab Reza Khan lived on intimate terms with 'Shaib Lok' inviting them to his palace and presenting a fine object......When the foreign Governors came down from Srirampur, Chandannagore, Chinsura, they landed at Chitpur, where a deputation received them, and they rode in state upto Government House'.

নবাব স্যার এ. এফ্. এম্. আবদুর রহমান কলকাতা

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কলকাতার তথা বাংলার মুসলিম্ সম্প্রদায়ের শিক্ষিত সমাজে নবাব স্যার আবদুর রহমান খান বাহাদুর ছিলেন একজন সংস্কৃতি-সম্পন্ন মানুষ ও খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্। নিজ সম্প্রদায়ের উন্নতিকল্পে উৎসর্গীকৃত প্রাণ।

নবাব এ. এফ্. এম্. আবদুর রহমানের (পিতা আবদুর সাহেব) জন্মস্থান চট্টগ্রাম জেলায় দররায়পুর গ্রামে। তিনি বিবাহ করেন বল্লভপুরের জমিদার ও চা-বাগানের মালিক রহিম বক্স্ চৌধুরীর কন্যাকে [১]। নবাব সাহেবের কৈশোর ও যৌবনকালের কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। নবাব আবদুর রহমান তাঁর সম্প্রদায়ের ছাত্রদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। বর্তমান স্থরেন্দ্র ব্যানার্জী রোডে অবস্থিত তালতলা হাইস্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতা মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে ও ইলিয়ট্ হোষ্টেল প্রতিষ্ঠায়, তাঁর বিশেষ অবদান ছিল। তিনি ছিলেন মনোনীত মিউনিসিপ্যাল্ কমিশনার ও কলকাতা ইউনিভারসিটির ফেলো। কলকাতায় কোনো এক সময়ে তিনি বসবাস করেছেন ১৬, তালতলা লেনের একটি বাড়ীতে—বর্তমানে পোদ্দারদের জীর্ণ 'লালবিহারী ভবন'।

নবাব আবদুর রহমানের পুত্র নবাবজাদা এ. এফ. এম্. আবদুল আলি এম. এ., এফ্. আর. এস্. এ. একজন সুশিক্ষিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ভারত সরকারের অধীনে ইম্পিরিয়্যাল্ রেকর্ড-কিপার। পরে ওয়াকফ্ কমিশনার পদে আসীন হন। ভারতীয় মিউজিয়াম্ (যাদুঘর)-এর উদ্যোগে পুরাবস্তুর সংরক্ষণের কাজে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। অবিবাহিত নবাবজাদা থাকতেন ২, টারনার লেন; বর্তমানে রাস্তাটির নাম হয়েছে তাঁর পিতার নামে, নবাব আবদুর রহমান স্ট্রীট, কলকাতা-১৬।

নবাব মৌলবী সিরাজুল ইসলাম্ কলকাতা

নবাব স্যার আবদুর রহমান সাহেবের প্রায় সমসাময়িক নবাব মৌলবী সিরাজুল্ ইসলাম্ সাহেব বিশ শতকের প্রথমভাগে কলকাতার মুসলমান সম্প্রদায়ের কৃতী পুরুষ। কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী হলেও, মৌলবী সাহেবের ইসলাম্ ধর্মশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি একাধিকবার কলকাতা মিউনিসিপ্যাল্ কমিশন-এর মনোনীত সদস্য ছিলেন। নিজ-সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতিকল্পে তাঁর অবদান, কর্মদক্ষতা ও রাজভক্তির স্বীকৃতি হিসাবে, ইংরাজ সরকার তাঁকে প্রথমে 'খান বাহাদুর' ও পরে ১৯১১ খ্রীঃ সম্রাট পঞ্চম-জর্জের রাজ্যাভিষেক পর্বে 'নবাব' (ব্যক্তিগত) উপাধিতে ভূষিত করেন।

১। ফেণীর ইতিহাস—জমির আহম্মেদ।

বেশ কয়েক বছর (১৯১২ খ্রীঃ) তিনি বসবাস করেছেন ৭, মৌলবী গোলাম্ শোভান্ লেনের বাড়ীতে এবং পরে (১৯২৬ খ্রীঃ) এই রাস্তায় 'ইসমাইল লজে'। বর্তমান তাঁর স্মরণে এই রাস্তার নাম হয়েছে নবাব সিরাজুল ইস্লাম্ লেন, কলকাতা-১৬।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী কুমিল্লা

মোগল বাদশা জাহাঙ্গীর ছিলেন 'কবি-সম্রাট' আর তাঁর বিবি নূরজাহান ছিলেন 'কবি-সম্রাজ্ঞী'। ভারতের ইতিহাসে অন্তঃপুরবাসিনী নারীও যুগে যুগে কাব্য-সাধনা করে যশস্বিনী হয়েছেন। বাংলার কবি চন্দ্রাবতী (আনুঃ ১৫৫০ খ্রীঃ), রামায়ণপ্রণেতা আনন্দময়ী (বিক্রমপুরের রামগতি সেনের কন্যা—১৭৭২ খ্রীঃ), কবি রহিমুন্নিসা (চট্টগ্রাম অধিবাসিনী, আনুঃ ১৭৬৩-১৮০০ খ্রীঃ), 'পদ্মাবতী' পুঁথি প্রণেতা স্বর্ণকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় প্রমুখের নাম আমাদের জানা আছে। এই সঙ্গে নওয়াব ফয়জুন্নেসার নাম সঙ্গত কারণে যুক্ত হ'তে পারে।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর জন্ম হয় ত্রিপুরা জেলায় (বর্তমানে কুমিল্লা) পশ্চিম গাঁয়ে ১৮৩৪ খ্রীঃ। জমিদার ঘরের কন্যা ফয়জুন্নেসার পিতা আহম্মদ আলী চৌধুরী—মাতা আরফান্নেসা চৌধুরানী। তাঁর পারিবারিক জবান ছিল উর্দু, অথচ জ্ঞান-চর্চা করতেন বাংলায়। গৃহ-শিক্ষক ছিলেন তাজউদ্দিন। তাঁর 'আত্মকথায়' [১] লিখেছেন 'কত কঠোর সাধনায় বিভিন্ন ভাষায়—বাংলা, আরবী, ফার্সী ও সংস্কৃত—ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায় তা সহজেই অনুমেয়'। দৈনন্দিন জীবন-পঞ্জীর মধ্যে নিয়মিত সাহিত্য-চর্চা ছাড়া, জমিদারীর দপ্তরে পর্দার আড়ালে বসে আমলাদের কাজের ভার দিয়ে বিদায় দিতেন।

ফয়জুন্নেসা চৌধুরানীর ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহোত্তর যুগ। 'ইংরাজদের শোষণের ফলে মুসলিমদের জীবনে নেমে আসে অমানিসার অন্ধকার। আলো তাদের পেতেই হবে'। তাই ফয়জুন্নেসা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত উন্নতির সম্ভাবনা নেই। নিজ গ্রামে অবৈতনিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন ১৯০১ খ্রীঃ। আজ তা ফয়জুন্নেসা সরকারী ডিগ্রি কলেজ। মুসলিম্ সমাজের নারী-শিক্ষার প্রতি বিরূপতার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জেহাদের ফলে, উচ্চ-ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় কুমিল্লায় ১৮৭৩ খ্রীঃ। নবাব সৈয়দ আমীর আলি, নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ প্রমুখ গুণীজনের সহানুভূতি পেয়েছিলেন। জমিদার হিসাবে তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক ও জনকল্যাণকামী। দীঘি খনন, রাস্তাঘাট তৈরী ছাড়া, মুসলিম্ শিক্ষা প্রসারণে তাঁর দান কুমিল্লায় লোক আজও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। ইংরাজ সরকার তাঁর সৎকর্মের

১। 'রূপ জালাল'—ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী।

স্বীকৃতি-স্বরূপ প্রথমে 'বেগম' পরে 'নবাব' উপাধি দেন রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ১৯০১ খ্রীঃ। ভারতে এক নতুন নজীর সৃষ্টি হয়েছিল।

নবাব মীর মোহাম্মদ আলি পদমদীর ফরিদপুর

নবাব মীর মোহাম্মদ আলি ছিলেন ফরিদপুরে পদম্‌দীর জমিদার। বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্য-প্রেমী নবাব মীর মোহাম্মদ আলি, সুসাহিত্যিক মীর মশাররফ্‌ হোসেন সাহেবের জ্ঞাতি-ভ্রাতা। সমকালীন নাট্য-সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন মীর মশাররফের 'জমিদার দর্পন' নাটকখানি (১৮৭২ খ্রীঃ) নবাব মীর মোহাম্মদ আলির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়েছিল। নাটক গ্রন্থটি নবাব সাহেবের নামে উৎসর্গ। পরে মীর মশাররফ্‌ সাহেব নবাবের পদম্‌দীর জমিদারীর ম্যানেজার হন। কলকাতা থেকে প্রকাশিত পত্রিকা—বাংলার মুসলমান সমাজের অন্যতম মুখপত্র, 'মিহির সুধাকর' (১৮৯৫ খ্রীঃ) ও 'প্রচারক' তার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রীঃ বাংলার ব্যবস্থাপক সভায় মনোনীত সভ্য ছিলেন। প্রথম থেকেই 'ইণ্ডিয়ান্ অ্যাসোসিয়েশনের' সহ-সভাপতি ছিলেন। 'ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট্' (১৮৭৮ খ্রীঃ) ও 'সিভিল সার্ভিস রেগুলেশন্ অ্যাক্ট্'-এর বিরূপ সমালোচনা ও বিরোধিতা করার উদ্দেশ্যে, সম্পাদক আনন্দমোহন বসুর আহুত এক সভায় নবাব মীর মোহাম্মদ সভাপতিত্ব করেন। 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশনের' (১৮৮৯ খ্রীঃ) সক্রিয় সভ্য ছিলেন। পূর্ব-বাংলার মুসলমান জনগনের নেতা হিসাবে সরকারী মহলে তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁর সমাজ-সেবার স্বীকৃতি-স্বরূপ সরকার তাঁকে 'নবাব' উপাধি দেন [১]। তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর জমিদারীর একটি বড় অংশ দেশের সৎকার্যে দান করে যান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যালয়, আরবী-ফার্সী মাদ্রাসা, দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা প্রভৃতি পরিচালনার ব্যয়ের জন্য ঐ দানের ব্যবস্থা করেন। মুসলমান সমাজ ও জনগণের উন্নতির জন্য তাঁর বিশেষ আগ্রহ থাকলেও সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব কোনো দিন ছিল না।

নবাব বদরুউদ্দীন্ হায়দার নোয়াখালি

নবাব বদরুউদ্দীন্ হায়দার ছিলেন নোয়াখালি জেলার একজন বড় জমিদার। নোয়াখালি ও কলকাতায় বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী। মুসলমান সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধিসাধনের

১। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ভারত-সম্রাজ্ঞী আখ্যা ঘোষণা উপলক্ষে, কলকাতায় ১৪ আগস্ট, ১৮৭৭ খ্রীঃ এক বিশেষ দরবারে, বাংলার ছোট লাট স্যার এ্যাসলে ইডেন মোট আট জন জমিদারকে রাজকীয় খেতাব প্রদান করেন। পৃষ্ঠা ২৭৩ পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

জন্য তাঁর দানে, কয়েকটি স্কুল ও মক্তব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতায় পুরানো 'ওয়াক্‌ফ্‌নামায়' (ঈশ্বরের নামে দানপত্র), তাঁর দানের বেশ কয়েকটি ভূসম্পত্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া তিনি একাধিক ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তির মূতওল্লী (তত্ত্বাবধায়ক) ছিলেন। ইংরাজ সরকারের বিশেষ বিশ্বাস-ভাজন হওয়ায়, 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর [1] তিন কন্যা ও চার পুত্র—কামার-উদ্দীন্‌, শরফ্‌-উদ্দীন্‌, জালাল্‌-উদ্দীন্‌ ও জীয়া-উদ্দীন্‌। সকলেরই ইন্তেকাল হয়েছে। কনিষ্ট পুত্র নবাবজাদা জীয়া-উদ্দীন আইনজ্ঞ ও কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার ছিলেন। তাঁর দুই কন্যা ও দুই পুত্র—মাসুদ-উদ্দীন্‌ ও ফারুক্‌-উদ্দীন্‌। বর্তমানে কলকাতায় ১২, থিয়েটার রোডে বসবাস করেন।

নবাব মেশাররফ্‌ হোসন চট্টগ্রাম

নবাব মেশাররফ্‌ হোসেন চট্টগ্রাম জেলায় চৌদ্দগ্রাম থানার চিওড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৩ খ্রীঃ। বি. এ. পাশ করে (১৮৯৮ খ্রীঃ), আইন কলেজে অধ্যয়নের পরে আইনজীবী হিসাবে জলপাইগুড়ি কোর্টে কর্ম-জীবন শুরু করেন। তিনি চা-বাগানের মালিক ও ধনাঢ্য জমিদার খান বাহাদুর রহিম বক্সের কন্যার পানিগ্রহণ করেন। পরে নিজেই চা-বাগানের মালিক হন। সুশিক্ষিত হোসেন সাহেব, তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে উচ্চ ও মাধ্যমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লিটন্‌ বৃত্তি' তাঁরই দানে সৃষ্টি। স্বগ্রাম চিওড়ায় স্ত্রী ফয়জ্‌উন্নেসার নামে উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন ১৯২৫ খ্রীঃ। তিনি ১৯২৯ খ্রীঃ বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচিত সদস্য এবং দু'দফায় ১৯৩৭ ও ১৯৪২ খ্রীঃ বাংলার ফজলুল্‌ হক্‌ সাহেবের এবং ১৯৪৩-৪৫ খ্রীঃ খাজা নাজিমুদ্দিন্‌ মন্ত্রীসভার সদস্য ছিলেন। ইংরাজ সরকার তাঁর সদগুণ ও বদান্যতার স্বীকৃতি দেন, তাঁকে প্রথমে 'খান বাহাদুর' পরে 'নবাব' উপাধি দানে।

নবাব আবদুল্‌ সোবহান্‌ চৌধুরী বগুড়া

বগুড়ার নবাব সৈয়দ আল্‌তাফ্‌ আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র নবাব সোবহান্‌ চৌধুরী একজন বিশেষ প্রভাবশালী জমিদার। বহু সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা ও সেবা-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায়, সমাজসেবী হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। যদিও তিনি আভিজাত্যের প্রতীক 'মোগল আস্‌রাফ্‌' ছিলেন না, কিন্তু আভিজাত্যের গৌরব করতেন। তিনি ছিলেন বগুড়া কেন্দ্রের 'ন্যাশন্যাল্‌ মোহামেডান্‌ অ্যাসোসিয়েশন্‌'-এর সভাপতি। বগুড়ায় মাদ্রাসা ও তাহিরুন্নেসা মহিলা হাসপাতাল ও বিখ্যাত উড্‌বার্ণ—আলতাফ্‌উন্নেসা পার্কের (লর্ড

১। কলকাতায় চিৎপুরের বড় মসজিদ্‌-এর কাছে নবাব বদরুদ্দীন স্ট্রীট তাঁর স্মরণিক।

উড্‌বার্ণের বগুড়া সফরের স্মরণার্থে) প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ব্যক্তিগত গুণাবলী ও জনহিতকর কর্মের স্বীকৃতি-স্বরূপ, তাঁকে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করা হয় ১৮৯৩ খ্রীঃ।

নবাব মহম্মদ আলি চৌধুরীও এই বংশের অন্যতম কৃতী পুরুষ। তিনি ১৯৫৫ খ্রীঃ পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী হয়ে বাঙালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

নবাব স্যার কে. জি. এম্. ফারুকি রতনপুর, কুমিল্লা

এই বিশ শতকে আশি-নব্বুই বছর যাবৎ যে কয়েকটি ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষ কলকাতা তথা বাংলায় অভিজাত হিন্দু-মুসলমান সমাজে বিশেষ সমাদর ও মর্যাদা লাভ করেছেন, স্যার মহিউদ্দিন্ ফারুকি তাঁদের অন্যতম। ফারুকি সাহেবের জন্ম হয় নবাব বংশের পৈতৃক ভিটা কুমিল্লায় রতনপুরে ১৮৯৩ খ্রীঃ। প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের পর সরকারী রাজস্ব-জরিপ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। বিবাহ করেন স্যার আবদুল হালিম গুজনাভি সাহেবের কন্যাকে। তাঁদের একটি মাত্র কন্যা বহুদিন বাংলাদেশে চলে গেছেন।

স্যার ফারুকি কলকাতায় জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সব সম্প্রদায়ের মানুষের উন্নতিকল্পে সরকারী ও বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অকাতর সহয়তা দিয়েছেন। বঙ্গীয় মন্ত্রী পরিষদের মনোনীত সদস্য ছিলেন ১৯২৯ খ্রীঃ। 'ক্যাল্‌কাটা ক্লাবের' সভাপতি ১৯৫৩ খ্রীঃ এবং কলকাতার 'সেরিফ' ১৯৬০ খ্রীঃ। কলকাতায় গুরুসদয় দত্ত রোডে তাঁর নিজস্ব বাসভবন থাকা সত্বেও, তিনি থাকতেন রোলাণ্ড্ রোডে এক ভাড়া বাড়ীতে। প্রবৃদ্ধ স্যার ফারুকির ইন্তেকাল হয় ১৯৮৪ খ্রীঃ কলকাতায় ৯১ বছর বয়সে।

বিস্মৃত নবাবদের অন্যতম নবাব সৈয়দ স্যার সামসুল্ হুদা ১৯১২ খ্রীঃ বঙ্গীয় শাসন পরিষদের মনোনীত সদস্য ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

মোগল বাদশাহি আমলে পাওয়া বাংলার নবাব নাজিমদের কয়েকটি খেতাব— 'নবাবশাহি আমল' পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১। মুতামান্-উল্-মুল্ক্, আলা-উদ্-দৌলা, জফর খান, নাসির জঙ্গ্ নবাব মুর্শিদকুলি খান।
২। মোতামিন্-উল্-মুল্ক্, সুজ-উদ্-দৌলা, সুজাউদ্দীন মহম্মদ খান বাহাদুর আসাদ্ জঙ্গ্।
৩। সুজা-উল্-মুল্ক্, হিসাম্-উদ্-দৌলা নবাব আলিবর্দী খান।
৪। মনসুর-উল্-মুল্ক্, সিরাজ-উদ্-দৌলা শাহ্ কুলি খান বাহাদুর হিবাৎ জঙ্গ্।
৫। সুজ-উল্-মুল্ক্, হিসাম্-উদ্-দৌলা মীর মহম্মদ জাফর আলি খান বাহাদুর মহবৎ জঙ্গ্।
৬। নবাব নসির-উল্-মুল্ক্, ইমতিয়াজ-উদ্-দৌলা, মীর মহম্মদ কাশিম আলি খান নসরৎ জঙ্গ্।
৭। মুমতাজেম্-উল্-মুল্ক্, মোসেন-উদ্-দৌলা, ফেরাদুন্ জাহ্ সৈয়দ মনসুর আলি খান বাহাদুর, নসরৎ জঙ্গ।
৮। ইহ্‌টিশান্-উল্-মুল্ক, রয়িস্-উদ্-দৌলা, আমির-উল্-ওমরাহ, মহবৎ জঙ্গ সৈয়দ হাসান্ আলি মির্জা।

পরিশিষ্ট (Addendum)

মুর্শিদাবাদের নবাব ও ইংরাজ কোম্পানীর চুক্তিপত্র

মোগল সম্রাটদের প্রতিভূ মুর্শিদাবাদের নবাবদের সঙ্গে ইংরাজ ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি-পত্রের কৌতূহলী অংশ-বিশেষের ইংরাজী অনুবাদ দেওয়া হল। প্রত্যেক চুক্তি-পত্রের উল্লেখ 'নবাবশাহি পরিচ্ছেদে' ১ আছে।

ক। Agreement between Nobab Serajadowla, The servant of king Alumgir, the Invincible and the Company dated February 9, 1757. (Signed seven times by Sirajadowala).

(i) That the Company be not molested upon account of such privileges as have been granted them by the King's Firmaund and Husbulhookums.

That the villages which were given to the Company by the Firmaund, but detained from them by the Soubah be likewise allowed them, nor let any impediment or restriction be put upon the Zemindars.

(ii) That all goods belonging to the English Company having their Dustuck, do pass freely by land or water, in Bengal, Bihar and Orissa, without paying any duties or fees of any kind.

(iii) That restitution be made to the Company, of their factories and settlements at Calcutta, Cossimbazar, Dacca, &c., which have been taken from them.

(iv) That the Company be allowed to fortify Calcutta in such a manner that they shall esteem proper for their defence, without any hinderance or obstruction.

(v) That siccas be coined at Allinagar (Calcutta) in the same manner as at Moorshidabad.

(Signed by the Governor & Committee. Witnesses—Nowrish Ali Khan, Meerjafar Khan, Raja Durlavram.

১। ১৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঋ। A Treaty between the Nobab Meer Mahomed Kossim Khan and the Company, dated September 27, 1760. [১]

(i) The Nobab, Meer Mahomed Jaffer Khan Bahadur, shall continue in possesion of his dignities, and a suitable income shall be allowed for his expenses.

(ii) The Nezamut of the Subahdarry of Bengal, Azimabad and Orissa &c., shall be conferred by his Excellency, the Nobab, on Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur ; he shall be invested with the administration of all affairs of the Provinces, and after his Excellency he shall succeed to the Government.

(iii) Betwixt us and Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur, a firm friendship and union is established, his enemies are our enemies and his friends are our friends.

(iv) The Europeans and Telingas of the English Army shall be ready to assist the Nobab.

(v) For all charges of the Company and of the said Army, and provisions for the field, &c the lands of Burdwan, Midnapur and Chittagong shall be assigned, and sunnad for that purpose shall be written and granted.

(vii) The balance of the former tuncaw shall be paid according to the Kistabundee agreed upon with the Royroyan. The Jewels which have been pledged shall be received back again.

(viii) We will not allow the tenants of the Circar to settle in the lands of the English Company, neither shall the tenants of the Company be allowed to settle in the lands of the Circar.

(x) Whether there be peace with the Shahzada or not, our agreement with Meer Mahomed Kossim Khan Bahadur, we will (by the Grace of God) inviolably observe as long as the English Company's factories continue in the Country.

১। ১০২ ও ১৪৫ পৃষ্ঠার পাদটিকা দ্রষ্টব্য।

খ। Articles of a Treaty and Agreement between the Governor and Council of Fort William on the Part of English East India Company and Nobab **Meer Mahomed Jaffer Khan** dated July 10, 1763. ১

On the Part of the Company—"We engage to reinstate the Nobab Meer Mahomed Jaffer Khan Bahadur in the Subahdarry of the provinces of Bengal, Bihar and Orissa, by the deposal of Meer Mahomed Kossim Khan, and the effects, treasure, and jewel &c, belonging to Meer Mahomed Kossim Khan, which shall fall into our hands, shall be delivered up to the Nobab aforenamed."

On the Part of the Nobab—(i) Confirmation and ractification of the Treaty which I (Meer Mahomed Jaffer Khan) concluded with Company upon my accession to the Nizamut.

(ii) Confirming the grant of Chucklas of Burdwan, Midnapur and Chittagong which were before ceeded.

(iii) Grant of the privilege of carrying on their trade free from all duties, taxes excepting $2\frac{1}{2}$% tax levied on articles of salt.

(vi) I will maintain twelve thousand horse and twelve thousand foot in the provinces. Besides these, the force of the English Company shall attend me when they are wanted.

(viii) The late Perwannahs issued by Kossim Ally Khan, granting to all merchants the exemption of all duties for the space of two years, shall be reversed and called in, and the duties collected as before.

(ix) Rupees coined in Calcutta & Murshidabad in every respect be equal and pass without deduction of batta.

(x) I will give Thirty Lakhs of Rupees to defray all expenses and loss occuring to the Company from the war and stoppage of their investment.

১। ১৪৫

ঘ। Firmaund from the King Shah Alum granting Dewanny of Bengal, Bihar and Orissa to the Company. ১

'At this happy time our royal Firmaund, indispensably requiring obedience, is issued, that where as, in consideration of the attachment and services of the high and mighty, the noblest of exalted nobles, the chief of illustrious warriors, our faithful servants and sincere well-wishers, worthy of our royal favours, the English Company, we have granted them the Dewanny of the Provinces of Bengal, Bihar and Orissa, from the beginning of the Fassel rubby of the Bengal year 1172, as a free gift and altumgau, without the association of any other person, and with an exemption from the payment of the customs of the Dewanny, which used to be paid by the Court. It is requisite that the said Company eagage to be security for the sum of twenty-six lakhs of Rupees a year, for our royal revenue, which sum has been appointed from the Nobab Nudjum ul Dowla Bahadur, and regularly remit the same to the Royal Circar ; and in this case, as the said Company are obliged to keep up a large Army for the protection of the Provinces of Bengal, &c., we have granted to them whatsoever may remain out of the said Provinces, after remitting the sum of twenty-six lakhs of Rupees to the Royal Circar and providing for the expenses of the Nizamut. It is requisite that our descendants, the Viziers, the bestowers of dignity, the Omrahs high in rank, the great officers, the Muttaseddees of the Dewanny, the managers of the business of the Sultanut, the Jaghirdars and Crories, as well the future as the present, using their constant endeavours for the establishment of our royal command, leave the said office in possession of the said Company, from generation to generation, for ever and ever.

(Written on the 24th Sophar, of the 6th year of The Jaloos The 12th August, 1765).

---

১ ১৪৭, ১৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বাংলায় আড়াইশো বছর পরম্পরীণ ইংরাজ রাজপ্রতিনিধিরা

(পাঠ্যবস্তুর যথাযথ স্থানে এঁদের উল্লেখ আছে)

Governors of Bengal (Company) & Date of Assumed Charge

William Hedges, July, 1682
William Gyfford, Aug. 1684
Edward Littleton, July, 1699
Charles Eyre, May 26, 1700
John Beard, Jan. 7, 1701
John Russel, Mar. 4, 1710
A. Wellden, July 20, 1710
Robert Hedges, Dec. 3, 1713
Samuel Feake, 1717
John Deane, Jan. 1722
Henry Frankland, Jan. 1725
John Stackhouse, Jan. 1738
Thomas Bradyll, Jan. 29, 1738
John Forester, Feb. 4, 1745
W. Barwell, Apr. 18, 1748
Adam Dawson, July 17, 1749
Robert Clive, June 27, 1750
William Fytche, July 5, 1752
Rodger Drake, Aug. 8, 1752
H. Vansittart, July 27, 1760
John Cartier, Dec. 26, 1762
John Spencer, Dec. 3, 1764
Lord Clive, May 3, 1765
Harry Verelst, Jan. 29, 1767
J. Z. Holwell, Jan. 28, 1768
W. Hastings, April 13, 1772

Governor-General of Fort William in Bengal

W. Hastings, Oct. 20, 1774
Sir John M. Bart, Feb. 8, 1785
Cornowallis, Sep. 12, 1786
Sir John Shore, Oct. 28, 1793
Gl. A. Clarke, Mar. 17, 1798
Earl of Mornington, May 18, 1798
Cornowallis, July 30, 1805
George Barlow, Oct 10, 1805
Earl of Minto, July 31, 1807
Earl of Moira, Oct. 4, 1813
John Adam, Jan. 13, 1823
Earl of Amherst, Aug. 1, 1823
B. Bayley, Mar. 13, 1828

Governors General of India

William Bentinck, July, 1828
C. Metcalfe, Mar. 20, 1835
Lord Auckland, Mar. 4, 1836
Ellenbrough, Feb. 28, 1842
W. W. Bird, June 15, 1844
H. Hardinge, July 23, 1844
Lord Dalhousie, Jan. 12, 1848
Earl or Canning, Feb. 29, 1856

Viceroys and G. G. of India

Earl of Canning, Nov. 1, 1858

Earl of Elgin, Mar. 12, 1862
Robert Napier, Nov. 21, 1863
W. Denison, Dec. 2, 1863
John Lawrence, Jan. 12, 1864
Earl of Mayo, Jan. 12, 1869
John Strachy, Feb. 9, 1872
Lord Napier, Feb. 23, 1872
Lord Northbrook, May 3, 1872
Lord Lytton, April 12, 1876
Lord Ripon, June 8, 1880
Lord Dufferin, Dec. 13, 1884
Lansdowne, Dec. 10, 1888
Earl of Elgin, Jan. 27, 1894
Lord Curzon, Jan. 6, 1899
Lord Minto, Nov. 18, 1905
Lord Hardinge, Nov. 23, 1910
Lord Chemsford, April 4, 1916
Lord Reading, April 2, 1921
Lord Lytton, Oct. 4, 1925
Lord Irwin, April 4, 1926
Haukhurst, June 29, 1929
Willingdon, April 18, 1931
Sir John Stanley, May 16, 1934
Linlithgow, April 18, 1936
Brabourne, June 25, 1938
Lord Wavell, Oct. 20, 1943
Mountbatten, March, 24, 1947

Lient. Governors of Bengal

F. J. Halliday, April. 28, 1854
John P. Grant, May 1, 1859
Cecil Beadon, April 24, 1862
William Grey, April 24, 1867
G. Campbell, Mar. 1, 1871
R. Temple, April, 9 1874
Ashley Eden, Jan. 8, 1877
S. C. Bayley, July 15, 1879
A. Thompson, April 24, 1882
H. Cockerell, Aug 11, 1885
S. C. Bayely, April 2, 1887
C. A. Elliot, Dec. 17, 1890
A. MacDonnell, May 30, 1893
A. Mackenzie, Dec 8, 1895
Charles Stevens, June 23, 1897
J. Woodburn, April 7, 1898
J. Bourdillon, Nov. 22, 1902
A. H. L. Fraser, Nov. 2, 1903
Ampthill, April 30, 1904
Lancet Hare, April 10, 1906
F. A. Slacke, Aug. 16, 1906
E. N Baker, Dec. 1, 1908
F. W. Duke, July 14, 1911
Carmichael, April 1, 1912
Ronaldsay, Mar. 26, 1917
Earl of Lytton, Mar. 28, 1922
H Stephenson, June 10, 1926
F S. Jackson, Mar. 28, 1927
J. Anderson, Mar. 29, 1932
J. Woodhead, Aug. 10, 1934

Governors of Bengal

J. Anderson. April 1, 1937
Brabourne, Nov. 27, 1937
R. N. Read, June 25, 1938
J. Woodhead, June 12, 1939
J. Herbertson, Nov. 18, 1939
R. G Casey, Jan. 22, 1944
H. Barrows, Feb. 19, 1946

উৎস নির্দেশ

কলকাতা দর্পণ	রাধারমন মিত্র, ১৯৮০
কিম্বদন্তী ঢাকা	নাজির হোসেন
কোচবিহারের ইতিহাস	খাঁ চৌধুরী আমানতুল্লা আহমদ
ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত	কার্তিকেও চন্দ্র রায়, ১৯৩২
চাক্‌মা জাতির ইতিহাস	সতীশচন্দ্র ঘোষ
জগৎশেঠ	নিখিলনাথ রায়
জগৎশেঠের কাহিনী	কণিষ্ক (রাম বসু)
ঢাকার ইতিহাস	যতীন্দ্রমোহন রায়, ১৩৮৯
ঢাকার কথা	রফিকুল ইসলাম
তারিখ্-ই-বাঙ্গালা	সলীমউল্লা, ১৭৬৩
দুর্গাপূজা-সেকাল থেকে একাল	বিমল চন্দ্র দত্ত, ১৩৯৩
নাটোরের কথা ও কাহিনী	নাটোর মহকুমা সম্মিলনী, ১৯৮১
প্রসঙ্গ কলকাতা	ডঃ নিশীথরঞ্জন রায়
বর্ধমান পরিচিতি	অনুকুল সেন ও নারায়ণ চৌধুরী
বংশ পরিচয় (১ম—২০ খণ্ড)	জ্ঞানেন্দ্রকুমার, ১৩২৮
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস	নগেন্দ্রনাথ বসু
বাঁকুড়ার ইতিহাস	প্রভাস সোম
বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি	অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায়
বাংলার ইতিহাস (নবাবী আমল)	কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়, ১৩১৫
বাংলাদেশের ইতিহাস (২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)	ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
বাংলার অনন্ত সামন্তচক্রের ইতিহাস	ধনঞ্জয় দাস মজুমদার
বাংলার ইতিহাস	রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়
বীরভূম বিবরণ (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)	মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী ও হরেকৃষ্ণ মুখার্জী
বৃহদ্বঙ্গ	দীনেশচন্দ্র সেন
ময়মনসিংহের ইতিহাস	কেদারনাথ মজুমদার
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, ১৮৬৯
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ	ডঃ অলোককুমার চক্রবর্তী

মহারাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর জীবন-চরিত	চন্দ্রকিশোর রায় গুণাকর
মহারাজা নন্দকুমার চরিত	সত্যচরণ শাস্ত্রী, ১৩০৫
মহারাজা নন্দকুমার	চণ্ডীচরণ সেন, ১৩৮৭
মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর জীবন-চরিত	বিপিনবিহারী মিত্র, ১৮৯৭
মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র	সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
মহারাজা রাজবল্লভ সেন	রসিকলাল গুপ্ত
মহারাজা সূর্যকান্ত	যোগেন্দ্রপ্রসাদ দত্ত, ১৩১৬
মহারানী স্বর্ণময়ী	বিহারীলাল সরকার
মেদিনীপুরের ইতিহাস	যোগেশচন্দ্র বসু
মেদিনীপুরের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন	বিনোদশঙ্কর দাস, ১৯৮৯
মুর্শিদাবাদের ইতিহাস	নিখিলনাথ রায়, ১৩০৯
মুর্শিদাবাদ কাহিনী	নিখিলনাথ রায়, ১৯৮৩
যশোহর ও খুলনা জেলার ইতিহাস	সতীশচন্দ্র মিত্র, ১৯৬৩
রাজসাহীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়
রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়	মন্মথনাথ ঘোষ
রাজা রাধাকান্ত দেব	দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী, ১৯৮৫
রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত	নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২৮৭
রাজা রামমোহন	দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৯২৮
রাজা সীতারাম রায়	যদুনাথ ভট্টাচার্য, ১৩১১
রাজা রামকৃষ্ণ	দুর্গাদাস লাহিড়ী
রাজা বৈদ্যনাথ	দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১৩২২
রানী ভবানী	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
রানী ভবানী	হারানচন্দ্র রক্ষিত
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (১ম, ২য় খণ্ড)	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫)	বিনয় ঘোষ
সিরাজদ্দৌলা	অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ১৩৬৫
সুবর্ণ বণিক—কথা ও কীর্তি	নরেন্দ্রনাথ লাহা
সেকালের কলকাতা	আর. কে. মিত্র
হিকি সাহেবের কলকাতা	বরুণ সেন
হুগলী জেলার ইতিহাস (তিন খণ্ড)	সুধীরকুমার মিত্র

BIBLIOGRAPHY

A Report on the district of Jessore, its Antiquities, its History and commerce	J. Wettland
A view of the Rise, Progress & Present state of English Government in Bengal	H. Verelst, (1767-72)
Alivardi and his Times	K. K. Dutta, 1963
Annals of Rural Bengal	W. W. Hunter
A Narrative of Transactions in Bengal	H. Vansittart, (1760-64)
Bara Bhuiyas of Bengal	D. Avity
Bengal Past & Presents, Vols. I, II, III (1907-1909)	
Bengal Nawabs	Jadunath Sarkar, 1952
Bengal under the Lt. Governors	C. E. Buckland, 1901
Changing Times	Maharaja Bhupendra Chandra Sinha
Chittagong Hill Tracts	R. H. Sneyd Hutchinson
Dictionary of National Biography	Edited by S. P. Sen
Diary (1681-89)	Sir William Hedges
Encyclopedia of India Vols. I, II, III (1807-09)	
Early Annals of the English in Bengal, Vols. I, II	C. R. Wilson
Fifth Reports	Ven. W. K. Firminger
Good Old Days of Honourable John Company	W. H. Carey
Golden Book of India	Sir Roper Leth Bridge

Glympises of Bengal — A. C. Campbell, 1907
History of the Indian Chiefs,
History of India — Mills
History of Bengal — J. N. Sarkar
History of Bengal — Charles Stewart, 1813
History of Bengal Suba — K. K. Dutta
History of Muslims of Bengal — Dr. Md. Mohar Ali
History of Murshidabad District — Walsh (Major)
Impeachment of Warren Hastings — Edmund Burke
Interesting Historical Events — T. Z. Holwell
India, a hundred years ago — D. D. Bishop Hunter
List of Documents of Calcutta, Part I (1764-1800) edited by — Prof. Adhir Chakravarty
Life of Warren Hastings — Malleson
Life of Lord Robert Clive — Sir John Malcolm, 1836
Maharaja Sukhmoy Roy — B. Chatterjee, 1910
Murshidkuli Khan and his times — A. Karim,
Mansad of Murshidabad — Dr. R. C. Majumder
Memoir of Maharaja Nabakrishna — N. N. Ghose
Rajas and Zamindars, Part II — Lokenath Ghosh, 1881
'Riaj-us-Salatin' — Golam Hoshain Salatin, 1788
'Sair Mutakherin' — Golam Hassain Khan.
Statistical Accounts of Bengal Vol. I — Hunters'
Tarikh-I-Dhaka — Rahaman Ali
Trial of Maharaja Nandakumar — H. J. Beveridge, 1886
Twelve Men of Bengal in the 19th Century — F. R. Bradley Birt 1910

All available District Gazetteers of Bengal (W. B. Secretariate Library, Writers' Buildings, Calcutta).

নির্দেশিকা